প্রবন্ধসংগ্রহ ২

সুকুমারী ভট্টাচার্য

গা ঙ চি ল

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০২

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

বিক্রয়কেন্দ্র
৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
বর্ণনা ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা ৭০০ ০৩২

প্রচ্ছদচিত্র: ঋগ্বেদ-এর লিপি। ভারত, ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ
পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু

মুখবন্ধ

এই খণ্ডে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত হল তার মধ্যে 'দাম্পত্যের স্বরূপ' একটু ভিন্ন। এতে বিবাহের নানা দিক নিয়ে আলোচনা আছে, যা হয়তো এ সমাজেও খানিকটা প্রাসঙ্গিক। দু'টি প্রবন্ধ— 'বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ' ও 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য'— বেদ আশ্রিত।

বহুকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে বেদের যুগে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু, ঘটনা হল খাদ্যের প্রার্থনায় মানুষ দেবতাদের কাছে মিনতি করে এসেছে, যজ্ঞ করেছে— কেননা খাদ্য সুরক্ষা ছিল অনিশ্চিত। আবার বেদের যুগেই মানুষ দেবতাদের উপর বিশ্বাসও হারাচ্ছিল— যজ্ঞ-অনুষ্ঠান কখনও কখনও ফলপ্রসূ হলেও, প্রায়শই হত না। সংশয় ও নাস্তিক্য চিরকালই নানা পরিমাণে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত, কেউ স্বীকার করত, কেউ বা করত না। এমন কোনও যুগ ছিল না যখন মানুষ এ দু'টিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছিল। মানুষের জীবনে বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংশয়, আত্মসমর্পণ নানা রূপে দেখা দেয়— নানা জটিল রূপ ধারণ করে। যখন সেটা সরল বিশ্বাস, তখন সেটা সাধারণ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য, জটিল ব্যাপার কম জনপ্রিয়। এই আলোচনা আছে 'আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত' প্রবন্ধে। মানুষ এ দুই মহাকাব্যকে গ্রহণ করেছে দু'টি পর্যায়ে— একটির কাহিনি সরল ও জনপ্রিয়, অন্যটি জটিল, কম জনপ্রিয়— কিন্তু অত্যন্ত চিন্তাপ্রণোদক। রামায়ণের সারল্যের বিপরীতে মহাভারতে নানা সামাজিক অসমতা ও নৈতিক সংকট নিয়ে যে জটিল বুনন তা পাঠকের মনকে প্রশ্নসমৃদ্ধ করে।

এ লেখাগুলোতে উপস্থাপিত বক্তব্য আগে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়েছে— 'প্রবন্ধসংগ্রহ'তে অন্তর্ভুক্তিকালে যথাসম্ভব পরিমার্জন করার সুযোগ পাওয়া গেল। সংগ্রহ প্রকাশের যে দুঃসাহসিক ঝুঁকি গাঙচিল-এর শ্রীমতী অণিমা ও শ্রীঅধীর বিশ্বাস নিয়েছেন, তাতে তাঁদের ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় নেই, কিন্তু বুদ্ধিচর্চার প্রতি টানটা স্পষ্ট। শ্রীবিপুল গুহ-র সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। শ্রীঅমল দত্ত যে ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে অক্ষরবিন্যাসের কাজটি করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ শব্দটা খুবই ছোট।

খণ্ডগুলো সম্পাদনার বিপুল শ্রমসাধ্য কাজটি কাঁধে তুলে নিয়েছে আমার ছাত্রকল্প শ্রীমান কুমার রাণা। তার জীবন আনন্দময় হোক।

সূচি

বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ

২

বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য

৩

আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত

৪

দাম্পত্যের স্বরূপ

বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ

প্রাক্‌কথন

অন্নাভাব প্রাচীনকালে পৃথিবীর সব দেশেই ছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের গ্রিসে হেসিয়ডের 'ওয়র্কস্ অ্যান্ড ডেজ' বইতে পড়ি, 'যে ব্যক্তির বাড়িতে যথাকালে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত হয়নি— ভূমিতে জন্মায় যে ফসল, শস্যলক্ষ্মীর দানা সেই খাদ্য— সেই লোকের কোর্ট কাছারির বিবাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।'[১] অর্থাৎ সমাজে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হল খাদ্য সঞ্চয়। এ রকম বিত্তবান সমাজে মুষ্টিমেয়ই ছিল, গ্রিসে শুধু নয়, সর্বত্রই। সঞ্চয়ের উপদেশ দিচ্ছেন হেসিয়ড, সঞ্চয় ক্ষুধাকে ঠেকায়।[২] সঞ্চয়ের প্রাকশর্ত হল প্রাচুর্য এবং উদ্বৃত্ত এবং সেটা জনসাধারণের ভাগ্যে কখনওই ঘটত না। তারা সারা পৃথিবীতে চিরকালই 'দিন আনি দিন খাই'-এর শেকলে বাঁধা। প্রাচীন মিশর, চিন কোথাওই চাষি-মজুর সারা বছর পেট ভরা খাবার পেত না। ভারতবর্ষও ব্যতিক্রমী নয়; দারিদ্র্যে, অভাবে, ক্ষুধায় অন্য সব দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষেরও বৃহৎ জনগোষ্ঠী এক সারিতেই ছিল। পার্থক্য একটাই: আমরা বলে থাকি, প্রাচীনকালের মানুষ প্রাচুর্যে লালিত ছিল। দেশটা ছিল সুজলা সুফলা। এমনকী রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য / দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন'। কখনও কখনও ভারতবর্ষ থেকে খাদ্যপণ্য বিদেশে গেছে এ কথা যেমন সত্য তারই সঙ্গে এ-ও সত্য, সে রপ্তানি সম্ভব হয়েছে দেশের বহু লোককে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করে। ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিও করেছে। বৈদিক আর্যরা সর্বতোভাবে তৃপ্ত ছিল এমন একটা রূপকথা প্রায়ই প্রচারিত হয়। এক ধরনের ইতিহাস বইতে এবং গণমাধ্যমে এ ধরনের কল্পিত কথা প্রায়ই পরিবেশিত হয়। সেই রূপকথাটা যাচাই করতেই এ প্রবন্ধের সূত্রপাত।

ক্ষুধা ও খাদ্যের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান ছিল। এ কথা শুনতে যত অপ্রিয়ই হোক, মানতে যত অসুবিধেই হোক না কেন, বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি-সহযোগে সেই তথ্যগুলি এ বইতে সন্নিবেশিত হল। যে ধরনের নির্লজ্জ মিথ্যা, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস

১ 'Little concern has he with quarrels and courts who has not a year's victuals laid up betimes, even that which the earth bears.' Hessiod, *Works and Days*. pp. 30-32.

২ 'He who adds to what he has, will keep off brighteyed hunger.' *ibid* p 363

বলে ছড়ানো হয়েছে তারই কিছু প্রতিকার ঘটুক প্রকৃত তথ্য থেকে, এ বাসনা এই রচনার পিছনে কার্যকরী। বৈদিক যুগে অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পেত না, এটা তথ্য। বিজ্ঞান তখন খুবই পশ্চাৎপদ ছিল; শস্য উৎপাদনের কৃৎকৌশল ছিল অনুন্নত, শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না; প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি ঘটত; এ সবের জন্যে যে-অভাব তা ছিল সার্বত্রিক এবং তার মধ্যে গ্লানির কিছু নেই। আবার বৈদিক ইতিহাস অনুধাবন করতে করতে দেখি, আর্যরা আসার চার পাঁচ শতাব্দীর মধ্যেই উৎপাদন ব্যবস্থায় কৌশলগত প্রকরণে বিপ্লব এসে যাওয়ায় উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রয়োজনকে ছাপিয়ে কিছু উদ্বৃত্তও থাকছে। কিন্তু ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে শ্রেণিবিভাগও দেখা দিয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে। তারা তা নিরন্ন মানুষের মধ্যে বণ্টন না করে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করল স্বদেশে ও বিদেশে। ফলে নিচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন কোনও দিনই মিলল না।

উপনিষদের যুগে দেখা দিল জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব এবং তার কিছু পরে কর্মবাদ। কাজেই খেটেখাওয়া মানুষের অর্ধাহার-অনাহারের পুরো ব্যাখ্যা মিলল: মানুষ যেহেতু মৃত্যুর পরে বারে বারে জন্মায়, তাই এ জন্মের এই যে অন্নাভাব এ তার পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিরই ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিটা এ জন্মের অগোচরে, এ জন্মের সুকৃতি দিয়ে তার প্রতিকার ঘটবে যে পরজন্মে, সে-ও তার অগোচরে। ফলে মেনে নেওয়া ছাড়া এবং সমাজের কর্তাব্যক্তিদের শ্রীচরণ সেবা করা ছাড়া অভুক্ত দরিদ্রের আর করবার কিছুই রইল না। কাজেই দুঃখ দারিদ্র্য যথাপূর্বম রইল, ব্যাখ্যা রইল, আর রইল নিষ্প্রতিকার ক্ষুধা।

ব্যাখ্যা-দুর্ব্যাখ্যা দিল শাস্ত্র এবং তার প্রবক্তা ও পুরোহিতরা। এরা নিজেরা উৎপাদনকর্ম থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেয়ে বাকি সমাজের ওপরে পরগাছার মতো থেকে খাদ্যের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছিল। এই উৎপাদক-অনুৎপাদক বিভাজন বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। পুরোহিতদের উৎপাদন করতে হত না, যজ্ঞের ক্রিয়াকর্মই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত কর্ম, বাকি সময়ে তার বিনিময়ে তারা বরাদ্দ খাদ্যে অধিকারী ছিল। শ্রমকে যখন কায়িক ও মানসিক হিসেবে দু'ভাগ করা হল, তখন থেকে পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে কায়িকশ্রমী বুদ্ধিজীবীর চেয়ে নিচের স্তরের জীব বলে পরিগণিত হতে লাগল। সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেল শাস্ত্রকার ও পুরোহিতদের হাতে। যেহেতু মূলত ক্ষত্রিয় রাজারাই তখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাই ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সাহিত্যে ক্ষমতার জন্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের একটা রেষারেষি চোখে পড়ে।

সংহিতা-ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডে খাদ্যের জন্যে সরাসরি প্রার্থনা অসংখ্য; সমস্ত দেবতার কাছে, সব ঋষিবংশের সূক্তকাররাই খাদ্যের জন্যে করুণ আর্তি নিবেদন করেছেন। তার মধ্যে ক্ষুধার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা দুই-ই ধরা পড়ে। যজ্ঞ করা হত খাদ্যলাভের জন্যে, অন্যান্য ঐহিক সুখের জন্যেও, কিন্তু খাদ্য ছিল একটি মুখ্য কাম্যবস্তু। ক্ষুধা সম্পর্কে আতঙ্ক বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে অশনায়াপিপাসে, ক্ষুধাতৃষ্ণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আবেদনে। অশনায়াপিপাসার অপর নাম মৃত্যু, এর থেকেই ক্ষুধা সম্পর্কে আতঙ্ক স্পষ্ট

বোঝা যায়। যজ্ঞ দিয়ে, দেবতার স্তব দিয়ে, তীব্র প্রার্থনা দিয়ে ক্ষুধাজনিত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা দেখতে পাই।

আরণ্যক-উপনিষদে অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে কি ছবিটা পালটে গেল? তখন তো লোহার লাঙলের ফলা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, স্বল্পতর শ্রমে বেশি জমি চাষ করা যাচ্ছে, ফসল ফলছে বেশি। ক্ষুধার প্রকোপ কি তখন কমল কিছু? এ যুগে মুখ্য কথাটা যজ্ঞ নয়, ব্রহ্মজ্ঞান। ধর্মচেতনায় জন্মান্তরবাদ এসে গেছে, এবং তারই সঙ্গে জন্মান্তরের পরম্পরা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে জ্ঞান দিয়ে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করাই তখনকার ধর্মাচরণের প্রকৃষ্ট পথ। যেখানে এই সব তত্ত্বকথা সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে খাদ্যের জন্যে আকুলতা কি কমেছে কিছু?

আরণ্যক-উপনিষদ সাহিত্যে ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। এখানেও ক্ষুধার অন্নের জন্যে একই রকম আগ্রহ এতটাই যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে ব্রহ্মের সঙ্গে অন্নকে বারে বারে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। নানা উপাখ্যানে ও সন্দর্ভে ক্ষুধার গুরুত্ব এবং অন্নের মহিমা ব্যক্ত করা হয়েছে। তার সংখ্যা ও পরিমাণ এত বেশি যে এ যুগেও নিরন্ন মানুষের সংখ্যা, সমাজে অন্নের ব্যাপক অভাব, ক্ষুধায় মৃত্যুর আতঙ্ক সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

তত্ত্ব আলোচনার যুগে মাঝেমাঝেই যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের সভায় এসে আলাপ করতেন। একবার তেমনই আসার পরে জনক প্রশ্ন করলেন, 'কী মনে করে ঠাকুর? ব্রহ্মতত্ত্বের জন্যে এলেন, না গাভীর জন্যেই?' 'দুইয়ের জন্যে, মহারাজ', নিঃসংকোচে বললেন যাজ্ঞবল্ক্য। অন্যত্রও পড়ি খাদ্যসংস্থান বা বৈভববৃদ্ধির জন্যে যাজ্ঞবল্ক্যের তৎপরতার কাহিনি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের যেমন সরাসরি জনকের সভায় খাতির ছিল বলে নিজের ইষ্টসিদ্ধিটা তিনি ঠিক মতো গুছিয়ে নিতে পারতেন, আপামর-জনসাধারণের তো সে সুবিধে ছিল না। রাজদ্বারে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাই অভাবের দিনে তাদের উপবাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন বিধান ছিল না যে, খরা-অজন্মার দুর্ভিক্ষে রাজকোষ উন্মুক্ত করে নিরন্ন মানুষের অন্ন জোগাতে হবে। নিশ্চয়ই অঞ্চলে কোনও কোনও রাজা বা ভূস্বামী তা করতেন, কিন্তু এমন বহু তথ্য পাওয়া যায় যখন ভিক্ষা সংগ্রহ করতে না পারলে মানুষকে উপবাস করতেই হত। মনে পড়ে:

> দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
> জাগিয়া উঠিল হাহা রবে,
> বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে
> শুধালেন জনেজনে,
> ক্ষুধিতের অন্নদানসেবা
> তোমরা লইবে বল কেবা।

রাষ্ট্রে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে বুদ্ধ তাঁর ভক্তদের সে দায়িত্ব নিতে বলতেন না।

পুরাকালে মানুষের অবস্থা ভাল ছিল, বেদের যুগে মানুষ বেশি ভাল খেতে, পরতে পেত এমন একটা কল্পকথা সমাজে চালু আছে; এ গ্রন্থে বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ নজিরে এ কল্পকথাটা যাচাই করতে গিয়ে ঠেকে গেছি। উত্তর-বৈদিক তত্ত্বের যুগেও যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর প্রস্থানের বড় বড় তত্ত্বের প্রবক্তা, তাঁরা ইহকাল, পরলোক, জন্মান্তর, কর্ম, কর্মফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে মানুষগুলো দিনভর খেটে তাঁদের অন্ন জুগিয়ে নিশ্চিন্ত রেখেছে, ওই সব তত্ত্ব আলোচনার অবকাশে সেই হতভাগ্যরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেল কিনা তা নিয়ে তাঁরা কেউই মাথা ঘামাননি। ফলে সমাজে ধর্মচর্চাও চলল, পাশাপাশি ক্ষুধার প্রকোপও রইল অব্যাহত। মনে পড়ে, গান্ধীজির একটি উক্তি,[৩] 'ক্ষুধিতের সামনে স্বয়ং ভগবানও খাদ্য ছাড়া অন্য চেহারায় আসতে সাহস পান না।' 'সাহস পান না' কথাটা প্রণিধানযোগ্য। ক্ষুধা এক তীব্র অভিজ্ঞতা, তার দাবিও তেমনই অপ্রতিরোধ্য। তার মুখোমুখি হতে গেলে কেবলমাত্র খাদ্যসংস্থান দিয়েই তা সম্ভব; নীতিকথা, ধর্মাচরণ, তত্ত্ব-উপদেশ সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এই যে সরাসরি খাদ্য দিয়ে ক্ষুধার মোকাবিলা করা, তা বেদের যুগেও হয়নি, আজও হয়নি।

এই নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ। পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু 'গাঙচিল' কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত আমার রচনা সংকলনে অন্তর্ভুক্তি কালে যথাসম্ভব পরিমার্জন করার চেষ্টা হয়েছে। মূল্যায়নের ভার পাঠকের।

৩ 'Before the hungry even God dares not come except in the shape of bread.'

খাদ্যের প্রার্থনা

মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক— এই এক হাজার বছর সময়কালে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়। সম্ভবত ভারতের বাইরেই এর রচনা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে সেই কাজ এ দেশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর প্রধান দুটো ভাগ: কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ও উপনিষদ। আমাদের আলোচনায় সংহিতা পর্বকেই বৈদিক সাহিত্যের পূর্বভাগ ধরে নেব, যদিও ব্রাহ্মণের অনেকগুলিই সেই যুগে রচনা হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের আলোচনা করব, কারণ বিষয়গতভাবে এ তিনটির সংযোগ অনেক বেশি।

আর্যরা ভারতবর্ষে একবারে আসেনি, দলে দলে, বারে বারে এসেছিল। তাদের মধ্যে একটি দলই বেদ বহন করে এনেছিল— সেটিই হয়তো ছিল শেষ বৃহৎ দল। তখনকার ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানাও খুব স্পষ্ট নয়, হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের দিকের অনেকটা অংশই ভারতবর্ষের সীমার মধ্যেই ছিল। আর্যরা ঠিক কবে কোথা থেকে আসে তাও খুব সুনিশ্চিত নয়।[১] তবে বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে একটি বৃহৎ ভূখণ্ডে যে ইন্দো-ইরানীয় ও ইন্দো-আর্য ভাষা কথিত হত, আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রামশরণ শর্মার মতে, 'দক্ষিণ পারস্য থেকে, আফগানিস্তান হয়ে বালুচিস্তান পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে এক প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। ইন্দো-পারসিক ও ইন্দো-আর্য ভাষাভাষী লোকেরা ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের পর এখানে বসতি স্থাপন করে।'[২]

প্রথম দিকে যে সব আর্য গোষ্ঠী খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে আসে তাদের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের কিছু সূক্ত বহন করে

---

১ Habib, Irfan & Faiz Habib, "The Historical Geography of India 1800-800 B C." in *Proceedings of the Indian History Congress*, 52nd section (ed), K M Srinali, Secy, Indian History Congress, New Delhi, 1991-92, pp. 72-97.

২ '...a vast area with a pre-Aryan population extended from South Iran through Afganistan to Baluchistan in which the speakers of the Indo-Iranian and the Indo-Aryan languages settled after 2000 B C ' R S Sharma; *Looking for the Aryans*. Orient Longman, 1995, p 70.

শেষতম যে গোষ্ঠীটি ভারতবর্ষে এল তাদের বিষয়ে জানবার একমাত্র উৎস ঋগ্বেদ। মনে করা হয় যে, এরা যাযাবর পশুচারী ছিল। হয়তো-বা আরও দূর অতীতে এরা ইয়োরোপের কোনও অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে, কয়েক শতক পরিক্রমা করে, এখানে পৌঁছয়। তখন এদের মূল খাদ্য ছিল ফলমূল, গরু ছাগলের দুধ, ঘি, দই, ক্ষীর, ইত্যাদি, আর আগুনে-ঝলসানো পশুমাংস। যে সব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এরা আসে তাদের মধ্যে অনেকেই চাষ করতে জানত, ফসল থেকে তৈরি রুটিও সে অঞ্চলে এরা কখনও কখনও পেয়ে ও খেয়ে থাকবে। কিন্তু এরা নিজেরা চাষ করতে জানত না। যাযাবর অতীতে এরা যখন কোনও বিপদে পড়ে বা বিপদের আশঙ্কায় দেবতার শরণাপন্ন হত, অথবা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বা ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে কৃতজ্ঞতায় দেবতা শরণ নিত, তখন এরা খুব সংক্ষিপ্ত একটা যজ্ঞ করত। সম্ভবত দলেরই— প্রবীণতম বা প্রাজ্ঞতম— একজন একটা পরিষ্কার জমিতে একটা পশু বধ করত। সে নিজে বা আর কেউ কিছু মন্ত্র আবৃত্তি বা গান করত। তারপর সেই মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে সকলে ভাগ করে খেত এবং যে লোকটি পশু বধ করে গানে, আবৃত্তিতে যজ্ঞটি নিষ্পন্ন করত, সে-ও তার পরই পশুপালক হয়ে দলে যোগ দিত। এই ছিল প্রাথমিক পর্বের যজ্ঞ। পশুচারীদের মধ্যে চালু ছিল বলে এ যজ্ঞপদ্ধতির কয়েকটি স্থায়ী লক্ষণও ওই জীবনযাত্রার দ্বারা নিরূপিত হয়েছিল। যেমন, এরা নিজেরা যাযাবর ছিল বলে এদের কোনও মন্দির ছিল না, কোনও দেবমূর্তিও ছিল না। বেদি ছিল পরিষ্কার-করা এক টুকরো জমি। ওই বেদির ওপরে দেবতাদের উদ্দেশে স্তব করে নিজেদের অভ্যস্ত খাদ্য— পশুমাংস, মধু, দুধ, ঘি, ইত্যাদি নিবেদন করত এবং যা তাদের প্রয়োজন তার জন্য প্রার্থনা করত। কী সেই স্তবস্তুতি? দেবতাদের বর্ণনা আর পূর্বে তাঁরা ভক্তদের যা যা দিয়েছেন তার উল্লেখ করে প্রশংসা। আর প্রার্থনা হল: শত্রুজয়, দীর্ঘজীবন, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, পুত্রসন্তান, ধনসম্পত্তি (প্রধানত গোধন) এবং সর্বোপরি খাদ্য।

ইতিহাসের প্রথম পর্বে মানুষ ফলমূল সংগ্রহ করত; তার পরে শিকার করে মাংস সংগ্রহ করত। তার পরের পর্যায়ে সে পশুপালন করত। শিকার পাওয়া খানিকটা অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু পশুপালনে খাদ্যসংস্থান অনেক বেশি নিশ্চিত ছিল। ভারতবর্ষে আসবার সময়েও আর্যরা যাযাবর পশুচারীই ছিল, অনেক পরে প্রাগার্যদের কাছে চাষ করতে শিখেছিল। এ দেশে এসে তারা প্রাগার্যদের হারিয়ে দেয়। পরাজিতদের একটি অংশ আর্যদের দাসে পরিণত হয়, বাকিরা বিন্ধ্য পর্বতমালার কাছের অরণ্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। আর্যরা ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পঞ্জাবে ও পরে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ দখল করে বসবাস করতে থাকে। বনজঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে, তত দিনে তারা প্রাগার্যদের কাছ থেকে চাষ করতে শিখেছে।

তার আগে প্রথম যখন প্রাগার্যদের সঙ্গে সংঘাত হয়, তখনো আর্যরা পশুপালকই ছিল এবং প্রাগার্যদের সম্পত্তি ও খাদ্য লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করত, শিকারও করত, বনে ফলমূল সংগ্রহও করত। কিন্তু এ সব মিলিয়েও যা খাবার জুটত তা তাদের প্রয়োজনের

তুলনায় কম ছিল। শিকারের যুগ থেকে পশুপালনের যুগ পর্যন্ত খাদ্য সংকট তাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। শিকার পাওয়া ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করত, আর পশুপালনেরও নানা বিপদ ছিল; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে ঘাসের জমি নষ্ট হয়ে গেলে পশুপালের খাদ্যের অভাব হত এবং তখন পুরনো চারণভূমি ছেড়ে নতুন চারণের উদ্দেশে যেতে হত। এ ধরনের অনিশ্চয়তা লেগেই থাকত। তা ছাড়া পশুপালে মাঝে মাঝে মড়ক দেখা দিত, তখন পশুপালকদের খাবার— দুধ ও মাংসে টান পড়ত। খাবারের জোগানে এই রকম অনিশ্চয়তাতে আর্যরা অভ্যস্ত ছিল। কাজেই দেবতাদের কাছে খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা তাদের নিত্যকার প্রধান একটি প্রার্থনা ছিল। এই অংশে আমরা বেদের পূর্বভাগ হিসেবে শুধু ঋগ্বেদ সংহিতা নিয়েই আলোচনা করব।

ঋগ্বেদের কিছু অংশ হয়তো আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার আগেই রচনা করেছিল। এই অংশে এবং পরে এ দেশে এসেও তারা যে ঋক্‌গুলি রচনা করে তাতেও খাদ্যের জন্যে বিস্তর প্রার্থনা আছে। এ সব প্রার্থনায় খাদ্যের নানা প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন বিশেষত 'আস্য' রচনা— যা মুখে মুখে রচিত এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত— তাতে প্রতিশব্দ-প্রয়োগ বিলাসিতা। কোনও প্রাচীন আস্য সাহিত্যেই এক অর্থে বহু প্রতিশব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। তবু, এক ঋগ্বেদেই অন্নের চোদ্দটি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়: অন্ন, অন্ধস্, ইষ, বাজ, পৃক্ষ, পিতু, ভক্ত, শ্রবস্, স্বধা, ঊর্জ, ইলা, চন, নমস্ ও বয়স্। এখন এর কয়েকটি হয়তো আঞ্চলিক প্রতিশব্দ, দু-চারটি হয়তো বা কোনও বিশেষ ধরনের খাদ্য বোঝাত। তা হলেও এতগুলি প্রতিশব্দে তখনকার সমাজে খাদ্যের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাই বোঝাত। নানা নামে অভিহিত হয়ে খাদ্যের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা যেন বিশেষ একটি তাৎপর্য পেয়েছে।

খাদ্যের প্রার্থনা কোন দেবতার কাছে করা হত? ঋগ্বেদে খুব কম দেবতাকেই বিশেষ কোনও অভীষ্টের জন্য আহ্বান করা হত। বায়ুবাতাঃ, পর্জন্য, আপঃ, নদঃ— এগুলি প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রকাশ, যেমন, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি। কিন্তু প্রার্থনার বেলায় এঁরা কেউই বিশেষ কোনও অভীষ্ট বস্তু দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। মোটের ওপরে অধিকাংশ দেবতার কাছেই প্রায় সব রকমের কাম্যবস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু খুব অবাক লাগে যখন দেখি, খাদ্যের জন্যে বেশ ছোট ছোট, অর্থাৎ কম তাৎপর্যপূর্ণ এমন সব দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যাঁদের উদ্দেশে ঋক্‌ও কম, দেবমণ্ডলীতে যাঁদের গুরুত্বও কম। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশ সূক্ত, তাই খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা তাঁর কাছেই সবচেয়ে বেশি। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, অশ্বিনৌ, উষস্, বরুণ, আপঃ, নদ্যঃ, আদিত্যরা, মিত্র, সবিতা, সূর্য, সোম (পবমান)— এঁরাও ঋগ্বেদে প্রধান দেবতাই, এঁদের কাছে খাদ্যভিক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু বেশ কিছু অপেক্ষাকৃত গৌণ দেবতার কাছেও খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে: বৈশ্বানর, দ্রবিণোদা (অগ্নি), পূষা, রুদ্র, সরস্বতী, অপাং নপাৎ, নদী, অরণ্যানী, দধিক্রাবা, ঋভবঃ, শুদ্ধাগ্নি, ত্বষ্টা, এমনকী ইন্দ্রের দুটি ঘোড়া— হরীও বাদ যায়নি। এর থেকে মনে হয়, স্তোতারা এ ব্যাপারে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। কে জানে কোন দেবতার বিশিষ্ট কী

কী ক্ষমতা আছে? সকলকেই বলা রইল, যাঁর যা সাধ্য আছে দিয়ে দেবেন। খাদ্যের টানাটানির যুগে এটা স্বাভাবিক।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে মোটামুটি যে দু-ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে দেবতাদের প্রশংসা বা স্তব বাদ দিলে থাকে প্রার্থনা। আগেই দেখেছি, এ সব প্রার্থনা নিরাপত্তা, পরমায়ু, সম্পত্তি ও খাদ্যের জন্যে। খাদ্য নিয়ে ঋগ্বেদে প্রার্থনা প্রচুর। ভাষায় প্রকারভেদ আছে, কিন্তু মূল সুরটা একই:

> '(অগ্নি) আজ তুমি সুমনা হয়ে খাদ্যবিষয়ে, আমাদের দানশীল রক্ষক হয়ো— ইষং পৃণ্বতাং সুকৃতে সুদানব তা বর্হিঃ সীদতং নরাঃ'; (১:৩৬:২) '(অশ্বিদ্বয়) তোমরা সৎকার্যকারীকে অন্নে ভরিয়ে দিও'; (১:৪৭:৮) 'দেব ইন্দ্র নানা রকম খাদ্য দিয়ে আমাদের পূর্ণ কর ব্যাপ্ত ভূমিতে— ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব। চিত্রমিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজান্'; (১:৬৩:৮) '(অশ্বিদ্বয়) আমাদের জন্যে খাদ্য বহন করে এনো— আ ন উর্জং বহতামশ্বিনা যুবন।' (১:১৫৭:৪)

এ সব থেকে দেবতাদের কাছে খাদ্যের জন্যে মিনতি স্পষ্টই বোঝা যায়:

> 'ইন্দ্র ঊর্ধ্বে অন্নের দাতা— ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা'; (১:৩৬:১৩) 'উষা অন্ন দাও— উষো বাজং হি বংস্ব'; (১:৪৮:১২) 'সমস্ত স্ত্রোতাদের অন্ন দিও— বিশ্বে সচন্ত প্রভৃথেষু বাজম্'; (১:১২২:১২) 'আমরা যেন অন্ন, খাদ্য, সুরক্ষা সুখ ভোগ করি— ইষমুর্জং সুক্ষিতিং স্যুম্নমশ্যুঃ'; (২:১৫:৮) 'কীর্তির জন্যে অন্ন মুক্ত করে দিও— বাজং শ্রুত্য অপাকৃধি'; (২:১:৬) 'আমরা নিশ্চিত সুরক্ষার জন্যে অন্নলাভের জন্যে (স্তুতি করছি)— স্ফারবৃক্তাভিরূতীভী রথে মহে সনয়ে বাজসাতয়ে'; (২:৩১:৩) 'উষা আমাদের জন্যে গাভী, অশ্ব, বীর্যযুক্ত (অর্থাৎ যা বীর্য দান করবে এমন) স্তবের উপযোগীয় ও অন্ন দান করুন— সা অস্মাসু ধা গোমদশ্ববদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্যম'; (১:৪৮:১২) 'হে ইন্দ্র যেন ঐশ্বর্য এবং যা অতিশয় দীপ্ত এমন অন্ন, খাদ্য লাভ করি— সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুচন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ'। (১:৫৩:৫) অন্নই প্রধান প্রার্থিত বস্তু; এরই জন্যে ভক্তের আর্তি। 'যে স্তব করছে তার জন্যে সুন্দর অন্নের ব্যবস্থা কর— বর্ত ধিয়ং জরিত্রে বাজপেশসম'; (২:৩৪:৬) 'অন্নের ব্যবস্থা কর যেন রথের ঘোড়াও আমি লাভ করি'; (২:৩২:৭) 'ইন্দ্র ও অগ্নি তোমাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা করছি— ইন্দ্রাগ্নী ইষং তা আবৃণে।' (৩:১২:৫)

নানা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কাছে অসংখ্য বার এই ধরনের প্রার্থনা করেছেন।

ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে আমাদের রক্ষা কর, স্তোতাদের পালন কর, আর অন্নে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, 'অন্নে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর।' অন্ন কি তারা তখন আহার করছিল না? করছিল; তবে সে আহার কখনও জুটত, কখনও জুটত না; কারও কারও জুটত, কারও কারও জুটত না; কখনও প্রয়োজন মতো পরিমাণে জুটত, কখনও অর্ধাহার বা স্বল্পাহারে দিন কাটাতে হত। অর্থাৎ প্রয়োজনের

অনুপাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আহার সকলের জুটত না। একটা অনিশ্চয়তা ছিল, ফলে অন্নাভাবের, অনিয়মিত পরিমাণের আহারের আতঙ্ক ছিল। দেবতার কাছে প্রার্থনা— অন্নে 'অধিকার' প্রতিষ্ঠা কর। অধিকার থাকলে প্রভুত্ব থাকে, প্রয়োজন মতো অন্ন প্রতিদিনই পাওয়া যায়। সেইটে তখন পাওয়া যাচ্ছিল না বলে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আহারের নিশ্চয়তার জন্য এই প্রার্থনা: 'সুরক্ষা ও অন্নই মুখ্য অভীষ্ট— রক্ষা চ ন মঘোনঃ পাহি সুরীন রায়ে চ নঃ স্বপত্যা ইষে ধাঃ।' (১:৫৩:৫) আনুষঙ্গিক নানা কাম্যবস্তু, সূক্তগুলির মধ্যে মাঝেমাঝেই অনুপ্রবেশ করছে যেমন দেখেছি গাভী, অশ্ব, রথের বাহন। কিন্তু মূল ভিক্ষা হল, 'তিনি আমাদের অনেক খাদ্য দিন— স নো যক্ষি মহীমিষম।' (৪:৩২:৭) এই প্রার্থনাটি অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে: প্রচুর অন্ন দাও। নানা ভাষায় 'প্রচুর অন্ন'-র জন্যে দেবতাদের কাছে স্তুতি করে প্রার্থনা করা হয়েছে। এর থেকে একটিই সিদ্ধান্ত করা যায়: অন্ন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল না। যথেষ্ট পরিমাণের অর্থ হল, প্রয়োজন মিটবার মতো। প্রয়োজন উদরপূর্তির এবং বল ও শক্তিলাভের জন্য যা পর্যাপ্ত।

মনে রাখতে হবে, যাযাবর পশুচারী আর্যদের জীবনযাত্রা কঠোর ও প্রচুর শ্রমসাধ্য ছিল। ফলে তারা যেমন শারীরিক পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিল, তেমনই তাদের ক্ষুধা ও পুষ্টির প্রয়োজনও বেশি ছিল। ভারতবর্ষে এসে তারা যতটুকু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছিল, স্পষ্টতই তা প্রয়োজনের অনুপাতে পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে উদরপূর্তিও হত না, পুষ্টিও হত না। তারা অপুষ্টিজনিত নানা ব্যাধিতে ও রোগে আক্রান্ত হত; যক্ষ্মার কথা ও অন্যান্য অপুষ্টির রোগের কথা অথর্ববেদে পাই। তাই অন্নের প্রাচুর্যের জন্য এ ধরনের প্রার্থনা বারে বারেই উচ্চারিত হয়েছে। নানা ভাষায় প্রাচুর্য বর্ণনা করা হয়েছে, 'শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে' 'অন্নের ধারা', 'গাভীযুক্ত অন্ন' অর্থাৎ অন্ন, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা বহু দেবতার কাছেই করা হয়েছে। এ সবের দ্বারা প্রমাণ হয় খাদ্য খানিকটা জুটত, কিন্তু সকলের নয়, খিদে মেটাবার মতো পরিমাণে নয়, পুষ্টিজনক নয়, প্রচুরও নয়। অসংখ্যবার তাই অন্নে প্রাচুর্যের জন্যে নানা ঋষি নানা দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন। এতে সমাজে খাদ্যাভাবের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> 'স্তোতাদের জন্য অন্ন বহন করে আনো— ঈষং স্তোতৃভ্য আ ভর'; (৫:৬:২,৩) 'অন্নলাভের পথ দেখিয়ে দাও— রৎসি বাজায় পন্থাম্'; (৫:১০:১) 'অন্নপ্রাপ্তির জন্য দান কর— আ বাজং দর্ষি সাতয়ে'; (৫:৩৯:৩) 'যারা স্তব করে তেমন ধনীদের জন্য, অন্ন দান কর— ইষং স্তোতৃভ্য মঘবদ্ভ্য আরট্'; (৭:৭:৭) 'আমরা পার হয়ে গিয়ে অন্ন লাভ করব— বয়ং তরুত্রা সনুয়াম বাজম্'; (৭:২৬:৫) 'হে ইন্দ্র নানা ধরনের অন্ন প্রকাশ কর— স ইন্দ্র চিত্রাঁ অভি তৃণহি বাজান্'; (৬:১৭:২) 'যেন অন্ন লাভ হয়— ভুবৎ বাজস্য সাতয়ে।' (৫:৯:৭)

'বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে বলা হচ্ছে তিনি 'অন্ন বর্ষণকারী'— পৃক্ষস্য বৃষ্ণঃ।' (৬:৮:১) উষাকে বলছে 'হে অন্নবতী, শোভন দীপ্তিসহ অন্নের প্রেরয়িত্রী হও— সুংদ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহিসং বাজেন বাজিনীবতি।' (১:৪৮:১৬) কেন অন্ন চাই? 'পুষ্টির জন্যে'— ঈষমশ্যাম ধায়সে।' (৫:৭০:২) সেই জন্যে বলছে, 'শ্রেষ্ঠ অন্ন আমাদের জন্যে বহন করে আনো—

ঈষমা বক্ষীহীষং বর্ষিষ্ঠাম্।' (৬:৪৭:৯) খাদ্যেরও ভালমন্দ আছে, পুষ্টিরও কমবেশি আছে। তাই সবচেয়ে পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ, বলদায়ী অন্নের জন্যে বারে বারেই প্রার্থনা শোনা যায়। 'সবচেয়ে বলযুক্ত অন্ন প্রশস্ত মনে করেন বিদ্বান্‌রা— শবিষ্ঠং বাজং বিদুষো চিদধ্বম্।' (৫:৪৪:১০) বা 'উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণ অন্নলাভের জন্যে— মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।' (৬:২৬:২) অথবা 'প্রশংসনীয় অন্নলাভের জন্য— বাজস্য রাধ্যস্য সাতৌ।' (৬:১১:৬)

কেমন সে অন্ন? 'খাদ্যের মধ্যে কাম্য অন্ন— ইষঃ পৃক্ষ ইষিধঃ...।' (৬:৬৩:৭) 'সুরক্ষার জন্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী অন্ন এনে দাও— ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে।' (৮:১:৪) 'নিকটবর্তী অন্ন' শুনলে সহসা অর্থবোধ হয় না। যখন কৃষিভূমিতে নিয়মিত উৎপাদন হচ্ছে না তখন অন্নকামী মানুষ মৃগয়া, লুণ্ঠন ও প্রাগার্যদের ফসল কেড়ে নিয়ে অন্নসংস্থান করত। নিজস্ব কৃষিভূমি বা বাস্তুর কাছাকাছি— যার কাছে নিজস্ব বা গোষ্ঠীগত পশুচারণভূমি— এগুলি কেড়েকুড়ে দখল করে নিতে সময় লাগা সম্ভব। ততদিন পর্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে প্রয়োজন মতো অন্ন সংগ্রহ করা অনিশ্চিত ছিল। তাই এ ধরনের প্রার্থনা:

> 'হে অন্নপতি আমাদের বীর্যদায়ী ধন দাও— স ত্বং ন উর্জাং পতে রয়িং ধাস্ব সুবীর্যম্'; (৮:২৩:১২) 'ইন্দ্র হলেন যশযুক্ত অন্নের অধিপতি— ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতি'; (১০:২৩:৩) 'এই অগ্নি হলেন শত সহস্র অন্নের অধিপতি— অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ'; (৮:৭৫:৪) 'প্রচুর পরিমাণে অন্ন দিতে পারেন, প্রচুর পরিমাণে অন্ন দাও, (পবিত্র কর) সোম, যার সঙ্গে গাভী আছে, হিরণ্য আছে, অশ্ব আছে, শক্তি আছে,— আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। অশ্ববদ্বাজবৎ সুতঃ; (৯:৪১:৪) 'প্রচুর কাম্য অন্ন ও ধন (দাও)— মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্; (১০:১৪০:৫) 'অন্ন দাও, উজ্জ্বল অন্ন দাও— বয়ো দধে রোচমাণো বয়ে দধে'; (৯:১১১:২) 'আমাদের সহস্র পরিমাণ অন্ন এনে দাও, সোম— ইন্দ বা ভব বিদাঃ সহস্রিণীরিষাঃ'; (৯:৪০:৪) 'ইন্দ্র, আমাদের কাছে শতপরিমাণ সহস্রপরিমাণ অন্ন নিয়ে এস— ইন্দ্র ণ উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া'; (৮:৯২:১০) 'সহস্র পরিমাণ অন্ন নিয়ে যেতে যেতে...— গচ্ছন্ মাবাজং সহস্রিণম্'; (৯:৩৯:১) 'সোম এই সোমযোগে যেন প্রচুর অন্ন পাই (সে ব্যবস্থা কর)— আ নো ইন্দো মহীমিয়ং পবস্ব (৯.৬৫:১৩) অথবা পবস্ব বৃহতীরিষ।' (৯:৪২:৬)

এই শত পরিমাণ সহস্র পরিমাণ, ঠিক কতটা পরিমাণ বোঝাত তার কোনও স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু কথ্যভাষায় যেমন 'শ'য়ে শ'য়ে, 'হাজারে হাজারে' বলে আমরা প্রচুর পরিমাণ বোঝাতে চাই এখানে মনে হয় সেই ব্যঞ্জনাটাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ অন্নের জন্যে আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা। বাস্তবে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলে এ সব প্রার্থনার দরকার হত না। প্রাচুর্যের জন্যে প্রার্থনার পিছনে থাকে বাস্তবে অন্নাভাব। তাই এত ভাবে ওই কথাটাই বলা হচ্ছে।

খাদ্যের জোগান যেন কেউ আচ্ছাদিত করে রেখেছে তাই ভক্ত দেবতাকে বলছে, 'অন্নের ওপরের আচ্ছাদন তুলে দাও অর্থাৎ মুক্ত কর অন্নের রাশিকে— উর্ণুহি বি বাজান্।' (৯:৯১:৪)

দেবতা ইচ্ছা করলে মানুষকে প্রচুর অন্ন দিতে পারেন, যখন দেন তখন কোথাও না কোথাও যেন একটি অন্নভাণ্ডার আছে, তার থেকেই দেন; তাই প্রার্থনা: উন্মুক্ত কর সে ভাণ্ডার, ঢেকে রেখো না, আমাদের বঞ্চিত কোরো না। অকৃপণ হস্তে অন্নদান করবার জন্যে এ ধরনের আরও বহুসংখ্যক প্রার্থনা থেকে বোঝা যায় সমাজে বৃহৎ একটি অংশ পর্যাপ্ত অন্ন পাচ্ছিল না, তাই এই আকুতি। বারংবার একই কথা নানা ভাষায় নানা দেবতাকে বলা, যেন কোনও না কোনও দেবতা কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তের দিকে তাকান, তার অন্নাভাব মোচন করেন।

প্রয়োজন শুধু অন্নের নয়, দুধের জন্যে গাভী চাই; নিরাপদে থাকবার জন্যে যুদ্ধ করতে হয়, তাই রথে বাহন অশ্বও চাই; দরকার বীরপুত্রেরও। তাই বারেবারে গাভী, অশ্ব ও পুত্রের জন্য প্রার্থনাও জুড়েছে অন্নের প্রার্থনার সঙ্গে:

> 'হে সোম, গাভী, বীর, অশ্ব সমেত অন্নের জন্যে তোমাকে প্রস্তুত করছি, এর থেকে আমাদের প্রতিদিন প্রচুর খাদ্য দাও— গোমন্নঃ বীরবদশ্ববদ্বাজবৎ সুতঃ। পবস্ব বৃহতীরিষঃ'; (৯:৪২:৬) 'দেবতা তোমরা আমাদের জন্যে প্রতিদিন ধন ও খাদ্য আনো— রায়েষাং নো নেতা ভবতামনু দ্যূন্।' (৩:২৩:২)

খাদ্যের প্রয়োজন শুধু উদরপূর্তির জন্যে নয়, শক্তির জন্যেও। মনে রাখতে হবে, আর্যরা এসে পড়েছিল এক প্রতিকূল পরিবেশে। তখন আর্যাবর্তে ব্যবহারিক জীবনে অনেক বেশি উন্নত সিন্ধুসভ্যতার প্রভাব। যুদ্ধে হোক বা প্রতাপে-পরাক্রমে হোক তাদের হটিয়ে দিয়ে আগন্তুকরা এখানে বসবাস করত। অতএব দ্বন্দ্ব সংগ্রাম লেগেই থাকত, এ সব সংগ্রামে শক্তিমান যোদ্ধার দরকার এবং তাদের শক্তি জোগায় খাদ্য। তাই খাবারে ঘাটতি থাকাটা আর্যদের পক্ষে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ব্যাপার। এই জন্যেই খাদ্যের জন্যে এত তীক্ষ্ণ আর্তি। উষার মহিমা এই জন্যেই যে তিনি 'শক্তি ও অন্ন বহন করে আনেন— বাজমূর্জং বহন্তীঃ'; (৬:১:৫) 'আকাশ ও পৃথিবী আমাদের শক্তিরূপে (অন্ন) দিন— উর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী পিন্বতাম্'; (৬:৭০:৬) '(বায়ু) স্থূল (= প্রচুর) শুভ্র মেদযুক্ত অন্ন দিন— পীবো অন্নাঁ বয়িবৃধ সুমেধা শ্বেতঃ সিষক্তি'; (৭:৯১:৩) 'যে অন্ন আমাদের বৃদ্ধি ঘটায় সেই খাদ্য দান কর— ধক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষমা বা চনঃ।' (৮:১৩:১৫) এই রকমই শুনি '(বায়ু) দান করেছিলেন পুষ্টিবর্ধক খাদ্য, অন্ন— অধুক্ষৎ পিপ্যুষীমিষ উর্জম্।' (৮:৭৩:১৬)

এই অন্ন গ্রহণ করেও তো মানুষ অনেক সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাই ভক্ত সন্তর্পণে নিবেদন জানায় যাতে যে-অন্নের দ্বারা রোগ নিবারণ হয়, দেবতা যেন তেমন অন্নই দান করেন: 'যক্ষ্মারহিত অন্ন প্রচুর পরিমাণে— অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ'; (৯:৪৯:১) '(দেবতা) দোহন করে দাও পুষ্টিবর্ধক অন্ন— ধুক্ষস্ব পিপুষীমিষম্।' (৯:৬১:১৫) অগ্নির কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, 'অগ্নি আয়ু সৃষ্টি কর, শক্তি এবং অন্ন (সৃষ্টি করে দাও)— অগ্ন আয়ূষি পবস আ সু বোর্জমিষং চ নঃ'; (৯:৬৬:১৯) 'যশের জন্যে মঙ্গলযুক্ত অন্ন ভোগ করব— উর্জং বসানঃ শ্রবসে সুমঙ্গলঃ।' (৯:৮০:৩) দেবতা হলেন 'খাদ্যের অধিপতি, পুষ্টির অধিপতি ও সখা—

ইনঃ বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।' (১০:২৬:৭) এখানে 'সখা' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজে বন্ধু তার বন্ধুর আতিথ্য করে পুষ্টিযুক্ত অন্ন দিয়ে; দেবতা যখন তা করেন তখন তিনি মানুষের প্রতি সখার কৃত্যই করেন। দেবতা অনুকূল না হলে, সখা না হলে ভয়স্থান। যিনি ভক্তের প্রয়োজন জেনেও তাকে বিমুখ করেন অথবা তার প্রার্থনায় উদাসীন থাকেন তিনি তো তখন ভক্তের 'সখা' নন, উদাসীন। ভক্তের প্রার্থনা দেবতাকে তার প্রতি অনুকূল করে রাখা। দেবতা অনুকূল না থাকলে ভক্তের ভরসা কোথায়? তার নিজের চেষ্টায় সে তো পর্যাপ্ত অন্ন উৎপাদন করতে পারছে না। যা উৎপন্ন হচ্ছে তাতে খিদে মেটে না। বহু মানুষই সমাজে অভুক্ত থাকছে, যারা খেতে পাচ্ছে তারাও নিয়মিত ভাবে পাচ্ছে না এবং সর্বোপরি যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছে না; এমন খাদ্য পাচ্ছে না যাতে তাদের আয়ু ও পুষ্টি বৃদ্ধি পায়। এ সব সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে উপায় তারা ভাবতে পেরেছিল তা হল যজ্ঞে স্তব ও হব্য দান করে দেবতাকে অনুকূল করে তাঁর কাছে মিনতি করা যাতে তিনি সখার মতো আচরণ করেন। প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও কৃপণতার বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র আশ্রয় হল দেবতার আনুকূল্য। পুষ্টিই অন্নর জন্যে প্রার্থনার মূলে। পুষ্টি থেকে আসবে শক্তি, এবং শক্তিমান্ জয়যুক্ত হবে। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর ওপরে আধিপত্যই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় এবং এ সবের মূলে অন্ন, তাই অন্ন পুষ্টির উৎস।

শুধু পুষ্টি নয়, অন্ন জীবনেরই সমার্থক। 'যাকে গৃহ ও জীবনসাধন অন্ন দিয়েছ— যস্মা অরাসত ক্ষয়ং জীবাতুং চ।' (৮:৪৭:৪) তাই প্রার্থনা, 'পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যেন অন্ন ভোগ করি— পুত্র পৌত্রাদিভির্ভোজমশ্নম্।' (৮:৯৩:১৫) এখন প্রশ্ন আসে: সেই যুগের মানুষগুলির কাছে অন্নের রূপ কী ছিল? 'ভক্ষঃ সখা', খাদ্য হল বন্ধু (তৈত্তিরীয় সংহিতা; ২:৬:৭:৩) 'আপঃ (জল দেবতা) যাকে দীপ্ত করে অন্নের সেই সোনা-রং ঘৃত মিশ্রিত অন্ন...' (তৈ/সং; ২:৩৫:১:১) 'পৃশ্নি (রুদ্রদের মাতা) সে-ই হল অন্নের রূপ— পৃশ্নির্ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপম্; (তৈ/সং; ২:১:৭:৫,৫:৫:৬:৩) 'অন্ন হল প্রজাসাধারণ— অন্নং বিট্; (তৈ/সং; ৩:৫:৭:২) 'অন্ন শক্তি— অন্নং বৈ বাজঃ; (তৈ/সং'; ৫:১:২:২) শুধু তাই নয়, অন্নকে বহু দেবতার সঙ্গে একাত্ম কল্পনা করা হয়েছে, 'অন্ন আদিত্য, অন্ন মরুদ্‌গণ অন্ন গর্ভ— অন্নং বা আদিত্যোঽন্নং মরুতো অন্নং গর্ভা' (তৈ/সং; ৫:৩:৪:৩) অন্নের পুষ্টিতেই গর্ভধারণ করা সম্ভব তাই এখানে অন্নকে গর্ভও বলা হয়েছে। তেমনই আবার শুনি 'অন্ন অগ্নি... বিরাট (ছন্দ)ই অন্ন— অন্নং বৈ পাবকঃ... বিরাভন্নম্'। (তৈ/সং; ৫:৪:৬:৩) 'অন্ন বরণীয়— অন্নং বামঃ'। (তৈ/সং; ৫:৪:৭:২; ৬:১:৬; ৭:৫:৮:৩)

সেই প্রাচীন প্রথম পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্যেই অন্নের যখন এত গৌরব কীর্তন, তখন স্বভাবতই মনে হয়, ক্ষুধা সম্পর্কে একটা আতঙ্কের মনোভাব জনমানসে কার্যকরী ছিল। সাধারণ মানুষ বলে সমাজে যাদের স্বীকৃতি আছে তারা সাধারণ খাবারই খেত; যারা তা পেত না তারা অন্য হীন খাদ্য যেমন তেমন করে জোগাড় করে খেত। সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষ চণ্ডাল, আর্যসমাজের বাইরে অস্পৃশ্য একটি গোষ্ঠী। আর্যরা তাদের বরাবরই

ঘৃণা করে এসেছে, কারণ তারা শ্বপাক বা শ্বপচ অর্থাৎ শ্বন্ বা কুকুরের মাংস পাক করে খায়। অন্য মাংস কিনতে হয়, এ দরিদ্র গোষ্ঠীর সে ক্ষমতা কোথায়? তাই যা কিনতে হয় না, পথেঘাটে ঘুরে-বেড়ানো কুকুর মেরে খেত এই চণ্ডালরা— পেট ভরাবার জন্যে, কতকটা বা পুষ্টিরও জন্যে। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ বামদেব ঋষি বলছেন, 'অভাবের জন্যে আমি কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছি; দেবতাদের মধ্যে কোনও সাহায্যকারী পাইনি, (নিজের) স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেছি, পরে এক শ্যেন আমার জন্যে মধু আহরণ করে।' (অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে, ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্। অপশ্যং জায়ামহীয়মানামধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার।। ঋগ্বেদ; (৪:১৮:১৩) এর ওপরে মন্তব্য করবার প্রয়োজন নেই। কতখানি অভাব থাকলে চণ্ডালের খাদ্য, অর্থাৎ কুকুরের মাংসও জোটে না, তাই কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেতে হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আপন স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেন, যেমন লাঞ্ছনা বহু দরিদ্র স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে; মানুষ তো দূর, দেবতাদের মধ্যেও কোনও সহায়ক খুঁজে পাননি বামদেব, শেষে কোনও বাজপাখির সঞ্চয় থেকে মধু খেয়ে প্রাণরক্ষা করেন। লক্ষণীয় এই শাস্ত্রাংশটি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋষিমণ্ডলগুলির (দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল) অন্তর্গত। অর্থাৎ, এখানে বামদেবের যে ক্ষুধার তাড়না তাতে ঋষি বাধ্য হয়ে চণ্ডালও যা ফেলে দেয় সেই কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রেঁধে খাচ্ছেন। এটি বেদের প্রাচীনতম যুগেরই একটি সমাজচিত্র। এখানে লক্ষণীয়, দেবতাদের মধ্যে কেউ-ই তাঁকে সাহায্য করেননি। দেবতা কী ভাবে সাহায্য করতেন? কোনও মানুষের চিত্তে করুণা উদ্রেক করে, যাতে অভুক্ত ঋষিকে সে খেতে দেয়। কিন্তু কেউ দেয়নি, অর্থাৎ বামদেবের দুঃসহ ক্ষুধার যন্ত্রণাতে দেবতা বিমুখ, মানুষও। কেউ ডেকে খাওয়ায়নি তাঁকে। এ অবস্থার পেছনে খাদ্যাভাবের ত্রাসও আছে। অর্থাৎ মানুষ হয়তো ইচ্ছে থাকলেও সাহস পায়নি তার খাদ্য ভাগ করে খেতে— যদি তারও ওই অবস্থা হয়? সমাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য থাকলে এ-অবস্থা হত না। প্রত্যেক সমাজেই কিছু মানুষ থাকে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না— শিশু, প্রসূতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ; সমাজ এদের জন্যে অন্নসংস্থান রাখে। বামদেবের কথায় মনে হয়, তাঁর অন্ন উৎপাদনের সাধ্য বা সঙ্গতি ছিল না এবং সমাজেও সেই পরিমাণ প্রাচুর্য ছিল না যাতে অভুক্তকে আহার দেওয়ার আতিথেয়তা আসে। এখানে ব্যাপক একটি খাদ্যাভাবের পটভূমিকা দেখা যাচ্ছে। খাদ্য যথেষ্ট নেই বলেই হয়তো মানুষ কৃপণ ও অনাতিথেয়। এই কার্পণ্য এমন বলেই বামদেব বলছেন দেবতারাও কেউ সাহায্য করলেন না। দরিদ্র বলে তিনি অভুক্ত, তাঁর স্ত্রী লাঞ্ছিত।

ঠিক এই ধরনের কথা পড়ি প্রাচীন আক্কাদীয়দের এক দরিদ্রের রচনায়। সে তার দুর্দশার দীর্ঘ বিবরণের পরে বলে, 'কোনও দেবতাই সাহায্য করেননি, কেউ আমার হাত ধরেননি।'[৩]

৩. 'No god helped, [none] seized my hand.' 'Akkadian observations on life and world order' পরিচ্ছেদ, *Ancient Near Eastern Text* (ed) J P Pritchard, Princeton, 1955 p.

অন্যত্র ভক্ত বলছেন, '(হে ইন্দ্র) গাভী দিয়ে উত্তীর্ণ হব দারিদ্র্যজনিত কষ্ট, সকল ক্ষুধা উত্তরণ করব যব দিয়ে— গোভিষ্টরেমামতিং পু রেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহুত বিশ্বাম্।' (১০:৪২:১০) এই দশম মণ্ডলটি রচনার ও সংকলনের দিক থেকে সবচেয়ে অর্বাচীন, এখানে তখনকার প্রচলিত খাদ্যশস্য যবের উল্লেখ আছে নাম করেই; এই যব দিয়ে পুরোডাশ্ (অনেকটা দক্ষিণ ভারতীয় ইড়্লির মতো) তৈরি হত, যা ভাত বা রুটির মতো প্রধান একটি খাদ্য ছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ক্ষুধা বর্তমান, এবং তা নিবারণ করবার উপায়ও ভাবছে ভক্তরা।

'যেন খেতে পাই'— এ প্রার্থনাটা ব্যাপ্ত হয়ে আছে সারা বৈদিক সাহিত্য জুড়ে। 'অকুটিলগতি (সরলচিত্ত) আমরা খাদ্য লাভ করব— অপরিহবৃতাঃ সনুয়াম বাজম্'; (১:১০০:১৯) অর্থাৎ 'আমরা যদি কুটিলতা পরিহার করে নৈতিক ভাবে জীবনযাপন করি, তা হলে, দেবতা আমাদের আহার জোগাবেন', এমন একটা বিশ্বাস মানুষের চেতনায় অন্তর্নিহিত ছিল। সেই গুরুতর খাদ্যাভাবের দিনে ঠিক কী করলে আহার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসে তা কেউ ঠিক করে জানত না, তাই চিত্তশুদ্ধিকে খাদ্যলাভের একটা প্রাক্‌শর্ত হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অথবা সরাসরি বলছে, 'ইন্দ্রের দ্বারা আমরা খাদ্য লাভ করব— বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজম্'; (১:১০১:১১) 'আমাদের পথ যেন সুগম ও অন্নযুক্ত হয়— সদা যুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থাঃ'; (৩:৫৫:২১) 'অন্ন যেন লাভ করতে পারি— ইলাভিঃ সং রভেমহি'; (৮:৩২:৯) 'প্রজা ও অন্ন যেন ভোগ করতে পারি— ভক্ষীমহি প্রজামিষম্'; (৭:৯১:৬) 'যেন অন্নের ওপরে (আমাদের) অধিকার থাকে; যেন অন্নের সবচেয়ে নিকটে থাকতে পারি— ভবা বাজানাং পতিঃ। নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম'; (৯:৯৮:১২) 'নেদিষ্ঠতমা', সবচেয়ে নিকটবর্তী, অর্থাৎ অন্নের সঙ্গে যেন আমাদের কোনও দূরত্ব না থাকে। এর মানেটা হল, যেন সহজেই অন্ন লাভ করতে পারি। 'অন্নের গন্ধযুক্ত খাদ্য যেন খাই, অন্নের গৃহ যেন পাই— অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্।' (৯:৯৮:১২)

খাদ্যের জোগানের অবস্থা কী অবস্থায় থাকলে অন্নগন্ধি খাদ্য ও কাম্য হয়ে ওঠে তা বোঝা কঠিন নয়। আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ হল, 'অন্নের গৃহ' কথাটি— এটি শস্যের ভাণ্ডার বা মরাই অর্থে প্রযুক্ত কিনা তা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু কোনও একটা জায়গায় শস্য মজুত থাকার আশ্বাসটাই এখানে প্রয়োজনীয়। যেন 'হা অন্ন, হা অন্ন' অবস্থাটা না ঘটে। বলা বাহুল্য, এমনটা না ঘটে থাকলে এ প্রার্থনা থাকত না। 'অরণ্যানী' সূক্তে যথেচ্ছ স্বাদু ফল খাবার জন্যেও প্রার্থনা আছে— স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নিপদ্যতে।' (১০:১৪৭:৫) আগেই বলেছি, ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় থেকেই খাদ্য ও পানীয় ছিল পশুমাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, শস্য থেকে তৈরি খাদ্য, অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা ফল, মধু, সোমরস ও সুরা। ফল ও মধুর জন্যে লোকে বনে যেত, শিকার করতেও যেত পশুমাংস সংগ্রহের জন্যে; অবশ্য পরে পশুপালনের যুগে পশুপাল থেকে পশু হনন করে যজ্ঞ করা হত এবং খাওয়া হত; দুধ ও দুধ থেকে তৈরি দই, ঘোল, ছানা, চরু (পায়স) এ সবও খাদ্যের অংশ ছিল। সে যুগে গ্রামের বাইরেই পশুচারণভূমি এবং তার বাইরেই অরণ্য ছিল। গ্রামের চাষের জমি, বাইরে পশুচারণভূমি এবং তার বাইরে

অরণ্যভূমি— এই তিনটি থেকেই মানুষ তার খাদ্য সংস্থান করত।

মানুষ পরিশ্রম করে শিকার, পশুপালন, ফলমূল সংগ্রহ বা চাষ, যা করেই হোক খাবার জোগাড় করত; কিন্তু এর প্রত্যেকটিই নানা ভাবে বিপৎসংকুল ছিল। শিকার পাওয়া, না পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করত ভাগ্যের ওপরে। পশুচারণভূমি নষ্ট হয়ে যেত খরা, বন্যায়; তা ছাড়া মাঝে মাঝে পালে মড়ক লাগত, জঙ্গলে নানা হিংস্র জন্তু ছিল, চাষেও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, ইত্যাদি নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকত। তাই মানুষ কোনও মতেই তার খাবার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। প্রকৃতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ যেটুকু ছিল, তা খুবই প্রাথমিক স্তরের। স্বভাবতই মানুষ কিছু একটা অবলম্বন চাইত যার থেকে তার খাবারের জোগানের সম্পর্কে সে একটা আশ্বাস পায়। এই কারণে সে কল্পনা করল ঊর্ধ্বলোকে কিছু দেবতা তার সুখদুঃখের হিসেব রাখেন। তাঁদের যজ্ঞে ও স্তবে যথাবিধি প্রসন্ন করতে পারলে খাদ্য সম্বন্ধে হয়তো একটা স্থায়ী আশ্বাস থাকে। খাবার যখন মেলে তখন নিশ্চয়ই কোনও দেবতা মানুষের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তা পাঠান বলেই মানুষ তা পায়। যখন মেলে না, তখন কোনও দেবতার অসন্তোষ বা রোষকেই দায়ী করা হত। কাজেই অন্নসংস্থানের সঙ্গে দেবতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত করত সে যুগের জনমানস।

'মন্ত্রদ্রষ্টা প্রশস্ত অন্ন ধারণ করেন— চাক্ষ্মো যদ্বাজং ধরতে মহী।' (২:২৪:৯) কিন্ত এ অন্ন তিনি ধারণ করেন দেবতার কৃপায়। ইন্দ্রকে বারে বারে 'বাজসনি' অর্থাৎ অন্নদাতা বলা হয়েছে। অগ্নিকেও: 'অগ্নি পরম অন্ন ও ধনের (দাতা)— অগ্নির্বাজস্য পরমস্য রায়ঃ'; (৪:১৩:৩) '(দেবতা) দ্রুত আহরণ করে আনেন স্পৃহনীয় (কাম্য) অন্ন— মক্ষু বাজং ভরতি স্পার্হিরাধাঃ।' (৪:১৬:১৬) যে অন্ন সমস্ত ক্ষুধার্তের আকাঙ্ক্ষিত সেই অন্ন দেবতা ভক্তের স্তবে ও যজ্ঞে প্রীত হয়ে দান করেন এমন কথা বারেবারেই বলা হয়েছে। 'ইন্দ্রের স্তব কর, প্রশংসা কর, স্তাবকের জন্যে যেন তিনি স্ফীত নদীর মত অন্ন দান করেন— নু ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।' (৪:১৭:১২,২১; ৪:২০:১৬) এ কথা বারে বারে বলার উদ্দেশ্য সম্ভবত ওই উপমাটি যা অন্নকামী ভক্তের মনে ধরেছিল: বর্ষায় ফেঁপে-ওঠা নদীর মতো সুপ্রচুর অন্নসম্ভার। 'ইনি (দেবতা) যাকে দান করেন তার জন্যে অন্ন আহরণ করেন— অয়ং বাজং ভরতি যং সনোতি।' (৪:১৭:৯)

শুধু ইন্দ্র, অগ্নি নয় অশ্বিদ্বয়কেও অন্নদাতা বলে বারে বারে অভিহিত করা হয়েছে। 'অশ্বিনৌ বাজিনী বসূ'— এ কথা অনেক ঋকেই পাই। (৫:৭৫:৬, ৭; ৫:৭৮:৩; ৮:৫:৩; ১২, ২০, ৩০; ৮:২২:৭, ১৪, ১৮; ৮.২৬:৩, ৮:৮৫:৩; ৮:১০১:৮) পূষা, যিনি মুখ্যত পশুপালনের রক্ষক দেবতা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'পূষার স্তব করি, তিনি অজ, অশ্ব ও অন্নের অধিকারী' অশ্ব বাহন— পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষাম বাজিনম্।' (৬:৬০:১) কিন্তু অজ ও অন্ন খাদ্য, তাই পূষার কাছে এ সব চাওয়া প্রাসঙ্গিক। ইন্দ্র শুধু শত্রুজয়ই করেননি অন্নও দান করেন: 'যিনি বৃত্রকে বধ করেছেন, তিনি অন্ন দান করেন, বণিক্‌শ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র কাম্য ধন দান করেন— হন্তা যো বৃত্রং সনিতেতে বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধা।'

(৪:১৭:৮) অশ্বিন্‌রাও অন্ন এবং ধন দান করেন: 'দুজনেই অন্ন ও ধনের দাতা। (৬:৬০:১৩) দেবতার অন্নদান প্রকারান্তরে সুরক্ষাও দেয়, কারণ, অন্নপুষ্ট সুস্থ মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ, তাই দেবতা 'আমাদের অন্ন দান করেই সুরক্ষাও দান করেন— দানো বাজং বি যমতে ন উতীঃ।' (৭:৭:৪) অগ্নি অন্নদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— বাজসাতম (৫:১৩:৫, ৫:২০১) '(হে দেবতা) তোমার (দেওয়া) অন্নের শক্তি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করুক— বাজো নু তে শবসস্পাত্বন্তম্।' (৫:১৬:৫)

কণ্ববংশীয়দের ঋষি বংশধরদের সম্বোধন করে বলছেন, 'হে কণ্বরা, স্তবগানে অন্ন (চেয়ে নাও), উত্তম প্রভু, মহাত্মা অন্নপতি দেবতার স্তব গেয়ে অন্নলাভ কর— গাথ শ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্বামং পুরুত্মানম্। কণ্বাসো গাথ বাজিনম্।' (৮:২:৩৮) দেবতা স্তবে তুষ্ট হলে ভক্তকে অন্নদান করবেন, এমন একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের চিহ্ন বহন করে বহু ঋক্। '(হে দেবতা) তুমিই গাভী ও অন্নের সত্য ও উৎপৃষ্ট দাতা— ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ।' (৫:২৩:২) 'শতক্রতু ইন্দ্র, প্রচুর ও মহৎ ধনের দাতা— উরোষ্ট ইন্দ্র রাধসঃ বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।' (৫:৩৮:১) এই ধনের মধ্যে অনুক্ত হলেও অন্নও আছে। 'তিনি প্রচুর অন্নলাভের জন্যে তোমাদের বিশেষ ভাবে রক্ষা করুন— প্রাবন্ত বস্তুজয়ে বাজসাতয়ে'; (৫:৪৬) 'ইন্দ্র এবং অগ্নি এক সঙ্গে বৃত্রনিধন করে অন্ন দান করুন— শ্নথদ্বৃত্রমুত সনোতি বাজমিন্দ্রা বো অগ্নী সহুরী সপর্যাৎ।' (৬:৬০:১) 'গাভী প্রমুখ অন্ন দান করুন উষা— উষং গোৎগ্রান্ উপমাসি বাজান্'; (১.৯২.৭) 'উষাগুলি অন্ন আনে, অয়ি অন্নবতি (উষা)— বাজপ্রসূতাঃ বাজিনীবতি'; (১.৯২:৮, ১১, ১৩, ১৫) 'উষা সৎ কাজের জন্যে, দানের জন্যে অন্ন বহন করে আনেন— ইষং বহতী সুকৃতে সুদানবে।' (১:৯২:৩)

অন্যান্য সূক্তে উষার একটি অনুষঙ্গ আছে: ভোর হলে পশুপালক পশুপাল নিয়ে গোঠে যায়, চাষি চাষ করতে মাঠে যায়। দুটো কাজই শেষ পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এ সব কাজে মানুষকে প্রবর্তনা দেন উষা, ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে তারা যেন নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদনের ভূমিকায় তৎপর হয়। উষা তাই গৌণ ভাবে খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। উষা তাই 'বাজিনীবতী' অর্থাৎ অন্নবতী, এবং তাই তাঁর স্তবে খাদ্যের উল্লেখ। 'ইন্দ্র অন্ন, বল ও শক্তির অধিপতি— স বাজস্য শবস্য শুষ্মিণস্পতিঃ।' (১:১৪৫:১) এখানে অন্ন, বল ও শক্তি পরপর উচ্চারিত। আগন্তুক আর্যরা এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে বল ও শক্তির গুণে: এ শক্তি আসবে কোথা থেকে? অন্ন থেকে, তাই অন্ন এত প্রয়োজনীয়। 'হে অশ্বিন্‌রা, যে সুরক্ষা দিয়ে স্তোতাকে অন্ন দিয়ে পালন কর সেই সুরক্ষা নিয়ে তোমরা এস— যাভির্বিপ্রং প্র ভরদ্বাজমাবতং তাভিরু ষ উতিভিরশ্বিনা গতম্।' (১:১১২:১৩) 'তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে, হে ইন্দ্র আমরা অন্নলাভ করব— ত্বোতা ইদিন্দ্র বাজমস্মন্।' (২:১১:১৬১) বারবারই দেখছি সুরক্ষার সঙ্গে অন্নের একটা সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। এর কারণ একটা প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার মধ্যে আগন্তুক এবং জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব দৃঢ় করতে চাইলে প্রথম প্রয়োজন শক্তি, এবং যেহেতু অন্নই সেই শক্তি জোগায় তাই অন্নের জন্যে এত আর্ত আবেদন। 'ত্বষ্টা দেবগণ

ও দেবপত্নীগণের সঙ্গে অন্নে প্রীত হোন— মন্দস্ব জুজুষাণো অন্ধসঃ ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ'; (২:৩৬:৩) 'ইন্দ্র অন্নকে উন্মোচিত করেছিলেন— অপাবৃণোদিষ ইন্দ্রঃ।' (১:১৩০:৩) অর্থাৎ দলপতি ইন্দ্রের পরাক্রমের ফলে দলের লোকেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্ন আর তাদের কাছে আবৃত বা দুষ্প্রাপ্য রইল না। 'ইন্দ্র, রক্ষাকামী আমরা তোমাদের সুরক্ষার দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি করব— স্যাম তে ত ইন্দ্র যে ত উতী অবসুব উর্জং বর্ধয়ন্ত।' (২:১:১৩) ওই একই ধরনের যোগসূত্র, সুরক্ষার সঙ্গে অন্নের, এখানেও দেখা যাচ্ছে।

দেবতারাই অন্ন দেন, কিন্তু সে-ও একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেটি হল যজ্ঞ। মানুষ যজ্ঞে দেবতাদের স্তব করে; তাঁদের আকৃতি, বেশবাস, অস্ত্র, অলংকার, গুণ, শক্তি ও পূর্ববর্তী ভক্তদের তাঁরা কী কী দিয়েছেন তার তালিকা পেশ করে; তা ছাড়াও চরু, পুরোডাশ, সোম, সুরা ইত্যাদি হব্য উৎসর্গ করে— এই বিশ্বাসে যে, স্তবে ও হব্যে দেবতারা প্রীত হন, ফলে ভক্তের প্রতি অনুকূল হয়ে তার প্রার্থিত দ্রব্য তাকে দেন। কাজেই যজ্ঞই সেই প্রক্রিয়া যা দেবতাদের কাছে মানুষের প্রার্থনা পেশ করে, তাঁদের কাছ থেকে মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে আনে। 'সোমরস ছাঁকা হচ্ছে (সোমযোগে) অন্নলাভের জন্যে— পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ'; (৯:১৩:৩) 'দেবতা অন্ন ও পানীয় দান কোরো— রাস্ব বাজমুত বংস্ব'; (৬:৪৮:৪)— বলা হচ্ছে যজ্ঞের প্রসঙ্গে। 'অন্নের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছি— অন্নং যজেব'; (২:২৪:১২) '(দেবতা) হব্য আস্বাদন কর ও অন্ন দান কর— স্বদস্ব হব্যা সমিষা দিদীহি'; (২:২২:১১, ৯:৩১:২) যজ্ঞ কিসের জন্য করছি? 'অন্ন লাভের জন্যে এবং ধনলাভের জন্যে— বাজস্য সাতৌ পরমস্য রায়ঃ'; (৭:৬০:১১ (যজ্ঞে) পূষা আমাদের (জন্যে) প্রচুর অন্ন ও রথ রক্ষা করুন; আমাদের স্তব শুনুন ও (আমাদের) অন্নের বৃদ্ধি সাধন করুন— অস্মাকমূর্জা পূষা অবিষ্ট মাহিনঃ। ভুবদ্বাজানাং বৃধ ইমং ন শৃণবদ্ধবম্'; (৯:২৬:৯) 'আমরা অন্ন ও ঋক্‌গুলি দিয়ে অন্ন ধারণ করছি— দধামন্নৈঃ পরি বন্দ ঋগ্‌ভিঃ।' (৩:৩৫:১২)

এখানেও যজ্ঞের উপকরণগুলিকে অন্নের উৎপাদক হিসাবে দেখানো হয়েছে:

> 'এই তিনি বহু অন্নযুক্ত যজ্ঞে খাদ্য উৎপাদন করছেন— এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ।' (৯:৪:১০) যজ্ঞে 'স্তোতাদের দ্বারা অন্ন ও গাভী (আনতে) যাচ্ছেন— স হি জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমবতি।' (৯:২৬:৯) 'সেই (দেবতার) যজনা কর (যিনি দেবেন) কাম্যবস্তু, সকল মানুষের স্তুতির ফলে সঞ্জাত অন্ন— স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতী বিশ্বজন্যাঃ।' (৯:১:৬)

মানুষের প্রয়োজন ও প্রার্থনা এবং দেবতাদের অনুগ্রহ— এর মধ্যে সেতুরচনা করে, যজ্ঞ মানুষের হবির্দান ও স্তুতি বহন করে দেবতাদের কাছে নিয়ে যায়, যাতে তাঁরা করুণাপরবশ হয়ে ক্ষুধিতকে খাদ্য দান করেন। যজ্ঞ, যা আদিমতম ধর্মানুষ্ঠান, তার একটা প্রধান ভিত্তিই হল অন্নের ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থনা যেহেতু অন্নের জন্যেই, তাই সহজেই বোঝা যায়, এই প্রাথমিক প্রয়োজনই ছিল যজ্ঞকর্মের মূল প্রবর্তনা।

আবার মানুষ, ইন্দ্র ও বরুণের কাছে এমন প্রার্থনাও করছে যাতে সেই মানুষ নিজেও অন্ন দান করতে পারে (ভূয়াসং বাজদান্নাম্ ১:১৭:৪), কারণ, অন্নের অভাব সমাজে পরিব্যাপ্ত; খুব ছোট একটি অংশই প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট অন্নের সংস্থান করতে পারত; বাকিরা অন্নাভাবে কষ্ট পেত। স্বভাবতই কিছু মানুষ সেই কষ্ট দেখে তা মোচন করতে উৎসুক হত। তা ছাড়া অন্নহীন সমাজে অন্নদান করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। সমাজে প্রতিপত্তি লাভেরও এটা একটা নিশ্চিত পন্থা। তাই অন্ন দান করার মর্যাদা অর্জন করবার জন্যে এই প্রার্থনা। যাদের অন্নের প্রাচুর্য ছিল তারা সকলেই কিন্তু অন্যের অভাব মোচনে তৎপর ছিল না। এখনকার মতো তখনও বিস্তর লোক প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কৃপণ ছিল। দান করে অন্নভাণ্ডার ক্ষয় করার মতো পরার্থপরতা খুব কম লোকেরই ছিল:

> 'যে দান করে সে ভোজক; অন্নকামী প্রার্থী, যে (অনাহারে) হাঁটতে হাঁটতে রোগা হয়ে গেছে তাকে দান করা ঐশ্বর্যবানের লক্ষণ— স ইদ্ভোজো যে গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।' (১০:১১৭:৩) 'যে অন্ন ভিক্ষা করে, সহানুভূতি-প্রার্থী যে ব্যক্তিকে (অন্ন) দান করে না, সে বন্ধু নয়— ন স সখা যো ন দদাতি তস্মৈ সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।' (১০:১১৭:৪) 'প্রচুর অন্নের মালিক যে ব্যক্তি ঘুরে বেড়ানো দারিদ্র্যপীড়িত যাচকের প্রতি মন কঠিন করে, অন্ন দিয়ে তার সেবা করে না, উত্তরকালে সে কোনও সাহায্যকারী পাবে না— যে আধ্রয়ে চরমাণায় পিত্বোৎন্নবান্ সন্ রফিতায়োপ জগ্মুষে। স্থিরং মনঃ কৃণুতে ন সেবতে পুরোতো চিৎ স মর্ডিতায়োপজগ্মুকে রং না বিন্দতে।' (১০:১১৭:২)

'যে মানুষটা মর্মান্তিক দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হয়ে মনমরা হয়ে গুমরে রয়েছে তাকে কখনও বিদ্রুপ কোরো না; একে (দারিদ্র্যকে) অমর দেবতারাই পাঠিয়েছেন।'[৪] হেসিয়ড এখানে বলতে চান দেবতাদের ইচ্ছাক্রমেই মানুষ দরিদ্র হয়, অতএব বিধাতার বিধানে যে ব্যক্তি দরিদ্র তার দারিদ্র্য তো তার দোষে ঘটেনি। অতএব, তাকে নিয়ে শ্লেষ বিদ্রূপ করা ঠিক নয়। 'কোনও কিছুর প্রয়োজন থাকলেও সেটা না জোটাতে পারলে হৃদয় বিষণ্ণ হয়।'[৫] এই অভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ তো অন্নাভাব, এবং অন্নার্থী সব সময়ে অন্ন ভিক্ষা করেও পেত না। এমন অভাবগ্রস্তের চিত্র আক্কাদীয় সাহিত্যে পাই। 'উপবাসে আমার চেহারা (বিকৃত হয়েছে), আমার মাংস ঝুলে পড়েছে, আমার রক্ত (শেষ হয়ে যাচ্ছে), আমার হাড় ভেঙে গেছে। আমার পেশীগুলো (ব্যাধিতে) ফুলে উঠেছে...।'[৬] এই উপবাসের চেহারা পৃথিবীর সর্বত্রই এক। এ হল অন্নাভাবের আদি ও অকৃত্রিম চেহারা।

৪. **'Never dare to taunt a man with deadly poverty who eats out the heart; it is sent by the deathless gods.' Hesiod: *Works and Days Loeb. II.* 717-18**

৫. **'...it grives the heart to need something and not to have it. *ibid II.* 368-69)**

৬. **'Through starving my appearance. ...my flesh is flaccid, my blood is (going) my bones are smashed... my muscles are inflamed.' 'Akkadian Observation on life and world order' in *Near Eastern Texts pp.* 25-27**

অন্নপ্রার্থীকে বিমুখ করা তখন সমাজে গর্হিত বলে গণ্য হত। এর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকাশ যে মন্ত্রটিতে তা হল, 'কৃপণ বৃথা অন্ন ভোজন করে, সত্য বলছি, তার বিনাশই ঘটে। সে অর্যমা (দেবতা)কে পুষ্ট করে না, বন্ধুকেও করে না; যে একাকী (নিজের) অন্ন ভোজন করে, তার পাপ তার একারই হয়— মোঘমন্নং বিন্দতে প্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কিবলাদী।' (১০:১১৮:৬) এই মন্ত্রে কৃপণের প্রতি ধিক্কারের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে সময়কার সমাজের কথা হচ্ছে তখন শুধু যে খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত ছিল না, তাই নয়, তখন যে দুর্ভাগ্য দরিদ্র খাবারের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে শীর্ণ শরীরে, তার একমাত্র ভরসা ছিল কোনও গৃহীর করুণা ও আতিথ্য।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গ্রিক লেখক হেসিয়ড্ বলেন, 'মানুষের জন্যে বিধাতার নির্দেশিত কাজ কর যাতে মনের প্রচণ্ড গ্লানিতে তুমি ও তোমার স্ত্রী-পুত্র কোনও প্রতিবেশীর কাছে জীবিকার জন্যে প্রার্থী না হও ও সে তোমাকে বিমুখ না করে।'[৭]

সমাজে অল্প কিছু লোকের প্রাচুর্য ছিল; খাদ্য-ভিক্ষু আশায় বুক বেঁধে তার কাছে প্রার্থী হত উদরপূর্তির জন্যে। এই প্রার্থিত আতিথ্য কিন্তু তখন তার শেষ ভরসাস্থল, সেখানে গৃহস্বামী বিমুখ হলে তখনকার সমাজব্যবস্থায় তার ক্ষুধা নিবারণের আর কোনও বিকল্পই ছিল না। এখনকার মতো খাবারের দোকান বা হোটেল ছিল না, থাকলেও ওই হতদরিদ্রের সঙ্গতি ছিল না দাম দিয়ে খাবার কেনার। তাই এই ধিক্কার। অর্যমা আর্যদের গোষ্ঠীগত মর্যাদার ও আর্যত্বের প্রতিনিধিস্থানীয় দেবতা। কৃপণ ব্যক্তি অর্যমাকেও প্রকারান্তরে বিমুখ করে, মানুষ সখাকেও। অতএব দেবতাদের মধ্যে কোনও সাহায্যকারী সে পায় না, তাই তার সম্বন্ধে মন্ত্রটি বিধান দিচ্ছে মৃত্যুর। কারণ যে-কৃপণ অন্নের ভাগ কাউকে না দিয়ে একা খায় তার পাপের বোঝাও সে একাই বহন করে। দেবতার হয়ে সমস্ত সমাজ ধিক্কার দিচ্ছে অন্নদানে বিমুখ ধনীকে। কেন? কারণ তখন সত্যিই বহু দুঃস্থ মানুষেরই অন্নসংস্থান ছিল না। অন্নভিক্ষাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

.যে-অন্নদানে কৃপণ তারও আতঙ্কের হয়তো কিছু হেতু ছিল। প্রকৃতির ওপরে তখন মানুষের এতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না যে খাদ্য সম্বন্ধে মানুষ নিশ্চিত থাকতে পারে। খাদ্য সঞ্চয় করার মতো উন্নত বিজ্ঞান ছিল আয়ত্তের বাইরে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হত মাঝেমাঝেই। শত্রুরা লুঠ করত খাদ্য। স্বভাবতই মানুষ যা পারত ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখত। সবটা তার শুধু কৃপণতা নয়, অনিশ্চয় এবং নানা বিপর্যয়ের জন্যে অভাবের সম্ভাবনাও তাকে সন্ত্রস্ত রাখত। তাই অভাবে এবং স্বভাবে মানুষ মাঝে মাঝে কার্পণ্য দেখাত।

৭. 'Work the works which the gods ordained for men, lest in bitter anguish of spirit you with your wife and children seek your livelihood amongst your neighbours and they do not heed.' Hessiod, *Works and Day. II.* 398-99

এতক্ষণ ঋগ্বেদ সংহিতার কথাই হচ্ছিল। এর দশটি মণ্ডলের শেষেরটি যখন রচনা হয় সম্ভবত সেই সময়েই যজুর্বেদ সংহিতা রচনাও চলছিল। অথর্ব সংহিতার কিছু অংশ ঋক্‌সংহিতার চেয়েও প্রাচীন আবার কিছু অংশ ঋক্ ও যজুর্বেদের পরের রচনা। যজুর্বেদের প্রধান সংহিতা তৈত্তিরীয়তে যে সমাজ চিত্রটি পাই তাই আর্য-প্রাগার্য মিশ্রণের চিহ্ন বহন করে। এ মিশ্রণ গোষ্ঠীগত ভাবে অন্তর্বিবাহের দ্বারা সাধিত; এর প্রতিভাস পাওয়া যায় এর সাংস্কৃতিক অধিসংগঠনে। সংস্কৃতির একটা অংশ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণে প্রতিফলিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় অনুষ্ঠানের কিছু নির্দেশের সঙ্গে যজ্ঞকালে যে পাঠ করতে হবে তাও আছে। এই মন্ত্রগুলিই আমাদের এই সমাজের অবস্থা জানবার একমাত্র সূত্র। এখানেও দেখি ক্ষুধার প্রকোপ সমান ভাবেই আছে। দেবতাকে বলা হচ্ছে, 'তুমিই অন্নের সত্য ও আশ্চর্য দাতা, যে অন্নের সঙ্গে আছে গাভী, বলদ, বশা গাভী— ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতে উক্ষান্নায়, বশান্নায়...।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা; ১:৩:১৪:৭) অন্যত্র শুনি, 'অগ্নি, আমাদের আয়ুকে পবিত্র কর, খাদ্য অন্ন উৎপাদন কর— অগ্নে আয়ুংষি পবস্ব আ সুবোর্জমিষং চ নঃ।' (তৈ/সং; ১:৩:১৪:৮; ১:৬:৬:২) প্রায় সমকালীন অথর্ব সংহিতায় শুনি, 'লোকজয়কারী, স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় এই যে প্রচুর অন্ন, (দেবতা তুমি) একে ব্রাহ্মণের জন্যে নিহিত রেখেছ— ইমমোদনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু বিষ্টারিতং লোকজিতং স্বর্গম্।' (অথর্ব সংহিতা; ৪:৩৪:৪)

খাদ্যে অগ্রাধিকার ব্রাহ্মণেরই। যে সমাজে ক্ষুধা ব্যাপক এবং ক্ষুধিতের অধিকাংশ অব্রাহ্মণ, তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ, সেখানে অন্নকে মুষ্টিমেয় অনুৎপাদক মানুষের অধিকারে রক্ষা করা অমানবিক। কিংবা খাদ্যকেই উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, 'এস খাদ্য, এস অন্ন, সত্য এস, সুরক্ষা এস— ঊর্জ এহি স্বধ এহি সুনৃত এহীরাবত্যেহীতি।' (অ/সং; ৮:১০:৪) আগেই দেখেছি পর্যাপ্ত খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান করে এবং সুরক্ষা শক্তিমানের কাছে সহজলভ্য। ভক্ত প্রার্থনা করছে, বৈশ্বানরের (অগ্নির) মহৎ মহিমা যে অন্ন তা আমাদের (পক্ষে) শুভ এবং মধুময় হোক— বৈশ্বানরস্য মহতো মহিমা শিবং মহ্যং মধুমদস্ত্বন্নম্।' (অ/সং; ৬:৭:৩) এ অন্ন এক প্রজন্মের জন্যে হলে আশ্বাস যথেষ্ট হয় না। পরবর্তী প্রজন্মও যেন অন্নাভাবে কষ্ট না পায় সে প্রার্থনাও শুনি। যজ্ঞকালে 'পুত্রের নাম নেয়, (এর দ্বারা) তাকেও অন্নের ভোক্তা করে— পুত্রস্য নাম গৃহ্ণাতি অন্নাদ্যমেবৈনং করোতি।' (তৈ/সং; ১:৫:৮:৫) শুধু পুত্র নয়, পরবর্তী দ্বাদশ পুরুষ যেন অন্ন ভোজন করে, সে ব্যবস্থাও যজ্ঞের দ্বারা নিশ্চিত করে তুলতে চেয়েছে মানুষ— সযোন্যেবান্নমব রুন্ধে দ্বাদশাৎ পুরুষাদন্নমত্তি।' (তৈ/সং; ২:৬:২:৩)

অন্ন যথেষ্ট ছিল না বলেই সমাজে সে সম্বন্ধে নানা কুসংস্কারও দেখা গিয়েছিল। এখনও আমরা যেমন চাল না থাকলে সরাসরি তা বলি না, বলি 'চাল বাড়ন্ত', ঠিক তেমনই অথর্ব সংহিতায় শুনি, 'যে অন্নের মহিমা জানবে সে (অন্নের সম্বন্ধে) বলবে না 'অল্প' বা 'ব্যঞ্জন নেই', 'নেই' (বলবে না), 'এটা নেই' (বলবে না), বা 'কী?' (বলবে না)— স য ওদনস্য মহিমানং বিদ্যাৎ নাল্প ইতি ব্রূয়ান্নানুপসেচন ইতি নেদমিতি চ কিং চেতি।' (অ/সং;

১১:৩:২৩-২৪) স্পষ্টতই এমন একটা সংস্কার প্রচলিত ছিল যে অন্ন সম্বন্ধে এ জাতীয় নালিশ করলে কোনও দেবতা কোথাও রুষ্ট হবেন, আর অন্নদান করতে চাইবেন না। অন্ন কি সামান্য কোনও বস্তু? 'এই অন্ন থেকেই প্রজাপতি তেত্রিশ 'লোক' সৃষ্টি করেছিলেন— এতস্মাদা ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতং লোকং নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।' (অ/সং; ১১:৩:৫২) 'জল নিয়ে দম্পতী তণ্ডুল থেকে অন্ন পাক করেন— তা ওদনং দম্পতিভ্যাং প্রশিষ্টা আপঃ শিক্ষন্তী পচতা সুনাথাঃ।' (ওই, ১২:৩:৫২) অন্নের মাহাত্ম্য স্পষ্ট উচ্চারণ পেয়েছে: 'এই অন্ন ভোগ করেই দীর্ঘকাল উদীয়মান সূর্যকে দেখব— ইহেড়য়া সধমাদং মদন্তো জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্।' (অ/সং; ৬:৬২:৩) এই হল বৈদিক যুগের প্রথমার্ধের অন্তর্নিহিত গভীর বাসনা: মোক্ষ নয়, পুনর্জন্ম নয়, এই জন্মে এই পৃথিবীতেই যত দিন সম্ভব বাস করে উদীয়মান সূর্যের দর্শন পাওয়া এবং এই দীর্ঘ জীবনকে সুনিশ্চিত করতে পারে একমাত্র যথেষ্ট অন্নলাভের নিশ্চিত আশ্বাস। স্পষ্টই বোঝা যায় এ আশ্বাস মিলছিল না; সব মানুষের জন্যে যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন হচ্ছিল না; তাই এই কামনা এতবার উচ্চারিত।

ভক্তের প্রার্থনা যেন অন্ন ভোজন করতে পারি। 'অগ্নি, আমি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞকর্মের দ্বারা (লব্ধ) অন্নে যেন অন্নভোজী হই— অগ্নেরহং দেবযজ্যায়ান্নাদন্নাদো ভূয়াসম্।' (তৈ/সং; ১:৬:১১:৫) অথর্ব বেদের বিখ্যাত ভূমিসূক্তে পড়ি 'হে ভূমি, বল ও পুষ্টি যুক্ত অন্নের ভাগ ও ঘৃত (যেন পাই)— উর্জং পুষ্টং বিভ্রতীমন্নভাগং ঘৃতম্...।' (অ/সং; ১২:১:২৯) অন্নের ওপরে মানুষের প্রাণ নির্ভর করে বলেই বলা হয়েছে 'অন্নই প্রজা'— অন্নং বিট্।' (তৈ/সং; ৩:৫:৭:২) এ অন্নের কি কম মাহাত্ম্য? 'ঋতের প্রথম সন্তান ওদন, প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা একে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন— য মোদনং প্রথমজা ঋতস্য প্রজাপতিস্তপসা ব্রহ্মণ্যপচৎ।' (অ/সং; ৪:৩৫:১) রুদ্রদের মায়ের নাম পৃশ্নি, সেই 'পৃশ্নিই অন্নের রূপ'— পৃশ্নির্ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপম্।' (তৈ/স; ২:১:৭:৫) বিরাট একটি ছন্দের নাম যার তাৎপর্য যজ্ঞে বারবার উল্লিখিত হয়েছে এবং বহুবার একথা বলা হয়েছে যে এই 'দশ-অক্ষর-যুক্ত বিরাটই অন্ন— বিরাডন্নং বিরাজি এব অন্নাদ্যে প্রতিষ্ঠতি।' (তৈ/সং; ৫:৪:৬:৩) দশাক্ষরা বিরাডন্নম্ (তৈ/সং; ৩:৩:৫:৫; ৬:১:৯:৬; ৬:৬:৪:৫; ৭:৩:৭:৪; ৭:৪:২:১; ৭:৪:৪:৩; ৭:৫:৮:৩; ৭:৫:১৫:২)

এতগুলি মন্ত্রে অন্ন ও বিরাট্ এর সমীকরণ অন্নের গুরুত্ব বোঝায়— বৈশ্বানর (অগ্নি)-র মহান মহিমায় অন্ন আমার পক্ষে শুভ ও মধুময় হোক— বৈশ্বানরস্য মহতো মহিম্না, শিবং মহ্যং মধুমদস্ত্বন্নম।' (অ/সং; ৬:৭:৩) অন্নকে দেবতাদের সঙ্গে সমীকৃত করে বলা হয়েছে, 'অন্নই আদিত্য, অন্নই মরুদ্‌গণ— অন্নং বা আদিত্যান্নং মরুতঃ।' (তৈ/সং; ৫:৩:৪:৩) 'অন্নই অগ্নি— অন্নং বৈ পাবকঃ।' (তৈ/সং; ৫:৪:৬:৩) 'অন্নই সকল দেবতার সমাহার— বৈশ্বদেবং বা অন্নম্।' (তৈ/সং; ৬:৬:৫:৩) অন্নের স্বরূপ কী ছিল তার একটা আভাস মেলে যখন শুনি 'অন্ন হল যব— অন্নং বৈ যাবা।' (তৈ/সং; ৫:৩:৪:৫) অর্থাৎ আর্যরা তখন যবই উৎপাদন করছে এবং সেটাই প্রধান খাদ্যশস্য। আর দুধ তো পশুপালক আর্যদের, দীর্ঘদিনের

খাদ্য ছিলই। এখন তারা শস্য মিশিয়ে পায়স করতে শিখেছে, সে পায়স হয়ে উঠেছে খাদ্য— মানুষের, অতএব দেবতারও। চরু নৈবেদ্য দেওয়া হত যজ্ঞে, 'এ-ই হল সাক্ষাৎ অন্ন যা চরু, চরু দিয়ে অন্নকে অধিকার করে রাখে— এতৎ খলু বৈ সাক্ষাদন্নং যদেষ চরুর্যদেতং চরুমুপদধাতি সাক্ষাদেবাস্মা অন্নমব রুন্ধে।' (তৈ/সং; ৫:৬:২:৫) এ ছাড়া ভাতের কথাও শুনি, 'এই যে ওদন, সর্বাঙ্গ, সর্বপূরক, পূর্ণাঙ্গ, যে এ কথা জানে সে-ও সর্বাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ হয়— এষ বা ওদনঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ। সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সং ভবতি য এবং বেদ।' (অ/সং; ১১:৩:৩১) 'যে অন্ন ভক্ষণ করি, বহুরূপ বহু বিচিত্র সুবর্ণ, অশ্ব, গাভী অথবা অজ, মেষ— এর যা কিছুই গ্রহণ করি অগ্নি তার হোতা হয়ে, তাকে সুষ্ঠু হবন করুন— যদন্নমদ্মি বহুধা, বিরূপং হিরণ্যমশ্বমু গামজামবিম্। যদেব কিঞ্চ প্রতিজগ্রাহমগ্নিশুদ্ধোতা সুহুতং কৃণোতু।' (অ/সং; ৬:৭১:১)

অন্নকে দেবতারূপে দেখার মধ্যেও এর মহার্ঘতা ও দুষ্প্রাপ্যতা এ দুইয়েরই অনুষঙ্গ আছে, আর আছে এর পবিত্রতার বোধ। আর পাঁচটা প্রয়োজনীয় বস্তুর থেকে অন্ন স্বতন্ত্র। শুধু বহুমূল্য নয়, এটা দেবতার অনুগ্রহের দান, এতে এর মহিমা যেন প্রকাশিত হচ্ছে, এর স্বরূপই হল দেবতা। এর পুষ্টি ও শক্তি দেওয়ার ক্ষমতাও একে অন্য এক মর্যাদা দিয়েছে। ইতিহাসের সেই পর্বে আগন্তুক জনগোষ্ঠী যদি পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে চায় তবে শক্তির উৎস তার কাছে প্রায় উপাস্য হয়ে দেখা দেবেই। অন্নকে শক্তিস্বরূপ ভেবে নানা ভাবে তার মহিমা কীর্তন করেছে মানুষ।

সে যুগে নিরাপত্তার সঙ্গেই যুক্ত ছিল খাদ্যসংস্থানের সমস্যা। তাই সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ছিল ক্ষুধাতৃষ্ণার আতঙ্ক। আগেই দেখেছি বামদেব ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছিলেন। এই ক্ষুধা তাড়া করে ফিরেছে বহু নিরুপায়, বিত্তহীন, অন্নহীন দরিদ্রকে। তাদের মনে হয়েছে 'ক্ষুধাই শত্রু, যে এ কথা জানে সে ক্ষুধা রূপ শত্রুকে হনন করে— ক্ষুৎ খলু ভ্রাতৃব্যং য এবং বেদ হন্তি ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যম।' (তৈ/সং; ২:৪:১২:৫) সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনও মতে খাদ্য সংগ্রহ বা অর্জন করবার। যখন তার ক্ষুধা বিনাশের চেষ্টা সার্থক হয়, তখনই সে ক্ষুধা-শত্রুকে হনন করতে পারে। মানুষ যখন বলে 'খাদ্য অন্ন আমি গ্রহণ করছি, তখন খাদ্য ও অন্নের দিক্ অবরুদ্ধ করে। সেই দিকে যে থাকে সে ক্ষুধিত হয়— ইষমূর্জমহমা দদে ইতীষমেবোর্জং তস্মৈ দিশোৎব রুন্ধে ক্ষোধুকা ভবতি যস্তস্যাং দিশি ভবতি।' (তৈ/সং, ৫:২:৫:৬) অন্ন দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথাও শুনি, 'লোকধারণের নাভিমূল এই ওদন। তার দ্বারা মৃত্যুকে উত্তরণ করব— যো লোকানাং নাভিরেষা তেনৌদনেন তরামি মৃত্যুম্।' (অ/সং; ৪:৩৫ সূক্তটির ১-৬ মন্ত্রের ধ্রুবপদ এই বাক্যটিই)। এর চেয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ কমই আছে: অন্ন দিয়েই মৃত্যুকে তরণ করা যায়। অর্থাৎ অন্নাভাবই মৃত্যু, খাদ্যই জীবন। 'সংবৎসরের দ্বারা ঐ ব্যক্তি "অন্ন আমার, অক্ষুধা আমার" এই কথা বলে অন্নকে বেঁধে রাখে, এই হল অন্নের রূপ— সংবৎসরেণৈবাস্মা অন্নমব রুন্ধেঽন্নং ম্যেক্ষুচ্চা ম ইত্যাহৈতদ্বা অন্নস্য রূপম্।' (তৈ/সং; ৫:৪:৮:২) 'সে বন্ধুসমেত প্রজাদের অন্ন ও

অন্নভোজনকে অভ্যুদিত করে, সে-ই বন্ধুসমেত প্রজাদের ও অন্নভোজনের প্রিয় আশ্রয় হয় যে এ কথা বোঝে— স বিশঃ সবন্ধুনন্নমন্নাদ্যমভ্যুদতিষ্ঠৎ। বিশী চ বৈ সবন্ধুনাং চান্নাদ্যস্য চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ।' (অ/সং; ১৫:৮:২,৩) অন্নভোজন এমন একটা ব্যাপার যার নিশ্চয়তা নেই বলেই কেউ যখন বহুজনের, বন্ধুসমেত প্রজাদের জন্য খাদ্যসংস্থান করে তখন সে বহুলোকের প্রিয় আশ্রয় হয়। অন্নদাতা ত প্রকারান্তরে জীবনদাতা-ই। তাই অন্নদাতার প্রশংসার অন্তর্নিহিত থাকে জীবনরক্ষার আশ্বাসের প্রশংসা।

'ঋতু ছ'টি, প্রজাপতির দ্বারা এ ব্যক্তির অন্নভোজন গ্রহণ করে ঋতুরা, তারপরে ওকে তা দান করে— ষট্ বা ঋতবঃ প্রজাপতিনৈবাস্যান্নাদ্যমাদায়ার্তবো অস্মা অনু প্র যচ্ছন্তি।' (তৈ/সং; ৩:৪:৮:৬) ছয় ঋতু মানে সম্বৎসর। উৎপাদন ব্যবস্থা এমন স্তরে ছিল না যে সাধারণ মানুষের সারা বছর খাবার জোটবার কোনও আশ্বাস ছিল, তাই মানুষ ভেবেছিল প্রজাপতি, যিনি ফসলের ও প্রজননের অধিদেবতা, তাঁর কাছে থেকে ঋতুরা যদি খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মানুষকে তা দান করে তা হলে অনাহারের আতঙ্ক কিছু কমে। 'হে অন্নপতি, আমাদের অন্ন দাও ...অগ্নিই হলেন অন্নপতি, তিনিই একে অন্ন দান করেন— অন্নপতে অন্নস্য নো দেহীত্যগ্নির্বা অন্নপতি স এবাস্মা অন্নং প্রথস্থতি।' (তৈ/সং; ৫:২:২:১) বারবারই দেখছি অন্ন কোনও দেবতার দান বলে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বোঝা সহজ, এর মূলে ছিল অন্নের অপ্রাচুর্য, ফলে যখন কারও আহারের সংস্থান ঘটে, তখন সে খাদ্যকে দেবতার দান বলেই সাদরে গ্রহণ করে। একটা কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থা এতটা অগ্রসর ছিল না যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারত। ফসল ফলাবার সমস্ত চেষ্টাই মাঝে মাঝে ব্যাহত হত, ফলে মানুষের নিজের শক্তির ও তার প্রয়াসের সাফল্যের ওপরে আস্থা রাখা সম্ভব ছিল না। যারা অন্নের বিষয়ে জানত সেই আমাদের কৃষকদল বিদ্যা দ্বারা (ভূমি) খনন করে যা উৎপাদন করেছিল, 'হে অগ্নি, সেই হব্য রাজা বিবস্বানের উদ্দেশে যজ্ঞে হবন করছি, এ বার আমাদের যজ্ঞিয় অন্ন মধুময় হোক— যদ্ গ্রামং চক্রুর্নিখনন্ত অগ্নে কার্ষীকা অন্নবিদো ন বিদ্যয়া। বিবস্বতে রাজনি তজ্জুহোম্যথ যজ্ঞিয়ং মধুমদস্তু নোৎন্নম।' (অ/সং; ৬:১১৩:১) 'বল এবং সুবুদ্ধি সেখানে মরুদ্‌গণ প্রচুর ভাবে বর্ষণ করুন যেখানে মানুষের আছে, আমাদের দিকে (তাঁরা) মধু সিঞ্চন করুন— ঊর্জং চ তত্র সুমতিং চ পিন্বত যত্র নরো মরুতঃ সিঞ্চমা মধু।' (অ/সং; ৬:২২:২)

দেবতারা অন্নদান করলেও সেটা যজ্ঞের মারফৎ মানুষের কাছে পৌঁছয়। ধারণাটা এ রকম ছিল যে মানুষ হব্য দিয়ে দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, বিনিময়ে তাঁরা মানুষকে যা যা দান করেন তার মধ্যে এক প্রধান দান হল খাদ্য। এই বিনিময়টা নিষ্পন্ন হয় যজ্ঞের মাধ্যমে, যে-যজ্ঞে মানুষ প্রথমে খাদ্য দিয়ে দেবতাকে আপ্যায়ন করে, খাদ্য ও অন্যান্য প্রার্থিত দ্রব্য লাভের আশায়:

> 'মানুষ পৃথিবীকে অন্নভোজনের (উদ্দেশ্যে) অনুকূল করতে পারেনি। পৃথিবী এই মন্ত্র দর্শন করেন; তখন তাঁকে (সে) অন্নভোজনের (উদ্দেশ্যে) অনুকূল করতে পারল— পৃথিবীমন্নাদ্যে

নোপানমৎ সেতং মন্ত্রমপশ্যত ততো বৈ তামন্নাদ্যমুপানমৎ।' (তৈ/সং ১:৫:৪:২) 'অন্নকামী ব্যক্তি (দেবতা) পূষার উদ্দেশে বলিকালে (ছাগ) হনন করুক, অন্নই পূষা। তাঁর নিজের ভাগ দিয়েই পূষার কাছে উপস্থিত হয়, তাঁরা একে অন্ন দান করেন; সে অন্নভোজক হয়— পৌষ্ণং শ্যামমালভেত অন্নকামঃ অন্নং বৈ পূষা; পূষণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মা অন্নং প্রযস্থন্ত্যন্নাদ এব ভবতি।' (তৈ/সং ২:১:৬:১) 'যার জন্য (এ) অন্নভোজী হোক কামনা করবে, সেই হেতু রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে ত্রিধাতু (বলি) উৎসর্গ করবে— যং কাময়েত অন্নাদঃ স্যাদিতি তস্মাদেতং ত্রিধাতু নির্বপেৎ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে।' (তৈ/সং ২:৩:৬:১) 'অন্নকামী বিশ্বদেবের উদ্দেশে চিত্ররূপা (পশু) হনন করবে, বিশ্বদেবেরই অন্ন সমস্ত দেবতার উদ্দেশে নিজের অংশ নিয়ে উপস্থিত হয়; তাঁরা একে অন্ন দান করেন— বৈশ্বদেবীং বহুরূপামালভেত অন্নকামো বৈশ্বদেবং বা অন্নং বিশ্বানেব দেবান্ স্বেন ভাগধেয়েন ধাবতি এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছতি।' (তৈ/সং ২:১:৭:৫)

বিশ্বদেব বৈদিক সাহিত্যের প্রথম পর্বের শেষের দিকের একটি কল্পনা। সমস্ত দেবতার সমন্বিত দেবমণ্ডলীর একটি কল্পরূপ। এঁদের কাছে সমবেত ভাবে, আবার এঁদের মধ্যে কোনও কোনও দেবতাকে একক ভাবেও স্তব করে প্রার্থনা করা হত। যেমন, বরুণের জন্যে সোমরস যজ্ঞে দান করেও অন্নভোজী হওয়া গেল না:

সে এই কৃষ্ণবর্ণ বশা বরুণের (বিশিষ্ট) পশু বশা গাভী 'দেখতে পেল, সেই কৃষ্ণবর্ণা বশা গাভী হনন করল তার নিজস্ব দেবতার (বরুণের) উদ্দেশে; তখন (তার) অন্নভোজী হওয়ার জন্যে (বরুণ) অনুকূল হলেন— বরুণং সুষুবাণমন্নাদ্যং নোপানমৎ স এতাং বারুণীং কৃষ্ণাং বশামপশ্যৎ তাং স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত ততো বৈ অন্নাদ্যমুপানমৎ।' (তৈ/সং ২:১:৯:১) 'দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই অন্নভোজী— অগ্নির্দেবানামন্নাদঃ।' (তৈ/সং ২:৬:৬:৫) 'আমি (যেন) অন্নবান্ হই' এই কামনা যে করে, সে অন্নবান অগ্নির উদ্দেশ্যে আটটি সরায় পুরোডাশ উৎসর্গ করবে— অগ্নয়ে অন্নবতে পুরোডাশমষ্টকপালং নির্বপেদ্ যঃ কাময়েদ্ অন্নবান্ স্যাম্।' (তৈ/স ২:২:৪:১, ওই কথাই অন্য ভাবে আছে তৈ/স ৩:৪:৪:৩) স্তুতিমাত্র ইন্দ্রের দ্বারা অন্নের আহার নিশ্চিত হয়।' (তৈ/সং ২:২:৭:২) 'যাদের বিষয়ে কামনা করবে যে সে অন্নবান হোক, এই নিমিত্ত রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে ত্রিধাতু যাগ অনুষ্ঠান করুক— যং কাময়েত অন্নাদঃ স্যাদিতি তস্মাদেতং ত্রিধাতুং নির্বপেৎ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে।' (তৈ/সং ২:৩:৬:১) 'বিরাজ ছন্দের মন্ত্রোচ্চারণযুক্ত যোগের দ্বারা অন্নকে অবরোধ করা যায়— বিরাজৈবান্নাদ্য মবরুন্ধে।' (তৈ/সং ২:৬:১:২) রথন্তর স্তোত্রের দ্বারাও অন্নভোজনকে অবরুদ্ধ (বা নিশ্চিত) করা যায়। (তৈ/সং ৫:৪:১১:২) কর্ম বা যজ্ঞের দ্বারা (দেবতাদের দ্বারা) অন্ন প্রেরিত হয় এমন কথাও শুনি। (তৈ/সং ৩:২:১১:১) 'অন্নকামী দ্রোণপাত্রে অন্নসঞ্চয় করবে, দ্রোণে অন্ন রাখা হয় (অতএব) উৎপত্তিস্থল-সমেত অন্নকে অবরোধ করা যায়।' (তৈ/সং ৫:৪:১১:২) 'যে অগ্নিচয়ন (যজ্ঞ) করে সে অন্ন ভোজন করে— অগ্নিং চিন্বানমত্ত্যন্নম্।' তৈ/সং

৫:৬:১০:২) 'মহাব্রত যাগ যে সম্পাদন করে সে অন্নভোজন(কে) নিশ্চিত করে— মহাব্রতবান্ অন্নাদ্যাস্যাবরুদ্ধ্যৈ।' (তৈ/সং ৭:২:২:২) 'যে দক্ষিণার পাঁচটি পাত্রে অন্ন ও ছাগ দান করে সে অন্ন, তেজ ও শক্তি দোহন (লাভ) করে— ইষং মহ উর্জমস্মৈ দুহে যো পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্জ্যোতিষং দদাতি।' (অ/সং ৯:৫:২৪)

উপরের মন্ত্রগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অন্নবান্ হওয়ার কামনা বৈদিক সমাজের একটি গভীর ও মৌলিক কামনা; এ কামনার ভিত্তি হল সার্বিক খাদ্যাভাব; এবং মানুষ আপন চেষ্টায় যেটুকু উৎপাদন করছে তাতে এই ব্যাপক ক্ষুধা বা খাদ্যাভাবের কোনও প্রতিকার করা যাচ্ছে না। ক্ষুধা সমাজে পরিব্যাপ্ত। মানুষ দেখছে লৌকিক প্রয়াসে এ ক্ষুধার সমাধান নেই, তাই সে দ্বারস্থ হচ্ছে দেবতাদের: জনে-জনে দেবতাদের ডেকে বলছে, অন্ন দাও, শস্য দাও, ক্ষুধা নিবারণ কর; ক্ষুধাতৃষ্ণাই মৃত্যু, এ মৃত্যু থেকে বাঁচাও আমাদের। বহু দেবতার কাছে, বিভিন্ন ভাষায়, বারংবার এই প্রার্থনায় ফুটে উঠেছে সমাজের সমবেত এক আর্তি।

মানুষ ক্ষুধায় জর্জর এবং প্রতিকারের কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, এই অবস্থায় দেবতাকেন্দ্রিক যজ্ঞনির্ভর সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেই। 'সমস্ত যজুর্বেদে তাই দেখি, আজ যা নিরর্থক যজ্ঞানুষ্ঠান বলে মনে হয় তারই একটি প্রকাণ্ড সমাবেশ, যেটির মধ্যে প্রতিফলিত রয়েছে একটি অন্তর্নিহিত অভাব; খাদ্য উৎপাদনের অ-পর্যাপ্ত ব্যবস্থার ফলে করুণ খাদ্যাভাব।'[৮] এই সময়ের যজুর্বেদের সাহিত্যে জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম একক সংজ্ঞা হল 'গ্রাম'; 'গ্রাম শব্দটির মুখ্য তাৎপর্য তখনও ছিল এক যাযাবর পশুচারী গোষ্ঠী।'[৯] পরে যজুর্বেদেরই অন্তর্ভুক্ত শতপথ ব্রাহ্মণে পড়ি 'শর্যাতো হ বা ইদং মানবো গ্রামেণ চচার' (৪:১:৫:২): শর্যাত গ্রাম, অর্থাৎ পশুচারী যাযাবর জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এই ভ্রাম্যমাণ পশুপালক দল কৃষিতে নিযুক্ত হওয়ার আগে কোথাও স্থিতিশীল হয়ে বসবাস করেনি; পশুপালের জন্যে চারণভূমি যেখানে তৃণশ্যামল, সেখানেই থাকত; খরায়, বন্যায় বা পশুপাল ঘাস খেয়ে যখন রুক্ষ করে ফেলত তৃণভূমিকে তখন দলবল এবং পশুপাল নিয়ে নূতনতর চারণভূমির সন্ধানে তাদের বেরিয়ে পড়তে হত। খাদ্য অর্জনের এই স্তরে মানুষ সম্পূর্ণত প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতি সদয় হলে, যথাকালে বর্ষণ হলে, আকস্মিক কোনও দুর্যোগ দেখা না দিলে তৃণভূমি পশুপালের এবং প্রকারান্তরে পশুপালকদেরও আহার জোগাত। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলেই পশু ও পালকের অবধারিত অনাহার ও মৃত্যু, যদি না তারা তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারত। এ অবস্থা খাদ্যের প্রাচুর্য সূচিত করে না। প্রাথমিক ভাবে

৮. 'The whole of the Taittirrya Samhita with its monstrous accretion of what now appears to be senseless ritual reflects a painful underlying necessity· shortage of food under the inadequate system of production.' Kosambi *An Introduction*...to the Study of Ancient Indian History.' p. 140

৯. 'The word grama had still the major connotation of a pastoral group on the move.' W Rall. *Staat und gesellschaft*. p. 51

যখন কাঠের ফলার লাঙলের চাষ এরা শিখল তখনও প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের জোগানে প্রচুর ঘাটতি ছিল, তাই বহু সংখ্যক দেবতার কাছে, খাদ্যের জন্যে বারংবার এত করুণ আকুতি, নানা ভাষায় এত প্রার্থনা। এবং নিত্যনূতন যজ্ঞ আবিষ্কার করে অনুষ্ঠান করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো, কিসে খাদ্য সংস্থান নিরাপদ ও পর্যাপ্ত হয়। যজুর্বেদের ক্রমবর্ধমান যজ্ঞের সংখ্যা, জটিলতা ও ব্যাপ্তির পশ্চাতে খাদ্যাভাবের পর্দাটাই বেশি করে চোখে পড়ে।

'অথর্ববেদের রচনার কিছু অংশ ঋগ্বেদেরও পূর্বের, আর কিছু অংশে যজুর্বেদ সংকলনেরও পরের, সেই জন্যে অথর্ববেদের সব শেষে উল্লেখ। এখানে খাদ্যের সংজ্ঞা এবং সে সম্বন্ধে প্রার্থনায় কিছু বৈচিত্র্য আছে: ব্রীহি, তণ্ডুল, ওদন, শারিশাকা শ্যামাক, মাষ, ইত্যাদি ধান্যবাচক নানা শস্যেরও নাম যেমন পাচ্ছি তেমনই খাদ্যের অপর অংশ দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাংসের জন্যে পশুপালের কুশল প্রার্থনা পাচ্ছি। (অ/সং ২:২৬; ৩:১৪; ৬:৫৯) এ সব পশু যেন হিংস্র শ্বাপদের ও দস্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় সে জন্যেও পশুপালকের প্রার্থনা পাই। (অ/সং ৪:৩) সহসা বজ্রপাতে শস্যের ক্ষতি যেন না হয় তার জন্যে (অ/সং ৭:১১) এবং কীটপতঙ্গ যেন ফসল না নষ্ট করতে পারে তার জন্যেও প্রার্থনা পাই। (অ/সং ৬:৫০) যা কিছু ক্ষুধার্ত মানুষের উদরপূর্তির উপকরণ জোগায় তার সংরক্ষণের জন্যে প্রার্থনা এখানে আছে। এ ধরনের প্রার্থনার অনুবৃত্তি পরবর্তী যুগেও আছে। আর্য আগন্তুকরা দক্ষিণ-পূর্বে এগোতে এগোতে বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে পৌঁছনোর কাছাকাছি সময়ে অথর্ববেদের কিছু অংশ রচিত হয়, তাই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের— যে যুগে সংহিতাগুলির শেষাংশের সমান্তরাল ভাবে ব্রাহ্মণগুলির প্রথমাংশ রচনা চলছিল— সেই সময়কার চিত্র বিধৃত আছে অথর্ববেদে।

অথর্ববেদের শেষ পর্যায়ের একটি রচনাতে দেখি যে তখন খাদ্যসম্ভারে কিছু বৈচিত্র্য এসেছে। কুন্তাপসূক্তে এক জায়গায় পড়ি: 'কোন্‌টা তোমার জন্যে আনব? দই, ঘোল না যবসুরা?' এই কথা স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, 'সেই রাজ্যে', যেখানে রাজা পরিক্ষিৎ রাজত্ব করেন— কতরত্ত আ হরামি দধি মন্থাং পরিস্রুতম্। জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ।' (অ/সং ২-:১২৮:৯) এত বিকল্পের অর্থ প্রতীকী সমৃদ্ধি। অর্থাৎ শুধু যে সমাজে কিছু বিত্ত এসেছে তা নয়, এ বিত্ত এসেছে অল্প কয়েকটি ভাগ্যবানের হাতে। রাজা পরিক্ষিতের রাষ্ট্রে ধনীরা ভাল খেত, তাদের ভাণ্ডারে নানা বিকল্প খাদ্য ছিল; পরিতৃপ্ত বধূ স্বামীকে তখন প্রশ্ন করতে পারে, 'কোনটা খাবে, বল?' অর্থাৎ শুধু উদরপূর্তির জন্যে বাধ্যতামূলক ভাবে যার যেটুকু জোটে তাই নয়, রুচির প্রশ্নও এসেছে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী সাহিত্যে পরীক্ষিতের রাজ্যকালকে কলিযুগের সূত্রপাত হিসেবে দেখা হত, অর্থাৎ সে যুগে অন্তত কিছু লোকের ভাগ্যে খাদ্যের বেশ কিছু বিকল্প ও প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। বোঝা কঠিন নয়, এই কতিপয় ভাগ্যবানের বাইরে বৃহত্তর সমাজে অন্নের জন্যে হাহাকার অব্যাহতই ছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ও কিছু বিত্তশালী রাজন্য বা বণিক সারা দেশের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে না। শুধু প্রমাণ করে যে তখন শস্য উৎপাদনে কিছু বৈচিত্র্য এসেছিল।

খাদ্যাভাব ও যাগযজ্ঞ

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়, বা তার কিছু আগে থেকে উত্তর ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থায় গভীর এবং ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকেই এখানে প্রথম লোহার দেখা মেলে; তবে সে লোহা হয়তো অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, ঘোড়ার খুর, ইত্যাদিতে ব্যবহার হত। আরও তিন শতক পরে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষে ও সপ্তম শতকের প্রথমে দেখি কৃষিতে লোহার লাঙলের ফলার চল হল। আগে কাঠের ফাল ছিল লাঙলের মুখে, তাতে বহু পরিশ্রমে দীর্ঘ সময়ে স্বল্প জমিতে অগভীর 'সীতা' রেখাপাত। এর অনেক অসুবিধে ছিল; বীজ গভীরে না পড়ার ফলে পাখি ও কীট পতঙ্গ খেয়ে নিতে পারত; সবটা বীজে গাছ গজাত না। দ্বিতীয়ত, অনেক পরিশ্রমে অনেক সময়ে লাঙল দিয়ে যে চাষটুকু হত তার ফসলের পরিমাণ বরাবরই অ-পর্যাপ্ত হত, ক্ষুন্নিবারণের পক্ষে তা ছিল নেহাতই অপ্রচুর; ফলে সারা সমাজে পরিব্যাপ্ত ক্ষুধা মেটাবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন লোহার লাঙলের ফলা যেহেতু অনেক মজবুত তাই লাঙলের ফাল গভীর হল, বীজ গর্তে থাকল, পাখি বা কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলতে পারল না; গাছ জন্মাল বেশি। সবচেয়ে বড় কথা হল, অল্প সময়ে বেশি জমি চাষ করা গেল, ফলে ফসলের পরিমাণও হতে লাগল বেশি। এর সঙ্গে আরও কতকগুলো ব্যাপার যুক্ত হল, যেমন কম শ্রমে কম সময়ে বেশি জমি চষার সম্ভাবনা দেখা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে হালের বলদের প্রয়োজন বাড়ল। সে রকম সংখ্যার বলদ পশুপালে ছিল; কিন্তু তার অনেকগুলোই অন্য ভাবে খরচ হয়ে যাচ্ছিল যজ্ঞের পশুহননে। প্রত্যেকটি বড় যজ্ঞে শ'য়ে শ'য়ে পশুহননের বিধান ছিল। মনে রাখতে হবে, যাগ ছিল তিন রকমের: পশু, ইষ্টি ও সোম। এর মধ্যে শুধু ইষ্টিতেই পশুহনন হত না, বাকি দুটোতে হত এবং বহু সংখ্যায় হত। সমাজে সহজে বেশি শস্য-উৎপাদনের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিতেই যজ্ঞে বহুসংখ্যক পশুহনন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, অকল্যাণকর বলে স্বীকার করতে হল। তাই শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, 'যে ধেনু ও ষাঁড়ের (মাংস) আহার করবে তার বিনাশ হবে... সে পাপী...।' অতএব ধেনু ও ষাঁড়ের মাংস খাবে না। যাজ্ঞবল্ক্য এ কথা বলছেন কিন্তু, এও বলছেন, 'আমি (কিন্তু) খাব যদি সুস্বাদ হয়— যা

ধেন্বনডুহোরশ্নীয়াদন্তগিতিরিব... পাপী... তস্মাদ্ধেন্বনডুহোর্নাশ্নীয়াত্তদু হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽশ্নামেবাহমংসলং চেদ্ভবতীতি।' (শ/ব্রা ৩:১:২:২১) অন্যত্র দেখি, 'এই হল শ্রেষ্ঠ আহার, এই মাংস তাই পশুবন্ধ যাগ করলে সে পরম অন্নের (অর্থাৎ মাংসের) ভোক্তা হয়— এতদু হ বৈ পরমমন্নাদ্যং যন্মাংসং স পরমস্যৈবান্নাদ্যস্যাত্তা ভবতি।' (শ/ব্রা ১১:১:৬:১৯)

তখন অবশ্য গৃহপালিত পশুর অথবা শিকার করে বনের পশুর মাংস খাওয়া হত। 'দুরকম পশুই (যজ্ঞে) হনন করা হয়, গ্রামের ও অরণ্যের উভয় পশুকে অবরোধ করার জন্যে— উভয়ান্ পশূনালভতে গ্রাম্যাংশ্চারণ্যাংশ্চ উভয়েষামবরুদ্ধ্যৈ।' (তৈ/ব্রা ৩:৯:২২:৯) অর্থাৎ যজ্ঞে দু' রকম পশু হনন করে মাংস হব্য হিসেবে দেওয়া হত, যাতে দু' রকমের পশুমাংসই আহারের জন্যে অবরুদ্ধ বা নিশ্চিত হয়: যজ্ঞে যা দেওয়া হবে দেবতারা তাতে প্রসন্ন হয়ে মানুষের ভোগের জন্যেও তা দেবেন এই বিশ্বাস থেকে। কোনও এক রকমের মাংস থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় এই বিধান। কিন্তু গ্রামের পশু যজ্ঞে যদি অনেক সংখ্যায় হনন করা হয় তা হলে চাষের সেই মৌলিক সমস্যাটা থেকেই যায় অর্থাৎ হালের বলদে টান পড়ে। তাই এখনকার শাস্ত্রে এ সব নিষেধের অবতারণা।

এ ত হল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে গাভীবলদ সংরক্ষণের নির্দেশ, এবং মনে রাখতে হবে যে এ নির্দেশ আকস্মিক নয়: এ নীতি স্পষ্টতই যজ্ঞের শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করছে অর্থনীতির স্বার্থে; যজ্ঞে বহু সংখ্যক পশু হননের যে অনুজ্ঞা কয়েকশো বছর ধরে চালু ছিল তার বিরুদ্ধতা করছে। এ ছাড়াও তখন বুদ্ধের পূর্বে যে সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, যাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল প্রব্রজ্যার পথে যেমন আনাড় কলাম, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, রুদ্রক রামপুত্র, পূরণ কশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, সঞ্জয় বৈরাটীপুর— এঁরা সকলেই বেদবিরোধী এবং যজ্ঞবিরোধী, ফলে পশুহননের বিপক্ষে। এঁদের মধ্যে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেন। এই দুই ধর্মেরই একটি ভিত্তিপ্রস্থর হল অহিংসা, অর্থাৎ পশুহননের বিরোধিতা। বলা বাহুল্য, এ অহিংসার মূলে একটি আতঙ্ক: যজ্ঞে যদি ওই ভাবে শ'য়ে শ'য়ে পশুহত্যা চলতে থাকে তা হলে হালের বলদে টান পড়বে, ফলে যথেষ্ট চাষ হবে না। সম্ভবত টান তখনই পড়ছিল বলেই যজ্ঞবিরোধী, পশুহননবিরোধী, অহিংসার বাণী এত দ্রুত এত জনপ্রিয়তা পেল এবং যজ্ঞ ও পশুহত্যা ধীরে ধীরে কমে এল।

কাজেই লোহার লাঙলের ফলার সাহায্যে অল্প শ্রমে দ্রুত বেশি জমি চাষ করার কিছু কিছু সুফল সদ্যই পাওয়া গেল, প্রত্যাশার অতিরিক্ত। উদ্বৃত্ত ফসল। এ উদ্বৃত্তের অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। এর অর্থ আগে যে ক'জন মানুষ যতটা সময়ে যে কটা হালের বলদ দিয়ে, যতটা জমি চাষ করতে পারছিল এবং যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি পেতে শুরু করল।

এরই সঙ্গে আরও কতকগুলো ঘটনা সম্পৃক্ত। আর্যদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রাগার্য দূরে পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে সরে গিয়েছিল, তাদের ক্রমে ক্রমে দাস হিসেবে গ্রহণ করল আর্যসমাজ। লোহার লাঙলের ফলার কল্যাণে চাষেও কম মানুষ নিযুক্ত করা হচ্ছিল; কাজেই

এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হল কুটির শিল্পে; কাঠ, ধাতু, চামড়া, পাথর মাটি, রত্ন, সোনারুপো ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে প্রয়োজনীয় ও সুদৃশ্য বস্তু নির্মাণ করবার কৃৎকৌশল আয়ত্ত ছিল প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর। এ কয় শতাব্দীর মধ্যে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করে নিল আগন্তুক— এবং তৎকালে মিশ্র জনগোষ্ঠী। কৃষির উদ্বৃত্ত এবং শিল্পে নির্মিত বস্তু দুই-ই রপ্তানিযোগ্য। প্রাগার্য যুগে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকেরও পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের নৌবাণিজ্য ছিল; সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল মধ্যপ্রাচ্য, মিসর, চিন হয়ে দক্ষিণ ইয়োরোপ পর্যন্ত। আর্যরা আসবার অনতিকাল পরেই এ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। পুনর্বার চালু হয় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী নাগাদ। আমরা দেখলাম, এই সময়টাতেই শস্যে ও শিল্পে এখানে উদ্বৃত্ত সৃষ্ট হচ্ছিল, এ উদ্বৃত্ত এখন নৌবাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যে পরিণত হল। ফলে দূর বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন দ্রব্য এবং সোনারুপো যেমন আসতে লাগল, তেমনই ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিও হতে লাগল।

এরই কিছু পরে উত্তর ভারতে মুদ্রার প্রচলন হয়। এর একটা তাৎক্ষণিক সুবিধে হল বণিক সার্থবাহের বহু দীর্ঘ দলগুলির সঙ্গে ক্ষত্রিয় রক্ষিবাহিনী দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে যেত। পূর্বের রেশমপথেই হোক বা এখনকার স্থলপথে কিংবা বণিক-নৌকার সহযাত্রী রক্ষা হিসেবেই হোক, এই রক্ষিবাহিনী থাকতেই হত। এখন তাদের মুদ্রায় বেতন দেওয়া সম্ভব হল। যে সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য, তারা এখানকার বণিকদের কবালা পাট্টার মতোই সম্মান করত সেই বণিকদের পাঠানো মুদ্রা। কাজেই বহির্বাণিজ্য এবং দূরস্থ প্রবেশগুলির মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যেও খুব কাজে লাগল সদ্য প্রচলিত মুদ্রার ব্যবস্থা।

কারা এই বাণিজ্যের কর্তা ছিল? রাজারা ও রাজন্যরা, অর্থাৎ সমাজের মুষ্টিমেয় একটি ধনিক গোষ্ঠী। এরা বাহুবলে এবং লোকবলে বেশি জমির মালিক হয়েছিল, ফলে প্রথমে আমদানি করা ও পরে স্থানীয় লোহা ব্যবহার করে লাঙলের ফলা তৈরি করে চাষিদের নিযুক্ত করে চাষের উদ্বৃত্ত ফসল এদেরই হাতে আসত এবং টাকার জোরে কুটিরশিল্পের উপাদান কাঠ, ধাতু, মণিরত্ন, ইত্যাদির জোগান দিয়ে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করিয়ে দেশে রাজা-রাজন্যদের কাছে ও বিদেশের বণিকের কাছে তা বিক্রি করবার একচেটিয়া অধিকার ছিল সমাজের উপরতলার সেই মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়েরই। ক্ষত্রিয় যখন ইতস্তত ছোট ছোট যুদ্ধ ছাড়া অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত, বৈশ্য তখন পশুপালন ও চাষ করছে। কিছু ধনী বৈশ্য ও দরিদ্র শূদ্র তখন চাষে আসছে কারণ তত দিনে বাণিজ্যে ধীরে ধীরে বৈশ্যের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সময়টা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি। তখন ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজন্যর প্রসাদপুষ্ট কিছু ব্রাহ্মণ ভূসম্পত্তি, দাসদাসী ও পশুপাল দক্ষিণা হিসেবে পেয়ে, কেউ বা বহুসংখ্যক ছাত্রের অধ্যাপনার জন্যে 'কুলপতি' হয়ে বেশ ধনী ব্রাহ্মণের মর্যাদায় ছিলেন। শাস্ত্র বলে, দশ হাজার ছাত্রকে যে অন্নদান করে পোষণ করে, শিক্ষা দেয় সে-ই কুলপতি।

ছাত্রাণাং দশসহস্রং যোহন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

কাজেই এই বিপ্রর্ষি ধনীই হতেন। তা হলে সমাজে ক্ষত্রিয় রাজা, রাজন্য ছাড়াও কিছু ব্রাহ্মণ ধনী ছিল। আর ধনী ছিল এই সময়ে বাণিজ্যে অবতীর্ণ কিছু বৈশ্য, যারা দেশে ও বিদেশে পণ্যসঞ্চালনের কর্ণধার ছিল। এই সব কটি শ্রেণিরই অধিকাংশ সাধারণ মানুষ দরিদ্রই ছিল। শূদ্র প্রধানত চাষবাসে নিরত ছিল; সে কিছু পশুপালনও করত, ক্রীতদাস ও গৃহদাস হিসাবে কাজ করত; শিল্পদ্রব্য নির্মাণেও তাকে নিযুক্ত করা হত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিস্তর ছিল— যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যাদের স্থান হত না, রাজপ্রাসাদের কাছেও যারা পৌঁছতে পারত না। দরিদ্র ক্ষত্রিয়ও অনেক ছিল— শিশু, বৃদ্ধ, রমণী, অসুস্থ বা ক্ষীণকায় অথবা যাদের কোনও ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে স্থান জোটেনি তেমন মানুষ। তারা বর্ণধর্মের নির্দিষ্ট বৃত্তি ছেড়ে আপদ্ধর্মের নীতিতে জীবনরক্ষার জন্যে যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করত। সব বৈশ্য বণিক ছিল না। ওপরতলার মুষ্টিমেয় ক'জনই বাণিজ্যের সুযোগ পেত। বাকি বহুসংখ্যক বৈশ্য পশুপালন করে জীবিকানির্বাহ করত। আর শূদ্রের তো কথাই নেই, সে চিরকালই উচ্চ ত্রিবর্ণের পদসেবার দ্বারা প্রাণ ধারণ করত; আজও এটাই তার অবলম্বন। ব্যতিক্রমী দু-চারজন হয়তো সামান্য ধন সঞ্চয় করতে পারত শিল্পজীবী হয়ে বা শিল্পকর্ম করে, কিন্তু নেহাতই অল্পসংখ্যক ক'জন। তা হলে দেখা গেল, পুরো সমাজে বর্ণনির্বিশেষে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। এ সময়ে এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহ হত এবং মিশ্রবর্ণগুলি সংখ্যায় বাড়ছিল এবং এরা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে ছোট ছোট স্বতন্ত্র বৃত্তিগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল, তবে এ ব্যাপারটা অনেক দ্রুত ও বেশি পরিমাণে ঘটে মৌর্য যুগে ও তার পরে।

বহির্বাণিজ্যে শুধু পণ্যদ্রব্যই আসছিল না, নানা বিচিত্র ধর্মমত, দেবদেবী, সম্প্রদায়, জীবনবোধ, আচরণ-পদ্ধতিও আসছিল এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মানচিত্রে নতুন যে পরিবর্তনটা চোখে পড়ে তা হল আর্যাবর্তে ষোলোটি মহাজনপদের অভ্যুত্থান। এগুলি হল: গান্ধার, কাম্বোজ, কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, মৎস্য, মল্ল, চেদি, বৎস, কাশী, কোসল, মগধ, অঙ্গ, অবন্তী, বৃজ্জি এবং অশ্মক। এই জনপদগুলির প্রত্যেকটি ছিল কোনও একজন রাজার দ্বারা শাসিত, রাজধানীর আশপাশে অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত। একটি জনপদে রাজধানী ছাড়া অন্য নগরও থাকত, বিশেষত, জনপদটি যদি আয়তনে খুব বড় হয়। নগরায়ণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ঘটে প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার আমলে, যখন পুরো সিন্ধুসভ্যতা জুড়ে নানা নগর ছিল। আর্যরা আসবার পরে যে বিপর্যয় ঘটে তাতে বেশ কয়েকশো বছর ধরে নগরসভ্যতার অবক্ষয় ঘটে। পোড়া ইঁটের বাড়ি করার দক্ষতা ছিল না; রোদে-শুকনো-ইঁটের বাড়ি মাটির নীচে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই অংশে নগরের চিহ্নই পাননি। আবার খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি শস্যে স্বয়ম্ভরতা, শিল্পে স্বীকৃতিযোগ্য নির্মাণ, উদ্বৃত্ত অর্থে অধিকসংখ্যক চাষি ও কারিগরকে বৃত্তি দেওয়ার সম্ভাবনা, বাণিজ্য থেকে অধিক অর্থাগম এবং সাধারণ ভাবে নানা দিকে সমৃদ্ধির বিকাশ, অন্তত মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণির পক্ষে— এ

সমস্তই অনুকূল ছিল নতুন নতুন নগর নির্মাণের জন্যে।

নগর কী? যেখানে প্রাথমিক খাদ্যশস্যের চাষ প্রায়ই হয় না, হলেও অকিঞ্চিৎকর পরিমাণে হয়। সেখানে থাকে কে? রাজা, রাজকর্মচারী, বণিক, শিল্পী (তার কারখানা ও শিল্পশালায়), নানা জাতের কারিগর, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা, ধনীদের ভৃত্যকুল, সৈন্যরা এবং আগন্তুক রাজ অতিথিরা। বোঝাই যায়, এদের সংখ্যা অনেক এবং সকলেই ভরণপোষণের জন্যে নগরের বাইরের গ্রামগুলির ওপরে নির্ভরশীল। সেখানে চাষি চাষ করে, জেলে মাছ ধরে, তাঁতি তাঁত বোনে। যা কিছু এদের শুধু খেয়ে পরে বাঁচবার জন্যে, এবং কিছু লোকের বাহুল্যপূর্ণ শৌখিন ভাবে বাঁচবার জন্যে দরকার, তার প্রায় সবই নির্মিত হয় গ্রামে। গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগ প্রশাসনগত, রাজস্ব দেওয়া, সুরক্ষা পাওয়ার এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার। সেই সময় ধনী মালিক চাষে বা কারিগরিতে যাদের নিযুক্ত করত— প্রায়শই পেটভাতায়— তারাই খাজনা দিত; আধপেটা খেয়ে বাঁচিয়ে রাখত নগরগুলিকে, জোগাত তাদের নানা বিলাসের উপকরণ এবং বাণিজ্যের জন্যে পণ্যদ্রব্য।

নগরায়ণের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শ্রেণিবিভাজন। আগে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চার বর্ণের কথা শুনেছি। ক্রমে ক্রমে নানা বিশিষ্ট বৃত্তির প্রয়োজনে এবং বর্ণগুলির মধ্যে ক্রমাগত অন্তর্বিবাহে বর্ণের স্থান নিল জাতি। কিন্তু বর্ণ ও জাতি মুখ্যত ছিল বৃত্তিনির্ধারিত। এখন বর্ণ ও জাতিকে এফোঁড়-ওফোঁড় চিরে ফেলে নতুন যে বিভাজনে সমাজের মুখ্য পরিচয় হল, তা হল শ্রেণি বিভাগ। এ বিভাগে ধনী ও নির্ধন যেমন একটা প্রধান পরিচয়গত ভাগ, তেমনই সঙ্গে সঙ্গেই এল শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। কিন্তু এ দুটি সমার্থক নয়। অনেক মূর্খ ধনী যেমন ছিল তেমনই অনেক দরিদ্র বিদ্বানও ছিল। কিন্তু সমাজ মেনে নিল যে, হাতেকলমে কাজ করাটা সামাজিক খাতিরের মানদণ্ডে নিচু, আর মাথা খাটিয়ে কাজ করাটা উঁচু মানের ব্যাপার। বোঝা কঠিন নয়, মান ও অর্থ এক আধারেই সর্বত্র থাকত না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষই মাথা নোয়াত ধনের কাছে এবং খুব উচ্চ কোটির বিদ্যাবত্তার কাছে। এ দুজনেই সংখ্যায় কম ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল অবিদ্বান ও নির্ধন, এবং তারাই বহুগুণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সমাজে। দরিদ্র চাষি বা মজুরের শ্রম কেনার ক্ষমতা ছিল ধনীর; তেমনই নির্বিত্ত বুদ্ধিমানের বুদ্ধিবৃত্তিকে কিনে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের স্বার্থে নিয়োজিত করার সামর্থ্যও ছিল অল্প কয়েকজনের।

যে-যুগের কথা বলছি তখন যাযাবর আর্যরা কৃষিতে নিযুক্ত; তারা আর ভ্রাম্যমান নয়। জমিতে তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। এ সময়ে যে দর্শন ও ধর্মচর্চা চলছিল— বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক ও উপনিষদ্— তার মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন এবং কতক পরিমাণে আজীবিকও, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। উপনিষদের তত্ত্বের একটা দিক হয়তো সাধারণ মানুষ তার মতন করে বুঝতে পেরেছিল কিন্তু তার দর্শনের দিকটা তাদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। যজ্ঞ তখনও চলছিল এবং জটিল ও দীর্ঘবিলম্বিত নানা যজ্ঞ ও তাদের নানা অঙ্গ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন চলছিল পুরোহিতকুলের হাতে। ধর্মানন্দ কোসাম্বীর কথায়, 'সাধারণ ভাবে

একটি স্থিতিশীল উৎপাদক সমাজের আপাত উদ্দেশ্য হল পুরোহিত তন্ত্রের অর্থাগম। এদের অনুজ্ঞা হল কিছু কিছু অনুষ্ঠান করা আবশ্যক: একটি স্তরে এই সব পল্লবিত প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে সমাজের গতি রুদ্ধ করে, নতুন উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধক হয়, সমাজের শ্রেণিবিন্যাস ও স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখে।'[১] উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা রক্ষিত হলে কৃষি একই জায়গায় থাকে, উৎপাদন বাড়ে যদি চাষের জমির পরিমাণ বাড়ে। ধনীরা চাষ, শিল্পপণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের দ্বারা মূলধন বাড়ালে চক্রবৃদ্ধি হারে তাদের লাভ ও ধনসম্পত্তি বেড়ে চলে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ চাষি বা মজুর তার দ্বারা উপকৃত হয় না।

কাঠের ফলার লাঙলে যে ধরনের চাষ হত তার চেয়ে নতুন কৃষিবিপ্লবে অর্থাৎ লোহার ফলার লাঙলে অনেকগুণ বেশি ফসল ফলত। আগে যখন মানুষ বনেজঙ্গলে খাদ্য আহরণ করত, তার চেয়ে বেশি এবং নিশ্চিত খাদ্য সে পেল গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে শিকার করে ও প্রকৃতির উৎপাদন কুড়িয়ে নিয়ে, কিন্তু এতেও পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষ নিতান্ত অসহায়ই ছিল।[২] চাষে মানুষ খাদ্য উৎপাদনে প্রকরণগত ভাবে নূতনতর, উন্নততর ধাপে পৌঁছয়। প্রথম দিকে কাঠের ফলার লাঙলে ফসল উৎপাদন অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য ছিল; পরে লোহার ফলায় উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল খাদ্যশস্য যব, গম, নানা জাতের ধান ছাড়াও অন্যান্য রবিশস্য আখ, ফল, সবজি, ইত্যাদিরও চাষ হত। লোকে গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, ইত্যাদি পালন করত দুধ এবং মাংসের জন্যে। পশুপালনের আগে মানুষ শিকার করে পশুমাংস খেত— মাংস খাবার অভ্যাস ও মাংসে রুচি সেই আদিম যুগ থেকেই আছে। এর পর পশুপালনের যুগেও মাংস খাওয়ার অভ্যাস ছিল এবং চাষের আগে পর্যন্ত, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের সঙ্গে মাংসই মুখ্য খাদ্য ছিল। মাংস সম্বন্ধে দুর্বলতা শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি থেকে বোঝা যায়। এ ছাড়াও পড়ি, মাংস অন্ন অর্থাৎ খাদ্য, 'পশুরা অন্ন, পশুর মাংস খাদ্য— অন্নং পশবোঽন্নমু পশোর্মাংসম্।' (শতপথব্রাহ্মণ ৭:৫:২:৪২) শুধু তাই নয়, এমন কথাও শুনি-যে 'এ-ই হল শ্রেষ্ঠ খাদ্য, (এই) মাংস, (পশুবন্ধ যাগে যাগকারী) সে (এই) পরম খাদ্যের খাদক হয়— এতদু হ বৈ পরমমন্নাদ্যং যন্মাংসং স পরমস্যৈবান্নাদ্যস্যাত্তা ভবতি।' (শ/ব্রা ১১:৭:১:৬) পরবর্তী কালের পুরাণে মাংসহীন ভোজন (ভোজনং মাংসরহিতম্) অভিশাপের ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু চাষ শুরু হওয়ার পর মাংস আর প্রধান আহার্য রইল না। প্রথমত, পশুপালন তখনও ছিল, কিন্তু সেটা তখন আর মুখ্য বৃত্তি ছিল না, চাষের সঙ্গে ফলমূলমধু-সংগ্রহের মতো একটা অনুপূরক

১. 'Generally the immediate purpose in settled producing society is profit for the priest class which insist that certain observances are necessary: at a deeper level, the unwidely mass of ritual serves to petrify the later society, to discourage innovation, to help preserve the class structure and the status quo'. D. D. Kosambi, *An Introduction to the study of Ancient Indian history*, p. 24

২. কোসাম্বী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

আহার্য সংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে রইল। দ্বিতীয়ত, মৃগয়া স্বভাবতই কমে এল। নিত্যকার বৃত্তি নয়, কালেভদ্রে কখনও কখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজা, রাজন্য ও ধনীরা মৃগয়া করতেন, খাদ্যসংস্থানের জন্যে ততটা নয়, যতটা শখ মেটানোর জন্যে। তৃতীয়ত, বহু ব্যাপ্ত পরিসরের জমি তখন হাতে এসেছে, লোহার লাঙলের ফলায় অল্পশ্রমে তাতে বেশি ফসল ফলানো যায়, তাই নানা রকম খাদ্যশস্য ফলসব্জি ফলানো চলছে এবং এগুলির বিশেষ সুবিধে হল, মৃগয়ালব্ধ মাংস যেমন তাহাতাড়ি খেয়ে শেষ করে না ফেললে পচে যায়, ফসল তত সহজে নষ্ট হয়ে যায় না, বেশ কিছুকাল ভাল ভাবেই জমিয়ে রেখে দেওয়া যায়। তাতে খাদ্য সম্বন্ধে একটা নিরাপত্তাবোধ আসে, যা মৃগয়ায় বা পশুপালনের যুগে ছিল না। তা ছাড়া মৃগয়া কমে যাওয়ায় এবং পশুপালন গৌণ উৎপাদনে পরিণত হওয়ায় ফসল ও সব্জির তুলনায় মাংস আর সহজলভ্য রইল না, কালেভদ্রে জুটত, অন্তত যারা খুব ধনী নয় তাদের ক্ষেত্রে। তত দিনে এরা মাছ খেতেও শিখেছে, তাই খাদ্যে বিকল্প বেড়েছে, খানিকটা বৈচিত্র্য এসেছে।

কার? অবশ্যই ধনীর। কারণ লোহার লাঙলের ফলার প্রচলনের ফলে কৃষিবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই জনসংখ্যাতেও একটা বিপ্লব দেখা দিতে বাধ্য; সভ্যতার ইতিহাসে এ ব্যাপার সর্বত্রই বারে বারে ঘটেছে। 'যখনই একটি জনগোষ্ঠী পূর্বের অনিয়মিত খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতির থেকে নিয়মিত ভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে শুরু করে তখনই তাদের সন্তানসন্ততির জন্ম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উন্নততর খাদ্যের জোগানের অর্থ হল, অধিক সংখায় সন্তানের জন্ম, অধিক সংখ্যায় পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বাঁচা, অধিক সংখ্যক ব্যক্তির বার্ধক্যে পৌঁছানোয়। আলোচ্য সময়কার "আর্য" মানে পশুচারণের দ্বারা জীবনধারণ করত এমন এক লড়াইবাজ গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষি জনগোষ্ঠী, যাদের বাড়তি খাদ্য জোগাত চাষ। এখন আর্যরা সেই ক্রান্তিকালে অবস্থিত যখন অল্পকালের মধ্যেই লাঙল পশুপালের চেয়ে বেশি খাদ্য জোগাবে। কাজেই যার প্রসার ঘটল তা হল, নতুন এক প্রণালীর জীবনযাত্রা... লাঙলের চাষ খাদ্যসংস্থানের অনেক বেশি উন্নতি ঘটাল এবং অনেক বেশি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে। এর অর্থ শুধু যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি তা-ই নয়, কিন্তু এমন একটি জনগোষ্ঠী যার একক পরিবারগুলির সদস্যও অনেক বেশি সংখ্যায় একত্র বাস করত।'[৩] এই বৃহৎ পরিবারের পারিভাষিক নাম 'কুল', যেখানে তিন-চার প্রজন্ম একত্রে বাস করে। তখন চাষের জন্যে সমাজ স্থিতিশীল এবং কয়েক প্রজন্মের সমবেত

৩. 'As soon as people take to regular food production from a previous irregular food gathering mode they bred more rapidly. The improved food supply means that more children are born, more survive to maturity, more people reach old age. "Aryan" at the period under discussion means a warlike tribal people who lived by cattle-breeding, supplemented by plough cultivation. The Aryans were at the crucial stage where soon the plough cultivation would produce more than cattle. So what spread was a new way of living. .. ...plough cultivation greatly improved the food supply, made it more regular. This meant not only a far greater population, but one that lived together in greater units. Kosambi.' পূর্বোক্ত; pp 113-14

পরিশ্রমের ফলে যেটুকু ফসল উঠত তা-ও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হত না। কাজেই সর্বব্যাপী অভাবটা থেকেই গেল। ধনী প্রচুর চাষের জমির মালিক এবং কারিগরি শ্রমিকদের মালিক মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে পেত, সঞ্চয় করতে পারত, বাণিজ্যে সে-সঞ্চয়কে পণ্যে পরিণত করে চক্রবৃদ্ধি হারে ধন বাড়িয়ে চলতে পারত। সমাজে প্রতিপত্তিশালী ছিল এরাই। কিন্তু এদের তুলনায় নিরন্ন বা অর্ধাহারী চাষি মজুরের সংখ্যা বহু বহু গুণে বেশি ছিল। কাজেই সমাজে খাদ্যাভাব ছিল প্রায় সার্বত্রিক।

পরবর্তী কালের সাহিত্যে এই খাদ্যাভাবের প্রচুর প্রমাণ মেলে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পড়ি 'যে অন্নভোজন করতে চায় সে প্রযাজ আহুতির সঙ্গে দক্ষিণার ব্যবস্থা করুক— যোঽন্নাদ্যমিচ্ছেৎ প্রযাজাহুতিভির্দক্ষিণা স ইয়াৎ।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২:৪) 'এই আহুতি অগ্নিতে দেবে অন্নভোজনের জন্যে 'অন্নপতিকে স্বাহা' এই (বলে), অন্ন যে ভোজন করে সে-ই অন্নপতি হয়, সন্তানসন্ততির সঙ্গে (অন্ন) আহার করে, যে একথা জানে— এতামাহুতিং জুহোত্যগ্নয়েঽন্নাদ্যায়া অন্নপতয়ে স্বাহেত্যন্নাদো হান্নপতির্ভবত্যশ্নুতে প্রজয়ান্নাদ্যং য এবং বেদ।' (ঐ ব্রা ৮:২:১১)

এখানে সন্তানসন্ততির ক্ষুধা নিবারণের জন্যে পিতামাতার স্বাভাবিক উদ্বেগ উচ্চারিত এবং এই বিশেষ যজ্ঞের দ্বারা নিজের ও সন্তানের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার চেষ্টা হয়েছে। অন্ন তো শুধু অন্ন নয়, জীবনধারণের উপায়, তাই শুনি 'প্রাণকে অঙ্গীকার করে অন্ন এ জন্যে... মহাব্রত অনুষ্ঠান— প্রাণঃ প্রতিগৃণাত্যন্নমিত্যাদিত্যেন... মহাব্রতং... ভবতি।' (ঐ ব্রা ৫:৫:৩)

অন্ন-সমস্যা আজ শুধু মানুষের, কিন্তু একদা এ সমস্যা দেবতাদেরও ছিল; 'প্রজাপতি কামনা করলেন আমি অন্নভোজী হব, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে এ দুটি মহিমান্বিত গ্রহ (যজ্ঞের আহুতিবিশেষ) "দেখলেন", সে দুটি গ্রহণ করলেন। তার পরে তিনি মহান্ অন্নভোক্তা হলেন। যে কেউ এই ইচ্ছা করেন, তার উচিত এই ভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা— প্রজাপতিরকাময়ত মহানন্নাদঃ স্যামিতি। স এতবশ্বমেধে মহিমানৌ (গ্রহৌ) অপশ্যৎ। তাবগৃহীত। ততঃ স মহানন্নাদোৎভবৎ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।' (৩:৯:৯:৪১)

যজ্ঞ করে অন্ন পাওয়া যায় এ বিশ্বাস সে যুগের ধর্মবোধের ভিত্তিতেই ছিল। যজ্ঞের দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় এ কথা জনমানসে প্রত্যয়যোগ্য করে তোলার সবচেয়ে বড় উপায় হল এই কথা বলা যে, একদা দেবতারাও অন্নাভাবে কষ্ট পেতেন; তাঁরা ঐশী শক্তির দ্বারা অন্ন সৃষ্টি করে ক্ষুধানিবারণ করেননি বা করতে পারেননি; তাঁদেরও যজ্ঞ করেই অন্নের সংস্থান করতে হয়েছিল। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাঁরা দেবতা বলে তাঁদের দিব্যদৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়েছিল কোন্ যজ্ঞ করলে অন্নলাভ হবে। সেই যজ্ঞ তাঁরা অনুষ্ঠান করে অন্ন পেয়েছিলেন এবং যজ্ঞটির উত্তরাধিকার পেল মানুষ, যাতে সে ক্ষুধার প্রতিকার কীভাবে করতে হয় সেই জ্ঞান প্রজন্মপরম্পরায় সঞ্চারিত করে যেতে পারে, উত্তরপুরুষের অনুরূপ অন্নাভাবের প্রতিবিধানের জন্য। অতিকথা (মিথ্)-এর শাস্ত্রে দেবতাদের এই প্রাথমিক যজ্ঞানুষ্ঠান যা সম্পাদিত হয়েছিল 'সে-ই সেকাল'-এ 'in illo tempore'-এর অনুষ্ঠানই

যজ্ঞটির আদিকল্প, মানুষের দ্বারা যার অনুষ্ঠান পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই ধরনের কাহিনি প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো আছে ধর্মগ্রন্থগুলিতে। এর দ্বারা, (১) খাদ্যাভাব একটা নিত্যকালের অবস্থা বলে প্রতিপন্ন হয়; (২) খাদ্যাভাব দেব-মানব নির্বিচারে সার্বত্রিক বলে প্রতিপন্ন হয়, (৩) দেবতাদের দিব্যদৃষ্টি ছাড়া যে এর প্রতিবিধানের উপায় ছিল না, সে কথাও প্রমাণ হয়; (৪) বিশেষ ভাবে লব্ধ এই জ্ঞানের মহিমা প্রতিপাদিত হল— প্রজাপতি এর দ্বার অভীষ্ট লাভ করেছেন সে কথায়; (৫) যা দেবতাদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ তা মানুষকেও প্রার্থিত ফল দিতে সমর্থ, মানুষের এ প্রত্যয়ও জন্মাল। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের মহিমা কীর্তিত হল, যাতে মানুষ ওই বিশেষ যজ্ঞের দ্বারা ইষ্টলাভ করার ভরসা পায়।

মনে রাখতে হবে, সে যুগে মানুষ নিজের চেষ্টায় প্রকৃতিকে বশ করতে বা নিজের অনুকূলে আনতে পারত না বলেই যজ্ঞের উদ্ভাবন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারংবার এ ধরনের উপাখ্যান, যার পারিভাষিক নাম 'অর্থবাদ' (যা যজ্ঞক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও মহিমাকীর্তন করে)। যজ্ঞে মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা উৎপাদন করার জন্যেই এর আবিষ্কার। সে দিনের সমাজে মানুষ তার বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনেই অতিলৌকিকের শরণ নিতে বাধ্য হত, পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম পর্যায়ে মানুষের এই জাতীয় বিশ্বাস ও আচরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভাব্যতার নীতিতে কখনও কখনও তা ফল দিত, তাতে বিশ্বাস আরও বাড়ত; আবার ওই নীতিতেই অনেকবার তা ব্যর্থ হত, তখন অনুষ্ঠাতার বা অনুষ্ঠানের ত্রুটিকেই বিফলতার জন্যে দায়ী করা হত। এমনটা এখনও করা যায়। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না বলেই এরই উপরে বিশ্বাস ন্যস্ত করে মানুষ শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান করে চলত। যজ্ঞ সম্বন্ধে পরবর্তী কালের মীমাংসা-শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে কত বার মানুষ বিধিমতে যজ্ঞ করেও প্রত্যাশিত ফল পায়নি। কিন্তু সে যুগের অনুন্নত বিজ্ঞান-চর্চা, প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নেহাৎ প্রাথমিক জ্ঞানটুকুই যাদের সম্বল, নানা দৈবদুর্বিপাকের সামনে যারা সম্পূর্ণ অসহায়, তারা যজ্ঞে খাদ্যসংস্থান হোক বা না হোক যজ্ঞ ছাড়া আর কীই বা করতে পারত? স্পষ্টতই মানবায়ত প্রয়াসে যেটুকু খাদ্য উৎপন্ন হত তা একেবারেই অপ্রতুল, তাই যজ্ঞ ও দেবতাই ছিল ভরসা।

শতপথব্রাহ্মণ বলে, 'যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরে সমস্ত দেবতারা এলেন, সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত যশ, সকল অন্নভোজন, সমস্ত সমৃদ্ধি— তাবনু সর্বে দেবা প্রেয়ুঃ সর্বা বিদ্যা সর্বং যশঃ সর্বমন্নাদ্যং সর্বা শ্রীঃ।' (১:৬:২:১৫)

এ বিশ্বাস না থাকলে যজ্ঞ হয় না, আর যজ্ঞ ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির কী-ই বা বিকল্প ছিল তখনকার মানুষের? সফল হোক বিফল হোক, যে কাজ মানুষ নিজের চেষ্টায় করতে পারছে না সে-ভার তার নিজের চেয়ে শক্তিমান দেবতার ওপরে অর্পণ করায় একটা লাভ ছিল: নিশ্চিন্ততা। ওই অসহায় যুগে সেটুকুও ত কম নয়, এই নিশ্চিন্ততা লাভ করার জন্যে এখনও ত মানুষ দেবতার ওপরে নিজের ভার সঁপে দেয়। 'এই অন্নভোজন উদিত হল যা প্রজাপতির অন্নাহার; যে এমন জেনে এখন উপবাস করে প্রজাপতি তাকে রক্ষা করেন; সে এ ভাবেই অন্নভোজী হয় যে এ কথা জেনে এখন উপবাস করে— ইদমন্নাদ্যমভ্যুত্তস্থৌ যদিদং

প্রজাপতেরন্নাদ্যং স যো হৈবং বিদ্বান্ সম্প্রত্যুপবসতি; অবতি হৈনং প্রজাপতিঃ স এবমেবান্নাদো ভবতি য এবং বিদ্বান্ সম্প্রত্যুপবসতি'; (শ/ব্রা ১:৬:৩:৩৭) 'যে এমন জেনে সে কারণে হবন করে সে অন্নভোজিত্ব লাভ করে— প্রাপ্নোতি হৈবৈতদন্নাদ্যং য এবং বিদ্বাংস্তর্হি জুহোতি।' (শ/ব্রা ২:৩:২:১২) দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন (এই আশা নিয়ে যে) 'সমৃদ্ধি লাভ করব, যশ লাভ করব, অন্নভোজী হব— দেবা হ বৈ সত্রমাসত শ্রিয়ং গচ্ছেম যশঃ স্যামন্নাদঃ স্যাম্।' (শ/ব্রা ৪:৬:৯:১) শ্রী ও যশের আকাঙ্ক্ষার মতোই দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, 'অন্নভোজী হব।' অর্থাৎ তাঁরা যজ্ঞ করার আগে অন্নভোজী ছিলেন না। এতে মানুষ ভরসা পায় অন্নাভাবে দেবতারাও একদা তাদেরই মতো কষ্ট পেয়েছেন। অতএব তাঁরা যে প্রক্রিয়ায় অন্নভোজী হয়েছেন সেটি মানুষকেও অন্নভোজী করবে। 'যে অন্নভোজী এবং অন্ন-উৎপাদক দর্শপূর্ণমাস যাগ জানে, সে অন্নভোজী হয়— স যো হৈবৈতাবন্নাদঞ্চান্নপ্রদুঞ্চ দর্শপূর্ণমাসে বেদান্নাদ হৈব ভবতি।' (শ/ব্রা ১২:২:৪:৬) 'অন্নকে যে সমষ্টিযজু বলে জানে, সে অন্নকে অবরুদ্ধ করে (বেঁধে রাখে), অন্ন দিয়ে যা কিছু জয় করা যায় তা জয় করে— স যো হ বা অন্নং সমষ্টিযজুরিতি বেদাব হান্নং রুন্ধে যৎ কিঞ্চনান্নেন জয্যং সর্বং হৈব তজ্জয়তি।' (শ/ব্রা ১১:২:৭:৩১)

এখানে লক্ষণীয় হল 'যা কিছু অন্ন দিয়ে জয় করা যায়': কী তা? ক্ষুধা, অভাব, কিছু কিছু রোগব্যাধি, দারিদ্র, মৃত্যু, নিরন্নতার সামাজিক গ্লানি, অযশ, সমাজের তাচ্ছিল্য। এখন বোঝা যায়, অন্ন প্রার্থনার সঙ্গে বারে বারেই কেন যশ, শ্রী যুক্ত হয়েছে। যে সমাজে ব্যাপক অন্নাভাব সেখানে যে অন্নবান্ অর্থাৎ যার যথেষ্ট অন্ন আছে সে সামাজিক প্রতিপত্তি পায়। 'দ্বাদশাহ সোমযাগের দ্বারা অন্নভোজিত্ব লাভ করা যায়। (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ; ১০:৩:৯) 'অন্নকামী ষোড়শী (যাগ) দ্বারা স্তব করবে। (ত/ম-ব্রা; ১২:১৩:১৮) 'বিরাট্ (ছন্দ) অন্নভোজিত্বকে অবরোধ করার জন্যে— বৈরাজমন্নাদ্যাস্যাবরুদ্ধ্যৈ।' (তা/ম-ব্রা; ১৩:৭:৮) এই ক্রিয়াপদটি— 'অবরোধ করা' বারবারই পাওয়া যায়। কী অবরোধ করা? অন্নভোজিত্বকে, অর্থাৎ প্রত্যেক দিন যেন ক্ষুধানিরসনের জন্য পর্যাপ্ত অন্ন পাওয়া যায় সেই নিশ্চয়তা। মনে পড়ে বাইবেলে 'প্রভুর প্রার্থনা'য় খুবই দীন বিনীত নিবেদন: আজকের খাওয়াটুকু যেন জোটে তারই জন্য মিনতি। এ প্রার্থনা অভুক্ত মানুষ রোজই করবে, তার প্রাত্যহিক আহারটুকুর জন্যে। সোমযাগে তিনবার সোম ছেঁচে রস বের করা হত; সন্ধ্যার সময়ের পেষণটির নাম 'তৃতীয় সবন', 'তার দ্বারা লোকে অন্ন, অনুচর, পশু লাভ করে এবং এগুলি দিয়ে প্রাচুর্যকে অবরুদ্ধ করে— অন্নবত্যো গণবত্যঃ পশুমত্যস্তৃতীয়সবনে ভবন্তি ভুমানমেব তাভিরবরুন্ধে।' (তা/ম-ব্রা; ১৮:৭:৪) আবার সেই 'নিশ্চয়তার' উল্লেখ অবরোধ করার কথা। 'গায়ত্রী (ছন্দ) মুখ, অন্ন সপ্তদশ, মুখে অন্নধারণ করে যে একথা জানে সে অন্ন আহার করে অন্নভোজী হয়— মুখং গায়ত্র্যন্নং সপ্তদশো মুখত এব তদন্নং ধত্তে। অন্নমত্ত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ।' (তা/ম-ব্রা; ১৯:১১:৫-৬) 'এগুলি (যজ্ঞীয় ক্রিয়া) দ্বারা অন্নভোজিত্ব অবরোধ করে— এতাভিরন্নাদ্যমবরুন্ধে।' (ত/ম-ব্রা; ২৩:১৭:২,৩) নানা প্রক্রিয়া, অঙ্গ, ছন্দ, স্তব, সোমপেষণ ইত্যাদি যজ্ঞের নানা অংশে বিভিন্ন

স্থানে 'অন্নকে অবরোধ' করার শক্তি আরোপিত হয়েছে। ঠিক কোন কারণে কোন কার্য হয়, যজ্ঞের কোনও প্রকরণের দ্বারা অন্নকে জয় করা অর্থাৎ অন্নের জোগানকে নিশ্চিত করা যায় তা জানা নেই বলেই আন্দাজে এ ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। জ্ঞান যেখানে নেই সেখানেই তো অনুমান।

যজ্ঞ হল একটি প্রক্রিয়া কিন্তু অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা শুধু দেবতাদেরই আছে, এ কথা নানা দেবতা সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে। 'এই অগ্নি হল অন্নভোজী এবং অন্নপতি— অন্নাদ বা এষ অন্নপতির্যদগ্নিঃ।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ২:১:৫) অগ্নিকে অন্নভোজী বলা হয়েছে কারণ যজ্ঞের হব্য অগ্নি দগ্ধ করে। 'সে-ই অন্নাহারী ও অন্নপতি হয়। সন্তানদের সঙ্গে অন্নভোজিত্ব ভোগ করে যে এ কথা জানে— অন্নাদ্যোঽন্নপতির্ভবত্যশ্নুতে প্রজয়া অন্নাদ্যং য এবং বিদ্বান।' (ঐ/ব্রা; ২:১:৬) 'পূষা পোষণ করেছিলেন... যে দেবতারা পুষ্টিপতি— পূষা অপোষয়ৎ... যে দেবা পুষ্টিপতয়ঃ।' (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; ১:৬:২:১৩) দেবতারা যজ্ঞে প্রীত হয়ে অন্নদান করে পোষণ করেন, তাই তাঁরা পুষ্টিপতি। 'পূষাই অন্ন— অন্নং বৈ পূষা।' (তৈ/ব্রা; ১:৭:৩:২০, ২১) পশুচারীদিগের দেবতা ছিলেন পূষা, শুধু যে পশুপালের তত্ত্বাবধান করতেন, তাদের প্রজনিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতেন তাই নয়, দল ছেড়ে কোনও পশু হারিয়ে গেলে তাকে পালে ফিরিয়েও আনতেন, এমন বিশ্বাস ছিল। কাজেই সেই পশুচারণের যুগে যখন পশুমাংস, দুধ, মাখন, দই, ইত্যাদি ছিল প্রধান খাদ্য, তখন পূষা পশুদের পুষ্টি ও কল্যাণসাধন করে অন্ন জোগাতেন। পরে চাষের যুগেও পশুচারণ অঙ্গ-বৃত্তি হিসেবে রইল, কাজেই তখনও ওই পশুপালের দেবতা, পুষ্টির দেবতা, অন্নের দেবতা হিসেবে থেকে গেলেন। ইন্দ্রের বিষয়ে শুনি 'অন্ন বহন করে আনেন শক্তিমান ধনবান এই রাজা— ইষাং বোঢ়া নৃপতির্বাজিনীবান্।' (তৈ/ব্রা ২:৮:৭:৫৫)

> 'প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছ থেকে সৃষ্ট হয়ে তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তখন প্রজাপতি রোদন করলেন। তিনি অন্ন হয়ে উদিত হলেন। প্রজারা অন্নভোজন লাভ করে প্রজাপতির কাছে এল। অন্নকে থাকতে দেখলে প্রজা কাছে আসে। যারা এমন জানে সে সব পুরুষ (তাদের) সবই অন্ন হয়, তারা সমস্ত অন্নকে অবরোধ করে— প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তা অস্মাৎ সৃষ্টা পরাচীরায়ন্। স এবং প্রজাপতিঃ রোদনমপশ্যৎ। সোঽন্নং ভূতোঽতিষ্ঠৎ। তা অন্নাদ্যমবিত্বা। প্রজাপতিং প্রজা উপাবর্তত। অন্নমেবৈবং ভূতং পশ্যন্তীঃ প্রজা উপাবর্তন্তে। য উ চৈমম্বিদং বেদ। সর্বান্যন্নানি ভবন্তি। সর্বে পুরুষঃ। সর্বান্যন্নান্যবরুন্ধে।' (তৈ/ব্রা; ২:৭:৯:২৪-২৬)

এখানে কয়েকটি ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হয়েছে: প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেও প্রজারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, পেছনে ফেলে চলে গেল, কারণ তারা খাবে কী? প্রজাপতির রোদনে কাজ হয়নি, কাজ হল যখন তিনি অন্ন হয়ে দেখা দিলেন, তখন খাদ্যের কাছে বুভুক্ষু প্রজারা ফিরে এল। খাদ্য সৃষ্টি করে খাদ্য দিয়ে প্রজার ওপরে আধিপত্য পেলেন প্রজাপতি। অন্যত্র

পড়ি, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন, 'তারা এঁকে দেখে অন্নকামী হয়ে চারিদিকে সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হল। তাদের (প্রজাপতি) বললেন, "কী চাও?" তারা বলল, "অন্নভোজিত্ব (চাই)" তিনি বললেন তা-ই (হবে), এই অন্নভোজিত্ব সৃষ্টি করেছি, (সেটি) সামগান। তাই তোমাদের দিচ্ছি— তা এনং দৃষ্ট্বা অন্নকাশিনীরভিতঃ সমস্তং পর্যবিশন্ তা অব্রবীৎ কিংকামাঃ স্থ ইতি। অন্নাদ্যকামা ইত্যব্রুবন। সো ব্রবীদেবং বৈ বেদমন্নাদ্যমসৃক্ষি সমৈব। তদ্বঃ প্রযচ্ছামীতি।' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ; ১:৩:১:১) মনে রাখতে হবে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণটি সামবেদের অন্তর্গত, তাই এখানে প্রজাদের অভীষ্ট অন্ন আসবে যজ্ঞে সামগানের পথ ধরে। অর্থাৎ সামগানের ফল হিসেবে প্রজাপতি প্রজাদের অন্ন জোগাবেন। প্রজাপতি স্রষ্টা, প্রজা সৃষ্টি করা মাত্রই কিন্তু প্রজারা প্রজাপতির বশবর্তী নয়, অনেক আখ্যানেই তারা বিদ্রোহ করে। অবশ্য প্রায়ই বিদ্রোহের একটা সঙ্গত কারণ থাকে: প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজা খাবে কী? বেদ বলে, যথাবিধি যজ্ঞ করলে দেবতারা আহারের সংস্থান করেন। কিন্তু যজ্ঞই যদি না করতে পারে?

> 'যজ্ঞ দেবতাদের কাছ থেকে উঠে ওপরে পালিয়ে গেল। বলল, "আমি তোমাদের অন্ন হব না।" দেবতারা বললেন, "না, তোমাকে আমাদের অন্ন হতেই হবে।" তাকে (যজ্ঞকে) দেবতারা মন্থন করলেন। (যজ্ঞ তা সহ্য করতে পারল না, সে ক্ষীণ হয়ে গেল; দেবতারা তার শুশ্রূষা করে আবার তাকে পুষ্ট করলেন— যজ্ঞো বৈ দেবেভ্য উদক্রামৎ ন বোঽন্নং ভবিষ্যামীতি। নেতি দেবা অব্রুবন্ অন্নমেব নো ভবিষ্যসীতি। তং দেবা বি মেথিরে...।' (গোপথব্রাহ্মণ, উত্তরভাগ; ২:৬)

এখানে কয়েকটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়। অন্নার্থী মানুষ বিধিমতে যজ্ঞ সম্পাদন করলে যজ্ঞ থেকে আহার্য আপনিই পাবে এমন যে একটি বিশ্বাস ছিল তা অতিসরলীকৃত। যজ্ঞ মানুষের খাদ্যের উৎস হতে অস্বীকার করল। হয়তো এক সময়ে যে যজ্ঞ করে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছিল না, সে ঘটনার স্মৃতি এতে বিধৃত আছে। যাই হোক, ক্ষুধা বড় সাংঘাতিক জিনিস। দেবতারা যজ্ঞকে এনে তার দেহ মন্থন করলেন, বললেন, 'তোমাকে আমাদের খাদ্য হতেই হবে।' যজ্ঞ এই মন্থন যন্ত্রণায় কাতর ও ক্ষীণ হলে দেবতারাই শুশ্রুষা করে তাকে সুস্থ করলেন। এর মধ্যে যেমন প্রথম প্রচেষ্টা— সরাসরি যজ্ঞ থেকে অন্ন লাভ— তা ব্যাহত হওয়ার কথা আছে, তেমনই চূড়ান্ত খাদ্যাভাবে যেমন করেই হোক আহার্যসংস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেবতারা যজ্ঞকে কোনও ভাবে পীড়ন করলেন, এমন অযজ্ঞীয় আচরণ করলেন যাতে যজ্ঞ যন্ত্রণায় কাতর হল, তাও আছে। তখন যজ্ঞ দেবতাদের খাদ্য হতে রাজি হলে দেবতারা শুশ্রূষা অর্থাৎ নিষ্ঠার সঙ্গে বহুল উপকরণ খাদ্য নিয়ে যজ্ঞকে প্রীত ও পূর্ণাঙ্গ করে তুললেন। এ কাহিনিতে যজ্ঞবিধির বিবর্তন, সংযোগ, বিস্তার, হব্যদক্ষিণার বাহুল্য এ সবই ব্যঞ্জিত হয়েছে। অর্থাৎ যেমন তেমন করে যজ্ঞ করলে যজ্ঞ খাদ্যদানে বিমুখ থাকলেন, যথাবিধি প্রভূত যত্নে যজ্ঞ করলে পর যজ্ঞ দেবতাদের খাদ্য হতে সম্মত হলেন। খোদ দেবতাদেরই যদি এই অবস্থা তা হলে মানুষের আরও কত সাবধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, যাতে যজ্ঞ বাধাপ্রাপ্ত

না হয়, ত্রুটি না থাকে কর্মকাণ্ডে। তা হলে দেবতাদের শর্তে যেমন যজ্ঞ শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন, মানুষের আর্তি দেখেও তেমনই দয়া করবেন। যজ্ঞ থেকে অন্নলাভের মধ্যে অনেক ইতিহাস, বিবর্তন, বাধা ও তার নিরসন এখানে বিবৃত হল। কিন্তু যজ্ঞই যে অন্নলাভের উপায়, সে কথা দৃঢ় ভাবে ঘোষিত হয়ে রইল।

সোমযাগে পুরোহিত অগ্নিকে বলে, 'তুমিই আহার, অন্ন দিলাম, একথা যে জানে সে অন্নভোজী হয়— অত্তিরস্যন্নমদাসম্। অন্নাদো ভবতি যস্ত্বেবং বেদ।' (জৈ/ব্রা; ২:৭:২:৮) যজ্ঞে হব্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত; চোখে দেখা যেত হব্য অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে, কাজেই অগ্নি তা খেলেন, খাওয়ার যজ্ঞীয় চেহারা ছিল অগ্নির নৈবেদ্যভক্ষণ। তাই অগ্নিকে পুরোহিত বলেন, তুমি আহার স্বরূপ। যে এ কথা জানে, সে যজ্ঞে হবির্দান করে অগ্নির কাছ থেকে প্রার্থিত আহার লাভ করে। উপরের অংশে দেখছি অগ্নি, পূষা, প্রজাপতি সরাসরি ভাবে খাদ্যসংস্থানের সঙ্গে জড়িত। অন্যত্র অন্যান্য কোনও কোনও দেবতা প্রাকারান্তরে খাদ্যের স্রষ্টা বা দাতা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। যজ্ঞের মাধ্যমেই আসুক অথবা সরাসরি দেবতার আশীর্বাদেই পাওয়া যাক, প্রার্থনার ধরনটা একই: খাদ্য দাও। লোহার ফলার লাঙলের দিনে চাষে ফসল বাড়ল, কিন্তু ক্ষুধার উপশম হল না, অন্তত সাধারণ মানুষের নয়। বিশেষ একটি 'যজ্ঞ এবং স্তোত্রের ফলে মানুষ অন্নভোক্তা হয়— 'অন্নং বৈ ন্যুঙ্খঃ... অথোহন্নাদ্যং প্রজায়তে।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ৫:৩:২) 'অন্নভোজী তা এর (সোমের) দ্বারা লাভ করে— তামনেন (সোমেন) সনতি।' (এ/ব্রা ৩:২:৩৬) অন্নলাভের হেতু এই (যজ্ঞের ক্রিয়া) তা-ই সম্পাদন করে। ('অন্নসনিমেবৈনং তৎ করোতি।' ঐ। ব্রা ৩:২:৩৭)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ শুরুই হচ্ছে যে মন্ত্রে তা হল, 'ব্রহ্মকে অবিচ্ছিন্ন কর, আমাকে তা পেতে দাও... ক্ষত্রকে... দাও অন্নকে... উর্জকে... ধনকে...পুষ্টিকে— ব্রহ্ম সন্ধত্তম্ তন্মে জিন্বতম্। ক্ষত্রম্.. ইষম্...উর্জম্... রয়িং... পুষ্টিম্।' (তৈ/ব্রা ১:১:১:১) 'খাদ্য, শক্তি আমাদের দাও— ইষমূর্জমস্মাসু ধত্তম্।' (তৈ/ব্রা; ১:১:১:৪) 'অথর্ব যেন আমাদের জন্যে খাদ্য রক্ষা করেন। এর দ্বারা অন্নকেই রক্ষা করে— অথর্ব পিতুং-মে সোপায়েত্যাহ। অন্নমেবৈতেন স্পৃণোতি।' (তৈ/ব্রা; ১:১:১০:৭৮) অন্নকে রক্ষা করা, অর্থাৎ অন্ন যেন না লুপ্ত হয়, এ আশঙ্কা ও এ প্রার্থনা সে যুগটিকেই সূচিত করছে। 'ধনের বৃদ্ধি, অন্ন, শক্তি আমাদের মধ্যে ধারণ করা হোক— রায়স্পোষমিষমূর্জস্মাসু দীধরৎ।' (তৈ/ব্রা; ২:৬:৪:১৩) 'আমার আয়ু, অন্নাহার, সন্ততি, পশু বৃদ্ধি কর— আয়ুরন্নাদ্যং প্রজাং পশুং মে পিন্বস্ব।' (তৈ/ব্রা ৩:৭:৬:৬০) 'বল ও পুষ্টি আমাদের জন্যে নিয়ে এস— উর্জং পুষ্টিং চ দদত্যাবৃৎস্ব।' (তৈ/ব্রা ৩:১০:৬:১) মন্ত্রগুলিতে বল, শক্তি, খাদ্য, পুষ্টি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। মুখ্য প্রার্থনা খাদ্যের, যা মানুষকে বল ও পুষ্টি দেবে, তার আয়ু বৃদ্ধি করবে। গোপথ ব্রাহ্মণ বলছে, 'অন্ন থেকেই বীর্য— অন্নাদ্বীর্যম্।' (গো/ব্রা, উত্তরভাগ; ৬:৪) কথাটা ঋগ্বেদে এবং অন্যত্র বারবার বলা হয়েছে। নতুন দেশের আদি অধিবাসীদের প্রতিকূলতা জয় করে আত্মশক্তিতে বিজয়ী হয়ে ওঠার জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল বল, শৌর্য, অস্ত্র, বাহন ইত্যাদি। অস্ত্র, রথ, বাহন সঙ্গে

নিয়েই এসেছিল আর্যরা; কিন্তু দীর্ঘদেহী, পেশীমান আর্যশরীর পর্যাপ্ত খাদ্য ছাড়া তো দুর্বল হয়ে পড়বে, হেরে যাবে প্রাগার্যদের সঙ্গে সংগ্রামে, তাই অন্নের এত আকুল প্রার্থনা, কেননা অন্ন থেকেই আসে বীর্য। অন্ন মানে ভাত শুধু নয়, খাদ্যমাত্রই অন্ন (যদদ্যতে তদন্নম্, যা খাওয়া হয় তাই অন্নম্)। এই শব্দটি ইন্দো-ইয়োরোপীয়, মূলত খাবার জিনিসই বোঝাত (তুলনীয় ইংরেজি edible, eat, জার্মান essen)। অন্ন যথেষ্ট পেলে তা থেকে শরীর বীর্য সংগ্রহ করবে, সেই শক্তিতে পরাক্রান্ত হয়ে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করতে পারবে। তখন লুণ্ঠিত পশু, স্বর্ণ, ভূমি, দাস, শস্য সবই আসবে তার হাতে, জয়ী হবে সে, এবং বিজিতদের ওপরে তার প্রভুত্ব স্থায়ী হবে। অতএব এ সবের মূলে যে খাদ্য, যা তারা নিজেদের চেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন বা সংগ্রহ করতে পারছে না, তার জন্যে যজ্ঞ ও দেবতার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অন্ন থেকে শুধু বল ও শক্তিই আসে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও আসে। 'তাই এখানে যার প্রচুর অন্ন, সে-ই দেশে সম্মানিত— তস্মাদ্ যস্যেবেহ ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি স এব ভূয়িষ্ঠং লোকে বিরাজতি।' (ঐ/ব্রা; ১:৫:৩৩) যে-অবস্থায় দেশে ব্যাপক অন্নাভাব তখন যে সৌভাগ্যশালীদের ভাণ্ডারে অন্নের প্রাচুর্য, সমাজ তাদেরই খাতিরে করে, ধনীর খাতির চিরদিনই, সব দেশেই। তাই পড়ি 'তাই হল সমৃদ্ধি, যেখানে খাবার লোক কম, খাবার বেশি— তদ্ধি সমৃদ্ধং যত্রাত্তা কনীয়ান্নাদ্যো ভূয়ান্।' (শতপথব্রাহ্মণ; ১:৩:২:১২) 'অন্নাহারই শ্রী'; তাই শুনি 'শ্রিয়ৈ অন্নাদ্যায়' (শ/ব্রা; ১:৫:১:৫) অর্থাৎ অন্নাহার ও সমৃদ্ধি সমার্থক, খেতে পেলেই বা সঞ্চয়ে প্রচুর খাদ্য থাকলেই মানুষ শ্রী-যুক্ত। 'অন্নই "গ্রহ"— (এ শব্দের যজ্ঞীয় পারিভাষিক অর্থ আছে, আর সাধারণ অর্থ হল 'যা গ্রহণ করে,' বা 'যার দ্বারা গ্রহণ করা যায়)। অন্নের দ্বারাই এ-সব গৃহীত, তাই যারা আমাদের অন্ন আহার করে, তারা সকলেই আমাদের অধীন— অন্নমেব গ্রহঃ অন্নেন হীদং সর্বং গৃহীতং তস্মাদ্ যাবতাং নোঽশনমশ্নন্তি তে নঃ।' (শ/ব্রা ৪:৬:৫:৪) এখানে খুব রূঢ় ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে খাদ্যের সামাজিক মান, ওজন ও সম্ভ্রমের ভিত্তি। যে আমার অন্ন আহার করে সে আমার অধীন। সামগ্রিক খাদ্যাভাবের দিনে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, আহার দিয়ে ক্ষুধিত মানুষকে কেনা যায়। ভৃত্য বা ভার্যা যে স্বামীর বশ, অধীন, সে ওই ভরণের দৌলতেই তো! ক্ষুধা এবং খাদ্যের সঙ্গে দেবতারা নানা ভাবে জড়িত। 'অন্ন থেকে অগ্নি হয়েছিলেন, অন্নই সোম, অন্নদাতাও তাই, এই সবই অন্ন— অন্নাদেবাগ্নিরভবদন্নং সোমোঽন্নাদশ্চ বা ইদং সর্বমন্নঞ্চ।' (শ/ব্রা ১১:১:৬:১৯)

এই যে অন্ন এ দেবতাদেরই হোক (অর্থাৎ হব্য) অথবা মানুষেরই হোক (খাদ্য) এ কখনও বিক্রি করবে না— ন দেবানামন্নং বিক্রীয়েত ন মনুষ্যাণাম্।' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ; ১:১৫:১:৫) এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ— অনুজ্ঞা হিসেবেও বটে, সমাজচিত্র হিসেবেও বটে। অনুজ্ঞার তিনটি দিক আছে: প্রথমত, অন্ন বিক্রয় করা যেতে পারত, অর্থাৎ সমাজে এর ক্রেতা-বিক্রেতা ছিল। দ্বিতীয়ত, বিক্রেতা হল সে যার প্রয়োজন ছাপিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত আছে,

আর ক্রেতা হল যার অন্ন নেই, ক্ষুধা আছে ও এমন কোনও সামগ্রী আছে, যার বিনিময়ে সে কেনাবেচা করতে পারে। সম্ভবত এ সময়ে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। তা হলে টাকা দিয়ে কেনাবেচারও সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয়ত, সমাজে ক্ষুধা, ক্ষুধার্তের ক্রয়সামর্থ্য, উদ্বৃত্তের বিক্রেতা থাকা সত্ত্বেও অন্নবিক্রয় নিষিদ্ধ। সামাজিক দিকটি হল এ অন্ন ভোজনযোগ্য, অর্থাৎ পাক-করা অন্ন, শস্য নয়। খাদ্যশস্যের কেনাবেচা তো চলতই। কেন এ নিষেধ? সম্ভবত সমাজপতিদের চেতনায় এমন বোধ ছিল যে, যে-অন্ন প্রাণদায়ী, তা যদি একবার পণ্য হয়ে ওঠে তবে সমাজ এমন এক পর্যায়ে নৃশংসতার অনুমোদন করবে যাতে মানুষ অমানুষ হয়ে উঠবে। তাই অন্নদান পুণ্য, তাই আজও 'ভাত-বেচা বামুন' নিন্দিত (দ্রষ্টব্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আদর্শ হিন্দু হোটেল*)। ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস নিয়ে কেনাবেচা একটা সংকোচের, গ্লানির ব্যাপার ছিল। তাই ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা সমস্ত সাহিত্যে মহাপুণ্য। দানে, দক্ষিণায়, অতিথি-আপ্যায়নে, দরিদ্র-ভোজনে, তীর্থে, ব্রতে, মানতে অন্নদানে বিশেষ পুণ্য ঘোষিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে, মহাকাব্য দুটিতে, পুরাণে এবং পরবর্তী সাহিত্যেও। অন্নে মানুষের সহজাত অধিকার। জল বাতাসের মতোই এটি বেঁচে থাকার প্রাথমিক উপাদান। তাই জলবাতাসের মতোই অন্নকে শাস্ত্র কেনাবেচার বাইরে দেখতে চেয়েছে।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে— দেবতাদের অন্নও বেচো না। দেবতাদের অন্ন কী? হব্য। চারিদিকে ব্যাপক ক্ষুধার পরিবেশে যজ্ঞান্তে হব্যও হয়তো মূল্যের বিনিময়ে নিতে চাইত কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ। কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু এই নিষেধই প্রকারান্তরে একটি প্রমাণ। মনে রাখতে হবে দর্শ পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয়, অগ্নিচয়ন সোমযাগ, সত্র, ইত্যাদিতে বহু পশু হনন করা হত; প্রচুর পরিমাণে চরু, পুরোডাশ্, দই, দুধ, আমিক্ষা (ছানা), মন্থ (ঘোল) মধু, সর্পিঃ (ঘি), সোমরস ও সুরা এবং প্রভূত পরিমাণে পশুমাংস হত হব্য। সম্ভবত যজ্ঞকারী যজমান, সতেরো জন প্রধান ঋত্বিক্ পুরোহিত ও তাদের সহকারীরাও অত খাদ্য খেয়ে উঠতে পারত না। এবং ঘি ছাড়া এ সবই দু' তিনদিনেই পচে যাবে, নষ্ট হবে। সেই নৈবেদ্যের উদ্বৃত্ত নিয়ে কিছু পুরোহিত হয়তো একটু আধটু ব্যবসা করতে অনিচ্ছুক ছিল না, তাই এ নিষেধ। দেবতার প্রসাদ বিক্রি আমাদেরও অচেনা নয়।

> 'অথর্ব কবন্ধের পুত্র কাবন্ধি 'বিচার' ছিল বুদ্ধিমান্, মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ। তার অত্যন্ত সম্মানবোধের জন্য সে মানুষের কাছে বিত্ত গ্রহণ করত না। তাকে তার মা বললেন, এই কুরু-পাঞ্চালের, অষ্টমগধের, কাশি-কোশলের, শল্ব-মৎস্যের, শবস-উশীনরের, উদীচ্যের শক্তিমানরা বলেছিলেন, 'এসবই তোমারই অন্ন (লোকে) খাচ্ছে, আমরা তোমার অতিরিক্ত মানের জন্যে খেতে পাচ্ছিনে, বাছা, যাও ঘোড়ার সন্ধান কর— বিচারো হ বৈ কাবন্ধিঃ কবন্ধস্যাথর্বাস্য পুত্রো মেধাবী মীমাংসকোঽনূচান আস। ন স্বেনাতিমানেন মানুষং বিত্তং নেয়ায়। তং মাতোবাচ ত এবৈতদন্নমবোচংস্ত ইমমেষু কুরুপাঞ্চালেষ্বষ্টমাগধেষু কাশিকৌশল্যেষু শাল্বমৎস্যেষু শবস-উশীনরেষূদীচ্যেষ্বন্নমদন্তীত্যথ বয়ং তবৈবাতিমানেনান্নাদ্যাস্মো বৎস বাহনমন্বিচ্ছেতি।' (গোপথব্রাহ্মণ, পূর্বভাগ; ২:৯)

কাহিনিটি পরবর্তী কালের হতে পারে, হয়তো বা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ের রচনা। কাবন্ধি 'বিচার' চাইলে শুধু তাদের পরিবারের সকলের যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তা-ই নয়, সে ধনীও হয়। মা তার দানে এই ঔদাসীন্য দেখে বললেন, যাও বাছা, যা তোমার পাওনা তা সংগ্রহ করতে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যাও।' এখানে দেখি, বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত এমন এক অভিমানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় অন্নচেষ্টা ত্যাগ করে ঘরে বসে ছিল। ফলে যা হওয়ার তা-ই হল। মা এবং সে, হয়তো পরিবারের অন্যরাও উপবাস করছে, কারণ 'বিচার' অন্যের কাছে সম্পত্তি নেবে না। এ সম্পতির মধ্যে তার উপার্জিত যজ্ঞক্রিয়ার দক্ষিণা; তার ঔদাসীন্যে অন্যেরা তা খাচ্ছে, তাই মা তাকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'যা তোমার প্রাপ্য তা সংগ্রহ করে আনো।' সে সম্ভবত গেল। কিন্তু এখানে যা লক্ষণীয়, কী বিপুল পরিমাণ অন্ন একজন পণ্ডিত ঋত্বিকের অধিকারে আসতে পারত। ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে যজ্ঞের যখন রমরমা অবস্থা তখন পুরোহিতরা ইচ্ছে করলে কী রকম ধনী ও অন্নবান্ হতে পারতেন এখানে সেই খবর পাই।

'ছ'টি ঋতু, প্রজাপতির দ্বারা (প্রথমে) তাঁর অন্নভোজিত্ব গ্রহণ করে ঋতুরা, পরে সেটা তাঁকে ফেরৎ দেয়— ষড়্ বা ঋতবঃ প্রজাপতিনৈবাস্যান্নাদ্যমাদায়র্তবো অস্মা অনু প্র যচ্ছন্তি।' (তৈ/সং; ৩:৪:৮:৬) ঋতুরা মাঝখানে একবার অন্নাহারী হয়। এ শক্তি মূলত প্রজাপতির, ঋতুরা নেয় কেননা ঋতুতে ঋতুতে ক্ষেত্রে নানা অন্ন জন্মায়, তা-ই ভোগ করে মানুষ, পরে সে-শক্তি প্রজাপতিতে ফিরে যায় এবং মানুষ প্রজাপতির নির্দেশিত যজ্ঞগুলি করে অন্ন লাভ করে। অর্থাৎ অন্নাহারের অধিকার প্রাথমিক ভাবে দেবতার— মানুষের নয়। ঋতুগুলি ফসল ফলিয়ে মানুষের অন্ন জোগায়, কিন্তু তা আহারের মুখ্য অধিকার প্রজাপতিরই থাকে। কাজেই অন্ন সম্বন্ধে মানুষের নিরন্তর অনিশ্চয় ও আতঙ্ক থেকেই যায়। এই অতিকথার পশ্চাতে সমাজের বাস্তব অন্নাভাবের একটা চিত্র রয়ে গেছে।

অন্নের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে বলা হয়েছে, 'সন্তান কামনা করে অদিতি ভাত রাঁধলেন, তার উচ্ছিষ্ট অংশ আহার করে তিনি গর্ভধারণ করলেন— অদিতির্বৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ তদুচ্ছিষ্টমশ্নাৎ সা গর্ভমধত্ত।' (গোপথব্রাহ্মণ, উত্তরভাগ; ২:১৫) এখানে দেখছি অন্ন শুধু প্রাণ ধারণের উপকরণই নয়, প্রাণ সৃষ্টিরও উপাদান। অদিতি দেবমাতা; আদিত্যরা তাঁর সন্তান; এই দ্বাদশ আদিত্যে সূর্যের নানা প্রকাশ, এঁরা দেবমণ্ডলীতে প্রধান দেবতা। কাজেই এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার— প্রধান দেবতাদের গর্ভে ধারণ করা— সেটা অদিতি কীভাবে সাধন করলেন? সেটা করলেন অন্ন পাক করে ও ভোজন করে। এতে অন্নের নতুন এক মহিমা প্রচারিত হল।

যজ্ঞে ব্যবহৃত কিছু কিছু বস্তুরও মাহাত্ম্য বেড়েছে অন্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। যেমন ডুমুর (উদুম্বর) গাছের কাঠ হল শুদ্ধ, তা দিয়ে তৈরি আসন, হাতা ইত্যাদি সব যজ্ঞে ব্যবহার হত। 'উদুম্বর হল অন্নভোজন, তাই তাতে বল ধৃত হয়। অন্নভোজন হল উদুম্বর— অন্নাদ্যমুদুম্বরমূর্জমেবাস্মিংস্তদন্নাদ্যং দধাতি, অন্নাদ্যমুদুম্বরমূর্জমেব তৎ।' (ঐ/ব্রা; ৮:২:৪:৫)

উদুম্বরের নিজের মাহাত্ম্য নগণ্য কিন্তু অন্নভোজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা বল হয়ে উঠল। এই কথা অন্যত্রও বলা হয়েছে। (তৈ/ব্রা; ১:২:৬:৪৮; ১:৩:৮:৪৯; তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ৫.৪.২; ১৬:৬:৪৩; ১৮:২:১১)

অন্নকে নানা রূপে দেখা হয়েছে, নানা গুণে ভূষিত করা হয়েছে, নানা ভাবে, নানা নামে, নানা কারণে চাওয়া হয়েছে। 'অন্ন হল শান্তি, উত্তম চারণভূমিতে (এ শান্তি) ভগবতী হয়ে উঠুক— শান্তির্বা অন্নং সূর্যবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়াঃ।' (ঐ/ব্রা; ৭:২:২) দশাক্ষর বিরাট্ ছন্দের সঙ্গে অন্নের সম্বন্ধ বারবার বলা হয়েছে। (ঐ/ব্রা; ১:৫:৩৩; ৫:৩:৪; ৬:৫:১০; ৬:৪:৮; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ; ৮:১০:৮; ১২:১০:৮; ১২:১১:২২; তৈ/ব্রা; ১:৮:২:৪; ৩:৮:২:৮৩; ৩:৯:১৭:৬২; ১৩:৭:৮) 'অন্নের এই রূপ— সুরা— অন্নস্য বা এতদ্রূপং যৎসুরা।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৩:১৯) 'জরাবোধীয় (নামক সামগান)-ই অন্ন, মুখ গায়ত্রী। মুখ দিয়ে অন্নধারণ করে, আহার করে— অন্নং বৈ জরাবোধীয়ং মুখং গায়ত্রী মুখ এব তদন্নং ধত্তে অন্নমত্তি।' (তাণ্ড্য মহা-ব্রা; ১৪:৫:২৮) তেমন 'এ-ই হল সাক্ষাৎ অন্ন, এই যে ইলান্দ (সাম গান)— এতদ্বৈ সাক্ষাদন্নং যদিলান্দম্।' (তাণ্ড্য মহা-ব্রা; ৫:৩:২:১) আবার 'এই হল সাক্ষাৎ অন্ন এই যে রাজন (সামগান)— (এতদ্বৈ সাক্ষাদন্নং যদ্রাজনম্।' (তা/ম/ব্রা; ৫:৩:২) কোনও ব্রাহ্মণ সামগানকে অন্ন বলছে, কোনওটা-বা যজ্ঞ ও তার অঙ্গকে অন্ন বলছে, এর দ্বারা সব সম্প্রদায়ই অন্নের মাহাত্ম্য স্বীকার করে এর অত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেছে।

শুধু অন্নের জন্যে অন্নকে অবরোধ করার কথা বারবারই পাই, 'অন্নের অন্নের (জন্যে) হোম করে। অন্নের অন্নের অবরোধের জন্যে— অন্নস্যান্নস্য জুহোতি। অন্নস্যান্নস্যাবরুদ্ধ্যৈ।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:৮:৪৮; ১:৮:২:৪) যেমন করে হোক অন্নের জোগান যেন নিশ্চিত হয় সে চেষ্টাই নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কখনও অন্ন শুধু অন্নরূপেই, কখনও কোনও দেবতার রূপে, আবার কখনও যজ্ঞে ব্যবহৃত কোনও উপকরণ, যজ্ঞের কোনও অংশ, কোনও ছন্দ, কোনও বিশেষ যাগ— এ সবের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছে অন্ন। উদ্দেশ্য দুটি: প্রথমত, দেবতাদের বা যজ্ঞাঙ্গকে অন্নের স্বরূপ বললে দেবতারা প্রীত হয়ে অন্ন দান করবেন। দ্বিতীয়ত অন্ন যে স্বতই মহৎ, মহামূল্য, আরাধ্য— এটি প্রতিপন্ন হল। অন্ন থেকে সুরা তৈরি করা হত; সুরার জনপ্রিয়তাও অন্নের মাহাত্ম্য বাড়াল। 'অন্ন পূষা... রাজন্য ইন্দ্রের, অন্ন পূষা। অন্নাহারের দ্বারা উভয়দিককেই পরিগ্রহণ করে।' তাই রাজন্য অন্নাহারী হবে— 'অন্নং বৈ পূষা... ঐন্দ্রো বৈ রাজন্যোঽন্নং পূষা। অন্নাদ্যেনৈবমুভয়তঃ পরি গৃহ্নাতি। তস্মাদ্রাজন্যোঽন্নাদো ভাবুকঃ।' (তৈ/ব্রা ৩:৮:২৩:৯০) 'অন্ন চন্দ্রমা অন্ন প্রাণ— অন্নং বৈ চন্দ্রমাঃ অন্নং প্রাণাঃ।' (তৈ/ব্রা ৩/২/৩/১৯) 'অন্ন মরুদ্গণ— অন্নং মরুতঃ;' (তৈ/ব্রা ১:৭:৭:৪৩) ;এই যে ওদন এ-ই পরমেষ্ঠী— পরমেষ্ঠী বা এষ। যদোদনঃ।' (তৈ/ব্রা ১:৭:১০:৬৪) 'অন্ন হল জল। তার থেকে অন্ন জন্মায়। যেহেতু জল থেকে অন্ন জন্মায় (তাই) তা (এর দ্বারা) অবরুদ্ধ হয়— 'অন্নং বা আপঃ। তাভ্যো বা অন্নং জায়তে। যদদ্ভ্যোঽন্নং জায়তে।' (তদবরুন্ধে। তৈ/ব্রা ৩:৪:১৪:৫) এ কথা অন্যত্রও আছে, 'যা অন্ন তা-ই জল— তদ্ যদন্নমাপস্তাঃ।' (জৈ/ব্রা ১:৯:২:৫) 'যা কৃষ্ণ তা হল জল,

অন্ন, মন ও যজু'র রূপ... নীল রূপ হল জল, অন্ন, মন ও যজুর রূপ— যৎ কৃষ্ণং তদপাং রূপমন্নস্য মনসো যজুষঃ... নীলং রূপং তদপাং রূপমন্নস্য মনসো যজুষঃ।' (জৈ/ব্রা; ১:৮:১:৩)

জলের সঙ্গে অন্নের সম্পর্ক কৃষিজীবী মানুষের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। জলকে অবরোধ করা মানে পানীয় জলের জোগান সম্বন্ধে নিশ্চয়তা। বারেবারেই শোনা যায় প্রাণ বা জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অশনায়পিপাসে। অর্থাৎ নিরাপদ পানীয় জল সম্ভবত খুব সুলভ ছিল না। জলে ধানগাছ বাড়ে তাই ধান দিয়ে জলের জোগান সম্বন্ধে একটা আশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা। এই কথাই আবার শুনি, 'জলই অন্ন— পয় এবান্নম্।' (শতপথব্রাহ্মণ; ২:৫:১:৬) 'অন্ন প্রজাপতি— অন্নং বা অয়ং প্রজাপতিঃ।' (শ/ব্রা ৭:১:২:৪) 'বসুদের রূপ হল চাল— বসূনাং ব এতদ্রূপং যত্তণ্ডুলাঃ।' (তৈ/ব্রা; ৩:৮:১৪:৫) 'এগুলিই সাক্ষাৎ অন্ন, ঊষাগুলি'। অন্নাহারে এদের সমর্ধিত (সমৃদ্ধ) হয়।' (এ তে হি সাক্ষাদন্নং। যদূষাঃ। সাক্ষাদেবৈনমন্নাদ্যে সমর্ধয়ন্তি। তৈ/ব্রা ১:৩:৭:৪৫) ওপরের তালিকায় অন্ন পূষা, চন্দ্রমা, প্রাণ, বসু, মরুদ্গণ, ঊষা, পরমেষ্ঠী, জল (মনে রাখতে হবে 'আপঃ' বা জলও স্বতন্ত্ররূপে দেবতা ছিল)— এতগুলি দেবতার সঙ্গে অন্নকে সম্পৃক্ত করা আকস্মিক বা অহেতুক নয়। অন্নাভাবে জর্জরিত জনগোষ্ঠীর কাছে অন্ন দেবতার মতোই সুদূর, দুষ্প্রাপ্য, ক্ষমতাশালী ও আরাধ্য।

অন্ন বলতে তখন ওদন, তণ্ডুল বোঝাত, নীবার-ও বোঝাত; 'এ-ই পরম অন্ন, নীবার। এই পরম অন্নের আহারের দ্বারা অন্নকে অবরোধ করা যায়— এতদ্বৈ পরমমন্নং যন্নীবারাঃ। পরমেণৈবাস্মা অন্নাদ্যেনান্নমবরুন্ধে।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৭:৩৮; ১:৬; ৪:৩৩) 'অন্ন হল গম— অন্নং বৈ গোধূমাঃ।' (শ/ব্রা ৫:২:১:৩) আর ছিল চরু, দুধ ও তণ্ডুলে পক্ব খাদ্য, চরু দেবতাদের ওদন, চরু-ওদন হল প্রত্যক্ষ অন্ন— চরুর্বৈদেবানামোদনো হি চরুরোদনো হি প্রতক্ষমন্নম্।' (শ/ব্রা ৪:৪:২:১) নানা রকম শস্যবীজ তখন চাষ হচ্ছে, কোনও কোনওটাকে দেবতার ভোজ্য বলে তার সম্মান বাড়ানো হচ্ছে, যাতে যত্নে চাষ ও সংরক্ষণ হয়, যেন অপচয় না হয়।

'অন্নই 'বাজ' (শক্তি), অন্নকেই অবরোধ করা হয়— অন্নং বৈ বাজঃ। অন্নমেবাবরুন্ধে।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৮:৫২; তাণ্ড্য ম-ব্রা ১৩:৯:১৩; ১৪:৫:৫) অন্যত্র বলেছে, 'অন্নপেয়ই হল বাজপেয় (যাগ)— অন্নপেয়ং হ বৈ নামেতদ্ যদ্বাজপেয়ম্।' (শ/ব্রা ৫:১:৩:৩; ৫:১:৪:১২; ৫:২:২:১) 'অন্নই বাজ, অন্নের দ্বারা জয় করা এই কথা বলা হয়েছে— অন্নং হি বাজোঽন্নজিত ইত্যেবৈতদাহ।' (শ/ব্রা ৫:১:৪:১৫) বাজপেয় একটি পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ যাগ; এটা জটিল ও ব্যয়সাধ্য, কিন্তু যজমানের সম্মান বৃদ্ধি করত। এই শাস্ত্রাংশে বলা হল এ যজ্ঞ অন্নকেন্দ্রিক, অন্নই বাজ। এই কথা বলাতে অন্ন বিশেষ একটি সম্মান লাভ করল। 'পূর্বকালে বাক্-ই দেবতাদের অন্ন ছিল— বাগ্ বৈ দেবানাং পুরান্নমাসীৎ।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৬:২৭) এ কথা বৈদিক সাহিত্যে শুধু নয়, সমস্ত প্রাচীন ধর্ম সাহিত্যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বাক্ হল সেই উপাদান যা দিয়ে মন্ত্র নির্মিত হয়। এই মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী? মন্ত্রে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব সৃষ্টি করে, এর দ্বারা বিশ্বভুবন সৃষ্ট হয়; এ শুধু শব্দসমষ্টি নয়; শক্তিপূত, তেজোগর্ভ শব্দসমষ্টি। এবং এমন যে-বাক্, তা ছিল দেবতাদের অন্ন, যা আহার করে তাঁরা শুধু বাঁচতেন না, সৃষ্টি

করতেন। কাজেই বাক্‌কে অন্ন বলে সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে অন্নের সঙ্গে সমীকৃত করা হল। 'অন্নকে প্রাণ, অন্ন অপান বলা হয়েছে। অন্নকে মৃত্যু, তাকেই জীবনের অবলম্বন বলা হয়েছে— অন্নং প্রাণমন্নমপানমাহুঃ। অন্নং মৃত্যুঃ তমু জীবাতুমাহুঃ।' (তৈ/ব্রা ২:৮:৮:৬১) প্রাণবায়ু অপানবায়ু দেহের মধ্যে থাকে বলে মনে করা হত। কিন্তু মৃত্যু কেন? অন্নাভাবই মৃত্যু আর অন্নাহার হল জীবাতু, জীবনের মূল উপাদান। এ যেন অন্নের স্তব।

অন্নাভাব যে কী মারাত্মক হতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের বেশ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। সতেরো সংখ্যাটি যজ্ঞের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত। বলা আছে অন্নই হল সপ্তদশ, 'মধ্যে যে সাত থাকে, (দু'দিকে) পাঁচ পাঁচ থাকে, সেই মধ্যেরটিই ক্ষুধাকে ধারণ করে; তাতে প্রজা ক্ষুধাহীন হয়— অন্নং বৈ সপ্তদশ, যৎ সপ্ত মধ্যং ভবতি পঞ্চ পঞ্চাভিতোহন্নমেব তন্মধ্যতো ধীয়তে অনশনায়ুকো ভবত্যনশনায়ুকঃ প্রজাঃ।' (ত/ম/ব্রা ২:৭:৭) দু'পাশে পাঁচ পাঁচ সংখ্যায়, ঊন, মধ্যের সপ্ত অধিক, এবং মধ্যেরটি নিরাপদে অক্ষুধা বা ক্ষুন্নিবারণকে ধারণ করে। যজ্ঞের এই রূপকবিনির্মাণের একটিই উদ্দেশ: ওই সপ্ত প্রজার অন্নসংস্থানকে নিরাপদে ধারণ করে, যাতে প্রজা ক্ষুধা থেকে অব্যাহতি পায়। এটি ছিল সে সমাজের একটি পরম কাম্যবস্তু।

যেন খেতে পাই, এই কথাটি অসংখ্য প্রার্থনার মূল কথা। 'ব্রহ্মোদ্য' হল ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনাসভা। এটা প্রায়ই ধনী রাজন্য বা রাজার আমন্ত্রণে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। একটি উদ্দেশ্য অন্নলাভ, 'ব্রহ্মোদ্য অন্নদান করে, ব্রহ্মপত্নী অন্নদান করেন— ব্রহ্মোদ্যং চান্নাদা ব্রহ্মপত্নী চান্নাদাঃ।' (ঐ/ব্রা ৫:৪:৬) 'আমি অন্ন আহার করছি— অহমন্নমহমদন্তমস্মি।' (তৈ/ব্রা ২:৮:৮:৪৮) এই কথা বারবার বলা হয়েছে। মন্ত্র জপ করার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, 'অন্ন (উৎপাদন) করব, অন্নে প্রবেশ করব, অন্ন জন্মাব— অন্নং করিষ্যাম্যন্নং প্রবিষ্যাম্যন্নঞ্জনয়িষ্যামি।' (তা/ম/ব্রা ১:৩:৬-৭) তেমনই শুনি, 'অন্ন (উৎপাদন) করেছি, অন্ন হয়েছে, অন্নের জন্ম দিয়েছি— অন্নমকরমন্নমভূদন্নমজীজনম্।' (তা/ম/ব্রা ১:৮:৭) রাজা কামনা করছেন, 'অন্নবান্, ওদনবান্, আমিক্ষা (ছানা)-বান্, যেন এদের রাজা হই— অন্নবতামোদনবতামামিক্ষাবতাম্। এষাং রাজা ভূয়াসম্।' (তৈ/ব্রা; ২:৭:১৬:৫৮) অর্থাৎ রাজার প্রজারা যেন থাকে দুধে-ভাতে; ভাত এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের অভাব যেন তাঁর রাজ্যে না থাকে। বলা বাহুল্য, এটি বাসনামাত্রই। কোনও কোনও রাজার রাজ্যে, কোনও কোনও যুগে, স্বল্পকালের জন্যে ক্ষুধার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম থাকত নিশ্চয়ই, কিন্তু মোটের ওপরে তা ব্যতিক্রমী, স্বল্পস্থায়ী। ব্যাপক ক্ষুধার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু এত অজস্র, এত আর্তকরুণ প্রার্থনা উচ্চারিত হতে পারে এত দিন ধরে। তবে রাজা ত সুখী প্রজা অর্থাৎ খেতে পায় এমন প্রজারই স্বপ্ন দেখবেন। এ সেই স্বপ্নের বর্ণনা। আগেই যেমন দেখেছি পরীক্ষিৎ রাজার রাজ্যে ধনীগৃহের গৃহিণী স্বামীকে প্রশ্ন করছে— 'দধি, মন্থ ও শরবৎ আছে বাড়িতে, কোন্‌টা দেব তোমাকে?' (অথর্ব সং; ২:১২৮:৯)।

'অন্নের অন্নপতি বলবত্তা নীরোগিতা দিয়েছিলেন, নমস্কার করি বিশ্বজনের মঙ্গলের জন্যে, হে পালয়িত্রি, আমাদের ক্ষতি কোরো না— অন্নস্যান্নপতিঃ প্রাদাদনমীবস্য শুষ্মিণো নমো

বিশ্বজনস্য, ক্ষামায় ভুঞ্জতি মা মা হিংসীঃ।' (তা/ম/ব্রা; ১:৮:৭) 'অন্ন কাছে, অন্ন আমাদের কাছে (আসুক)— উপ বা অন্নমন্নমেবাস্মা উপাবঃ।' (তা/ম/ব্রা; ৬:৯:৩) অন্ন যখন দুর্লভ হয়, তখন মনে হয়, অন্ন দূরে সরে গেছে, তাই প্রার্থনা ওঠে 'কাছে আসুক অন্ন।' একটি খুব ঘরোয়া ছবি পাই রান্না খাওয়ার। 'বাড়ি বাড়ি অন্ন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন যদি (কেউ কেউ) প্রশ্ন করে "কী করছে? এই লোকগুলি?" যজমানরা বলবেন— '(ওরা) অন্ন আহার করছে— কুলে কুলে অন্নং ক্রিয়তে তদ্ পৃচ্ছেয়ুঃ কিমিদং কুর্বন্তীমে যজমানা অন্নমৎস্যন্তীতি ব্রূয়ুঃ।' (তা/ম/ব্রা; ৫:৬:৯) রান্নার সময়ে 'কী করছে' প্রশ্ন করলে বলতে হবে 'ভাত খাচ্ছে।' এটা ইচ্ছাপূরক উত্তর, শুভ উত্তর, অশুভনিবারক উত্তর। 'কুল' মানে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার, সেই সব পরিবারে ভাত রান্না হওয়ার সময়ে বলতে হবে, এরা খাচ্ছে। উদ্দেশ্য 'যেন এরা খেতে পায়।' 'অন্নাহারকে নিশ্চিত করে— অন্নাদ্যমব রুন্ধে।' (তা/ম/ব্রা; ৬:১৮:২,১১; ১৬:৬:৬,৭,৮) এই অবরোধ করার অর্থ 'বেঁধে রাখে'— অসংখ্যবার এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কী করে অন্নকে অবরুদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ আশঙ্কা ছিল, অসতর্ক হলে, যজ্ঞে, স্তবে, নৈবেদ্যে কোনও ত্রুটি ঘটলে অন্ন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, ক্ষুধার অন্ন জুটবে না, বা তার কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না। এই কথাই অন্যত্র, 'অন্ন হল ব্রত। যা খেয়ে, মানুষ বাঁচে, সংবৎসর এই অন্নের দ্বারা অন্নভোজনকে অবরোধ করে— অন্নং ব্রতম্, সংবৎসরাদেতে-নান্নেনান্নাদ্যমবরুন্ধে।' (তা/ম/ব্রা; ১৬:৭:৫) 'প্রজাপতি মহান, তাঁর ব্রত এই অন্ন— প্রজাপতির্বাব মহাংস্তস্যৈতদ্ ব্রতমন্নমেব।' (তা/ম/ব্রা; ৪:১০:২) প্রজাপতির ব্রত অন্ন মানে তিনি স্বয়ং অন্ন আহার করে বেঁচে থাকেন; এ কথার দ্বারা অন্নের গরিমা বৃদ্ধি পায়; মানুষ ত কোন্ ছার, স্বয়ং প্রজাপতি বেঁচে থাকেন অন্নের জোরে। অতএব অন্ন সম্বন্ধে একান্ত এই প্রার্থনা আরও জোর পেল: এ হল সেই অন্ন যা স্বয়ং প্রজাপতিকে বাঁচিয়ে রাখে। 'এর জন্যে সকল দিক থেকে অন্নাহারকে অবরোধ করে— সর্বাভ্য এবাস্মৈ দিগ্‌ভ্যোঽন্নাদ্যমেবাবরুন্ধে।' (তা/ম/ব্রা; ১৬:১৩:১১) সমস্ত সমাজে দীর্ঘকাল ধরে এই এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত প্রার্থনা ছিল: অন্ন যেন অবরুদ্ধ হয় অর্থাৎ তাদের ঘরে অন্ন ও অন্নাহার যেন বাঁধা থাকে। এর যেন কোনও ব্যত্যয় না হয়। এর জন্য শাস্ত্রে যা কিছু করণীয় বলে নির্দেশ করেছে সবই তারা অবিকল ভাবে পালন করবে, কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয় বা নিয়মিত অন্নলাভের সম্বন্ধে সংশয় যেন তাদের না থাকে। 'অন্নই ভদ্র। অন্নাহারের দ্বারা একে সৃষ্টি করা হয়েছে— অন্ন বৈ ভদ্রম্। অন্নাদ্যেনৈবৈনং সংসৃজতি।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:৩:১৯)

অন্নকেও মাঝে মাঝে মালিন্য স্পর্শ করে তখন তা শোধন করার প্রয়োজন হয়। 'দেবতারা ব্রহ্মার ও অন্নের মালিন্য দূর করেছিলেন— দেবা বৈ ব্রহ্মণশ্চান্নস্য শমলমপাঘ্নন্।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:২:১৩) এমনই কথা আবার শুনি 'যজমানের থেকে অন্নের মালিন্য দূর করে। অন্নের মালিন্য হল সুরা— অন্নস্যৈব শমলং যজমানাদপহন্তি। অন্নস্য বা এতচ্ছমলং যৎ সুরা।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:৩:১৪) অন্নের মালিন্য শুনলে খটকা লাগে, কিন্তু একই নিঃশ্বাসে বলা হয়েছে দেবতারা ব্রহ্মার ও অন্নের মালিন্য দূর করেছিলেন। ব্রহ্মার যখন মালিন্য হতে পারে, তখন

অন্নের তো তা হতেই পারে; দেবতারা তা দূর করেছিলেন। এ দুটি শাস্ত্রাংশকে একত্র দেখা হয়তো ঠিক হবে না, যদিও সে সম্ভাবনা থেকেই যায়— এ দুটি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে খুব কাছাকাছি অংশ। তা যদি হয় তাহলে দেবতারা অন্নের যে-মালিন্য দূর করেছিলেন তা হল সুরা; ব্রহ্মা হয়তো সেই সুরায় আসক্ত ছিলেন, দেবতারা তা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। কিন্তু অন্ন থেকেও সুরা প্রস্তুত হত, তার সম্বন্ধে আসক্তিও সমাজ থেকে থাকবে। সমাজের একটি অংশের চোখে হয়তো সুরা প্রস্তুত করবার জন্যে যে-পরিমাণ অন্ন লাগত সেটা অপচয় বলে মনে হত। হওয়াটা অস্বাভাবিকও নয়, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যেখানে উদরপূর্তির পথে যথেষ্ট পরিমাণ অন্নের সংকুলান ছিল না, সেখানে নেশার জন্যে অন্নের অপচয়টা আপত্তির কারণ বলে মনে হতেই পারে। তাই অন্নের মালিন্য সুরা। অন্ন এবং ব্রহ্মার মালিন্য দূর করতে দেবতাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল।

অন্নের অপচয় বন্ধের প্রচেষ্টার পশ্চাতে আছে অন্ন সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজন, এবং সে বিষয়ে সতর্ক যত্ন। কারণ, 'অন্নই জীবন— অন্নং হ প্রাণঃ।' (ঐ/ব্রা; ৮:৩:১) '(সদ্যোজাত) পুত্রকে অন্নাহারে যেমন স্তন দান করা হয়, তেমনই জীবকে অন্নাহার দান করা হয়— অস্মৈ জাতায়ান্নাদ্যং প্রতিদধাতি যথা কুমারায় স্তনম্।' (ঐ/ব্রা; ৬:৫:৩,৪) শতপথব্রাহ্মণেও দেখি, 'যেমন সদ্যোজাত কুমারকে বা বাছুরকে স্তন্য দান করা হয় তেমনই একে অন্ন দেওয়ার হয়— যথা কুমারায় বা জাতায় বৎসায় বা স্তনমপি দধ্যাৎ এবমস্মা এতদন্নস্যাপি দধাতি।' (শ/ব্রা; ২:২:২:১) সদ্যোজাত শিশু স্তন্য ছাড়া বাঁচে না, তেমনই মানুষ অন্ন ছাড়া বাঁচে না। অন্ন প্রাণস্বরূপ, 'মানুষের অভ্যন্তরে প্রাণকে ধারণ করে সে যে (যজ্ঞীয়) অগ্নিগুলিকে ধারণ করে, তাদের মধ্যে এ শ্রেষ্ঠ অন্নভোজী হয়— প্রাণান্ বা এষ অভ্যাত্মন্ ধত্তে যোঽগ্নীনাধত্তে তেষামেষোঽন্নাদতমো ভবতি।' (ঐ/ব্রা; ৭:২:১১) 'অন্নই প্রাণ'— এ কথার সঙ্গে বলা হয়েছে 'খাদ্যই হল প্রাণ, তাই নিজের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করে— প্রাণো বৈ ভক্ষস্তৎ প্রাণঃ পুনরাত্মন্ ধত্তে।' (শ/ব্রা; ৪:২:১:২৯) 'খাদ্য হল আয়ুষ্কর রস— রসমন্নমিহায়ুষে।' (তৈ/ব্রা; ১:২:১:২৫) দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যও প্রাণধারণের উপকরণ, তাই 'গাভী হল প্রাণ, অন্নই প্রাণ— প্রাণো হি গৌরন্নং হি প্রাণঃ।' (শ/ব্রা; ৪:৩:৪:২৫) উদুম্বর বা ডুমুর ছিল খাদ্য; এবং আগেই বলেছি, যজ্ঞে ডুমুরকাঠও ব্যবহৃত হত। 'উদুম্বর থেকে শক্তি, তেমনই অন্নাহার থেকে বনস্পতিদের শক্তি; এর (মানুষের) মধ্যে (হয়) অন্নাহার ও ভোজ্য— অথ যদৌদুম্বরাদূর্জো বা এষোঽন্নাদাদ্ বনস্পতীনামূর্জমেবাস্মিংস্তদন্নাদ্যং ভৌজ্যঞ্চ।' (ঐ/ব্রা ৭:৫:৬) 'এই সেই অন্ন যা প্রাণ ও প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন, এই হল সকল যজ্ঞ, যজ্ঞই হল দেবতাদের অন্ন— এতদ্বৈ তদন্নং যত্তৎপ্রাণাশ্চ প্রজাপতিশ্চাসৃজন্তৈতাবান্ বৈ সার্বা যজ্ঞো যজ্ঞ উ দেবানামন্নম্।' (শ/ব্রা; ৮:১:২:১০) যজ্ঞে যা হব্য দেওয়া হয় তা দেবতারা আহার করেন এমন বিশ্বাস ছিলই; এখানে বলা হচ্ছে, অন্নই প্রাণ। অর্থাৎ দেবতারা যেমন যজ্ঞে আহার্য লাভ করেন, মানুষও তেমনই পায় অন্নে; কেউই আহার্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। 'প্রাণীর মধ্যে অঙ্গগুলি প্রাণকে ধারণ করে, সেই প্রাণই প্রাণ, প্রাণভৃৎ অন্নই প্রাণকে

ধারণ করে— প্রাণভৃতি অঙ্গানি হি প্রাণান বিভ্রতি, প্রাণাস্তু এব প্রাণা অন্নং প্রাণভৃদন্নং হি প্রাণান্ বিভর্তি।' (শ/ব্রা; ৮:১:৩:৯) অন্নকে এ ভাবে বারবার প্রাণের সমার্থক হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'জল হল সাক্ষাৎ অন্ন, তা প্রাণের জন্যে অন্ন ধারণ করে— অন্নং বা আপোঽনন্তর্হিতং তৎ প্রাণেভ্যোঽন্নং দধাতি।' (শ/ব্রা; ৮:২:৩:৬) জল খাদ্যের মতোই জীবনধারণের একটি মুখ্য উপাদান; ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই-ই মানুষের প্রাণকে পীড়িত ও ক্ষীণ করে, তাই অশনায়াপিপাসে, অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণাকে মৃত্যুর সমার্থক বলা হয়েছে।

আহারের পরে স্থালীতে যে-অন্নটুকু থাকে সেটা খাবে না ফেলে দেবে, এ নিয়ে একটা বিতর্ক ছিল। সে প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হল, 'যদি খায় তাহলে মহিমান্বিত অন্ন ভোজন করে। পরম আয়ুষ্মান হয়— যৎ প্রাশ্নীয়াৎ। জন্যমন্নমদ্যাৎ। প্রমায়ুকঃ স্যাৎ।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:১৫:৬২) এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ শাস্ত্রাংশ। খাবার পর স্থালীতে বেশি অন্ন থাকার কথা নয়, সামান্য কিছু গায়ে যা লেগে থাকে বিতর্ক তাই নিয়ে। সিদ্ধান্তটি লক্ষণীয়, ঐ-টুকু অন্ন মহিমান্বিত; অর্থাৎ অন্নের মতো দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য বস্তু সামান্য পরিমাণও অপচয় করলে কোথায় যেন ত্রুটি হয়, অন্নের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়; না করলে অন্নের মহিমা যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়। অন্নকে খাতির করলে অন্নও খাতির করে, অন্নাভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 'তা-ই হল সমৃদ্ধি, যখন আগেকার অন্ন নিঃশেষ হওয়ার আগেই, অন্য অন্ন আসে; তারই (সেই মানুষের অর্থাৎ ওই অন্নের মালিকের) বহু অন্ন হয়— তদ্ধি সমৃদ্ধং যদক্ষীণে এব পূর্বস্মিন্নন্নেঽথাপরসন্নমাগচ্ছতি স হি বহ্বন্ন এব ভবতি।' (শ/ব্রা; ১:৬:৪:১৪) এ-ই ছিল স্বপ্ন। অন্ন নিঃশেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী অন্নের পাক শুরু হওয়া— এই হল সমৃদ্ধির স্বরূপ। শুধু এ দেশে বা বৈদিক যুগেই নয়, সর্বত্র সর্বকালেই মানুষ চেয়েছে কিছু খাদ্য অবশিষ্ট থাকতেই পরবর্তী কালের খাদ্যের প্রস্তুতি হওয়া। অর্থাৎ ভাণ্ডার শূন্য হওয়ার পূর্বেই কিছু সংগ্রহ, যাতে ক্ষুধা মানুষকে আক্রমণ করার পূর্বেই তার প্রতিকার বিধান হয়। অর্থাৎ কিছু উদ্বৃত্ত। এই শাস্ত্রাংশে সেই ভাগ্যবানদেরই সমৃদ্ধ বলা হয়েছে যাদের ভাণ্ডার কখনওই শূন্য হয় না, যাদের স্থালী বা হাঁড়ি কখনওই একেবারে খালি হয় না। এই সব উক্তি প্রতিপন্ন করে যে এই অবস্থাটা কাম্য, কিন্তু বাস্তব ছিল না।

যজ্ঞ থেকে খাদ্য পাওয়া যেত এমন ধারণা ছিল, কিন্তু যে বছর যজ্ঞ সম্পাদন করা হত, শস্য সে বছর না-ও জন্মাতে পারত। তাই সে-ই কৃষির প্রথম যুগের রচনা তৈত্তিরীয় সংহিতায় পড়ি, 'যে বছর সত্র হয়, সে বছর প্রজা ক্ষুধার্ত থাকে, তাদের খাদ্য ও বল নিয়ে নেয়; যে বছর অক্ষুধিত, সমৃদ্ধ সে বছর প্রজার অন্ন ও বল নিয়ে নেয় না— যাং সমাং সত্রং ক্ষোধুকাস্তাং সমাং, প্রজা, ইষং হ্যাসামূর্জমাদদতে, যাং সমাং বৃদ্ধমমক্ষোধুকাস্তাং সমাং প্রজা ন হ্যাসামিষমূর্জমাদদতে।' (তৈ/সং; ৮:৫:৯:১) যজ্ঞ করার সঙ্গে সঙ্গেই তো ফসল হয় না, তাই এই সতর্কবাণী; কারণ ও কার্যের মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান তো থাকবেই। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেই যজ্ঞকর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ক্ষুধার সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হচ্ছে, আবার খুব দ্রুত ফললাভের আশা করতে বারণ করাও হচ্ছে। এই সময়টাতেই আর্যরা চাষ শিখেছে, শিখেছে ফসল বোনা ও কাটার মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান থেকেই। সেইটেকেই

যেন যজ্ঞকর্মের ওপরে আরোপ করা হচ্ছে। ক্ষুধিত অবস্থাটা সম্পর্কে কতকটা সহিষ্ণুতাও শেখানো হচ্ছে। ফললাভে বিলম্ব মানুষ যেন ধৈর্য ধরে সইতে পারে এমন উদ্দেশ্যও এতে নিহিত।

ক্ষুধা যে দুঃসহ, সে কথা মানুষ সংগ্রহী (ফলমূল খুঁজে আনা) যুগে এবং শিকারের যুগেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। পশুপালনের যুগে প্রথম অবস্থাটা কতকটা তার আয়ত্তে এল। তখনও নানা দৈব-দুর্বিপাকে পশুপালে মড়ক লাগত, জমির ঘাস খরায় শুকিয়ে যেত, বন্যায় ডুবে যেত, পচে যেত। আশপাশের দস্যুদলের আক্রমণে, লুণ্ঠনে পশুসংখ্যা হ্রাস পেত। তবু এ সব অপেক্ষাকৃত সাময়িক, আগন্তুক উৎপাত। মোটের ওপরে, পালের পশুর দুধ এবং তা থেকে দই, ক্ষীর, ইত্যাদি জুটত এবং পশুমাংসের একটা নিশ্চিত জোগান ছিল। তবু ক্ষুধা জিনিসটা অচেনা ছিল না; অচেনা ছিল তা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার জন্যে আতঙ্ক। ক্ষুধা যদি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী হত, তাহলে মৃত্যুও হত। চাষ করতে শেখার পর খাদ্যের ব্যাপারে খানিকটা বেশি নিশ্চয়তা এল। তবু তখনও দৈব-দুর্বিপাকে মাঝে-মাঝেই চাষ উঠত না। অনাহার বাস্তবরূপে দেখা দিত। বেশি দিন অনাহারের অর্থ মৃত্যু। তাই সেই ঋগ্বেদের যুগ থেকেই অনাহারের ত্রাস সমাজচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

ক্ষুধাকে বলা হচ্ছে শত্রু। ক্ষুধার উদ্রেকের আগেই খাদ্যসংস্থান করে পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে। 'আমি অন্ন ও বল গ্রহণ করি— এই বলে অন্ন ও বলকে এক দিকে অবরুদ্ধ করে, সে দিকে যে বাস করে সে ক্ষুধার্ত হয়— ইষমূর্জমহমিদমা দদ ইতীষমেবোর্জং তস্মৈ দিশোঽবরুন্ধে, ক্ষোধুকা ভবতি যস্তস্যাং দিশি ভবতি।' (তৈ/সং; ৫:২:৫:৬) 'ক্ষুধাই মৃত্যু— অশনায়া মৃত্যুরেব।' (তৈ/ব্রা; ৩:৯:১৫:৫৭) তখন ক্ষুধার পীড়নে মৃত্যুর কথা অজানা ছিল না, অশনা মানে খাওয়া, কার? যে ক্ষুধিত তার। ('অথাতোঽশনাঽনশনস্যৈব (ব্রতম্)'; (শ/ব্রা ১:১:১:৭) জীবমাত্রেরই ক্ষুধা, এর প্রতিবিধান করার দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তার। তাই প্রজাপতির চিন্তা 'কেমন করে আমার সৃষ্ট প্রজারা পরাভূত হচ্ছে?' তখন তিনি দেখলেন, 'ক্ষুধার জন্যে আমার প্রজারা পরাভূত হচ্ছে (এর পর তিনি স্তন্যের ব্যবস্থার জন্য স্তন সৃষ্টি করলেন)— কথং নু মে প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরাভবন্তীতি। স হৈতদেব দদর্শানশনতয়া বৈ মে প্রজাঃ পরাভবন্তীতি।' (শ/ব্রা ২:৫:১:৩) এই যে উপলব্ধি এটা মানুষেরই; প্রজাপতির ওপরে কেবল আরোপিত হয়েছে। ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর আতঙ্ক এত স্পষ্ট ছিল বলেই অন্নের জন্যে এত ব্যাকুলতা। 'একমাত্র ক্ষুধা (রূপ) মৃত্যুই পিছু নেয়... অন্ন দিয়ে ক্ষুধাকে হনন করে— এক উ এব মৃত্যুরন্বেত্যশনায়ৈব... অন্নেনাশনায়াং হন্তি।' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১:১:৩:৩) প্রজাপতির শিথিল দেহের মধ্যভাগ থেকে প্রাণ ওপরে উঠে যেতে চাইল, তাকে (তিনি) অন্নের দ্বারা গ্রহণ করলেন, তাই প্রাণ অন্নের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, যে অন্ন ভোজন করে, সে বেঁচে থাকে; যে অন্ন ভোজন করে সে বীর্যবান হয়।... এই অন্ন প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত দেবতারাই তার পর (অন্ন) লাভ করেন। এ সমস্তের জীবনই হল

অন্ন— প্রজাপতের্বিস্রস্তাৎ প্রাণো মধ্যত উদচিক্রমিষৎ তমন্নেন অগৃহ্নাৎ তস্মাৎ প্রাণো অন্নেন গৃহীতো যো হ্যেবান্নমত্তি স প্রাণিতি স উর্জয়তি। ...তদেতদন্নং প্রপদ্যমানঃ সর্বে দেবা অনুপ্রাপদ্যন্ত অন্নজীবনং হীদং সর্বম্।' (শ/ব্রা ৭:৫:১:১৬-১৮) এর মধ্যে লক্ষণীয় হল ওই কথাটি, 'সকলেই অন্নজীবন' অর্থাৎ অন্নেই বেঁচে থাকে; জীবমাত্রের পক্ষে এ কথা সত্য, তাই অন্নই জীবন। 'তাই যে দেশে ক্ষুধা মানুষকে শীর্ণ করে, সে দেশে মানুষ বুভুক্ষু থাকে— তস্মাদ্ যত্রৈষা যাতযামা ক্রিয়তে তৎ প্রজা অশনায়বো ভবন্তি।' (তা/ম/ব্রা ৬:৪:১২) 'প্রজাপতি অগ্নি নিজের পরিমাণ মতো অন্নের দ্বারা (সৃষ্টি বা জীবকে) প্রীত করেন, যে পরিমাণ অন্ন নিজের জন্য প্রয়োজন তা রক্ষা করে, মানুষের ক্ষতি করে না, তার চেয়ে কম পরিমাণ অন্নে (প্রাণ) রক্ষা হয় না— প্রজাপতিরগ্নিরাত্ম সম্মিতেনৈবেনমেতদন্নেন প্রীণাতি যদু বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ো ন তদবতি।' (শ/ব্রা ৯:২:২:২)

এটিও ওই ব্যাপক ক্ষুধার অন্য একটি প্রকাশ: ক্ষুধার অন্ন পরিমাণে এত কম ছিল যে তাতে প্রাণ রক্ষা হত না; যে অন্ন জীবনের সমার্থক তার অপ্রতুলতার অর্থ আধপেটা বা সিকিপেটা খাওয়া, সে খাওয়া ত নামেই খাওয়া, তাতে পিত্তরক্ষা হয়, প্রাণরক্ষা হয় না। এ অভিজ্ঞতাও পরিচিত ঘটনা ছিল, তাই ক্ষুধার অপর নাম মৃত্যু। দেখা যাচ্ছে, এ বোধে কোথাও কোনও অন্যথা ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকে রচিত এই ব্রাহ্মণগুলি সেই সমাজকেই বর্ণনা করছে যে সমাজে লোহার লাঙলের ফলার ব্যবহারে চাষে কিছু উদ্বৃত্ত হচ্ছে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে সমৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু ক্ষুধারূপ মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে না মানুষ। ব্যাপক এক সন্ত্রাসকে জিইয়ে রেখেছে সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা। সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর আতঙ্কে সন্ত্রস্ত। তার কোনও প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ন দিয়ে ক্ষুধাকে হনন করার কথা বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অনাহারজনিত মৃত্যুর প্রতিকার হল অন্ন। লোকে এ কথা জানত; সমস্যাটা জ্ঞানের ছিল না, ছিল অন্নের। এ মৃত্যু নিবারণের উপায় জানা থাকলেও সে উপায় অবলম্বন করার সাধ্য অভুক্ত মানুষের ছিল না। 'যে অনাহারে আছে সে যে শেষ খাওয়াটি খায়। এই শেষ খাওয়াটা খায় উপবাসী মানুষ— অনদ্যমানো যদন্তমত্তীতি। অনদ্যমানো হ্যেষা অন্তমত্তীতি।' (জৈ/ব্রা ২:১:২:১)

সমাজে বিপুলসংখ্যক অনাহারী বা অর্ধাহারী না থাকলে যজ্ঞনির্ভর যে সব ধর্মগ্রন্থ তাতে এত অসংখ্যবার 'ক্ষুধাই মৃত্যু' এ কথা উচ্চারিত হত না। প্রকারান্তরে যজ্ঞের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য যে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের খাদ্যসংস্থান করা সে কথাও এ সব বাক্যে স্বীকৃত। সমাজে অন্নাভাব ব্যাপক হলে শাস্ত্র বলে:

> (১) দেবাতারাও অন্নের দ্বারা প্রাণধারণ করেন; (২) প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করে আবিষ্কার করেন তাদের খাদ্য নেই, তাই তারা মারা পড়বে; তখন তিনি (৩) খাদ্য সৃষ্টি করতে উদ্যত হন; (৪) তাঁর সৃষ্ট প্রাণীর প্রাণ বেরিয়ে যেতে উদ্যত দেখে; (৫) তিনি অন্ন দিয়ে তাকে ধরে রাখেন; (৬) এই বৃহৎ বিশ্ব-সৃষ্টি মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিল, সে মৃত্যু ক্ষুধা। অর্থাৎ প্রাণীর

প্রাণধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল না, তাই সর্বব্যাপী মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ছিল সৃষ্টি। কী তার প্রতিকার? খাদ্য; (৭) সে খাদ্য পর্যাপ্ত হলে তবেই প্রাণীর প্রাণরক্ষা হয়।

কিন্তু সমস্যা হল, তা পর্যাপ্ত নয়, প্রজাপতি যত প্রাণী সৃষ্টি করে ফেলেছেন, তার উপযুক্ত খাদ্য কখনওই জোগাড় হল না।

ক্ষুধার দার্শনিক উচ্চারণ

আগেই দেখেছি, অন্নসংস্থানের প্রত্যেকটি উন্নততর ধাপে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেখে প্রচুরতর অন্নের সম্ভাবনা। ক্ষণকালের জন্যে হলেও তার অনাহারে মৃত্যুর ভয় অন্তর্হিত হয়। ফলে জন্মহার বাড়ে। প্রজা বৃদ্ধি হয়। আর ঠিক তার পরেই দেখা যায় প্রজার সংখ্যার সঙ্গে অন্নের পরিমাণের যে সংহতি আশা করা গিয়েছিল, তা নেহাতই মরীচিকা। ক্ষুধা ও খাদ্যের অনুপাত পূর্বের মতো বিসদৃশই থাকে। মানুষের সংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণের কোনও সংগতিই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সেই ব্যাপক ক্ষুধা, সেই অনাহারে মৃত্যুর আতঙ্ক, চাহিদা অনুসারে খাদ্য জোগানের সেই বৈষম্য।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, উন্নততর কৃষিতে যে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হল তা দিয়ে বর্ধিত জনসংখ্যার অন্নসংকুলান হল না কেন? দুটি উত্তর সম্ভব: প্রথমত, যে হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হল তার অনুরূপ পরিমাণে, অর্থাৎ তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে যতটা খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন ছিল ততটা হল না। উল্টো করে বলা যায়, খাদ্য উৎপাদন যতটা বেড়েছে বলে মনে হয়েছিল তাতে প্রজাবৃদ্ধি সম্বন্ধে মানুষের মনে যে আশ্বাস জন্মেছিল, সে-দুটোর মধ্যে একটা ফারাক দেখা গেল। অর্থাৎ খাদ্যবৃদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে মানুষের মনে যে ভরসা জন্মেছিল সেটার সঙ্গে বাস্তবের মিল ছিল না, তাই একটা ভ্রান্ত আশ্বাসে প্রজাবৃদ্ধি ঘটতে লাগল কিন্তু সমাজের খাদ্যভাণ্ডারে সে অনুপাতে খাদ্য মজুত ছিল না। তাই বেদ বলছে:

> মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে যে খাদ্য তা মানুষকে রক্ষা করে, কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য মানুষকে রক্ষা করতে পারে না, অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

এ কথাগুলি একটি বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন: প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য কম, ক্ষুধার অনুপাতে অন্ন নেই, ফলে আধপেটা খেয়ে যখন মানুষ বাঁচে না তখন সেই স্বল্প পরিমাণ খাদ্য প্রাণ রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ প্রলম্বিত অর্ধাহারের পরিণতি অনাহারেরই অনুরূপ। সে-ই অশনায়া, ক্ষুধা, যার অপর নাম মৃত্যু। যে ক্ষুধা-মৃত্যুর দ্বারা সারা সৃষ্টি আবৃত। স্বয়ং প্রজাস্রষ্টা প্রজাপতি যার কিনারা করতে পারেন না। মাঝে মাঝে এটা ওটা নানা যজ্ঞ বাৎলে

দেন, কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি হয় না। একাধিক শাস্ত্রাংশে প্রজাপতিকে যে তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্যে খাদ্যসংস্থানের প্রয়াস পেতে হয়েছে, এতেই প্রমাণ হয় ক্ষুধার কোনও স্থায়ী সমাধান কখনওই হয়নি। ক্ষুধা ও খাদ্যের মধ্যে বৃহৎ একটি ব্যবধান সর্বদাই বিরাজ করেছে, যাকে মানুষ চিনেছে মৃত্যু বলে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য যতটা বেশি উৎপাদিত হয়েছিল উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় তার সবটাই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ক্ষুধিত মানুষের নাগালে আসেনি। অনেকটাই ধনীর লোভকে পুষ্ট করেছে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়েছে। উদরসর্বস্ব কিছু মানুষ লোভের বশে খেয়েছে বেশি। কিছু অন্ন, যা ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারত তা পরিণত হয়েছে সুরায় এবং বিলাসী সুরাপায়ী তাতে নেশা করেছে। অন্নরূপে হোক, সুরারূপে হোক তা পণ্য হয়ে দেশ দেশান্তরে গেছে, অর্থগৃধ্নু বণিকের লোভ চরিতার্থ করেছে। দেশের চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুধিত লোক বরাবরই ছিল, তাদের চোখের সামনেই তাদের ক্ষুধার অন্ন শস্যরূপে বা সুরারূপে বিদেশে গেছে, বিত্ত হয়ে ফিরে এসেছে ধনীর হাতে। উদ্বৃত্ত অন্ন আহার করে ধনী তার যৎসামান্য অংশের বিনিময়ে শিল্পী ও শ্রমিকদের দিয়ে প্রয়োজনের ও বিলাসের উপকরণ নির্মাণ করিয়েছে। সেই শিল্পবস্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং নৌবাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর দূরপ্রান্তে চলে গেছে পণ্য হয়ে ধনীর ধন বৃদ্ধি করার জন্যে। বিলাসীর ভোগলালসা চরিতার্থ করবার জন্যে সে খাদ্যশস্য যথার্থ সমভাবে বণ্টন করে হয়তো দেশব্যাপী ক্ষুধা, অনাহার ও অর্ধাহারের এবং তার ফলে অসংখ্য ক্ষুধিতের তিলে তিলে মৃত্যু নিবারণ করা যেত। কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থসর্বস্ব ধনীর কাছে নগণ্য দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষুধা কখনওই এমন তীক্ষ্ণ বাস্তব সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি যাতে লোভের তাড়না দমন করে সে সেই শস্য জনসাধারণের হাতে তুলে দেবে। পৃথিবীতে ক্ষুধার এমন মানবিক সমাধান প্রায়ই ঘটেনি।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণসাহিত্যের বেশির ভাগ রচনার সময় থেকেই জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। এগুলি বেদ ও যজ্ঞকে অস্বীকার করে। এ ছাড়া আরও নানা যে সব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটে সেগুলির তাত্ত্বিক ইতিহাস আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছয়নি। কিন্তু এই সব ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি যে বেদবহির্ভূত ছিল সে কথা জানা যায়। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু অহিংসা, অন্তত যজ্ঞের নামে অধিকসংখ্যক পশু হননের বিরুদ্ধে একটা মত যে গড়ে উঠেছে তা শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের গোহত্যা নিবারণের জন্যে কথাগুলোতে স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মণসাহিত্যই তখন মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। নানা শাখায় তখন বহু ব্রাহ্মণ রচনা হচ্ছে। এই ব্রাহ্মণগুলির পরবর্তী অংশ মাঝেমাঝেই আর ব্রাহ্মণ থাকছে না, অন্য এক শ্রেণির সাহিত্যে পরিণত হচ্ছে, যার পরবর্তী কালের প্রতিষ্ঠিত অবস্থান নাম উপনিষদ। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী একটি স্বল্পায়তন সাহিত্য আছে, তার নাম আরণ্যক। সংখ্যায় বেশি নয় কিন্তু যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন আরণ্যকেই প্রথম ধরা পড়ে। এগুলিতে যজ্ঞকে রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করা

হয়েছে। যজ্ঞে ব্যবহৃত তৈজসপত্র (অবশ্য তখন এগুলি কাঠে তৈরি হত, ধাতু দিয়ে বাসন তৈরি আরও পরবর্তী কালের), হব্য, পানীয়, অগ্নি, বেদী এবং আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। যেন যজ্ঞে যে প্রক্রিয়াটা চলছে তার প্রকৃত তাৎপর্য বস্তুজগতের নয়, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জগতের।

আরণ্যকের এই লক্ষণটি থেকে যে নতুন ধরনের ধর্মচিন্তা প্রবর্তিত হল তার পূর্ণতম বিকাশ ঘটল উপনিষদগুলিতে। অবশ্য কালগত ভাবে যেমন ব্রাহ্মণ রচনার শেষ দিকেই আরণ্যক রচনা এবং শেষও হয়, তেমনই বেশ কিছু ব্রাহ্মণের শেষাংশ, আরণ্যক ও কয়েকটি উপনিষদ একই সঙ্গে রচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণের এই শেষাংশ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত পুরো যুগের সাহিত্যকে সাধারণ ভাবে জ্ঞানকাণ্ড বলে। এ নামটি উদ্ভাবিত হয়েছে প্রধানত পূর্ববর্তী সংহিতা ব্রাহ্মণের সাহিত্য থেকে এগুলিতে পৃথক ভাবে নির্দেশ করার জন্যে। কর্মকাণ্ড পুরোপুরি যজ্ঞনির্ভর, জ্ঞানকাণ্ডের সাহিত্য এক বিশেষ অর্থে যজ্ঞ নিরপেক্ষ। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞে দেবতাদের স্তব ও হব্য দান করে বিনিময়ে প্রার্থনা করা হত দীর্ঘ আয়ু, স্বাস্থ্য (নিরাময়), শত্রুজয়, পশু ও সন্তান, খাদ্য ও সম্পত্তি— এক কথায় পৃথিবীতে দীর্ঘ সুখী জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা-ই। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে মুখ্য লক্ষ্য হল ঐহিক সুখ। জ্ঞানকাণ্ডে লক্ষ্য বদলে গেল, ঐহিক সুখকে একেবারে অস্বীকার করে নয়, খানিকটা অতিক্রম করে এখন মানুষের লক্ষ্য হল যাতে জন্মান্তর না ঘটে। তত দিনে সমাজে জন্মান্তরবাদ বেশ সুপ্রোথিত এবং এর প্রথম উচ্চারণ 'বারবার জন্ম' নয়, 'বারবার মৃত্যু'। এই মৃত্যুপরম্পরা থেকে নিষ্কৃতিই এখন ধর্মাচরণের প্রধান উদ্দেশ্য বলে গণ্য হল। উদ্দেশ্য যখন বদলেছে তখন উপায়ও বদলে গেল। অর্থাৎ যজ্ঞ দিয়ে তো এ ইষ্ট সিদ্ধ হবে না। এখন ওই জন্মান্তর থেকে নিষ্কৃতি, বৌদ্ধধর্মে যার নাম নির্বাণ এবং উপনিষদ যাকে বলেছে মোক্ষ, তারই জন্যে সাধনা। মোক্ষ যজ্ঞের দ্বারা পাওয়া যায় না; উপনিষদ বলল, মোক্ষ পেতে হলে জানতে হবে ব্রহ্ম আর জীবাত্মা একই। অতএব উপায় এখন জ্ঞান; তাই এ পর্বের নাম জ্ঞানকাণ্ড। যে সব কথা আগে স্পষ্ট করে বলা হয়নি এখন ধীরে ধীরে সেগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হল। ব্যাপারটা ঘটেছেও ধীরে ধীরে, দীর্ঘকাল ধরে— ব্রাহ্মণসাহিত্যেই এই প্রথম লক্ষণগুলি দেখা দেয়। পরে আরণ্যকে যজ্ঞকে প্রতীকী ব্যাখ্যা করে বস্তুজগতের প্রক্রিয়া থেকে আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াতে উন্নীত করার চেষ্টা এবং উপনিষদে স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হল জন্মান্তরের: মৃত্যুতে মানুষের শেষ হয় না, মৃত্যুর পরে মানুষ ভিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যেরূপেই জন্মাক না তার স্বরূপ হল, সে বিশ্বসংসারের কেন্দ্রসত্তা ব্রহ্মের থেকে অচ্ছিন্ন। এই তত্ত্বটিকে সে যখন জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে তখনই সে জন্মান্তর পরম্পরা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে; এ-ই মোক্ষ।

এই পটভূমিকায়, যখন বস্তুজগৎ অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে যাচ্ছে, যখন মানুষের আত্যন্তিক সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হচ্ছে, তখনকার সাহিত্যে আমরা স্বভাবতই ক্ষুধা ও খাদ্য সম্বন্ধে অন্য ধরনের মনোভাব আশা করতে পারি। এক অর্থে সে আশা পূরণও হয়, কারণ পূর্বের

সংহিতাব্রাহ্মণে যেমন খাদ্যের জন্যে কয়েকশো সরাসরি প্রার্থনা আছে, এ সাহিত্যে ঠিক তেমন নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ওই প্রার্থনাগুলি তো ধর্মসাহিত্যে ছিলই এবং যজ্ঞকালে সেগুলি উচ্চারিত হত। কাজেই ওই সব প্রার্থনা সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে ওই ধরনের প্রার্থনা রচনার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না।

এই কালপর্যায়ে ক্ষুধা ও অন্ন সম্পর্কে মনোভাব কি বদলে গিয়েছিল? উপনিষদে সরাসরি খাদ্যপ্রার্থনা কম, তার একটা কারণ নতুন করে ওই সব প্রার্থনা রচনার প্রয়োজন কমে গিয়েছিল। পুরনো প্রার্থনা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান তখনও চালু ছিল, অতএব ওই সব প্রার্থনা যজ্ঞের প্রসঙ্গে উচ্চারিত হতই এবং খাদ্যলাভের জন্যে নির্দিষ্ট যজ্ঞগুলিও নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত হত। দ্বিতীয় কারণ হল, ওই সব প্রার্থনা দিয়ে খাদ্যলাভ করা যায়, এ বিশ্বাস হয়তো খানিকটা শিথিল হয়েছিল, কারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেবতাদের কাছে নিয়মিত অন্নভিক্ষা করেও সমাজে অভুক্ত মানুষের সংখ্যা কমল না, ক্ষুধার সমাধান হল না। এ কথা সংহিতাব্রাহ্মণের পরে আরও কয়েকশো বছর ধরে ত মানুষ চোখেই দেখতে পেল। ফলে যজ্ঞ ও প্রার্থনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস আর তত দৃঢ় থাকা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত, আরণ্যক রচনার কালে ওই যে সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি যজ্ঞ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, অথচ তাদের ক্ষুধার পরিমাণ যে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চেয়ে কম ছিল না তা তো অভিজ্ঞতাতেই ধরা পড়েছিল। যে কোনও উপায়ে যজ্ঞ না করেও তাদের যেমন তেমন করে খিদে তো মিটছিল? চতুর্থত, লোহার লাঙলের ফলার প্রচলনের পর চাষে যে ফসল উদ্বৃত্ত হচ্ছিল তা মানুষ প্রত্যক্ষ জানছিল। তারই সঙ্গে এ-ও দেখছিল যে সে-উদ্বৃত্ত ফসলে সমাজে পরিব্যাপ্ত ক্ষুধার নিবারণ হচ্ছিল না: সে-উদ্বৃত্ত ভোগে লাগছিল মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীর বাসনা ও লোভ চরিতার্থ করতে। কাজেই দেবতার কাছে খাদ্য চেয়ে আর কী-ই বা লাভ হবে? তা ছাড়া, ওই খাদ্য প্রার্থনা তো যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত, এবং সপ্তম শতকের পরে আর্যাবর্তের ধর্মজগতে যে বাতাস বইছিল তা যজ্ঞের প্রতিকূলে। নতুন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সবই যজ্ঞবিরোধী, কাজেই যজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে প্রার্থনা তাতে লোকের আস্থা খানিকটা টলে গিয়েছিল।

তার ওপরে তখনকার প্রবল একটি মত ছিল আজীবিকদের মত; এরা নিয়তিবাদের প্রবক্তা। এদের মতে সংসারে কোনও কিছুই কার্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত নয়, অতএব কোনও কিছুরই কোনও বিধিসঙ্গত প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। শুধু যে যজ্ঞ করে কিছু হয় না তা নয়, জ্ঞান দিয়েও, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েও জন্মান্তর ঠেকানো যায় না। কয়েক লক্ষ বার পুনর্জন্ম হওয়ার পর আপনিই তা বন্ধ হয়ে যায়। নিয়তিবাদ যে সমাজে প্রবল, সেখানে খাদ্য সম্বন্ধে প্রার্থনাও যেমন নিষ্ফল, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত যজ্ঞও তেমনই অর্থহীন। অবশ্য সে-সমাজে নিয়তিবাদই একমাত্র তত্ত্ব ছিল না। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধরাও যজ্ঞে সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিল, অন্যান্য ছোটবড় সম্প্রদায়ও যজ্ঞ সম্বন্ধে উদাসীন ও অবিশ্বাসী ছিল। এতগুলি প্রস্থান যেখানে যজ্ঞ বিষয়ে নিরুৎসুক, সেখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেবতাদের কাছে খাদ্যভিক্ষা কতটা কার্যকরী হবে সে

সম্বন্ধে বহু মানুষই ক্রমাগত সন্দিহান হয়ে পড়ছিল। এ সব মনে রাখলে বোঝা যায়, বাহুল্যবোধে ও নিষ্ফল জেনে মানুষ পূর্বের মতো যজ্ঞ করে দেবতাদের কাছে নিজেদের অন্নাভাব নিবেদন করে খাদ্যলাভের আশা করতে সাহস পাচ্ছিল না। কাজেই জ্ঞানকাণ্ডের সাহিত্যে সরাসরি খাদ্যভিক্ষা কমে গিয়েছিল। যদিও তার দ্বারা কোনও মতেই এটা প্রমাণ করা যায় না যে, সমাজে অন্নের প্রাচুর্য ছিল অথবা ক্ষুধা প্রশমিত হয়েছিল।

অন্ন ব্রহ্ম

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বহু কথাই উপনিষদে আবার বলা হয়েছে। তেমনই বৃহদারণ্যক উপনিষদে শুনি, 'প্রথমে এখানে (এই বিশ্বভুবনে) কিছুই ছিল না, এ সব মৃত্যু দিয়ে আবৃত ছিল। ক্ষুধা দিয়ে, ক্ষুধাই মৃত্যু— নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যু নৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াঽশনায়া হি মৃত্যুঃ।' (২:২:১) এ কথা ব্রাহ্মণসাহিত্যে বহুবার শুনেছি, এখন উপনিষদেও শোনা যাচ্ছে। অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ তো সরাসরি শতপথব্রাহ্মণেরই শেষাংশ। ব্রাহ্মণসাহিত্যই যেন বিবর্তিত হয়েছে উপনিষদে, কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেই প্রসঙ্গে আগের মতোই শোনা যায়, 'অন্ন থেকে বীর্য— অন্নাদ্বীর্যম্।' (প্রশ্ন উপ. ৬:৪) এ যেন ব্রাহ্মণসাহিত্যেরই অনুবৃত্তি, চেনা কথার পুনরুচ্চারণ। ছান্দোগ্য বলে, 'যে কুলে (বৃহৎ যৌথ পরিবারে) এই আত্মা বৈশ্বানর (অগ্নি)-কে উপাসনা করা হয়, সেখানে (লোকে) অন্ন আহার করে, শ্রী'র দেখা পায়, তার ব্রহ্মদীপ্তি আসে— অত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসম্। কুলে য এতমেবাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে।' (ছা/উ ৫:১২:২; ৫:১৩:২; ৫:১৪:২; ৫:১৫:২) এই ধরনের কথাই শুনি অন্যত্র: 'মহ হল অন্ন। অন্নের দ্বারাই সকল প্রাণ মহিমান্বিত হয়— মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে।' (তৈত্তিরীয় উপ. ১:৫:৩) হঠাৎ শুনলে কেমন অবাক লাগে, উপনিষদের যুগে— যখন আধ্যাত্মিকতাই জয়যুক্ত, যখন ব্রহ্মই পরম সত্য— তখন নেহাৎ তুচ্ছ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নকে এই গৌরব দেওয়া হচ্ছে: 'অন্নের দ্বারা সকল প্রাণ মহিমান্বিত হয়।' যত দিন গেছে ততই মানুষ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে বুঝতে পেরেছে উচ্চ কোটির দার্শনিক চিন্তা গৌরবের বস্তু হলেও সে চিন্তার আধার যে শরীরটা, তাকে বাঁচিয়ে রাখে অন্নই, কাজেই চিন্তার মহিমা অন্নের ওপরে একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল, এ অন্ন 'মহ', মহৎ, এর মধ্যে নিহিত প্রাণের মহিমা। 'অন্নেই এই সমস্ত প্রাণী নিহিত— অন্নে হীমানি সর্বানি ভূতানি বিষ্টানি।' (বৃ/আ/উ ৫:১১:১) সমস্ত প্রাণীর আধারভূত অন্ন, অন্ন বিনা প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারে না, আর জীবনই যদি বিপন্ন হয় ত উচ্চ চিন্তা তো নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। কাজেই এদের মুক্তদৃষ্টিতে অন্নের তত্ত্বটি খাঁটি ভাবেই ধরা দিয়েছিল। অন্য রকম চিন্তাও ছিল, কিন্তু এই ধরনের নির্মোহ দৃষ্টিও ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের; সামবেদ যজ্ঞের গানের সংকলন। সামগানের একজন গায়কের পারিভাষিক নাম 'প্রতিহর্তা'। ছান্দোগ্য ওই প্রতিহর্তার প্রতিহরণ কর্মটির একটা অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলছে, 'এই সব প্রাণীই অন্ন প্রতিহরণ (সংগ্রহ) করে বেঁচে থাকে। এই দেবতাটি প্রতিহারের অধীন— সর্বাণি হ ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা।' (ছা/উ ১:১০:৯) আচার্য শিষ্যকে বলছেন 'হে সৌম্য, মন হল অন্নময়— অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।' (ছা/উ ৬:৫:৪) এখানে মনে করতে হবে যে উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই জ্ঞানকাণ্ডের যুগে মন ও দেহের ব্যবধানটা নানা ভাবে উপলব্ধ ও স্বীকৃত হচ্ছে। তার একটা প্রকাশ হল, কায়িক শ্রমকে তখন নিচু চোখে দেখা হচ্ছে, সমাজে শ্রেণিবিভাজন হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে, এবং উচ্চতর শ্রেণির সংজ্ঞা হল: সে হাতপায়ে খাটে না, মাথা দিয়ে পরিশ্রম করে এবং সমাজে সে অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, পুরোহিত, শাস্ত্রকার ও সমাজপতিরা রাজা ও রাজন্যের প্রসাদপুষ্ট। অতএব এরা উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত নয়, এরা বুদ্ধি দিয়ে মতবাদ ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, দিনপাতের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্ন এদের তারাই জোগায় যারা উৎপাদন করে— সেই চাষি ও মজুররা। পরান্নজীবী এই শ্রেণিটিও কিন্তু এ বিষয়ে অবহিত যে যে-অন্ন তারা উৎপাদন করে না বটে কিন্তু আহার করে। সে-অন্ন দুঃস্থশ্রেণি কায়ক্লেশে উৎপাদন করে এবং সে-অন্ন না হলে উচ্চমার্গের চিন্তা করার সামর্থ্যই এদের থাকত না। যখন অন্ন-উৎপাদক সমাজে নিচের তলার নাগরিক, সামাজিক সংবিধানে সব রকমে অধিকারচ্যুত, তখনও প্রথম শ্রেণির নাগরিকরা, যারা এই শাস্ত্র রচনা করছে, তারা অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করছে যে, অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।

অন্ন মহৎ, প্রাণি-মাত্রকেই জীবনধারণের জন্য অন্নের উপর ভরসা করতে হয়, কারণ অন্ন বিনা প্রাণরক্ষাই হয় না। তাই এদের বলতে হয় যে, ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্য কে যে অবধারণ করবে অর্থাৎ জানবে সেই মন হল অন্নময়। এবং অন্নের এই মহিমার স্বীকৃতি নানা ভাষায়; আর এর স্বীকারের পিছনে আছে তার দুষ্প্রাপ্যতা। অন্ন সহজলভ্য হলে তার এত মহিমা কীর্তন থাকত না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ খুব খোলাখুলি ভাবে বলেছে, 'অন্ন বিনা প্রাণ শুকিয়ে যায়— শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেহন্নাৎ।' (বৃ/আ/উ ৫:১২:১) অন্নের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'অন্ন বলের চেয়ে অধিক... অন্নকে যে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করে সে অন্নবান, পানীয়বান লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়— অন্নং বাব বলাদ্ভূয়ঃ... যোহন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেহন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিধ্যাত।' (ছা/উ ৭:৯:১) এখানে প্রণিধান করবার মতো কথাটা হল, 'অন্নকে যে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করে।' উপনিষদে মাঝে মাঝেই অনেক বস্তুকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, যেমন প্রাণ, মন, ইত্যাদি। এগুলি দার্শনিক তত্ত্বের উপাদান, ব্রহ্মের কল্পনা থেকে দূরে নয়। কিন্তু অন্ন? সে যে নেহাতই স্থূল বস্তুজগতের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাদামাটা বস্তু। ধর্ম, দর্শন, ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে বহু যোজন দূরে তার অবস্থান। সেই অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করার কথা বলা হল। যে তা করে সে অন্ন, পানীয় লাভ করে। সহজেই মনে আসে,

অশনায়াপিপাসে'র কথা, যার অপর নাম মৃত্যু। অর্থাৎ অন্নকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করলে অন্ন ও পানীয়ের অভাব ঘটে না, অতএব মৃত্যুকে পরাস্ত করা যায়। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হল 'উপাসনা করা': অন্নকে উপাসনা করার কথা অসংকোচে উচ্চারিত হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে কর্মকাণ্ডে উপাস্য ছিলেন ইন্দ্র, সূর্য, আদি দেবতারা। যজ্ঞে তাঁদের উদ্দেশে হবিঃ সমর্পণ করে তাদের স্তব করাই ছিল তখনকার উপাসনা। তার থেকে নানা ফল প্রত্যাশিত ছিল, এগুলির মধ্যে অন্ন-পানীয়ও ছিল। কর্মকাণ্ডের যজ্ঞনির্ভর উপাসনার যে ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল, জ্ঞানকাণ্ডে যজ্ঞ যখন বাহুল্য বা নিষ্প্রয়োজন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, যখন উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি, তখন উপাস্য কী? অন্ন। কেমন ভাবে? ব্রহ্মরূপে। এ ব্রহ্ম হল বেদের কর্মকাণ্ডের দেবতাদের ঊর্ধ্বে এক পরম তত্ত্ব। তার বাস্তব রূপ হল অন্ন, প্রতীকী অর্থে নয়, ব্রহ্ম এখানে অন্নের সঙ্গে অভিন্নরূপে সমীকৃত। এই কথাই পড়ি অন্যত্র: 'অন্নকে ব্রহ্ম বলে' জানলেন। অন্ন থেকেই প্রাণীরা জাত হয়, অন্ন দিয়েই জাত প্রাণীরা বেঁচে থাকে। অন্নে প্রবিষ্ট হয়ে প্রাণীরা লীন হয়ে যায়— অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।' (তৈ/উ ৩:২:১-৩) সামান্য পৃথক ভাবে বলা হয়েছে, 'অন্ন থেকে প্রজারা জন্মায় যারা এ পৃথিবীতে আশ্রিত; তার পর অন্ন দ্বারাই প্রাণীরা বেঁচে থাকে। অন্নই প্রাণীদের জ্যেষ্ঠ। অন্ন থেকে প্রাণীরা জন্মায়। প্রাণীরা ভোজন করে ও ভুক্ত হয় তাই অন্নকে অন্ন বলে— অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীংশ্রিতাঃ... অথো অন্নেনৈব জীবন্তি... অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। অন্নদ্ভূতানি জায়ন্তে। জতান্যন্নেন জীবন্তি। অদ্যতে অত্তি ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।' (তৈ/উ ২:২:১-৩) দুটি শাস্ত্রাংশের মধ্যে পার্থক্য বেশি নেই, একটিতে প্রজার উল্লেখ আছে, অন্যটিতে প্রাণী বলা হয়েছে; প্রজাপতির প্রজাই হল প্রাণী। যে বাগ্‌ভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি লক্ষণীয়। এর আদিকল্পটি হল 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।' এই আনন্দব্রহ্মের স্বরূপ হল: তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এই বারে লক্ষ্য করি ব্রহ্মবাচক আনন্দ পদটিরই জায়গায় 'অন্ন' ব্যবহার করা হয়েছে। তা হলে ব্রহ্ম আর অন্ন স্পষ্টতই সমার্থক, অন্নই ব্রহ্ম এই কথাটাকেই এই ভাবে শব্দ বিপর্যাসের দ্বারা আরও স্পষ্ট করে বলা হল। এর ফলে অন্নব্রহ্ম তত্ত্বটি আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এইখানে সেইটেই উদ্দিষ্ট।

মনে রাখতে হবে, এই যুগে ব্রহ্মের কল্পনাও নতুন। কর্মকাণ্ডে ব্রহ্মা একজন দেবতা, পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতির মতোই একজন প্রধান দেবতা— প্রায়শই বিমূর্ত ভাবে কল্পিত। উপনিষদের ব্রহ্ম কিন্তু সে রকম দেবতা নন। পরবর্তী বেদান্ত সাহিত্যে ব্রহ্ম পদার্থ ও শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। উপনিষদে ঠিক তা নয়, তবে তার সূচনা এখানে দেখা যায়। ব্রহ্মের মধ্যে দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে যে সর্বাতিগ, সর্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠ একটি সত্তা কল্পনা করা হয়েছে, এ সব শাস্ত্রে বলা হচ্ছে অন্ন, সে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। সৃষ্টির মধ্যে, প্রাণীদের মধ্যে অন্ন জ্যেষ্ঠ— সেটাও অন্নের মহিমাই সূচিত করে। এই জ্যেষ্ঠত্বের উল্লেখ করা হচ্ছে, কারণ

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উপাখ্যানে আছে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করার পরে প্রজারা খুব ক্লিষ্ট হল ক্ষুধায়, তখন প্রজাপতি তাদের জন্যে খাদ্য সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির এই ক্রমকে বিপর্যাসের মধ্যে ফেলে অন্নকে সৃষ্টির জ্যেষ্ঠ বলা হচ্ছে, কারণ অন্নহীন বিশ্বে প্রাণী থাকা সম্ভব নয়, তাই অন্নকে আদি সৃষ্টি বলা হয়েছে। আর সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে একে অপরকে যে খায় সে তো জানা কথা তাই 'অদ্যতে', 'অত্তি'। অদ্ ধাতু নিষ্পন্ন এই দুটি শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে 'অন্ন' শব্দের ব্যুৎপত্তি বলা হল। অন্ন হল সেই বস্তু যাকে কিছু প্রাণী খায় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অন্য প্রাণীর দ্বারা ভক্ষিতও হয়। যেমন তৃণভোজী প্রাণী মাংসাশী প্রাণীর খাদ্য, ছোট মাছ বড় মাছের খাদ্য, বহু কীটপতঙ্গ ও মাছ অনেক পাখির খাদ্য। এই সব পরস্পরের 'অদন' বা খাওয়ার ভিত্তিতেই সৃষ্টিতে বিভিন্ন জীবের আহার সংস্থান চলছে। এই বিরাট, ব্যাপ্ত ও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটছে। তাই মনে হয়, একটি ব্যাপক অর্থে অন্ন ব্রহ্ম। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আহার একটি অপরিহার্য ব্যাপার, যার উল্টোদিকে আছে অনাহার ও মৃত্যু, তাই অন্ন জীবন। অন্নই ব্রহ্ম।

কৃষিপ্রধান দেশে ফসল জলের ওপরে একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। তাই শুনি প্রজাপতি বলছেন:

> প্রজার জন্যে আমি বহু হব। (তিনি) জল দেখলেন জল (বলল) বহু হব, প্রজার জন্ম দেব। জল তখন অন্ন সৃষ্টি করল, তাই যে কোনও জায়গায় বৃষ্টি হয় সেখানেই প্রচুর অন্ন (হয়) তাই জল থেকে আহার্য অন্ন উৎপন্ন হয়।— তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক্ব বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদান্নাদ্যং জায়তে। (ছান্দোগ্য উপ ৬:২:৪)

সিন্ধুসভ্যতায় যে সেচ ব্যবস্থা ছিল, আর্যরা এ দেশে আসবার পরে তার অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছিল, ফলে প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কৃষি বৃষ্টিনির্ভর। জল থেকে অন্ন, সেই অন্ন প্রজার জীবন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছে:

> অন্নকে নিন্দা করবে না। তাই বেঁচে থাকার অবলম্বন (ব্রত)। প্রাণই অন্ন। শরীর হল অন্নভোজী।... তাই এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত— অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্।... তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। (তৈ/উ ৩:৭)

শরীর বেঁচে থাকে প্রাণে, প্রাণের অবলম্বন অন্ন, অন্ন জীবনকে রক্ষা করে, তাই অন্নকে নিন্দা করবে না। তার মানে অন্নকে নিন্দা করার প্রসঙ্গ কিছু হয়তো ছিল। অর্থাৎ প্রাগার্য বা অপরিচিত জনগোষ্ঠীর কিছু খাদ্যকে হয়তো আগন্তুক আর্যরা তাচ্ছিল্য করত; হীন, অখাদ্য মনে করত। কিন্তু যে সমাজে ব্যাপক খাদ্যাভাব, সেখানে কোনও রকম খাদ্যের নিন্দা করা বা তাকে পরিহার করা প্রকারান্তরে আত্মঘাতী। এ সম্বন্ধে পরে দেখতে পাব যে আপৎকালে শুচি অন্ন ও অশুচি অন্নের বোধ কেমন করে ভেঙে যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা কোনও বিপর্যয়ে যখন পরিচিত, অভ্যস্ত অন্ন দুর্লভ হত, তখন মানুষ অনভ্যস্ত খাদ্য দিয়েই উদরপূর্তি করতে বাধ্য হত। এবং তখন সে-'অখাদ্য' শুধু খাদ্য হয়েই উঠত না,

প্রাণরূপে দেখা দিতে। যার অপর পিঠে আছে বুভুক্ষা, অশনায়া, যার অন্য নাম মৃত্যু। কাজেই শরীরকে যে বাঁচিয়ে রাখে, শরীরে প্রাণকে সেই আশ্রয় দেয়, অন্নের নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ, তা অপরিহার্য, তা যে-রূপেই দেখা দিক না কেন। অতএব এই ব্রহ্মতত্ত্বের যুগে, জ্ঞানকাণ্ডের এই উপনিষদের যুগে তাকে চূড়ান্ত সম্মান দিতে গেলে তাকে ব্রহ্ম বলতে হয়, সৃষ্টির ওপারের পরমতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখতে হয়। আমরা দেখেছি কর্মকাণ্ডের যজ্ঞের যুগে অন্নকে নানা দেবতার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছিল। সে যুগে দেবতারাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রতীক। এখন সেখানে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদক ব্রহ্ম, তাই অন্ন এখন ব্রহ্ম। তাই যে-কেউ অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তার কখনও অন্নাভাব হয় না, এমন কথা বারে বারেই শোনা গেছে।

মৃত্যুকালে পিতা পুত্রকে তাঁর সব কিছু উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়ে যেতেন। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পিতা পুত্রকে তাঁর ইন্দ্রিয়, মন, শক্তি, ধন ইত্যাদি দান করতেন। এই প্রসঙ্গে বলতেন, 'আমার অন্নরস তোমাতে নিহিত করছি... আমার যশ, ব্রহ্মবর্চস, আহার কীর্তি তোমার সেবা করুক— অন্নরসাম্মে ত্বয়ি দধামীতি পিতা... যশো ব্রহ্মবর্চসম্ অন্নাদ্যম্ কীর্তিঃ ত্বা জুষতামিতি।' (কৌষীতকি উপ. ২:২২) পিতা যখন পুত্রকে অন্নরস উত্তরাধিকার সূত্রে সমর্পণ করেন তখন সম্ভবত অন্নরস গ্রহণ করে তাঁর শরীরে যে পুষ্টি, শক্তি, স্বাস্থ্য, তেজ ও পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছিল সে সবই ছেলেকে দিয়ে যেতে চান। এ ছাড়াও তিনি বলেন আমার 'অন্নাহার' তোমাকে দিলাম। অর্থাৎ ক্ষুধা নিরসনের জন্যে আমি যে খেতে পেতাম, সেই ক্ষুধা নিবারণের অধিকার তোমাকে দিলাম। এ বড় কম দেওয়া নয়, যে সমাজে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য কম, যেখানে সকলে খেতে পায় না, যারা পায় তারাও নিয়মিত পায় না, প্রয়োজনের তুলনায় কম পায়, সেই সমাজে খেতে পাওয়ার উত্তরাধিকার পুত্রকে অর্পণ করা একটি তাৎপর্যপূর্ণ দান। পিতা হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালের পিতার মতো এ পিতাও কামনা করছেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' কামনা কামনাই, এ-দান ইচ্ছাপূরক দান; যশস্বী পিতার পুত্র অনেক সময়েই অপযশস্বী হয়, কাজেই পিতা দিতে চাইলেই যে পুত্র যশ, তেজ, কীর্তি লাভ করবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই; ঠিক তেমনই অন্নাহারে অধিকারও যে পিতার অভিলাষ বলেই পুত্র পাবে তারও ঠিক নেই। অন্নাহারের অধিকার যথেষ্ট ধনী পিতাই হয়তো পুত্রের জন্যে নিশ্চিত ভাবে দান করে যেতে পারবে। কিন্তু এ কামনা সব পিতারই থাকবে এবং এর একটা তীক্ষ্ণতা আছে, এই কারণে যে, সমাজে খাদ্যাভাব ছিল।

সৃষ্টির একটি উপাখ্যানে পড়ি, '(প্রজাপতিকে) ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বলল, আমাদের জন্য আধার নির্দিষ্ট করুন, (প্রজাপতি) বললেন, এই দেবতাদের মধ্যে তোমাদের ভাগ বিধান করব। তাই যে কোনও দেবতাকেই হবির্দান করা হোক না কেন, তাঁরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ভাগী হয়— তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম আবাভ্যামভি প্রজানীহীতি। স তেঽব্রবীৎ এতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতাউয় হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যোবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ।' (ঐতরেয় উপ ১:২:৫) এই অংশে যা প্রথমেই

দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, ক্ষুধাতৃষ্ণা তো মানুষের চিরশত্রু, প্রজাপতি তাদের প্রশ্নের উত্তরে তো বলতে পারতেন, 'মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে তোমাদের স্থায়ী আবাস নিরূপণ করছি।' বললে সেটা সহ্যও হত, মানুষের অভিজ্ঞতায় নির্ভরযোগ্য বলেও প্রতিপন্ন হত। তা না বলে প্রজাপতি এমন একটা উত্তর দিলেন যার সপক্ষে কোনও প্রমাণই নেই: কেউ কোনও দিন জানতে পারবে না দেবতা আছেন কিনা এবং থাকলে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে কিনা। তবু প্রজাপতি কেন এমন উত্তর দিলেন? এ জন্য যে, এতে সহজ একটা সমাধান হল, তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণাকে দেবতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে ক্ষুধাতৃষ্ণার গুরুত্ব বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেরও; কারণ, যজ্ঞে উৎসর্গ করা খাদ্যপানীয় দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করে। কিন্তু যজ্ঞ ত হচ্ছিলই, এ শাস্ত্রাংশে আরও যেটা প্রতিপন্ন হল তা হল ক্ষুধাতৃষ্ণার আক্রমণ থেকে দেবতারাও অব্যাহতি পান না, ক্ষুধাতৃষ্ণার এতই অপ্রতিহত শক্তি। শুধু তাই নয়, এ বিধান স্বয়ং প্রজাপতিরই, তিনিই ক্ষুধাতৃষ্ণাকে দেবতাদের দেহে স্থাপন করেছেন। স্বভাবতই মানুষ ভাববে, স্বয়ং দেবতারাই যখন ক্ষুধাতৃষ্ণার আক্রমণ থেকে মুক্ত নন, তখন সমাজে যে ব্যাপক অপ্রতিকার্য ক্ষুধা, তাকে মানুষ গুরুত্ব দেবে, এই বুঝে যে দেবতাদেরও ক্ষুধা আছে। মানুষ যজ্ঞ না করলে তাঁরাও অভুক্ত থাকেন। তা ছাড়া ক্ষুধার মহিমাও প্রচার করা হচ্ছে এই ভাবে, যেন প্রয়োজন হলে মানুষ সহিষ্ণু ভাবে মেনে নেয়, মনে করে দেবতারাও যে কষ্টে পীড়িত হন, আমার পক্ষে তা সহ্য করা কী আর এমন ব্যাপার!

কিন্তু অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'দেবতারা আহারও করেন না, পানও করেন না। শুধুমাত্র এই অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন— ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।' (ছা/উ ৩:৬:১) তবে? তবে কেন বলা হল, প্রজাপতি ক্ষুধাতৃষ্ণাকে দেবতাদের শরীরে স্থাপন করলেন? লক্ষ করলে দেখব, এ শাস্ত্র একবারও বলছে না যে দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ হয় না। বরং ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিপ্রেক্ষিতেই যেন বলা হচ্ছে, যখন দেবতারা ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ করেন তখনও মানুষের মতো খাদ্যপানীয় দিয়ে তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণার নিরসন করেন না। তাঁরা অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন। অর্থাৎ অমৃতের দর্শনেই তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা তৃপ্ত হয়। কিন্তু যজ্ঞে তো অমৃত কখনও নৈবেদ্য দেওয়া হয় না, হব্য পানীয়ই দেওয়া হয়। দেবতাদের অমৃত দেবলোকেরই ব্যাপার, সেখানেই তা কোনও ভাবে সংগৃহীত হয় তাঁদের জন্যে। এ শাস্ত্রে মানুষ তার প্রয়োজনীয় যে খবরটা পেল তা হল যজ্ঞে যে নৈবেদ্য, খাদ্য, পানীয় দেওয়া হয় দেবতারা তা দিয়ে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেন না, তাই অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যের ধূম ঊর্ধ্বদিকে চলে যায়, ভস্ম নীচে পড়ে থাকে। এটা না বললে যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে ভক্ষ্য ও পেয় দেওয়া অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং তা হলে ওই আগের কথা— প্রজাপতি দেবতাদের দেহে ক্ষুধাতৃষ্ণা স্থাপন করলেন— এটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হল, প্রজাপতির বিধানে দেবতাদেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা অবশ্যই আছে, কিন্তু মানুষের দেওয়া খাদ্যপানীয়ে তা নিবৃত্ত হয় না, হয় অমৃতে। দেবতাদের দেবলোক যেহেতু সম্পূর্ণ ভাবেই মানুষের অগোচরে, তাই সেখানে কীভাবে অমৃতের সংস্থান হয় কীভাবে তা দর্শনমাত্রেই

দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়, তার কোনও ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়নি। লক্ষণীয়, দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা যাতে মেটে তার নাম 'অমৃত'। সার্থক নাম, কারণ ক্ষুধাতৃষ্ণা, অশনায়াপিপাসের অপর নাম মৃত্যু। মৃত্যু থেকে দেবতাদের যা বাঁচায় তা অমৃত। যার দর্শনমাত্রই ক্ষুধাপিপাসা মিলিয়ে যায়।

অন্ন কার জন্যে? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় শরীরের জন্য। উপনিষদ্ একটু এগিয়ে গিয়ে বলছে, প্রাণের জন্যে। 'কুকুর থেকে শুরু করে শকুনি পর্যন্ত এই যা কিছু... তা সবই এর (প্রাণের) অন্ন— যৎ কিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্যঃ... এতাবানস্যান্নম্।' (ছা/উ ৫:২:১) কুকুর ও শকুনির উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, আরও এই কারণে যে, এ সব কিছুকে শরীরের অন্ন বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে প্রাণের অন্ন। অর্থাৎ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যখন অন্য ভদ্রতর গ্রাহ্যতার কোনও খাদ্য জুটছে না তখন শুধু প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই যে কোনও হীন খাদ্য, কুকুর-শকুনির মাংস যা স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্র মানুষের খাদ্যতালিকার মধ্যে থাকে না, আপৎকালিক সেই খাদ্যই প্রাণকে বাঁচায়। এর চেয়ে বড় তাগিদ প্রাণীর আর নেই।

মাঝে মাঝেই শুনছি, 'যে এ কথা জানে', যেমন, '(বিরাজ ছন্দ) দ্বারা, সে অন্নাহারী হয়, এ সকলই তার দৃষ্ট হয়, তার দৃষ্ট সবই তার অন্নাহার (-এ পরিণত) হয়, যে এ কথা জানে— অন্নাদী তয়েদং সর্বং দৃষ্ট সর্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।' (ছা/উ ৪:৩:৮ মাণ্ডুক্য উপ ১:৩:৬) 'যে এ কথা জানে' এই বাক্যাংশ দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে শুধু পরিচ্ছেদ শেষ হওয়ার সূচনা জানাতে নয়, এর গুরুত্ব বোঝাতেও। গুরুত্ব কেন? এটা উপনিষদের যুগ; কর্মকাণ্ডের যুগে যজ্ঞ সম্পাদন করলেই তার দ্বারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস ছিল। এখন লক্ষ্য চলে গেছে পার্থিব কাম্য বস্তুর ওপারে— মোক্ষে, নির্বাণে, ব্রহ্মে লয় হওয়ার। এবং তার উপায় আর যজ্ঞ নয় জ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভিন্নতার জ্ঞান; মানুষকে জানতে হবে তার বিচ্ছিন্ন সত্তাটা আপেক্ষিক সত্য, পরম সত্য হল সে বিচ্ছিন্ন নয়, পরমাত্মারই রূপভেদ মাত্র। অতএব এখন কর্মকাণ্ডের দ্বারা সভ্য যা কাঙ্ক্ষিত বস্তু, যেমন অন্ন, বা অন্নাহারী হওয়া সেটিও পাওয়ার উপায়, এ তত্ত্ব 'জানা'। তাই যে এই কথা জানে সে অন্নাহারী হয়। অর্থাৎ পূর্বে যা যজ্ঞের দ্বারা সিদ্ধ হত এখন সেটা ঘটবে 'জানা'র দ্বারা। এর মধ্যে বিরাজ ছন্দের যজ্ঞীয় মাহাত্ম্যও কীর্তিত হল, আবার যজ্ঞোত্তর জ্ঞানমার্গেরও মহিমা ঘোষিত হল। অর্থাৎ এ এমন একটা যুগ যখন, যজ্ঞ চলছে বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্যসমাজে এবং তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও চলছে উপান্তের আরণ্যসমাজের নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এরা বিভিন্ন মতের, কিন্তু কেউই বেদ বা যজ্ঞকে স্বীকার করে না। এদের সব মতই বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেওয়ার, কাজেই ব্যাপক এক অর্থে এরা এখন সারা দেশে পরিব্যাপ্ত যে জ্ঞানকাণ্ড তারই অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের বহির্বাণিজ্য যখন মিশর, চিন, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইয়োরোপের দক্ষিণ প্রান্তে আনাগোনা করছে তখন ওই সব অঞ্চল থেকে নানা ভাবধারাও এখানে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী তেমনই একটা সময়, যখন ভারতবর্ষের বাইরে ওই সব অঞ্চলেই,

চিন্তা-বিশ্বাস-ধর্ম- দর্শনের জগতে একটা প্রবল আলোড়ন চলছে এবং সে-সবটাই মূলত বুদ্ধির পরিধিতে। জানার পরিধি, গভীরতা, বৈচিত্র্য সম্বন্ধে, জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে একটা অস্থিরতা, ব্যাকুলতা এই বৃহৎ অঞ্চলকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। তারই ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতবর্ষের চিন্তাজগতের তটেও। তাই এখন বৈদিক এবং বেদবিরোধী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'জানা'-ই হয়েছে মুখ্য। এখন যজ্ঞ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার পর্ব হয়েছে গৌণ, জ্ঞান দিয়ে 'জেনে' লাভ করাই হয়েছে উপায়।

জৈমিনীয় উপনিষদেও এমন কথা শুনি:

> যে এ ভাবে ব্যাখ্যাত এই মহাসংহিতা জানে (বা এই মহাসংহিতাকে এই ভাবে ব্যাখ্যাত বলে জানে) সে যুক্ত হয় প্রজা (সন্তান) ও পশুর সঙ্গে, ব্রহ্মতেজ ও অন্নাহারের সঙ্গে এবং স্বর্গলোকের সঙ্গে (অর্থাৎ এগুলি লাভ করে)— য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাত বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন। (জৈ/উ ১:৩:৬)

এখন যজ্ঞক্রিয়ার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে তার সম্বন্ধে যে বেদাংশ তার যথাযথ ব্যাখ্যা। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞটাই ছিল মুখ্য, যথাযথ অনুষ্ঠিত হলে দেবতারা স্তবে ও নৈবেদ্যে প্রসন্ন হয়ে ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করতেন। এখন সে সবই গৌণ হয়ে গেল, মুখ্য হল যজ্ঞসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের বুদ্ধিগ্রাহ্য যথার্থ ব্যাখ্যা। যজ্ঞ যা ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করত, এখন তা করছে ব্যাখ্যা, বুদ্ধির কাছে পৌঁছে। এইখানে উপনিষদ জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ও অন্য বহু বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থানের মিল আছে: তারা সবাই যজ্ঞকর্মকে পরিহার করে বোধের ওপরে নির্ভরশীল। তাই এই মহাসংহিতার যারা ঠিকমতো ব্যাখ্যাটি জানে তারা সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, অন্নাহার, এমনকী স্বর্গলোকও পাবে। বেদে স্বর্গের কথা খুব কমই আছে। দুই একটি যাগের প্রসঙ্গে শুনি স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক, অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যাগ করলে স্বর্গে যাওয়া যায়। কিন্তু সে-ও ত পরিষ্কার একটি যাগের মধ্যেমেই স্বর্গের নাগাল পাওয়া। আর এখন? এই মহাসংহিতার এই ভাবে ব্যাখ্যা যে জানে, সে পশু, প্রজা, অন্ন, তেজ, এবং স্বর্গ সবই পাবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ধর্মাচরণ এবং ধর্মতত্ত্বের ভরকেন্দ্রটি একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে। মোক্ষ কাম্য হওয়ার আগে তো মানুষের কাম্য ছিল এবং এইগুলিই, প্রজা, পশু থেকে স্বর্গ পর্যন্ত; এবং এগুলি-সংবলিত দীর্ঘজীবন, ইহলোক, এ জন্মেই। তাই সেই সব কাম্যবস্তুও জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায় এমন কথা বলে জ্ঞানমার্গের মাহাত্ম্য সূচিত হল। তার পর যেন বলছে এ সব ত পাওয়া যায়ই, এর চেয়েও কঠিন ও দুর্লভতর যা— জন্মান্তরের অনন্ত শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি— তা-ও পাওয়া যায়।

তত দিনে অভীষ্ট বা কাম্য পাল্টেছে। জ্ঞানমার্গকে প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় হল এ কথা বলা যে, এ মার্গ তাকে কর্মমার্গের প্রার্থিত বস্তু দান করতে সমর্থ এবং তার পরে এই মার্গের সুদূরতর, দুর্লবতর, দুরূহতর লক্ষ্য, মোক্ষ, দান করতে সমর্থ। এই ধরনের কথাই তৈত্তিরীয় উপনিষদেও শুনি:

> যে কেউ এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানে, সে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্নবান এবং অন্নভোজী হয়। প্রজায় এবং পশুতে এবং ব্রহ্মতেজে মহান হয়, কীর্তিতে মহান হয়— স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতঃ বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। (তৈ/উ ৩:৮)

এটি আগেরটিরই অনুরূপ, প্রভেদের মধ্যে এখানে নতুন একটি প্রতিশ্রুতি, কীর্তির। সব মিলে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইলে যা যা দরকার— সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্তি, তেজ, কীর্তি সবই পাওয়া যাবে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানলে। কোনও যজ্ঞক্রিয়া করে নয়, শুধু 'জেনে'। এটিই উপনিষদের যুগের বৈশিষ্ট্য।

ব্রহ্মের সঙ্গে অন্নকে অন্বিত করে বহু কথাই বলা হয়েছে:

> তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম সংগ্রহ করা যায়, তার থেকে অন্ন জাত হয়। অন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য; লোকগুলি এবং কর্মে অমৃত— তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমৃভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্। (মুণ্ডক উপ ১:১:৮)

তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল, মননজাত এই তপস্যা উপনিষদের কেন্দ্রস্থ উপায়, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষ লাভ করা যায় এবং তখনকার সমাজে ত মোক্ষই পরমার্থ। কিন্তু তার পরেই প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলা হচ্ছে: ব্রহ্ম থেকে অন্নলাভ হয়। অন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য এবং কর্মে অমৃত লাভ করা যায়। এ অংশটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যে যুগ ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে মোক্ষ লাভ করতে উৎসুক তাকে এই শাস্ত্র কিন্তু প্রথমেই বলে, ব্রহ্ম থেকে অন্ন লাভ হয়। অর্থাৎ অন্নের প্রয়োজন ফুরোয়নি তখনও; যজ্ঞ দিয়ে না হলে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েই হোক, কিন্তু অন্নটা পাওয়া চাই। মনে পড়ে, একবার জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য এসে দাঁড়াতে জনক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে করে,' ঠাকুর— ব্রহ্মবিদ্যা না গোধন, কোনটা লাভ করবার জন্যে আসা?' যাজ্ঞবল্ক্য নিঃসংকোচে অম্লানবদনে বললেন, 'দুটোর জন্যেই, রাজা।' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাতে অন্নাভাব মেটে না। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে অন্নলাভ হয় এ কথা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিতরা রাজদ্বারে যে সম্মান পেতেন, রাজপ্রসাদে সেটা সহজেই সম্পত্তিতে ও অন্নে রূপান্তরিত হত। অন্ন থেকে প্রাণ লাভ বা রক্ষা হয় এ তো সহজেই বোঝা যায়। প্রাণ রক্ষা পেলে তবেই মন কাজ করে এবং তখন মানুষ যে কর্ম করে সেটা ব্রহ্মসন্ধান, ব্রহ্মোদ্যে অংশগ্রহণ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা— যাতে সিদ্ধি লাভ করলে অমৃত অর্থাৎ অমরত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ পুনর্জন্ম— উপনিষদে যাকে প্রথমে পুনর্মৃত্যু বলা হয়েছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। মৃত্যু থেকে পরিত্রাণই অমৃত। এই তত্ত্বের দিকে পরিপূর্ণ সংহতি আছে, কিন্তু এই কার্যকারণ পরম্পরার মধ্যে প্রথমটিই একটু বিস্ময়কর: ব্রহ্ম থেকে অন্নলাভ। এর দুটি তাৎপর্য: ব্রহ্মজ্ঞান ঐহিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, অন্নসংস্থান করে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এ যুগের যা সবচেয়ে কাম্য প্রাপ্তি— মোক্ষ, তার পথও ত ব্রহ্মজ্ঞানেই নিহিত আছে। তথাপি, তার পরেও নেহাতই স্থূল ঐহিক প্রয়োজন অন্নসংস্থান,

সেটিও উপেক্ষিত নয়, বরং ব্রহ্ম থেকে সর্বপ্রথম প্রাপ্তিই অন্ন। বাকিটা বারবার উচ্চারিত হয়েছে, অন্ন জীবন বা প্রাণ রক্ষা করে। শরীরেই মনের আধার, সেই মন সজীব থাকে, দেহ তার প্রয়োজনীয় অন্ন পেলে। সক্রিয় মনই সত্যসন্ধান করে এবং এই সন্ধানের শেষ প্রান্তেই আছে অমৃত।

অন্নলাভ, এই উপনিষদের যুগেও সহজ ছিল না। ঐতরেয় উপনিষদে পড়ি প্রজাপতির বিষয়ে বলছে, 'তিনি দেখলেন এই সব লোকগুলি ও লোকপালদের। "এদের জন্যে অন্ন সৃষ্টি করি"। তিনি জলরাশিকে তপস্যায় অভিতপ্ত করলেন। সেই জলরাশি তপ্ত হলে তাদের থেকে মূর্তি জাত হল, অন্নই হল সেই মূর্তি— স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি। সোঽপোঽভ্যতপৎ। তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ।' (ঐ/উ ১:৩:১) অন্যত্র অন্নকে সৃষ্টির পর স্রষ্টার খেয়াল হল, 'এরা খাবে কী?' তখন তিনি জলকে তপ্ত করলেন, সেই তপ্ত জলের অভ্যন্তরে মূর্তির জন্ম হল; সে মূর্তি অন্ন। বিজ্ঞানও বলে জলে তাপ সংযাগ হলে তার মধ্যে উদ্ভিদের জন্ম হয়। সেই উদ্ভিদই প্রাণীর প্রথম খাদ্য। এর মধ্যে লক্ষণীয় শব্দটি হল 'তাপ'। 'তপস্যা' এই শব্দেরই সজন্মা; প্রজাপতি কোথাও তপস্যা করে খাদ্য সৃষ্টি করছেন, কোথাও-বা জলকে তপ্ত করে তার থেকে প্রথম শৈবাল বা উদ্ভিদ সৃষ্টি করছেন যা প্রাণী আহার করতে পারে। অন্নের সংস্থান করা সৃষ্টিকর্তার দায়, তা না হলে তো তাঁর সৃষ্টি অকালে বিনষ্ট হবে, খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটবে তাঁর সৃষ্ট প্রাণীর। তাই জীবসৃষ্টির অনতিকাল পরেই তিনি জীবনের অবলম্বন, জীবাতু বা জীবনদায়ী অন্ন সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর জীবসৃষ্টি ব্যর্থ না হয়।

এত মহিমা যে-অন্নের তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলে:

> অন্নের নিন্দা কোরো না। তা (জীবনধারণের উপায়) ব্রত। প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নভোজী... অন্নকে কখনও প্রত্যাখ্যান কোরো না, তা ব্রত। (অর্থাৎ জীবনধারণের উপায়)। অন্নকে বহুল করে তুলো। পৃথিবী অন্ন, আকাহ অন্নভোজী— অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। ...অন্নং ন প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। অন্নং বহু কুর্বীত। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। (তৈ/উ ৩:৭-৩:৯)

এখানে অন্নের প্রতি যথাবিধি সমাদর প্রদর্শন করার কথা আছে। অন্নের নিন্দা করার কথাই ওঠে না। বিশেষত, যখন সমাজে ব্যাপক অন্নাভাব, তখন মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই জানে প্রাণই অন্ন, কারণ অন্ন বিনা প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব, অনাহারের অর্থই মৃত্যু। এই সমাজে যেখানে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে না, সর্বদাই ক্ষুধা ও অন্নের পরিমাণের মধ্যে বেশ বড়, দুরতিক্রম্য একটি ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে, সেখানে বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হল ওই ব্যবধানটি ঘোচাবার চেষ্টা করা। এর উপায় হল প্রচুর পরিমাণে অন্ন উৎপাদন করা। অন্নকে বহুগুণিত করা। ক্ষুধার অন্ন যে চেহারাতেই আসুক না কেন, তাকে প্রত্যাখ্যান না করা। তখন মানুষ জপ করবে, 'আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন; আমি অন্নভোজী, আমি অন্নভোজী,

আমি অন্নভোজী— অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ।' (তৈ/উ ৩:১০:৬) এই শাস্ত্র যেখানে বিস্মিত করে তা হল, এটা জ্ঞানকাণ্ডের যুগ; এখন মানুষকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জগতের ঊর্ধ্বে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ নিরবিচ্ছিন্ন জন্মান্তরের আবর্তনকে ছেদন করে মানুষকে মুক্তি দেবে ওই বোধ। আর অন্ন তো ক্ষুধা প্রশমিত করে দেহকে সুস্থ, পুষ্ট ও দীর্ঘায়ু করবে, জন্মান্তরের ধারার অবসান করতে বিলম্ব ঘটাবে। যে আর জন্ম নিতে না চায়, সে কেন দেহকে পুষ্ট করতে, দীর্ঘ পরমায়ুর অধিকারী হতে চাইবে?

আপাত ভাবে কোনও বিরোধ না থাকলেও, ইহমুখীনতা ও মোক্ষমুখীনতার মধ্যে একটা বিরোধ তো আছেই। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে ইহলোকের সুখ সম্বন্ধে তাঁর অনীহা জানিয়েছেন। সুদীর্ঘ কঠোপনিষদের কাছে জেনে নেওয়া, কারণ 'কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে, আবার অনেকে বলে, কিছুই থাকে না।' সেই খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়েও অনেকে বলত, মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না! এই নিয়ে যখন এত ব্যাকুলতা, তখন অন্নের জন্যে এই দুশ্চিন্তা খানিকটা অবাক করে বৈকি। যাজ্ঞবল্ক্য তপস্যা করবার উদ্দেশে বনে যাওয়ার আগে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দিতে উদ্যত হলে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেন, যা তিনি দিয়ে যাচ্ছেন তাতে অমরত্বের সম্ভাবনা আছে কিনা। মনে রাখতে হবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে সভাসমিতিতে বারেবারে নানা তত্ত্বকথা বলে যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজা ও অন্যদের কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। সেই বিপুল সম্পত্তির অর্ধেকের অর্থ অন্নাভাব থেকে চিরতরে অব্যাহতি এবং প্রাচুর্য। এই সহজ কথাটা কাত্যায়নী বুঝেছিলেন, তাই আর কোনও প্রশ্ন তোলেননি। মৈত্রেয়ী তুলেছিলেন। ক্ষুধা বা অশনায়া যখন মৃত্যু, তখন কোনও মতেই যাতে মৃত্যুর বশবর্তী না হতে হয় সে জন্যে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হল অমৃত, বা মোক্ষলাভ। সেই সাধনাতেই যাচ্ছেন যাজ্ঞবল্ক্য। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্পত্তির অর্ধাংশে তাঁর অধিকার আছে, কাজেই যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতের অধিকারী হলে মৈত্রেয়ীও তার অর্ধেকে অধিকারিণী।

এই অমৃতত্ব জন্মান্তর-পরম্পরা-ছেদেরই অপর নাম। উপনিষদের যুগে এইটিই পরম অভিলষিত বস্তু। অধিকাংশ উপনিষদের অধিকাংশ জুড়েই এ নিয়ে আলোচনা। কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকে ভাল ভাবে বেঁচে থাকার উপকরণগুলির জন্যে সন্ধান গৌণ হয়ে গেল; অমৃতের সন্ধান, জন্মান্তর-নিরোধের সাধনাই হল মুখ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'অন্নকে নিন্দা কোরো না, অন্নকে প্রত্যাখ্যান কোরো না... অন্নকে প্রচুর করে তোলো... আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্নভোজী, আমি অন্নভোজী, আমি অন্নভোজী'— বারে বারে এ কথা বলা যেন মূল প্রসঙ্গকে লঙ্ঘন করে, উপেক্ষা করে গৌণ, অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিষয়ে মনোনিবেশ করা। কিন্তু সমস্ত উপনিষদ জুড়ে এত বেশি বার এত বিভিন্ন ভাষায় ও নানা প্রসঙ্গে অন্ন সম্বন্ধে মানুষের তীব্র উদ্বেগ, আশঙ্কা, প্রার্থনা ও অন্ন সম্বন্ধে এত সশ্রদ্ধ মনোভাব দেখা যায় যে বিস্ময় জাগতে বাধ্য।

খাদ্যের আখ্যান

অন্ন কেবলমাত্র জীবনধারণেরই উপকরণ ছিল না। অন্নবান ব্যক্তি সমাজে সমাদর পেত এমন ইঙ্গিতও আছে মাঝে মাঝে। একটির উল্লেখ করা যায়:

> জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করতেন, বহু দান করতেন, বহু পাক করতেন, সব দিক থেকে তিনি (এই উদ্দেশ্যে) চারদিকে পান্থশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন যেন সকলে তাঁর অন্নভোজন করুন— জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাকা আস। স হ সর্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্বত এব মেঽন্নমস্যন্তীতি।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৪:৩:১)

নিঃসন্দেহে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণই একমাত্র ধনী ও অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন না। এই উপনিষদে যে প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছে সেটা হল, তিনি নিজের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্যে কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অনুনয় করতে চান। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের পরিচয় সূত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর বহু অন্ন, তিনি বহু দান করেন এবং সশ্রদ্ধ ভাবে দান করেন। অন্যত্র দান সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ মনে পড়ে, 'শ্রদ্ধাসহকারে দান করবে, অশ্রদ্ধায় দিও না।' তা এই জানশ্রুতি শ্রদ্ধাসহই দান করতেন। কী দান করতেন? বিপুল পরিমাণ খাদ্য। কারণ তাঁর নির্মিত বহু অতিথিশালাতে নিত্য বহু অন্ন পাক করা হত; তাঁর বাসনা ছিল, 'চারদিক থেকে লোক এসে আমার অতিথিশালায় আহার করুক।' এই ধরনের অন্নসত্র স্থাপনের পশ্চাতে যে সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকা ছিল, স্বভাবতই তা অন্নাভাবের। যাদের নিজেদের বাড়িতে অন্নকষ্ট নেই, তারা রাজার বা ধনীর অতিথিশালায় রোজ খেতে যাবে কেন? কিছু নিশ্চয়ই পান্থ, দূরপথযাত্রী ছিল যাদের বাধ্য হয়েই পান্থশালার অন্ন ও আশ্রয় গ্রহণ করতে হত। কিন্তু অনেকগুলি অতিথিশালায় নিয়মিত বহু অন্ন পাকের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অন্নাভাবগ্রস্ত বহু মানুষের অন্নসংস্থানের জন্যেই। এখানে একটি কথা বেশ প্রাসঙ্গিক— শ্রদ্ধা সহকারে অন্নদান। কথাটা ওঠে এমন ক্ষেত্রেই শুধু যেখানে অশ্রদ্ধায় দান করাটা প্রাসঙ্গিক হতে পারত, অর্থাৎ অন্নহীন দরিদ্রদের অন্ন দেওয়ার ক্ষেত্রেই। সে দেওয়া প্রায়শই হতশ্রদ্ধায় দেওয়া হয়ে থাকে, যাকে আমরা বলি 'কাঙালিভোজন'। জানশ্রুতির ওই সব অতিথিশালায় প্রত্যহ যা অনুষ্ঠিত হত তা প্রকৃতপক্ষে কাঙালি-ভোজনই বটে। কিন্তু পাছে অভাবকে তাচ্ছিল্য করা হয়, তাই তিনি

শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতেন। তিনি মানে তাঁর নির্দেশে ওই পান্থশালার অন্নসত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। আরও একটা প্রচ্ছন্ন কারণ অবশ্যই ছিল, অন্তত জানশ্রুতির মনে: তা হল যেখানে দেশব্যাপী অন্নাভাব, যেখানে প্রচুর ক্ষুধা আর অপ্রচুর খাদ্য, সেখানে অন্নহীন মানুষ তো তার অন্নভাবের জন্যে দায়ী নয়, কাজেই তাদের অশ্রদ্ধা করা ঠিক হয় না।

কিন্তু যে ব্যাপারটা প্রথমেই আমাদের চোখে লাগে তা হল, দেশে ব্যাপক অন্নাভাব ছিল ঠিকই; দলে দলে মানুষ জানশ্রুতির অন্নসত্রে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত ঠিকই; কিন্তু দেশে যে অন্ন ছিল না তা তো নয়। জানশ্রুতির ওই অন্নসত্রগুলিতে যে বহু অন্ন পাক হত সেটা তো কোথাও না কোথাও মজুত ছিল— তা হলে দেখা যাচ্ছে, অন্ন ক্ষুধিতের কাছে পৌঁছত না, কারণ বিত্তবানরা তা কিনে নিয়ে জমিয়ে রাখত এবং ক্ষুধিতের অন্নদানসেবা করত। এতে জানশ্রুতিরা দু'ভাবে যশস্বী হতেন: এত অন্ন বাজার থেকে কিনে মজুত করবার মতো বিত্ত তাঁদের ছিল বলে, আর, এত ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণের মতো পুণ্যকাজ তাঁরা করতেন বলে। বলাই বাহুল্য, সব বিত্তবান অন্নসংগ্রহ করতে পারলেও বুভুক্ষুর জন্যে তা খরচ করতেন না, অন্ন নিয়ে দেশে ও বিদেশে বাণিজ্য করে বিত্তবানরা বিত্তবত্তর হতেন। এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, চিরাচরিত ব্যাপার। বহু অন্ন অর্থ দিয়ে সংগ্রহ করতে পারলে সমাজ বিশেষত যে সমাজে এত অগণ্য ক্ষুধার্ত মানুষ— সে সমাজ ওই ধনী ব্যক্তিকে অন্য চোখে অর্থাৎ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। সে দিনও দেখত, আজও দেখে। অর্থাৎ বিত্তবান ব্যক্তি ক্ষুধিতের অন্ন অর্থ দিয়ে কিনে নিরন্ন সমাজে একটা কৃত্রিম সম্মান পেত। কৃত্রিম, কারণ— অন্ন সরাসরি ক্ষুধিতের অন্নপাত্রে না পৌঁছে ধনীর ভাণ্ডারে পৌঁছচ্ছে, এবং এই ধরনের ব্যবসায়ী যদিও নিরন্নকে আহার করিয়ে সে অন্নের সদ্ব্যবহার, অর্থাৎ যথার্থ পরিণতিই ঘটাত তবু ক্ষুধা আর অন্নের মধ্যে যে ব্যবধান সেইখানেই ওই ধনী মজুতকারীর ভূমিকা এবং তাকে অবলম্বন করেই তাদের পুণ্যার্জন। জানশ্রুতির বাসনা ছিল, 'সকলে আমার অন্ন ভোজন করুক।' বাসনাটিতে বদান্যতা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু একটু অহমিকাও কি ছিল না? 'সকলে আমার অন্ন ভোজন করুক'— এ ব্যবস্থা তো স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক হত সকলে নিজের গৃহের অন্নই যথেষ্ট পরিমাণে আহার করুক এই বাসনা। ঘটনাচক্রে সমাজের অর্থনীতি যখন সে ব্যবস্থা করে না, তখনই জানশ্রুতিরা দুঃখীর পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পুণ্যবান ও যশস্বী হন।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের কাহিনিতে ব্যাপক অন্নাভাবের পটভূমিকা আছে যার প্রতিকারকল্পে ওই অন্নসত্রগুলির প্রতিষ্ঠা। এ কাহিনির পরবর্তী অংশটিতে আমরা জানতে পারি:

> জানশ্রুতি রাজা ছিলেন। ঐশ্বর্য ও অন্নদানের জন্যে তিনি যশস্বী ছিলেন। এক রাত্রে একটি হংস অপর একটি হংসকে বলছে, 'জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের দীপ্তি দ্যুলোক পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে; দেখো, যেন তার তাপ তোমাকে দগ্ধ না করে।' অন্য হংসটি উত্তরে বলল, 'যে প্রশংসা কেবল সযুগ্বা রৈক্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সে প্রশংসবাক্য তুমি কার সম্বন্ধে প্রয়োগ করলে?' তাতে প্রথম হংসটি জিজ্ঞাসা করল, 'সেই সযুগ্বা রৈক্ক কেমন লোক?' তখন প্রথম হংসটি উত্তরে বলল, 'পাশা খেলায় সবচেয়ে উঁচু দান পড়লে

তার চেয়ে ছোট দানগুলো যেমন তার অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনই অন্য সব পুণ্যবানদের পুণ্য রৈক্বের পুণ্যেরই অন্তর্গত। রৈক্বের মতো জ্ঞান অন্য কোনও মানুষের দেখলে তাকে আমি রৈক্বের মতো জ্ঞানবান বলতাম।' দুটি হংসের এই আলাপ গাছের নীচে থেকে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শুনলেন।

লক্ষ করলে দেখি, রাজা জানশ্রুতি ধনী ছিলেন কিন্তু সযুগ্বা রৈক্ব অসাধারণ পুণ্যবান ছিলেন এবং বিদ্বানও ছিলেন। পরদিন ভোরে গাত্রোত্থান করার সময়ে রাজার বৈতালিকেরা যখন তাঁর বন্দনা করছিলেন তখন রাজা বললেন, 'ওহে সযুগ্বা রৈক্বের মতো কি বললে আমাকে?' সারথি রাজাকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজন্, সেই সযুগ্বা রৈক্ব কে?' তখন রাজা রৈক্ব সম্বন্ধে ওই হংসের দেওয়া সংজ্ঞাটি বললেন, তাঁর পুণ্য ও তাঁর বিদ্যা যে অতুলনীয় সে কথা জানালেন। সারথি রৈক্বের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না এবং রাজাকে সে কথা জানালেন। রাজা বললেন, 'যেখানে ব্রাহ্মণদের খোঁজ পাওয়া যায় সেখানে এঁর সন্ধান কর।'

তখন সারথি দেখলেন, একটা গরুর গাড়ির নীচে শুয়ে একজন লোক তার খোস চুলকোচ্ছে। সারথি সেখানে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করে প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, আপনিই কি সযুগ্বা রৈক্ব?' 'হ্যাঁ আমিই সে।' শুনে সারথি রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'খোঁজ পেয়েছি, মহারাজ।' তখন রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছ'শো গাভী, কণ্ঠহার ও অশ্বতরীসমেত রথ নিয়ে তাঁর কাছে এসে বললেন, 'মহাশয়, রৈক্ব, এই গাভী, রথ, অশ্বতরী ও কণ্ঠহার আপনারই জন্যে এনেছি। আপনি যে দেবতার আরাধনা করে থাকেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন।' উত্তরে রৈক্ব পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'হে শূদ্র, গাভীগুলো তোমার কাছেই থাকুক।' তখন আবার জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ এক হাজার গাভী, রথ, অশ্বতরী কণ্ঠহার, এবং নিজের কন্যাকে নিয়ে রৈক্বের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এই সবই আপনার জন্যে এনেছি, এটি আপনার পত্নী, এবং যে-গ্রামে আপনি বাস করেন সে গ্রামটিও আপনারই হোক। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে উপদেশ দিন।' রৈক্ব বুঝলেন, কন্যাটিকে উপঢৌকন দেওয়া হচ্ছে বিদ্যাগ্রহণের সূত্রপাতের কামনায়; বললেন, 'হে শূদ্র, তুমি এ সব এনেছ যাতে এগুলি অবলম্বন করে আমার মুখ খোলাতে পার।'

অতঃপর তিনি জানশ্রুতিকে দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। মহাবৃষদেশ রৈক্বপর্ণ বলে বিখ্যাত যে সকল গ্রামে রৈক্ব বাস করেছিলেন জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সে সমস্ত গ্রামই রৈক্বকে দান করেছিলেন। অর্থাৎ রাজার প্রতিজ্ঞা শোনবার পরে রৈক্ব বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করেছিলেন এবং সেই সমস্ত গ্রামই রাজা তাঁকে দান করেছিলেন।

জানশ্রুতির খোস চুলকানো তাৎপর্যপূর্ণ। খোস অপুষ্টি থেকে হয়, অতএব রৈক্ব অভাবগ্রস্ত ছিলেন। জানশ্রুতির উপঢৌকন থেকেও বোঝা যায় ধন দিয়ে অভাবগ্রস্ত পণ্ডিতকে নিজের অনুকূলে আনবার চেষ্টা চলছে, এবং রাজাকে 'শূদ্র' বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেও রৈক্ব শেষ

পর্যন্ত তাঁর দান গ্রহণ করে তাঁকে আধ্যাত্মবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষারই মাঝামাঝি জায়গায় শুনি:

> কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর কাছে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চান। তাঁরা ভিক্ষা না দিয়ে তাঁকে দার্শনিক প্রশ্ন করেন, উত্তরে তিনি বলেন, 'অদ্বিতীয় দেবতা যে প্রজাপতি, যিনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করেন তিনি চারটি মহাত্মাকে গ্রাস করেন। মর্ত্য মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না; তিনি বহুরূপে অবস্থিত। এ-অন্ন যাঁর জন্যে, তাঁকেই এটা দেওয়া হল না।' কাপেয় শৌনক কথাটা ভেবে ব্রহ্মচারীর কাছে এসে বললেন, 'হে ব্রহ্মচারি, স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছু যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়, যিনি সমস্ত দেবতার আত্মা, যাঁর দন্ত ভগ্ন নয় এমন ভক্ষক তিনি, এই-যে মেধাবী তাঁকে কেউ ভক্ষণ করে না, কিন্তু তিনি অন্য সব কিছুকে ভক্ষণ করেন বলে (পণ্ডিতরা) বলেন, তাঁর মহিমা অপরিমেয়। আমরা তেমন ব্রহ্মাকেই উপাসনা করি।' তার পর তিনি (অনুচরদের) বললেন, 'এঁকে অন্ন দাও।' তারা তাঁকে অন্ন দিল।... 'তাই সমস্ত দিকেই অন্ন দশ-ত্ব প্রাপ্ত হয় (দশগুণ হয়); সেই বিরাট-ই অন্নভোক্তা, সে-ই সব কিছু দেখেছে, অন্নভোজী-ও হয়েছে, এ কথা যে জানে, এ কথা যে জানে— তস্মাৎ সর্বাসু দিক্ষ্বন্নং দশ কৃতং সৈষা বিরাডন্নাদী ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।' (ছান্দোগ্য; ৪:৩:৮)

এই পুরো উপাখ্যানটিতেই কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। পরের দিকের তত্ত্বকথার বক্তা অপুষ্টির রোগে ক্লিষ্ট, দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ রৈক্ব। তা হলে জ্ঞানী ব্রাহ্মণও সেই যুগে— খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে— সব সময়ে অভাব থেকে নিষ্কৃতি পেত না। এ সময়ে নানা প্রস্থানের ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্মান পেলেও সব সময়ে অন্ন পেতেন না। সব পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের মতো সৌভাগ্যবান ছিলেন না, রাজা জনকের মতো মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভাগ্যে জুটত না। ফলে জ্ঞানবুদ্ধি নিয়েও বহু পণ্ডিত অভাবে পীড়িত হতেন। কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর প্রসঙ্গে বায়ু, প্রাণ, ইত্যাদি বিষয়ে দু-চারটি তত্ত্বকথার পরেই রৈক্ব হঠাৎ বলেন যে, এঁদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা পেলেন না। প্রশ্ন করে ব্রহ্মচারীর জ্ঞান কতটা তা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন। উত্তর দিয়ে ব্রহ্মচারী বলেন, 'এ-অন্ন যাঁর জন্যে, তিনিই তা পেলেন না।' অর্থাৎ ওঁদের অন্ন বুভুক্ষু ব্রহ্মচারীর জন্যেই হওয়া উচিত ছিল, সে-ই তা পেল না, কথাটা শুনে কাপেয় শৌনকের খটকা লাগে। তিনি পরমাত্মার বর্ণনা দিতে অন্যান্য নানা বিশেষণের সঙ্গে বললেন, 'যাঁর দাঁত ভাঙা নয় এমন ভক্ষক তিনি, তাঁকে কেউ ভক্ষণ করেন না, তিনি অন্য সব কিছুকে ভক্ষণ করেন; তাঁর মহিমা অপরিমেয়।'

পরমাত্মার বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি অভগ্নদন্ত, অর্থাৎ যাঁর দাঁত ভাঙা নয়। স্বভাবতই মনে পড়ে বৈদিক দেবতা পূষার কথা। গোপথব্রাহ্মণ বলে, প্রজাপতি রুদ্রকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করেন; রুদ্র যজ্ঞকে বিদ্ধ করলে তা 'প্রাশিত্র' হয়ে যায়, প্রাশিত্র হল যজ্ঞের হবি-র

যে অংশ অথর্ববেদের পুরোহিত ব্রহ্মা ভোজন করে। সেই প্রাশিত্রের দিকে তাকিয়ে ভগ অন্ধ হয়ে যান, সবিতার হাত দুটি খসে পড়ে এবং পূষা সেই প্রাশিত্র খেতে উদ্যত হলে তাঁর সব দাঁত ভেঙে যায়। (গোপথব্রাহ্মণ উত্তরভাগ; ১:২) দেবতাদের মধ্যে তা হলে একজন ভগ্নদন্ত ছিলেন পূষা, এবং দেবতা হিসেবে যজ্ঞের হব্য ভোজনে তাঁর অধিকারও ছিল, কিন্তু সেই হব্য ভোজন করতে গিয়ে তাঁর আহারের উপাদান অর্থাৎ দাঁত সব ভেঙে যায়। তা হলে অভগ্নদন্ত হলেন এমন দেবতা, প্রাশ্রিত্রভোজনে যাঁর অধিকার এমন পর্যায়ে স্বীকৃত যাতে তিনি অভগ্নদন্ত থাকতে পারেন। অর্থাৎ সর্ববিধ ভোজনে যাঁর অবিসংবাদিত অধিকার। ভোজনে অধিকার, সমাজে স্বীকৃতি এবং গৌরবের একটি মানদণ্ড।

এই উপাখ্যানে আমরা কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীকে দেখি ভোজনে অধিকারী অন্নবান কৃতী পুরুষ দুজন। এ কথা এমনই সর্বজনবিদিত ছিল যে ক্ষুধার্ত ব্রহ্মচারী তাঁদের কাছেই খাদ্যপ্রার্থনা করে। সমাজে খাদ্যে মানুষের সমান অধিকার ছিল না, ওই ধনী অন্নবানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অন্ন ছিল। এক দিকে প্রয়োজনের অতীত বাড়তি খাদ্য, অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত বুভুক্ষার ক্ষুধা; কিন্তু এ দুয়ের সংযোগ সর্বদা ঘটত না। ঋগ্বেদের সেই 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ... কেবলাদী ভবতি কেবলাঘঃ', অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি ব্যর্থ অন্ন ভোজন করে; যে একা খায় তার পাপ তার একারই হয়— এ সব কথা সমাজমানসে প্রোথিত ছিল অন্তত তিন-চারশো বছর ধরে; তবু এ উপাখ্যানে দেখি খাদ্যদানে কার্পণ্য। এর পেছনে অন্নবানের সেই ত্রাস: কী জানি, কখন ক্ষুধার দিনে হয়তো খাদ্য জুটবে না। এরা তাই 'তরাসে নিষ্ঠুর'। অর্থাৎ পর্যাপ্ত অন্ন সংগ্রহ করেও মানুষ বরাবরই ক্ষুধার সময়ে খাদ্য জুটবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কায় ভুগত। এবং নিশ্চয়ই এ আশঙ্কার কারণও ছিল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য যার ভাণ্ডারে, সমাজে তার সম্মানের স্থান ছিল এটাও এ উপাখ্যানে লক্ষ্য করি। তার উদ্বৃত্ত অন্ন আছে, ভৃত্য আছে, অতএব সমাজে প্রতিষ্ঠাও আছে। যে-বস্তু সমাজে দুর্লভ, সাধারণ মানুষ যা পর্যাপ্ত পরিমাণে সর্বদা পায় না এবং পাবার কামনায় একান্ত উৎসুক থাকে অথচ জানে যে সে রকম পাওয়া জনসাধারণের কাছে স্বপ্নমাত্র, সে-বস্তু, অন্ন। যার প্রচুর পরিমাণে আছে, ইচ্ছেমতো খেতে, দান করতে, বেচতে, জমিয়ে রাখতে পারে সে মানুষ তো সাধারণ লোকের ইর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রমের উদ্রেক করবেই; তখনকার অনিশ্চিত অন্নের যুগে যার অন্নভাণ্ডার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত সে তো সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেই। অন্ন তাই এক গভীর অর্থে ঐশ্বর্য ও সম্মানের মানদণ্ড ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে পড়ি উপমন্যুর পুত্র প্রাচীন শাল, পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল একত্র হয়ে আলোচনা করছিলেন, 'কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম'। সমাধান না পেয়ে তাঁরা সকলে অরুণের ছেলে উদ্দালকের শরণাপন্ন হলেন। উদ্দালক নিজে উত্তর না দিয়ে কেকয়ের রাজা অশ্বপতির কাছে তাঁদের পাঠালেন। রাজা তখন যজ্ঞ করছিলেন। তিনি এঁদেরকে বললেন যজ্ঞে প্রত্যেক ঋত্বিককে যত দক্ষিণা দেওয়া হবে এঁদের প্রত্যেককে ততটাই দেওয়া হবে।

এঁরা বললেন, আমরা এসেছি আপনার কাছে বৈশ্বানর আত্মার স্বরূপ জানতে। রাজা পরদিন তাঁদের উত্তর দেবেন জেনে তাঁরা শিষ্যের মতো সমিৎ (জ্বালানি কাঠ) হাতে নিয়ে রাজার কাছে এলেন। রাজা একে একে তাঁদের প্রশ্ন করে জেনে নিলেন যে তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও রূপে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তাই নানা ভাবে তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং তাঁদের বংশে ব্রহ্মতেজ জাত হয়। তাঁরা অন্নভোজী হয়েছেন এবং প্রিয় বস্তু দেখেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই খণ্ডিত বা আংশিক ভাবে বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন, এবং তাঁরা যদি রাজার কাছে না আসতেন তা হলে তাঁদের সাংঘাতিক দৈহিক ক্ষতি, এমনকী প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটত। অবশেষে তিনি তাদের বলেন, তোমরা আংশিক ভাবে বৈশ্বানর আত্মাকে জেনে অন্ন আহার করছ, কিন্তু কেউ যদি প্রাদেশমাত্র (এক বিঘৎ পরিমাণ) বা অভিবিমান (আকাশের মতো অপরিমেয়) রূপে বৈশ্বানর আত্মাকে জেনে যথাযথ ভাবে উপাসনা করেন, তবে তিনি সকল লোকে, সকলের মধ্যে ও সরল আত্মাতে অর্থাৎ (আত্মার আধার শরীরে) অন্ন আহার করেন। রাজা প্রত্যেককে বলেন, 'অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে।' শেষে বলেন, 'এতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভুতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি। (ছা/উ; ৫:১২:২; ১৩:২; ১৪:২; ১৫:২; ১৬:২; ১৭:২; ১৮:১)

এ উপাখ্যানের উপসংহারটি প্রণিধানযোগ্য: বৈশ্বানর আত্মাকে যে তার স্বরূপে জানে সে সকল লোকে অর্থাৎ ভূলোক, দ্যুলোক, ইত্যাদি সকল স্থানেই সকল প্রাণীর মধ্যে সকল আত্মাতেই অন্ন আহার করে। সকল প্রাণীর মধ্যে, কারণ, তখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের সূচনার যুগ, তাই মানুষ মৃত্যুর পরে নানা অন্য প্রাণীর দেহে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। সকল আত্মাতেই মানে— এ কথায় যে কোনও প্রাণীর দেহের আধারে যে আত্মা থাকে বলে তখন লোকে বিশ্বাস করত সেই সব আত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই দেহীর রূপে সে অন্ন আহার করে। কে করে? যে বৈশ্বানর আত্মাকে তার স্বরূপে জানে। এই আত্মাকে তার স্বরূপে জানাটাই উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কাজেই এ-ই হল এ যুগের মুখ্য জ্ঞেয় বা জানবার ও উপলব্ধি করার বস্তু, যার দ্বারা মানুষ পুনর্জন্ম থেকে মোক্ষ লাভ করে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে প্রতিশ্রুত শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে। এ কাহিনির উপসংহারে শুনি, এই শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান যে লাভ করেছে সে সকল লোকে, সকল প্রকার প্রাণীর দেহে অধিষ্ঠিত হয়ে অন্ন আহার করে। অর্থাৎ মোক্ষের যেন একটা বিকল্প রূপ হল সকল অবস্থায়— জন্মে জন্মে, যে কোনও দেহের মধ্যে থেকেই অন্নভোগী হওয়া। নিরন্তর অন্নের অধিকারী হওয়া এমন একটা বিরল সৌভাগ্য, যা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই লাভ করে যে বৈশ্বানর ব্রহ্মকে খণ্ডিত ভাবে নয়, পূর্ণরূপে জেনেছে। এ শাস্ত্র বলছে না যে, সে মোক্ষলাভ করে, বরং বলছে সে নিঃসংশয়ে নিরন্তর অন্নভোজী হয়। অন্যত্র যেমন উচ্চারিত হয়েছে যে অন্নই ব্রহ্ম, সেই কথাটাই এখানে অন্য ভাবে উচ্চারিত হল।

'অন্ন শরীরে পরিপাক হওয়ার পর তিন ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল অংশ বিষ্ঠায় ও মধ্যম অংশ মাংসে পরিণত হয় এবং সূক্ষ্ম অংশ মনে পরিণত হয়— অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমতন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।' (ছা/উ; ৬:৫:১) 'হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়— অন্নময়ং সৌম্য মন, আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি।' (ছা/উ; ৬:৫:৪) এই সংলাপ আরুণির সঙ্গে তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর আলাপের একটি অংশ। এখানে শরীরের বর্জ্য পদার্থ, কলেবর— যা মাংসে গঠিত— এবং মন এই তিন ভাগে দেহীকে ভাগ করা হয়েছে এবং এ তিনটির মধ্যে দেহ ও মন অন্নের দ্বারাই গঠিত এ কথা বলা হয়েছে। পরের অংশে প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময় বলা হয়েছে, কিন্তু মনকে অন্নময়ই বলা হয়েছে। দেহীর ব্যক্তিত্বের যে দুটি শ্রেষ্ঠ সত্তা, মন ও আত্মা তাদের সঙ্গে অন্নকে কার্যকরণ রূপে ও অভিন্নরূপে যুক্ত করা হয়েছে। উদ্দালক বলেন, অন্নকে বৈশ্বানর আত্মা বলে জানা-ই সত্য জানা; আর এখানে বলা হল, মন সৃষ্টি করে অন্ন, এতে অন্নের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বিশেষ করে যখন মনে রাখি যে, উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত এবং জ্ঞানকাণ্ডে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বোধ ও বুদ্ধিকে, তখন সেখানে এই বোধ ও বুদ্ধির আধার, মনের তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। অন্নকে সেই মনের উৎপাদক বলে তার গরিমা বাড়ানো হয়েছে, যেখানে উপনিষদে এর বিপরীতটাই প্রত্যাশিত ছিল। অথচ বারেবারেই দেখছি উপনিষদে অন্নের মাহাত্ম্য নানা ভাবেই ঘোষিত হয়েছে:

> আরুণির পুত্র ছিল শ্বেতকেতু, তাঁকে পিতা বললেন, 'তুমি (গুরুগৃহে) বাস করে ব্রহ্মচর্য পালন কর, সোম্য, আমাদের বংশে বেদাভ্যাস না করে ব্রহ্মবন্ধু (যে ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণোচিত আচার) হয় না। সে বারো বছর বয়সে (গুরুগৃহে) গিয়ে চব্বিশ বছর বয়সে সমস্ত বেদপাঠ শেষ করে গম্ভীর, বেদজ্ঞানে অহংকারী ও অবিনয়ী হয়ে ফিরে এল। পিতা তাঁকে বললেন, 'সোম্য, তুমি ত গম্ভীর, বেদাভিমানী ও অবিনয়ী হয়েছ।'[১]
>
> তার সঙ্গে কিছু শাস্ত্রালাপের পরে আরুণি এক দিন তাকে বললেন, 'সোম্য, পুরুষের মধ্যে ষোলোটি কলা (অংশ) আছে, তুমি পনেরো দিন কিছু খেয়ো না, কিন্তু যত ইচ্ছা জল পান কোরো, প্রাণ জলময় (অর্থাৎ জলনির্ভর), (তাই) যে জল পান করে তার প্রাণ যায় না।' শ্বেতকেতু পনেরো দিন আহার করল না, পরে ষোলো দিনের দিন সে পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা আমি কী বলব?' আরুণি তাকে বললেন, 'ঋক্, যজু ও সামগুলি উচ্চারণ কর।' শ্বেতকেতু বললেন, 'বাবা, ও-গুলি ত আমার

১. ওঁ শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ, 'শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং, ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি। স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হো পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী। স্তব্ধোঽসি...।' (ছা/উ; ৬:১:১-২)

মনে পড়ছে না।' তখন আরুণি তাকে বললেন, 'বড় একটা জ্বলন্ত আগুনের যদি সামান্য একটি অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তা দিয়ে তার চেয়ে বড় কিছু জ্বালানো যায় না। তোমার ষোলো কলার মধ্যে এখন মাত্র একটি কলাই অবশিষ্ট আছে, তার দ্বারা তুমি বেদগুলি আর অনুভব করতে পারছ না। তুমি গিয়ে আহার কর, পরে আমার সব কথা বুঝতে পারবে।' শ্বেতকেতু আহার করে আবার বাবার কাছে গেলেন। (তখন) পিতা তাঁকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন সে তার সব কিছুরই ঠিক উত্তর দিতে পারল। তখন পিতা তাকে বললেন, 'সেই প্রজ্বলিত বৃহৎ অগ্নির জোনাকির মতো মাত্র একটি কণা অবশিষ্ট ছিল। তাকে যদি খড়কুটো দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা যায় তা হলে (তখন) তার দ্বারা তার চেয়েও বড় বস্তুও পোড়ানো যায়। হে সোম্য, তোমার (অনাহারে) ষোলো কলার মধ্যে একটি মাত্র কলা বাকি ছিল। অন্ন-সংযোগে সেই (ক্ষীণ) কলাটি এখন জ্বলে উঠেছে, তার দ্বারা (তুমি) এখন বেদগুলি উপলব্ধি করছ। অতএব, সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক তেজোময়।' পিতার কথায় শ্বেতকেতু এটা বুঝতে পারলেন।[২]

উপবাসের পনেরো দিনে শ্বেতকেতু শুধু জলপান করেছিলেন তাই প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল, এই জন্যে প্রাণ জলনির্ভর। বেদ উচ্চারণ করবার জন্যে প্রয়োজন বাক্, বাক্ তেজনির্ভর, এই তেজ উপবাসে নির্বাপিত-প্রায় হয়েছিল, উপযুক্ত ইন্ধনে পুনরায় তেজ উদ্দীপিত হলে বেদবাক্য উচ্চারণ করা সম্ভব হল। কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করবে তো মন, সেই মন উপবাসে স্তিমিত, নিস্তেজ ও অন্তর্হিতপ্রায় হয়েছিল। সে মন পুনর্জীবিত না হলে বাক্য, বেদবাক্য, আবৃত্তি করবে কে? আর মন কিসে উজ্জীবিত হয়? অন্নে। উপবাসে যে জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল, অন্ন তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল মনকে সঞ্জীবিত করে।

এখানে দুটি ব্যাপার প্রণিধান করে দেখা প্রয়োজন। প্রথমেই আরুণি শ্বেতকেতুকে বলছেন, আমাদের বংশে সকলেই বেদচর্চা করে, অবেদজ্ঞ কেউ নেই, অতএব তুমিও যাও গুরুগৃহে বেদপাঠ কর। বারো বছরের শ্বেতকেতু গুরুগৃহে বারো বছর ধরে সমস্ত বেদ পাঠ করল,

২. 'ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ, পঞ্চদশাহানি মাঽশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো ছেৎস্যত ইতি। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপাসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতৃস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য ত ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টা স্যাৎ তয়ৈতর্হি বেদান্ নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি। স হা শাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽজাহিতস্যৈকমদারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তে তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্জ্বলয়েৎ তেন ততোঽপি বহু দহেৎ। এবং সোম্য ত ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টাঽভূত সা অন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীৎ তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন অপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।' (ছা/উ; ৬:৭:১-৬)

আয়ত্ত করল। ফিরল বেদজ্ঞানের দম্ভ নিয়ে। পিতা জানেন, এ দম্ভ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মানায় না। অতএব এ দম্ভ দূর করতে হবে। শ্বেতকেতুর দম্ভের ভিত্তি তার বেদজ্ঞান, সে জানে বেদ সে আয়ত্তে করেছে; আরুণি তাকে বোঝাতে চাইলেন যে বেদ আয়ত্ত করলেও তা আয়ত্তে থাকে না। হাতছাড়া হয়ে যায়, অর্থাৎ মন থেকে হারিয়ে যায় যদি মনের যা প্রধান উপাদান, যার ওপরে মনের ভিত্তি তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। তাই শ্বেতকেতুকে উপবাস করিয়ে দেখালেন, সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে যা সে আয়ত্ত করেছে বলে তার এই দম্ভ, সেটাও সম্পূর্ণতই অন্ন নির্ভর। বারো বছরের সাধনার ধন মাত্র পনেরো দিনের অনাহারে মন থেকে সম্পূর্ণ উবে গেল। এবং যথাযথ আহার করার পরে আবার তা মনে সম্যক্ ভাবে প্রতিভাত হল। অতএব জ্ঞান মন-নিষ্ঠ এবং মন অন্ননির্ভর; অন্নাভাবে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, প্রয়োজনীয় আহারের দ্বারাই মন তাকে ধারণ করতে পারে। যে বেদজ্ঞান প্রবল ভাবে প্রজ্বলিত অগ্নির রূপে তার মনে ষোলো কলায় বিরাজ করছিল, পনেরোটা দিনের উপবাসে তার ক্ষীণ একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ আর কদিন উপবাসে দেহই ধ্বংস হত, এবং যেহেতু দেহাভ্যন্তরের মনই জ্ঞানের আধার, তাই দেহনাশে জ্ঞানও নিরবলম্ব হয়ে বিলুপ্ত হত। সেই একটিমাত্র ক্ষীণ কলাকে নেহাৎ স্থূল পুষ্টি, অন্ন দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার পর বারো বছরের অধীত বিদ্যা আবার মনে উদিত হল।

উপনিষদ বৈদিক যুগের শেষ ভাগের জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত; শুধু তাই নয়, বেদের অন্তর্ভাগ বলে 'বেদান্ত' এবং পরবর্তী কালে বেদের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের প্রতীক বলে স্বীকৃত। এ যুগে আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদের উপলব্ধিই সাধনার বস্তু; অধ্যাত্মচর্চার যুগ এটা। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমের প্রস্তাবিত সমস্ত ঐহিক সুখকে প্রত্যাখ্যান করেছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দু'বার একটি উপাখ্যান বিধৃত হয়েছে, সেখানে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের দেওয়া বিপুল সম্পত্তির অর্ধাংশ লাভের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের আশায়। এই সেই যুগ যখন এক দিকে মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, আরও বহুতর সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় যজ্ঞকে, বেদকে অস্বীকার করে জ্ঞানকে অবলম্বন করে মোক্ষের বা পুনর্জন্মের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সাধনা করছেন। সেই যুগে ব্রাহ্মণ্যধারার শাস্ত্র উপনিষদ, জ্ঞানের আধার মনকে স্থূল বস্তুনিষ্ঠ, অন্ননির্ভর বলে প্রতিপন্ন করছে। উপনিষদের আত্মজ্ঞান তত্ত্বনির্ভর, কিন্তু সে জ্ঞান উদিত হয় যে-মনে, সে-মন যে কোনও জ্ঞানকেই ধারণ করে থাকুক তা দেহে আবৃত এবং দেহ অন্নের দ্বারা পুষ্ট হলে তবেই জ্ঞান তার মধ্যে প্রজ্বলিত থাকতে পারে। আগেই বলেছি, অন্নের এই মাহাত্ম্য উপনিষদে ঘোষিত হওয়া খানিকটা বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আরুণি শ্বেতকেতুর সংলাপে অন্যত্র এক জায়গায় একবার আরুণি জলকে অশনায়া বলে তার পরেই বলছেন 'অন্ন ছাড়া আর কী মূল হতে পারে, তাই সোম্য, এই প্রকারে অন্নের মূল দিয়ে জলের মূল খোঁজ কোরো— তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ।' (ছা/উ; ৬:৮:৪)

আমাদের মনে পড়ে আরুণি যখন শ্বেতকেতুকে পনেরো দিন উপবাস করতে বলেন তখন বলেছিলেন, 'যত ইচ্ছা জল পান কোরো, তাতে জীবনরক্ষা হবে।' আরুণি এখানে কতকটা ব্যুৎপত্তিগত কষ্টকল্পনাতে এর পূর্ব অংশে অশনায়া মানে জল নিষ্পন্ন করলেন, কিন্তু ঠিক তার পরে পরেই বললেন অন্নের মূল দিয়ে জলের মূলের খোঁজ কর। অর্থাৎ কেবলমাত্র জলপানের দ্বারাও অনির্দিষ্টকাল প্রাণরক্ষা হয় না, অন্ন সম্পূর্ণ অপরিহার্য, তাই অন্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে জলের খোঁজ কোরো। এখানেও অন্নের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'অশনায়াপিপাসে' ক্ষুধাতৃষ্ণাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে বারবার। তাই ব্যুৎপত্তি দিয়ে অশনায়াকে জলের সঙ্গে যুক্ত করলেও পিপাসার স্বতন্ত্র স্থান পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, যেমন অশনায়া বা ক্ষুধারও স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে।

এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই 'অন্নব্রহ্ম' পরিচ্ছেদে নারদ-সনৎকুমার সংলাপে এক জায়গায় পড়ি:

> বল থেকে অন্ন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে কেউ যদি দশ দিন না খেয়ে থাকে তা হলে যদিও বা সে (কোনও রকমে) বেঁচে থাকে তবু সে দৃষ্টিহীন, শ্রুতিহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন ও বিজ্ঞানহীন (বিশেষ-জ্ঞান-রহিত) হয়। আবার (যখন) অন্ন আহার করে (তখন) তার দৃষ্টি, শ্রুতি, মনন, বুদ্ধি ও ক্রিয়া আসে এবং বিজ্ঞানও আসে। অন্নকে উপাসনা কর। যে কেউ অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, তিনি এমন সব 'লোক' (স্থান) লাভ করেন যেখানে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ও পানীয় আছে। অন্নের যতদূর গতি তাঁরও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হয়।[৩]

এখানে প্রথমে বলা হয়েছে, অন্নের অভাবে দশ দিনের উপবাসে মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় কী ভাবে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বোধ, ক্রিয়া ও বিশেষ জ্ঞানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ যে সব বিশেষ শক্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে 'মানুষ' সংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ার অধিকার দেয়, যে-অধিকারবলে সে ব্রহ্মজ্ঞানচর্চার ক্ষমতা পায় এবং জন্মান্তরধারা রোধ করার ব্যবস্থা করতে পারে সেই সব ক্ষমতাই দশ দিন অনাহারে তিরোহিত হয়। আবার ভাল করে আহার করার পরে ধীরে ধীরে সে সব ক্ষমতা ফিরে আসে। অতএব 'অন্নকে উপাসনা কর।' যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন তাঁর এমন সব স্থানে অধিকার জন্মায় যেখানে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ও পানীয় আছে; অন্নের সীমা বা গতি যত দূর পর্যন্ত তাঁরও গতি তত দূর পর্যন্ত। অর্থাৎ তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর

৩. অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঽ দ্রষ্টাঽ শ্রোতাঽ মন্তাঽ বোদ্ধাঽ কর্তাঽ বিজ্ঞাতা ভবত্যথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি। স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি। (ছা/উ; ৭:৯:১-২)

কখনওই অন্নজলের অভাব হবে না। কার এই সৌভাগ্য? যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলে জানেন এবং সে ভাবে উপাসনা করেন। স্মরণীয়, এই পরিচ্ছেদটির নামই হল 'অন্নব্রহ্ম'। এ অংশের দুটি ভাগ: প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে শ্বেতকেতুকে আরুণি যা বুঝিয়েছিলেন অর্থাৎ অন্নাভাবে ইন্দ্রিয়গুলি— বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দুইই— সম্পূর্ণ অসহযোগ করে; তারা যেন থেকেও নেই। অথচ ধর্মসাধনার এই পর্যায়ে যে ব্রহ্মজ্ঞান পুনর্জন্ম খণ্ডন করার জন্যে অপরিহার্য, তার আধার হল মন, এবং মন আশ্রিত থাকে ওই ইন্দ্রিয়গুলির ওপরে। এবং এই অংশে দেখানো হল ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল খাদ্যের ওপরে। তা হলে প্রকারান্তরে উপনিষদের কেন্দ্রবস্তু যে ব্রহ্মজ্ঞান তা-ও একান্তরিত হয়ে নির্ভরশীল হয়ে উঠল অন্নের ওপরে, যেহেতু অন্ন বিনা সকল ইন্দ্রিয়ই নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, মনও বিকল হয়ে যায় এবং সে-অবস্থায় শ্বেতকেতু পনেরো দিন অনাহারের পরে বারো বছরে শেখা বেদজ্ঞান মনেই আনতে পারে না, নতুন করে ব্রহ্ম ও আত্মার একাত্মতা উপলব্ধি করা তো দূরের কথা। আবার অন্ন গ্রহণের পরে ইন্দ্রিয়গুলির সকল ক্ষমতাই ফিরে আসে। এখানে অন্নের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের সংযোগ প্রায়োগিক ভাবে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই উপলব্ধির যে সিদ্ধান্ত সেইটিই উপস্থাপিত করা হয়েছে: এই-ই যখন সম্বন্ধ অন্নের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের, তখন তো অন্নই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তির এই দৃষ্টি এসেছে, যে জেনেছে যে অন্ন বিনা অধ্যাত্মচর্চা করা শুধু দুষ্কর নয়, একান্তই অসম্ভব, সে অন্নকে ব্রহ্ম জেনে উপাসনা করে। যজ্ঞেও ছিল কর্মকাণ্ডের উপাসনা; তার ফল ছিল ঐহিক সুখের জন্যে কাম্যবস্তু লাভ করা। এবারে অন্নকে ব্রহ্ম জেনে যে উপাসনা, তা যজ্ঞের মতো অনুষ্ঠাননির্ভর কোনও যাগ নয়, তা হল একটা উপলব্ধি: অন্নই ব্রহ্ম। এ উপলব্ধির একটা বহিঃপ্রকাশ আছে; তা হল অন্ন সম্বন্ধে চূড়ান্ত সম্ভ্রমবোধ। সকল দেবতার ওপরে যেমন ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, তেমনই পার্থিব বস্তুর সব কিছুরই ওপরে অন্নের স্থান। এ কথা মনে থাকলে মানুষ অন্ন উৎপাদনে তৎপর হবে, সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে, অপচয়ের সম্ভাবনা রোধ করবে, দানও করবে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী অন্ন সুরক্ষা করার পরে। সংক্ষেপে, সংসারে শ্রেষ্ঠ দেবতার যে সম্মান প্রাপ্য অন্নের প্রতিও যেন মানুষের সেই সম্মান থাকে।

এই ধরনের সতর্কবাণী অন্যত্রও উচ্চারিত হয়েছে। কেন? স্পষ্টতই অন্নের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে অবহিত ছিল না। যে বছর ভাল ফসল হত, সে বছর ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়া হত, ফলে খরা-অজন্মার বছরে টান পড়ত। তা ছাড়া, উদ্বৃত্ত অন্ন বণিকের পণ্য হয়ে উঠত, দেশের অভুক্ত মানুষ নিরন্নই থেকে যেত। পরিশ্রমে উৎপাদন করা অন্নকে জীবনদায়ী বলে লোকে এমনিই জানত, কিন্তু স্পষ্টতই যে সম্ভ্রম থাকলে প্রতি কণা শস্য সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত মমত্ববোধ থাকে তা ছিল না। তাই অন্নের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব প্রতিপাদন করবার জন্যে অন্নকে, তখনকার শব্দকোষে যেটি শ্রেষ্ঠ অভিধা— ব্রহ্ম— তাই দিয়ে অভিহিত করা হল। মানুষ যেন মনে রাখে, যে-দেহে মনের অধিষ্ঠান, ইন্দ্রিয়গুলি যাতে সংস্থিত, যে-দেহ তার জীবিকার উপাদান জোগায়, যে-মন তার অভীষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বকে

অনুধাবন করতে সচেষ্ট সে-দেহমন একান্ত ভাবেই অন্ননির্ভর। এই অন্নকে ব্রহ্ম নাম দিলে অন্ন সম্বন্ধে সমাজে একান্ত প্রয়োজনীয় মানসিকতা— সমীহ, সম্ভ্রম, যত্ন, তার বৃদ্ধিপ্রয়াস— এগুলি আসবে, নতুবা অন্ন তার যথার্থ মর্যাদা না পেলে অন্নের প্রতি অবজ্ঞা, অযত্ন উপেক্ষা অন্নের অভাবকেই বাড়িয়েই তুলবে। অর্থাৎ এখনও সমাজে অন্নের জোগান সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নেই। আরও লক্ষ করি, এখানে মহিমার একটা সংজ্ঞা হল, 'যে সব কিছু খায়'। অর্থাৎ বহুভোজিত্ব বা সর্বভোজিত্ব মহিমার একটা মানদণ্ড। তখনকার সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার ও সম্মানের একটা ভিত্তি যে ছিল অন্নের প্রাচুর্য, এ আমরা আগেও দেখেছি। এই সংজ্ঞা উচ্চারণ করার পর কাপেয় শৌনক ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন ব্রহ্মচারীকে অন্ন দিতে। ছোট উপাখ্যানটির শুরুতেই এ ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চেয়ে না পেয়ে বলেছিলেন, 'এ অন্ন যার জন্যে, তাকেই এটা দেওয়া হল না।' স্পষ্টতই সে বলতে চায়, বুভুক্ষু যদি অন্ন না পায় তা হলে অন্নবানের অন্নসম্পদ ব্যর্থ। আবার দেখি, মনস্বী ব্রহ্মচারী, যে তত্ত্বজ্ঞানে কাপেয় শৌনক বা কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন নয়, সে নিরন্ন, অন্নভিক্ষা করে; এবং অন্নবান ব্রহ্মজ্ঞরা তাকে বিমুখ করে, অন্ন দেয় না। পরে যখন কাপেয় শৌনক পরমাত্মার সংজ্ঞা নিরূপণ করেন এই বলে যে, তিনি সর্বভোজী তখন তাঁর খেয়াল হয় অন্নভোজিত্বের ওপরে এই যে মর্যাদা আরোপ করা হচ্ছে তার সঙ্গে অন্নপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার কোথাও যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। তখন সে অনুচরদের ব্রহ্মচারীকে অন্ন দিতে বলে। তা হলে এ সমাজে রৈক্ব'র মতো পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অপুষ্টিতে ভোগে, বিদ্বান ব্রহ্মচারী এমন দুজনের কাছে ভিক্ষা চায় যারা তাকে অন্ন দিতে সমর্থ, কিন্তু প্রথমেই তার অন্নভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে। এ সমাজে সকলে খেতে পায় না। গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তত্ত্বজ্ঞানীও অভুক্ত থাকে। কাজেই ব্যাপক একটা অভাবের কালো পর্দা সব কিছুর পশ্চাতে দোদুল্যমান ছিল। সারা সমাজে একটা কালো অন্নাভাবের আতঙ্ক— পরিব্যাপ্ত ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ইন্দ্রিয়, বাক, চক্ষু, কর্ণ, মন এ সকলের উপরে প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে— প্রাণের অধীনে দেহের সব ইন্দ্রিয় কাজ করে। তার পরের খণ্ডে শুনি, প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পর প্রাণ প্রশ্ন করছে, 'আমার খাদ্য কী হবে?' উত্তরে ইন্দ্রিয়রা বলে, 'কুকুর ও শকুনি ইত্যাদি সর্ব জীবের যা কিছু অন্ন আছে।' যা কিছু খাওয়া হয় সবই 'অন'-এর অন্ন, 'অন' শব্দটি প্রাণের প্রত্যক্ষ (= সাক্ষাৎ) নাম। 'যে এ ভাবে জানে তার কাছে কোনও অন্নই অনন্ন হয় না— স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি যৎ কিঞ্চিদাশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং না হ বা এবং বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি।' (৫:২:১) এখানে লক্ষণীয় 'অন' (= প্রাণ, প্র + অন)-এর খাদ্য কুকুর থেকে শকুনি পর্যন্ত সব কিছুই। বলাই বাহুল্য, কুকুর বা শকুনি কোনওটাই খাদ্যপদবাচ্য নয়, সহজ অবস্থায় মানুষ এগুলো খায় না। তবে কেন এ দুটো প্রাণীর উল্লেখ? লক্ষ করতে হবে, কোন প্রশ্নের উত্তরে এ কথা; প্রশ্ন করছে প্রাণ, বলছে 'আমার খাদ্য কী হবে।' অর্থাৎ প্রাণধারণের জন্যে মানুষ কী খাবে। উত্তরে স্বাভাবিক প্রচলিত খাদ্যের নাম না করে বলা হচ্ছে এমন দুটো প্রাণীর

মাংসের কথা যারা স্বভাবত জুগুপ্সা উৎপাদন করে। উদ্দেশ্য হল এই কথা বলা যে, প্রাণধারণের প্রশ্ন যখন তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করে, তখন আর বাছাবাছি চলে না; কুকুর-শকুনির মাংস খেয়েও প্রাণরক্ষা করতে হবে। চোখে পড়ে, প্রাণরক্ষার জন্যে শস্যের কথা বলা হচ্ছে না, মাংসের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, সময়টা শস্যের ঘাটতির সময়, খরা অজন্মা ইত্যাদিতে তখন দুর্ভিক্ষ, যখন দেশে ফসল নেই, তখন প্রাণরক্ষার জন্যে পথের কুকুর ধরে বা আকাশের শকুনি শিকার করেও বাঁচতে হবে। এ সব কথা থাকতই না যদি না দুর্ভিক্ষ একটা সুপরিচিত ঘটনা হত। মনে পড়ে আক্কাদীয় সাহিত্যে পড়ি 'গম পচা হলেও আমি তা খাই। বীয়ার— (আহ্) স্বর্গীয় জীবন! আমি পরিহার করতে বাধ্য হয়েছি। (দারিদ্রের) এ যাতনা নিদারুণ দীর্ঘ হয়েছে।'[৪]

বৈদিক সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ণনা বা বিবরণ নেই। যখন ভিক্ষা মেলে না তখন দুর্ভিক্ষ— এই অর্থেই দুর্ভিক্ষ বোঝা যায়। নানা কারণে দুর্ভিক্ষ হতে পারে; তার মধ্যে খরার অজন্মা একটি। এই খরাজনিত দুর্ভিক্ষ প্রাচীন মিশরে পর পর সাত বছর হয়। তার একটি বর্ণনা পাই— 'ফসল নেহাৎ কম, ফলগুলো সব শুকিয়ে গেছে, যা কিছু মানুষ খেত তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক মানুষ তার সহচরের (ঘরে) চুরি করছিল... শিশুরা আর্তনাদ করছে। যুবকরা প্রতীক্ষা করছে, বৃদ্ধদের হৃদয় বিষাদে ভরা, তাদের পা গুলো বেঁকে গেছে, মাটিতে দুবড়ে পড়েছে, তাদের হাতগুলো জোড় করা। দেশগুলো অভাবে আচ্ছন্ন, মন্দিরগুলো বন্ধ; মঠে দেউলে বাতাস (ছাড়া কিছুই নেই)। সব কিছুই ফাঁকা হয়ে গেছে।[৫]

এমনই এক দুর্ভিক্ষের উপাখ্যান পাই ওই ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেই:

> 'কুরুদেশ'-এ যে বার শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়েছিল, তখন হাতির মাহুতদের গ্রামে, কিশোরী ভার্যার সঙ্গে বাস করতেন অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত উষস্তি চাক্রায়ণ। তিনি এক মাহুতকে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া মাষকলাই খেতে দেখে ভিক্ষা চাইলেন। (সে লোকটি) বলল, 'এই-যে-কটা আমার পাত্রে ঢালা আছে তা ছাড়া আমার তো আর নেই।'
>
> 'ঐগুলো থেকেই আমাকে দাও' সে ওগুলি তাঁকে দিল, আর বলল, 'চাইলে এই যে জল আছে (তা-ও নিন)।'
>
> (তিনি) বললেন, 'তাহলে তো আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়ে যাবে।'

৪. 'Wheat even though putrid, I eat Beer– life divine I have eliminated from me Extremely long has been this distress ' Akkadian Observations on Life and World Order in *Ancient Near Eastern Texts* pp 21-23

৫. 'Grain was scant. fruits were dried up and everything which they eat was short. Every man robbed his companion.. . The infant was wailing. the youth was waiting. the heart of the old man was in sorow, their legs were bent. crouching on the ground, their arms were folded. 'The countries were in need. the temples were shut up; the sanctuaries, held (nothing but) air. Every(thing) was found empty'. 'The Tradition of the Seven Lean Years in Egypt' in *Ancient Near Eastern Texts* p. 31

(মাহুতটি) বলল, 'মাষকলাইগুলোও কি উচ্ছিষ্ট ছিল না?'

(উষস্তি) বললেন, 'ওগুলো না খেলে বাঁচতেই পারতাম না, পানীয় জল তো আমি যেখানে ইচ্ছা খেতে পারি।'

তিনি খেয়ে উদ্বৃত্তটুকু স্ত্রীর জন্যে নিয়ে এলেন। স্ত্রীটি আগেই ভাল ভিক্ষা পেয়েছিল, (তাই) ওইগুলো নিয়ে রেখে দিল। সকালে উঠে (উষস্তি চক্রায়ণ) বললেন, 'যদি খানিকটা খাদ্য পেতাম, কিছু ধন লাভ করতাম। ওই রাজা যজ্ঞ করবেন, তিনি আমাকে সমস্ত ঋত্বিকের কাজে বরণ করতেন।'

তাঁকে স্ত্রী বললে, 'স্বামিন্, তা যদি হয়, তবে (তোমার দেওয়া) সেই নষ্ট মাষকলাইগুলো রয়েছে।'

(উষস্তি) সেগুলো খেয়ে সেই আয়োজিত যজ্ঞে গেলেন।[৬]

উষস্তি চাক্রায়ণ যজ্ঞস্থলে গিয়ে দেখেন যে যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। সামবেদের গানের যে চারজন পুরোহিত উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য, এঁদের মধ্যে প্রথম তিন জনকে উষস্তি বললেন, 'তোমরা যাঁর স্তব করছ তাঁকে যথার্থ ভাবে না জেনে যদি স্তব কর তাহলে তোমাদের মাথা খসে পড়বে।' এই কথা শুনে যজমান (যিনি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন) উষস্তিকে বললেন, মহাশয়, আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই। পরিচয় দিলে যজমান বললেন, 'আমি আপনারই খোঁজ করছিলাম আমার ঋত্বিক কর্মের জন্য; না পেয়ে এঁদের নিযুক্ত করেছি, এখন সমস্ত ঋত্বিক-কর্মের জন্য আপনাকেই বরণ করছি।' উষস্তি সম্মত হয়ে বললেন, 'আমার অনুমতি নিয়ে এঁরাই যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করুন, কিন্তু এঁদের যে পরিমাণ ধন দেবেন, আমাকেও ততটাই দেবেন।' যজমান বললেন, 'তাই হবে'। এর পর উষস্তি প্রস্তোতা, উদ্গাতা ও প্রতিহর্তাকে প্রশ্ন করলেন তাঁরা কোন কোন দেবতার স্তব করছেন। তাঁরা অজ্ঞতা নিবেদন করলে উষস্তি যথাক্রমে প্রস্তোতাকে বললেন, 'প্রাণই সেই দেবতা', উদগাতাকে বললেন 'আদিত্যই সেই দেবতা।' পরে প্রতিহর্তাকে বললেন, 'অন্নই (সেই দেবতা), সৃষ্টির সকল প্রাণী অন্নকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে জীবনধারণ করে। সেই অন্ন-দেবতাই প্রতিহারের দেবতা— অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি।' (ছা/উ; ১:১১:৯)

৬. মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সং জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস। স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি। এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রাদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ। ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদয়ন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি। স হ খাদিতত্বাঽতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার। সাঽগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ। স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাঽসৌ যক্ষ্যতে স মঃ সর্বরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি। তং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়। (ছান্দোগ্য উপ; ১:১০:১-৭)

এইখানে কাহিনির প্রথম অংশের সঙ্গে সংগতি খুঁজে পাওয়া যায়। অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ সে দিন সকালে স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'কিছু খেতে পেলে ওই যজ্ঞে পৌরোহিত্য পেতাম, কিছু ধনলাভ করতে পারতাম।' তিনি যজ্ঞস্থলে আসতেই পারতেন না চণ্ডালের এঁটো মাষকলাইয়ের বাসি উদ্বৃত্তটুকু না খেতে পেলে। অন্ন তার কদর্যতম চেহারায় এসেছিল উষস্তির সামনে, কিন্তু মর্মান্তিক যন্ত্রণায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রাণরক্ষার উপাদান হিসেবেই অন্নকে দেখতে হবে, জুগুপ্সাকে জয় করে হীনতম অন্নেও জীবনরক্ষা করতে হবে। মনে পড়ে, কুকুর বা শকুনির মাংসকেও প্রাণরক্ষার উপাদান হিসেবে শাস্ত্র সমর্থন করেছে। কাজেই এই উষস্তির দৃষ্টিতে যজ্ঞে প্রধান উপাস্য দেবতা যে হবে প্রাণ এবং তাকে টিকিয়ে রাখার প্রধান উপাদান যে হবে অন্ন তাতে আর আশ্চর্য কী। আদিত্য অর্থাৎ সূর্য জমিতে ফসল ফলাবার এক অপরিহার্য অধিদেবতা। তাই উষস্তির তত্ত্বসমাধানে দেবরাজ ইন্দ্র বা ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক অগ্নি বা বৃহস্পতি, পরমাত্মা এঁদের স্থান নেই। জীবনের ভিত্তি প্রাণ, তাকে জীইয়ে রাখার জন্যে ফসল ফলানোর অধিদেবতা আদিত্য এবং জীবনরক্ষার একান্ত অপরিহার্য উপাদান অন্ন— এই তিনটিই প্রাধান্য পেল উষস্তির ব্যাখ্যানে। লক্ষ করি, উষস্তির এই উত্তরের সঙ্গে কোনও যুক্তি বা কারণ নির্দেশ নেই। কেন যে তিনি, প্রাণ, আদিত্য, ও অন্নকে প্রধান দেবতার স্থান দিলেন তার কোনও যুক্তি দিলেন না। ফতোয়ার মতো করেই বললেন, এবং আগের ঋত্বিকরা তা মেনেও নিলেন। অর্থাৎ উপনিষদ এই তত্ত্ব— অন্নের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা— করতে চায় এবং তা করছে উপবাসক্লিষ্ট কদর্য খাদ্য দিয়ে কোনও রকমে উদরপূর্তি করে যজ্ঞে এসেছে এমন এক ব্রাহ্মণের বাণী দিয়ে। ভূমিকায় দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত প্রকোপ চিত্রিত করবার পরে বুভুক্ষু ব্রাহ্মণের মুখে অন্নকে প্রধান দেবতা বলে চিহ্নিত করে উপনিষদই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

এখানে আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। যজমানের কাছে উষস্তির শর্ত ছিল অন্য পুরোহিতদের যত দক্ষিণা তিনি দেবেন উষস্তিকে ততটা অর্থাৎ তিনজনের মিলিত দক্ষিণার সমপরিমাণ ধন তাঁকে দিতে হবে, কারণ যজমান তাঁকে ওই তিন পুরোহিতদের স্থলে নিযুক্ত করেছেন। দক্ষিণায় খাদ্য, বস্ত্র, স্বর্ণ, পশু ও দাসদাসী দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু দক্ষিণার খাদ্য ত খেলেই ফুরিয়ে যাবে, হয়তো সংরক্ষণ করবার মতো কিছু শস্যও পাওয়া যেত, কিন্তু দরাদরির সময়ে শুনি ধনের কথা। তার মানে ওই মারাত্মক দুর্ভিক্ষের দিনেও বেশি দাম দিয়ে খাবার কেনা যেত, অর্থাৎ এখনকার ভাষায় খাদ্যের 'কালোবাজার' ছিল। তখন সেই ফসলের আকালের দিনেও যজমান যজ্ঞ করছেন, অর্থাৎ অন্তত সতেরো জন পুরোহিতকে রোজ দু'বেলা খাওয়াচ্ছেন এবং পুরোহিত ছাড়াও যজ্ঞে যে নানা রকম সাহায্যকারী দরকার হত, তাদেরও খাওয়াচ্ছেন। উষস্তির স্ত্রী ভিক্ষা পেয়েছিলেন, কাজেই ভিক্ষা দেওয়ার মতো উদ্বৃত্ত খাদ্য কোনও কোনও পরিবারে ছিল এবং টাকা বা ধনের বিনিময়ে ওই দুর্ভিক্ষের দিনেও কোনও কোনও মজুতদারের কাছে খাবার কেনা যেত। চিত্রটা ব্যাপক খাদ্যাভাবের, কিন্তু তারই মধ্যে দুর্নীতি ও কালোবাজারও চালু ছিল। আবার এমন সদাশয় অন্নবান ব্যক্তিও কদাচিৎ পাওয়া যেত যারা উষস্তির কিশোরী বধূটিকে খাবার ভিক্ষা দিতেন। এমন অজন্মা বা

দুর্ভিক্ষের সময়ে সাধারণ গরিব মানুষ, যারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তারা অনেকেই খাদ্যাভাবে মারা যেত বা অখাদ্য খেয়ে অসুখে পড়ত। কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত অন্নের অধিকারী মুষ্টিমেয় ধনীদের কাছেই 'অশনায়াপিপাসে', অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা, মৃত্যুর রূপ ধরে আসত না। বাকিরা দুর্ভিক্ষের দিনে কীটপতঙ্গের মতোই মারা যেত।

উষস্তি চাক্রায়ণের কাহিনির ঠিক পরেই ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপাখ্যান আছে তার নাম 'শৌব উদ্‌গীথ', অর্থাৎ 'কুকুরদের সামগান'।

> বক দালভ্য— দলভ্য ও মিত্রার ছেলে বক, ওরফে গ্লাব নামে এক ঋষি, বেদ অধ্যয়নের জন্যে গ্রাম থেকে নির্গত হলেন। তাঁর সামনে একটি সাদা কুকুর দেখা দিল। তার কাছে অন্য কুকুররা এসে বলল, 'মহাশয়, আপনি গান করে অন্নের সংস্থান করুন, আমরা ক্ষুধার্ত। সেই শাদা কুকুরটি তাদের বলল, 'কাল সকালে তোমরা এই জায়গাতেই আমার কাছে এস। পরদিন বক দালভ্য (মিত্রার পুত্র) গ্লাবও সেইখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। তখন (যজ্ঞে) বহিষ্পবমান স্তোত্র গানের সময়ে যেমন (সামবেদের স্তোতারা) পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে (যজ্ঞভূমিতে) পরিক্রমা করেন, সেই রকম কুকুরগুলি (পরস্পরের লেজ ধরে?) প্রদক্ষিণ করল। তার পর বসে পড়ে হিংকার উচ্চারণ করল। ওম খাব, ওম পান করব, ওম দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এখানে অন্ন আনুন, অন্নপতি! এখানে অন্ন আনুন।[৭]

এই উপাখ্যানটিতে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখা প্রয়োজন। শাদা কুকুর এক ধরনের আভিজাত্যের প্রতীক। ঋগ্বেদে প্রগার্যদের সম্বন্ধে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বারবার বলা হয়েছে তারা কৃষ্ণাঙ্গ; অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ আর্যরা উঁচু জাতের এমন ইঙ্গিত এতে আছে। এখানে ওই কুকুরটি পুরোহিতদের নেতৃস্থানীয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অন্য কুকুররা তার শরণাগত হয়ে বলে, 'আপনি গান করে আহার আনুন।' ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত; সামবেদের পুরোহিতরা যজ্ঞে গানই করে, সেই যজ্ঞের অন্তে খাদ্যলাভ ঘটে এমন বিশ্বাস এখানে উচ্চারিত। 'বহিষ্পবমান' স্তোত্র গাইবার সময়ে পুরোহিতরা ঝুঁকে নীচু হয়ে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করে, এবং পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। তার পর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পুরোডাশ্ ও যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুমাংসের ভাগ পায় তারা। এ ছাড়াও যজ্ঞ যদি অভীষ্ট ফল দেয় তো সকলের জন্যেই খাদ্য সংস্থান হয়। বহিষ্পবমান স্তোত্রগানের অনুকরণ করার পরে কুকুররা যে হিংকারধ্বনি উচ্চারণ করে তা এখানে রূপান্তরিত হয়েছে অত্যন্ত শাদামাটা কথায়; বরুণ,

৭. অথাতঃ শৌব উদ্‌গীথস্তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্‌বব্রাজ। তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি। তান্ হোবাচেহৈব ম! প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার। তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ। ওমদামোং পিবামোং দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতাহন্নমিহাহরদন্নপতেহন্নমিহাহরাহহরোঁমিতি। (ছন্দোগ্য উপ; ১:১২)

প্রজাপতি, সবিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'আমরা খাব, পান করব, আমাদের জন্যে খাদ্য আনুন।' বরুণ এ যুগে জলের অধিদেবতা, অতএব পিপাসা দূর করার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা বোঝা যায়। প্রজাপতি ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকেই শস্যের, পশু ও মানুষের প্রজনিকা শক্তির অধিদেবতা, প্রজাকে পালন করতে শস্য ও পশুর যে কল্যাণ আবশ্যক, প্রজাপতি তার ব্যবস্থা করেন। আর ফসলের জন্যে, পশুর চারণভূমির উর্বরতার জন্যে যে সূর্যকিরণ প্রয়োজন সবিতা তার অধিদেবতা। সবিতা শব্দের অন্য অর্থ হল জন্মের অধিদেবতা ('সূ' ধাতুর অর্থ প্রসব বা জন্ম দেওয়া, সু + তৃচ = সবিতৃ → সবিতা)। কাজেই এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্যপানীয়ের জন্যে প্রার্থনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কাহিনিটি এই প্রার্থনাতেই শেষ, কুকুররা প্রার্থনার ফল পেল কিনা তা বলা হয়নি। যেমন ব্রাহ্মণসাহিত্যে সোমযাগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের গান ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানই বর্ণিত আছে, যজ্ঞের ফললাভের কথা কিছু বলা নেই। এ উপনিষদ সামবেদের, এ বেদের পুরোহিতদের যজ্ঞে নির্দিষ্ট কর্ম হল গান গাওয়া। যজ্ঞ যদি খাদ্যসংস্থানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে উদগাতা ও তার সহকারীদের ভূমিকা হল গান দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা, 'বহিষ্পবমান' অনুষ্ঠানটির শেষে হিংকার উচ্চারণ করার কথা। এখানে সি-হিংকার স্পষ্ট খাদ্য-প্রার্থনা। 'আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, আমাদের ভোজন ও পানের ব্যবস্থা কর।' সেই অশনায়াপিপাসে; এবং এখানে যে-শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'অশনায়াম' তার সোজা মানে হল, 'খিদে পেয়েছে।' কুকুরদেরও খিদে পেলে তারা যজ্ঞ কর্মের নকল করে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে, কারণ তখনকার সমাজ খাদ্য সংস্থানের ওই একটি উপায়ই জানত।

উষস্তি চাক্রায়ণের কাহিনির ঠিক পরেই এই 'শৌব উদগীথ'— এ দুটি উপাখ্যানের পটভূমিকা একই: ব্যাপক খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের চিত্র। প্রথমটিতে উষস্তি চণ্ডালের এঁটো, নষ্ট মাষকলাই খেয়ে যজ্ঞ করে পুরোহিতদের তত্ত্বশিক্ষা দিয়েছিলেন: অন্নই প্রধান দেবতা। সামবেদের পুরোহিতরা যে গান করছেন যজ্ঞে, সে গানের উদ্দিষ্ট দেবতা অন্ন। উষস্তি নিজে যজমানের সঙ্গে দরাদরি করে তিনজন পুরোহিতের দক্ষিণা নিজে যাতে পান সেই ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই করে রেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই মর্মান্তিক বুভুক্ষার নিষ্ঠুর রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, তাই তার থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে বাজারে দুষ্প্রাপ্য যে-খাদ্য তা যাতে চড়া দামে হলেও কিনতে পারেন সে সম্বন্ধে যজমানের কাছ থেকে নিশ্চয়তার আশ্বাস লাভ করেছিলেন এবং যজ্ঞনিরত পুরোহিতদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। বক গ্লাব বেদাধ্যয়নের উদ্দেশে বেরিয়ে যজ্ঞের অভীষ্ট ফল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন কুকুরদের আচরিত অনুষ্ঠান দেখে। সমাজে খাদ্যাভাব কোন পর্যায়ে গেলে উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরদেরও খাদ্যাভাব ঘটে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই সমাজে তখন মাঝেমাঝেই ব্যাপক অন্নাভাব ঘটত, তাতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ বিত্তহীনরা অন্নকষ্টে পীড়িত হত; মুষ্টিমেয় কিছু ধনীই শুধু বাড়তি দামে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত। অন্নাভাবের চিত্রটি ব্যতিক্রমী নয়, বরং এটি-ই মোটামুটি সাধারণ চিত্র।

শ্রেণিবিভাজন ও বহমান ক্ষুধা

দেখা গেল, কর্মকাণ্ডের যুগে সংহিতাব্রাহ্মণে সকল দেবতার কাছে বিভিন্ন ভাষায় খাদ্যের জন্যে বহু প্রার্থনা আছে; পরিসংখ্যানগত ভাবে দেখলে অন্য কোনও কাম্য বস্তুর জন্যেই অত প্রার্থনা নেই। অতএব খাদ্যাভাব তখনকার সমাজের একটি স্থায়ী ও ব্যাপক অবস্থা। আবার জ্ঞানকাণ্ডে আরণ্যক উপনিষদের যুগেও অসংখ্য ভাবে সেই একই প্রার্থনা উচ্চারিত; কখনও তত্ত্বকথার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও সরাসরি উপদেশে, কখনও-বা উপাখ্যান বা কাহিনির মাধ্যমে। জ্ঞানকাণ্ডের যুগে অন্নের মহিমা এতবার এত বিচিত্র ভাবে ঘোষিত হওয়াতে কতকটা বিস্ময় আসে, এবং এর থেকে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়: দেশে খাদ্যের অভাব ছিল। যে পুরোহিত যজ্ঞে গান গায়, সেই উদ্‌গাতার শাস্ত্র যে ছান্দোগ্য উপনিষদ, তাতে এত সংখ্যায় খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা? সামগানে প্রীত হয়ে দেবতা খাদ্য দেবেন? কিন্তু উষস্তি চাক্রায়ণ বলেন সামগানের মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব ও প্রার্থনা নিবেদিত হয় এবং যথার্থ বোদ্ধা সামগায়ক জানেন সেই উদ্দিষ্ট দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন অন্ন, যে-অন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব যজ্ঞের গান শুধু গানই নয়, দেবতাকে স্বরূপে বুঝে তাঁর উপাসনাই যথার্থ গায়কের কর্তব্য। স্বরূপে বুঝে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি সে প্রার্থনা পূরণ করেন, এমন বিশ্বাস ছিল। ছিল বলেই শাদা কুকুরটিকে অন্য কুকুররা বলে, 'আমরা ক্ষুধার্ত, তুমি সামগান গেয়ে আমাদের জন্যে খাদ্যসংস্থান কর।' এবং পরে যজ্ঞের অনুকারী যে বহিষ্পবমান স্তোত্র গাওয়ার অনুষ্ঠান কুকুররা মিলে করে, তারও পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ছিল ওই বিশ্বাস: যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান, করলে গানের প্রার্থনা— অন্নভিক্ষা— দেবতাদের কাছে পৌঁছয়। খাদ্যের জন্যে আর্তি কত গভীর ও মর্মান্তিক হলে বুভুক্ষু কুকুরদের দিয়েও যজ্ঞের একটি অংশের অনুকরণ করা হয়, তাদের প্রার্থনা শুনেও দেবতারা তাদের খাদ্য দেবেন এই বিশ্বাসে। অতএব সাধারণ অতি পরিচিত যে ছবিটি থেকে যায় তা হল দেশে প্রায়-সার্বত্রিক এক অন্নাভাব। হয়তো কোনও কোনও অঞ্চলে কোনও কোনও যুগে খাদ্যের মোটামুটি সচ্ছলতা ছিল, কিন্তু সাধারণ ছবিটায় খাবারের অসংকুলান পরিষ্কার দেখা যায়।

'অন্ন' কথাটির অর্থ যা খাওয়া যায়, অর্থাৎ খাদ্য। কিন্তু অর্থ সংকোচনের নীতিতে অনেক আগেই অন্ন মানে 'ভাত' দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখনও শব্দটি ওই অর্থই বহন করে। 'কেউ কেউ ধানের ব্যাপক ব্যবহারকে জমির শস্যবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে, এবং এক জায়গায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাবেশকে সম্ভব করে তোলার সঙ্গে এক করে দেখেছেন।'[১]

ধানের চাষ নানা কারণে বেড়ে যায়; বিভিন্ন ধরনের ধান ছিল, তার মধ্যে অনেকগুলো বিভিন্ন ঋতুতে ফলত, চাষটাও সহজ ছিল এবং আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত সর্বত্রই ধানের চল ছিল। ধানকে 'ধন' মনে করা হত তাই 'ধন' থেকে এর প্রতিশব্দ 'ধান্য' ব্যুৎপন্ন হয়েছিল। ধান থেকে সরাসরি ভাত রাঁধাও সহজতম পাক প্রক্রিয়া, কাজেই ক্ষুধিত জনসাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তির একটা সহজ উপায় ছিল ধানচাষ, এবং তা খুব ব্যাপক হারেই হত। তবু ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের যে সমান্তরাল দূরত্ব সেটা রয়েই গেল। অভুক্তের পাত্রে প্রয়োজন মতো খাদ্য জোগানের কোনও পাকা ব্যবস্থাই হল না। রয়ে গেল অভাব, গরিব সারা বছরই অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকত; যে-বছর উদ্বৃত্ত ফসল ফলত তা গিয়ে জমা হত ধনীর ভাণ্ডারে বা তার পণ্যসম্ভারে।

বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে যে-উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তাতে কাঠের ফলা-যুক্ত লাঙল দিয়ে যে-চাষ হত তার গতি ছিল ধীর, অনেক সময় নিয়ে ও অনেক পরিশ্রমে সামান্য জমি চাষ হত, সেই অনুপাতে ফসলের পরিমাণও কম ছিল। তা ছাড়া ছিল 'ঈতি'র আতঙ্ক এবং খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, পঙ্গপাল, শস্যনাশক কীট, ইঁদুর, শস্যের ব্যাধি, সৈন্যদের আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে বোনা ফসল সব সময়ে খাবারে উঠতে পেত না। এ ছাড়াও যে-বছর ভাল ফসল হত তখনো সে-ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে যা ছিল, তা আর্যদের প্রথম পর্যায়ে ছিল না। 'মহেঞ্জোদারো, হরপ্পাতে ও লোথালে আশ্চর্য উন্নত প্রণালীতে নির্মিত বিরাট আয়তনের শস্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। লোথালের কাছে তৈরি শস্যভাণ্ডার, যেটা সম্ভবত আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, সেটা তো খুব মজবুত ভাবেই তৈরি ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের পূর্বে কখনওই এত বেশি পরিমাণে শস্য এমন ভাবে সংক্ষরণের ব্যবস্থা ছিল না।'[২]

এ হল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও লোথালের কথা— সিন্ধুসভ্যতার যুগ, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের খবর। আর্যরা আসবার পর যাযাবরত্ব ত্যাগ করে

১. 'Some have identified the wide-spread use of rice as a mechanism to raise the carrying capacities and to allow the agglomeration of large concentrations of population in a single place.' Allchin, *The Archeology of Early Historic South Asia*. p. 66

২. 'Granaries or grain storage of surprising sophistication and size have been found at Mahenjodaro, Harapa and Lothal. (At Lothal) The vanished granary probably destroyed by fire .. Never in Indian history till recent times are grain stored on this scale.' K T Achaya, *Technology of food*, p 459

স্থিতিশীল কৃষিজীবী হয়ে যখন তারা আর্যাবর্তে বসবাস করতে শুরু করল তখনও তারা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় সিন্ধুসভ্যতার সার্বিক সুনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার শৃঙ্খলা অর্জন করে উঠতে পারেনি। লোহার ফলার লাঙলে অল্প পরিশ্রমে বেশি ফসল ফলাত, মাংস, দুধ ও দুধের তৈরি খাবার এবং ওই ফসলের থেকে রুটি ওইসব খেত। সুবৃষ্টি হলে ভাল ফসল হত, হয়তো তখন সাধারণ লোকেরও খাবার জুটত। কিন্তু স্থিতিশীল হয়ে গ্রামীণ সভ্যতায় যখন তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে তখন তাদের সমাজব্যবস্থা— অর্থাৎ কৌম (clan) ও গোষ্ঠী (tribe) ভেঙে বৃহৎ 'কুল' অর্থাৎ এক বাড়িতে কয়েক প্রজন্মের একত্র বসবাস চালু হয়েছে।

একই সঙ্গে অনেকগুলি কুল একত্রে একটি গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে। প্রাগার্য সভ্যতায় গ্রাম ছিল, শহরও ছিল। আগন্তুকরা এসে প্রথমটায় সে সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে তোলে। কয়েক শতক পরে স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজে বাস করতে শুরু করার পরে লাঙলের চাষের সময়ে গোষ্ঠী কৌম ভেঙে 'কুল' স্থাপিত হলে অনেকগুলি কুল গ্রামে বসবাস করতে থাকে। সচরাচর গ্রামগুলি স্বনির্ভর ছিল এবং আয়তনে বেশ বড় থাকায় ধীরে ধীরে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে গ্রামগুলিই একক বলে পরিগণিত হয়। 'লাঙলের চাষে খাদ্যের জোগান অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক বেশি নিয়মিতও হয়ে যায়। এর অর্থ একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই নয়, কিন্তু (এমন এক জনগোষ্ঠী যারা) বৃহত্তর এককে (গ্রাম) বাস করতে লাগল।'[৩]

ততদিনে এই ধরনের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারই সমাজের একক হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছে। শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সব রকম অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপদের প্রতিকার করবার মতো সুসংগঠিত বা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল যখন কমে যেত, তেমন সব অজন্মার বছরে, বা কোনও দৈবদুর্বিপাকে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে, মানুষের ভাগ্যে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাপক অনাহারই ঘটত। হয়তো দু-চারটি ভাগ্যবান পরিবারের কোনও সঞ্চয় থাকলে সে দুর্বৎসরটা কোনও মতে অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু প্রত্নখননে মহেঞ্জোদারো হরপ্পা ও লোঠালের পরে বহু শতাব্দী পর্যন্ত পাথরের বা ইঁটের তৈরি কোনও রকম শস্যসংরক্ষণ ভাণ্ডার প্রত্নখননে পাওয়া যায়নি। প্রথমত, উৎপাদন ছিল স্বল্প, দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহুবার সেই স্বল্প উৎপাদনও বিনষ্ট হয়ে যেত। তৃতীয়ত, তেমন কোনও শক্তিমান, সুসংহত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ছিল না যা প্রজাসাধারণের জন্যে ফসলের দুর্বৎসর ঠেকাবার জন্য অগ্রিম চিন্তা করে কোনও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারত। আর্যরা পোড়া ইঁটের ব্যবহার শেখে অনেক পরে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক নাগাদ। পাথরের স্থাপত্য সে যুগে পাওয়া যায় না; কাঠের ভাণ্ডগৃহ পোকায়, জলে, আগুনে নষ্ট হয়ে যেত, কাজেই মজবুত কোনও শস্যভাণ্ডারের নজির নেই।

৩. 'Plough agriculture greatly increased the food supply and made it more regular This meant not only a far greater population but one that lived together in greater units ' Kosambi, *An Introduction to the Study of Ancient Indian History* p 114

ফলে অনেকটা 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থাই চলত, সংগ্রহ সঞ্চয়ের পরিকল্পনাও ছিল না, ব্যবস্থাও ছিল না। চতুর্থত, জল, কীট, বাতাসের আর্দ্রতা থেকে ফসলকে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ রাসায়নিক জ্ঞান তখন ছিল না, ফলে নদীবহুল দেশে বর্ষার আর্দ্রতা ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসলকে বাঁচাবার উপযুক্ত প্রায়োগিক বিজ্ঞান একেবারেই ছিল না। তাই সঞ্চিত ফসলও দীর্ঘকাল ভাণ্ডারে থাকলে সম্পূর্ণ ভাবে খাবার অযোগ্য হয়ে উঠত। এর অর্থ প্রাকৃতিক যে কোনও দুর্যোগ মানেই দুর্ভিক্ষ, ব্যাপক অনাহার।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে লোহার লাঙলের ফলার ব্যবহারে স্বল্পতর পরিশ্রমে বহুলতর ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হল। যেহেতু সংরক্ষণের ব্যবস্থা তখনও অনুপস্থিত, তাই এই বাড়তি ফসলের দু-তিনটি গতি হত। প্রথমত, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে সমাজে শ্রেণিবিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই উপস্থিত, তাই কিছু ধনিক শ্রেণির লোকের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি, পশুসম্পত্তি যেমন বেশি ছিল, তেমনই ফসলের বেশি অংশ তাদেরই হাতে আসত। ফলে শস্যের অসম বণ্টন অনিবার্য ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের ভাগ্যে সামান্যই জুটত, চাষি মজুর পেটভাতায় কাজ করত এবং দুর্বৎসরে তাতেও টান পড়ত। বেশি উৎপাদনে ধনী লাভবান হয়েছিল তিন ভাবে। প্রথমত, তাদের কখনও খাদ্যাভাবে ভুগতে হত না; দ্বিতীয়ত, উদ্বৃত্ত খাদ্যের কিছু অংশ দিয়ে তারা অভুক্ত মানুষদের, কারখানার মজুর বা বাড়ির দাসদাসী হিসেবে নিযুক্ত করে রাখতে পারত; আর তৃতীয়ত, উদ্বৃত্ত ফসল ও কারিগরির শিল্পবস্তু নিয়ে বাণিজ্য করতে পারত। অতএব লোহার ফলার লাঙলে যে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল, তার ভাগ দরিদ্রসাধারণের মধ্যে এসে পৌঁছত না, তাই খাদ্যাভাব ব্যাপক ভাবেই থেকে গেল সমাজে।

খাদ্যাভাব কত আতঙ্কের হলে খাদ্যকে ব্রহ্ম বলতে হয়? ব্রহ্ম সাধারণ দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নন, ইনি পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নন, ক্লীবলিঙ্গ; অর্থাৎ দেব বা দেবী নয়, তাদের ঊর্ধ্বে একটি শক্তি। নানা দর্শনপ্রস্থানে তিনি নানা ভাবে স্রষ্টা, পালক ও সংহারকর্তা। অর্থাৎ ব্রহ্মের ঊর্ধ্বে কোনও শক্তি নেই, সমস্ত দেবমণ্ডলী ও বিশ্বচরাচর তাঁর সৃষ্ট ও তাঁর অধীন। এই শ্রেষ্ঠ সর্বশক্তিমান দিব্যপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তাকেই অন্নের সঙ্গে অভিন্ন বা একাত্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে বারেবারে, যেন অন্নের মর্যাদা ওই অতুলনীয় মহিমা পায়। কর্মকাণ্ডের যজ্ঞে অন্যান্য দেবদেবীদের কাছে যথাবিহিত স্তোত্র গান ও হব্য দিয়ে অন্ন প্রার্থনা করা হত, তখন 'বিরাজ' ছন্দকে অন্নস্বরূপ বলা হচ্ছিল; বিভিন্ন দেবদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছিল, 'তিনিই প্রকৃষ্ট অন্নদাতা।' স্বভাবতই মনে হয়, এ প্রক্রিয়াতেও ইষ্টলাভ হচ্ছিল না, ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য জুটছিল না। তার পর উন্নততর কৃৎকৌশলে চাষে যখন উৎপাদন বাড়ল তখনও মানুষ দেখছিল ফসল বেশি জন্মানোর কোনও সুবিধা তাদের পাতে পৌঁছচ্ছে না। যজ্ঞের দেবতারা যাদের অনুগ্রহ করছিলেন, তারা সংখ্যালঘু, নতুন প্রণালীর চাষেও তাদেরই লাভ হল, উৎপাদক জনসাধারণের বুভুক্ষা, অপুষ্টি, অনটন আগের মতোই রইল। এ বার, নতুন পর্যায়ে, অন্ন দেবতাদের ছাড়িয়ে উঠল, এ বার সে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে উঠল, 'যে অন্নকে ব্রহ্ম বলে

জানে, তার কখনও অন্নভাব হয় না।' বলা বাহুল্য, এ সব নির্দেশের মধ্যে সমাজের পক্ষে হিতকর একটি দিক আছে, তা হল মানুষ যেন অন্নকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, অপচয় না করে, যত্ন করে তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করে। এতে ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই লাভ; অন্ন যত্নে সুরক্ষিত হয়। তবে কিছু চক্ষুষ্মান্ মানুষ নিশ্চয়ই লক্ষ করছিল যে যজ্ঞে দেবতাদের কাছে যথেষ্ট আবেদন-নিবেদনেও যেমন খাদ্যে অন্বিষ্ট প্রাচুর্য মেলেনি, তেমনই এখন জ্ঞানকাণ্ডের যুগে অন্নকে ব্রহ্ম বলে মনে করাতেও সে প্রাচুর্য পাওয়া গেল না। এটা যে ঘটেছিল তার প্রমাণ যজ্ঞ-অবিশ্বাসী বেশ কিছু মানুষের যজ্ঞে অনীহা দেখা গেল। এদের মধ্যে যাঁরা বেশি বুদ্ধিমান বা যোগ্যতর তাঁরা বেদ ও যজ্ঞের বিরোধী কিছু ধর্মপ্রস্থান প্রবর্তন করলেন এবং যজ্ঞে বীতস্পৃহ আরও অনেক লোক তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁরা দেখলেন, যাঁরা বহু আড়ম্বরে, বহু পশু বধ করে, যজ্ঞ সম্পাদন করেন তাদের চেয়ে অরণ্যচারী এই সব অবৈদিক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বেশি কষ্টে আছেন তা নয়। এ সব প্রস্থানের অধিকাংশই জ্ঞানকাণ্ডের সমকালীন, কাজেই সমাজে যাঁরা যজ্ঞ করে অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করছেন তাঁদের মধ্যে যারা ইতর সাধারণ অর্থাৎ যাদের জমি, পশু, ইত্যাদি সম্পত্তি নেই, যারা ক্ষেতে চাষি, কারখানায় মজুর তাদের ভাগে অন্ন কিছু বেশি পড়ছে না। অতএব অত হাঙ্গামা করে যজ্ঞ করেও যেমন তাদের ক্ষুধা মেটেনি, তেমনি অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞান করবার দুরূহ মননপ্রক্রিয়ার কসরৎ করতে পারলেও তাদের অন্নাভাব মিটল না। এ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ভিক্ষাজীবী, যেমন বৌদ্ধ ও জৈনরা। অন্যদেরও অনেকে ভিক্ষা ও অরণ্যে ফলমূল সংগ্রহ করে প্রাণ ধারণ করতেন। ভিক্ষার অন্নও অনিশ্চিত, খরা, অজন্মায় দুর্ভিক্ষে ভিক্ষা মিলত না। যজ্ঞ যারা করত তারাও যেমন পর্যাপ্ত অন্ন পেত না, যারা অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করতে চেষ্টা করত বা করতে পারত তাদেরও তেমনই অন্নসংস্থান অনিশ্চিতই ছিল।

ভিখারি, অন্তত প্রাচীনকালে, সব দেশেই ছিল। তবে এ দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই অন্নভিক্ষা নানা ধরনের শাস্ত্রের সমর্থন পেয়েছিল। আশ্রমধর্মে ব্রহ্মচারী পরান্নে পালিত এবং সে ভিক্ষা করে খেত, এবং ভিক্ষান্ন আচার্যের বাড়িতেও আনত। যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে, মানুষ ফলমূল সংগ্রহ বা ভিক্ষা করে। জৈন সন্ন্যাসীও ভিক্ষা করত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভিক্ষার কথা 'জাতক' ও অন্য সব বৌদ্ধ গ্রন্থে বহু বিস্তৃত কাহিনির মধ্যেও পাওয়া যায়। অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের কথা, বিশেষত বুদ্ধ বোধিলাভ করার পূর্বে যে সব সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের কথাও পাওয়া যায়। এঁরা ছিলেন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, অতএব এঁদের ভিক্ষান্নে এবং সংগৃহীত ফলমূলেই ক্ষুধানিবারণ করতে হত।

পরাশরের 'ভিক্ষুসূত্র' গ্রন্থ এবং অন্যান্য অনেক দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রস্থানেও ভিক্ষার নির্দেশ দেওয়া আছে। 'অগেহী' বা 'অনিকেত' মানুষ সমাজে এক ধরনের সম্মান পেতেন। এঁরা যেহেতু নিজের বাড়িতে রান্না করতেন না, তাই পরের বাড়িতে ভিক্ষা করেই দিনপাত করতেন। অনেক ধরনের পাপের প্রায়শ্চিত্তেও ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খাওয়ার বিধান ছিল কোনও কোনও ব্রতেও ভিক্ষা করার বিধান ছিল। কাজেই সমাজে গৃহীর পাশাপাশি ভিক্ষাজীবীর

জন্যেও একটা ব্যবস্থা ছিল। তীর্থযাত্রী ভিক্ষা করেই খেতেন, বহু তীর্থস্থানেও অন্নসত্র থাকত। কাজেই বহু ক্ষুধিত মানুষ ভিক্ষায় পাওয়া খাদ্যে জীবনধারণও করতেন। ভিক্ষা পাওয়ার জন্যে সমাজে বেশ কিছু গৃহীর প্রয়োজন ছিল, যাঁরা ভিক্ষা দেবেন। অর্থাৎ এই সব সংসারী লোকেদের— বৌদ্ধ সাহিত্যে যাঁদের প্রধানত 'গহপতি' (গৃহপতি = গৃহী) বলা হয়েছে— বাড়িতে রান্না হত, এবং সে রান্নাটা শুধু বাড়ির লোকজনদের পরিমাপে নয়, কিছু বাড়তিও থাকত। দৈবাৎ এসে-পড়া অতিথি বা বুভুক্ষু ভিখারিকে বা নিয়মিত ভিক্ষার্থী সন্ন্যাসীকে তারই থেকে ভিক্ষা দেওয়া হত। ভিক্ষা দেওয়া, বিশেষত অন্নদান, তাই বরাবর সব শাস্ত্রেই পুণ্য কাজ। অর্থাৎ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন কখনওই ছিল না যাতে রাষ্ট্র থেকে ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণের দায় বহন করা হবে। তাই যার জমি নেই, যে ভাগচাষি সামান্য জমিতে মজুর খাটে, সে দুর্বৎসরে খাদ্য পেত না, বাধ্য হত ভিক্ষা করতে। তাই পেশাদার ভিক্ষুক ছাড়াও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজের শ্রম বিক্রি করেও খিদে মিটত না বহু তথাকথিত 'নিম্নবর্গের' মানুষের।

পণ্ডিত আই বি হর্নার বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলেন, '...এগুলির (এর) উদ্ভব একটু অদ্ভুত ধরনের— প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ভারতের মাটির থেকে পৃথক, জনগণের মানসিক গঠনের কাছে বিজাতীয়। ধর্ম সম্বন্ধে এদের বিশেষ অধিকার থাকলেও শুধু মহাবীর ও গৌতমের অনুগামীরাই নিজেদের ভিক্ষু সম্প্রদায়ে সংগঠিত করেছিল।'[৪]

ফরাসি পণ্ডিত লুই দুমঁ বলেছেন, গৃহী ও ভিক্ষুর মধ্যে সম্পর্কে গৃহীর দিক থেকে ভিক্ষু যেন ঈর্ষার পাত্র ছিল। শুধু যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এর হেতু ছিল তাই নয়, সমাজ সে উৎকর্ষ স্বীকার করল। সেই ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে, যাতে ভিক্ষুক উৎপাদন বা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন করবার দায় থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায়। বৈদিক যুগে এ অধিকার ছিল পুরোহিত ও আচার্যের, এ যুগের শেষার্ধে এ অধিকার ছিল রাজার এবং সৈন্যদের ও কিছু রাজকর্মচারীরও। ফলে যে মানুষগুলি কোনও না কোনও ভাবে পরিশ্রম করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত, নিজেদের এবং ওই পরোপজীবী গোষ্ঠীরও, তারা বুদ্ধিজীবী, মোক্ষার্থী বা নির্বাণকামীর কাছে ক্রমে ক্রমে হীন বলে পরিগণিত হল। অন্যান্য কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভিক্ষান্নে দিনপাত করবার বিধান ছিল, কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এটি একটি সর্বত্র-আচরিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসে উৎপাদক কৃষিকর্ম নিষিদ্ধ ছিল, এমনকী নিজের জন্যে রান্না করাও তাদের শ্রমণদের পক্ষে (বারণ ছিল), শ্রম হিসেবে

৪. '...were strange growths, constitutionally alien to the soil of India and foreign to the mentality of peoples In spite of their genius for religion, only the followers of Mahavira and Gotama formed themselves into communities of alms people.' I B Horner *1930 Women Under Primitive Buddhism: Lay Women and Almswomen*. London p. xxiii

শ্রমের কোনও মূল্য ছিল না, এবং এই নিষেধের অর্থ হল খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্যে ব্যবহারিক জীবনে গৃহীর ওপরে শ্রমণের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা।'[৫]

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে যখন বহু বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যেই মাধুকরী, ভিক্ষাটন, অনিকেতত্ব এবং শ্রমণত্ব স্বীকৃতি পেল, তখন স্বভাবতই এই সব প্রস্থানের পূর্বশর্তই ছিল সমাজের বৃহত্তর অংশ গৃহী থাকবে, সব রকম সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীর জন্য অন্নদানকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করবে। তাই তখনকার সব প্রস্থানের ধর্মগ্রন্থেই সন্ন্যাসী সম্পর্কে একটা সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করার চেষ্টা আছে এবং ভিক্ষুকে অন্নভিক্ষা দেওয়াকে পুণ্য অর্জনের উপায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। তা হলে গৃহীর ওপরে একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হল: পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান করা ছাড়াও ধর্মপ্রস্থানের নির্দেশে বা অন্য কোনও কারণে যারা নিজেরা উৎপাদনের কোনও কাজে লিপ্ত থাকবে না বলেই ভিক্ষার দ্বারা অন্নসংগ্রহ করবে তারা প্রার্থী হয়ে এলে তাদের অন্নদান করতে হত। ঋগ্বেদে যারা স্বার্থপরের মতো নিজের অন্ন নিজেরাই খায়, অন্নের ভাগ দেয় না তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদ সেই অর্থে নীতিনির্দেশক গ্রন্থ নয়; তাই তখন গৃহী ইচ্ছে করলে অন্নপ্রার্থীকে যে বিমুখ করতে পারত তার নানা নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখেছি। কিন্তু তার তিন চারশো বছর পরে ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী, পর্যটক, প্রায়শ্চিত্তকারী বা ব্রতধারীর জন্যে সমাজ একটা ভিন্ন ব্যবস্থা করল। তখন পাশাপাশি দুটি সম্প্রদায়— গৃহী ও ভিক্ষু— একই সঙ্গে সমাজে বিরাজ করছে। ধনীরা চিরদিনই ধনের বিজ্ঞাপন হিসেবে কিছু পরগাছার মতো আশ্রিত, নিষ্কর্মা মানুষকে অন্নদান করত আবার খেয়াল খুশি মতো প্রার্থীকে প্রত্যাখানও করত। কিন্তু ওই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শ্রমবিমুখ, উৎপাদনবিমুখ অংশ যখন আহারের জন্যে সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীর ওপরে নির্ভরশীল, তখন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়াকে পুণ্যকর্ম বলে প্রচার না করলে তারা খেতে পাবে না, বাঁচতে পারবে না। তাই ধর্মবোধের মধ্যেই ভিক্ষুকে অন্নদান অনুপ্রবিষ্ট হল। বৌদ্ধ গ্রন্থে, বিশেষ 'জাতক'গুলিতে এই মর্মে বহু কাহিনি আছে। রামায়ণ মহাভারত কিছু পরের সংকলন হলেও এগুলি রচনার সূত্রপাত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে এগুলিতেও দেখি ভিক্ষাদান পুণ্যকর্ম। কাজেই সমাজে একটা সংহত মূল্যবোধে ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী সম্মানের আসনে স্থান পেল এবং কতকটা অধিকার হিসেবেই পরান্নে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী হল।

এই সমাজে যখন উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম, অথবা বেশি হলেও তা বণিকের কাছে পণ্যরূপে সঞ্চিত হয়, যখন নানা আগন্তুক উৎপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য বিনষ্ট

'. .Buddhist monasticism denied productive agricultural work to its members. work as suchg was not valued, and its negation meant the monks, complete material dependence on the laity for the provision of food, clothing and shelter ' S J Tambiah. "The Renouncers Individuality and Community" in *Way of life: king. Householder, Renouncer* (ed) T N Madan, Vikas, 1982, p 306

হয়, যখন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল জানা নেই, এ বিষয়ে অপরিহার্য রাসায়নিক বিদ্যাও আয়ত্ত নয়— এই সমাজে ক্ষুধার তুলনায় খাদ্য অপ্রতুল। সাধারণ মানুষ তা বোঝে এবং যজ্ঞে, প্রার্থনায়, কৃষিকর্মে নিরন্তর খাদ্যের প্রাচুর্যের সন্ধান করে ফেরে, কারণ ক্ষুধা ও খাদ্যের মধ্যে সমান্তরাল ব্যবধানটা রয়েই গেছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও এমন কোনও বিধান ছিল না যে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ মজুত রেখে অকালে, দুর্ভিক্ষে দুঃস্থ প্রজাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে। এটা অনেক শতক পরে ধীরে ধীরে আসে এবং কখনওই পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি। ফলে এ দেশে বেদের সময় থেকেই খাদ্যাভাব ব্যাপক ভাবে বর্তমান ছিল, অর্থাৎ 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং', ইত্যাদি ইচ্ছাপূরক স্বপ্নের প্রকাশমাত্র। বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটিয়েছে, দেশে ফসল বেশি হলেও তার ভাগ পায়নি, কম হলে তো অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে, না হলে মৃত্যু এসেছে 'অশনায়াপিপাসে'র চেহারায়। সে দিন যজ্ঞে যে সব দেবতাকে মাথা খুঁড়ে মিনতি জানিয়ে ক্ষুধিত মানুষ বিফল হয়েছে তাদেরই উত্তরপুরুষরা আজ সরকারের পায়ে মাথা খুঁড়ে আবেদন-নিবেদন করে বিফল-মনোরথ হয়ে উপোস করছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

অথর্ব বেদ সংহিতা
ঋগ্বেদ সংহিতা
তৈত্তিরীয় সংহিতা
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
গোপথ ব্রাহ্মণ
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
শতপথ ব্রাহ্মণ
ঐতরেয় উপনিষদ্
ছান্দোগ্য উপনিষদ্
মাণ্ডুক্য উপনিষদ্
মুণ্ডক উপনিষদ্

Allchin, R 1995 *The Archaeology of Early Historic South Asia* OUP
Bandyopadhyaya N C 1945 *Economic Life and Progress in Ancient India*, Calcutta
Basu, J 1969 *India of the Age of the Brahmanas*, Calcutta
Bose, A N 1961 *Social and Rural Economy of Northern India circa 600 B C -200 A D*, Calcutta
Buch, M A 1979 *Economic Life in Ancient India* (2 vols), Allahabad
Chattopadhyaya, D P 1986, 1991 *History of Science and Technology in Ancient India* (2 vols) Calcutta
Claessen N J M & Kirk, P S 1978, *Thear Early State*, The Hague
Earle, T 1991 *Chiefdoms Power, Economy and Ideology*, CUP
Horner, I B 1930, *Women and Primitive Buddhism. Lay Women and Almswomen*, London
Iyenger P T S 1932, *Life in Ancient India* N Delhi
Khare R S 1976, *The Hindu Hearth and Home*, Carolina
Khare, R S 1976, *The Hindu System of Managing Foods*, Simla

Kosambi, D D 1956, *Introduction to the Study of Ancient Indian History*, Bombay.

Prakash, O 1961, *Food and Drink in Ancient India*, Delhi.

Rau, W 1957, *Staat und Gasellschaft in alter Indien nach dem Brahmanen Texten dargestallt*, Wiesbaden

Renfrew, A C & Shennan S (ed) 1982 *Ranking Resource and Exchange*, OUP

Sengupta, P 1950, *Everyday Life in Ancient India*, OUP

Sharma, R S 1980, *Indian Feudalism*, N Delhi

Sharma, R S 1983, *Material Culture and Civilization in Ancient India* OUP

Thakur, V K 1932 *Urbanization in Ancient India*, N Delhi

Wittfogel, K A 1957, *Oriental Despotism A Comperative Study of Total Power*, Yale Univ Press

Hesiod *Works and Days* Loeb edn

Pritchard J B *Ancient Near Eastern Texts*, Princeton Univ Press

Achaya K T "Technology of Food" in *Hist of Technology in India* (ed) A K Bag

Ganguli, R "Famine in Ancient India" *ABORI* 15, 1933-34

Gode, P K "Indian Dietetics Use of Fried Grants" *ANNORI* vol 29

Mahapatra, G "Meat and Drink in Indian Cultural Tradition" WSC Wien, SP (8), 1990

Pandeya, L P "Famines in Ancient India" *Quarterly of the India International Centre*, 12 (2) June, 1985

Russell, J C "The Population of Ancient India A Tentative Pattern" *J of Indian Hist*, 1973

Shendge, M "Floods and the Decline of the Indus Civilization" *ABORI*, 1990

Tambiah, S J "The Renouncers Individuality and Community" in T N Madan (ed) *Way of Life King Householder and Renouncer*, Vikas 1982

বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য

ভূমিকা

সংশয় ও নাস্তিক্যের মধ্যে প্রকৃতিগত, ব্যাপ্তিগত এবং মাত্রাগত পার্থক্য আছে। সব সংশয় নাস্তিক্য থেকে আসে না। আবার মূল নাস্তিক্যও সংশয়ের চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আস্তিকেরও সংশয় থাকতে পারে। সংশয় পরিসরে ছোট, গভীরতাতেও তাই। নাস্তিকের সংজ্ঞা হল 'ঈশ্বরাপ্রামাণ্যবাদী' অর্থাৎ যে ঈশ্বরকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না, এবং 'বেদাপ্রামাণ্যবাদী' অর্থাৎ বেদকে প্রামাণ্য বলে মানে না। এ ছাড়া উপনিষদে দেখি, যে পরলোকে বিশ্বাস করে না সে-ও নাস্তিক। পরলোক মানে শুধু স্বর্গনরক নয়, পরলোক থাকতে গেলেই মরণোত্তর আত্মা থাকতে হবে। তাই যে পরলোক নয়, শুধু ইহলোককেই স্বীকার করে সে-ও নাস্তিক। পরলোককে স্বীকার করলেও ঈশ্বরকে স্বীকার নাও করা যেতে পারে, এবং এ দুটি স্বীকার করেও বেদের প্রামাণ্যতা যে মানে না সে-ও নাস্তিক। হেমচন্দ্রের অভিধান বলে, নাস্তিকের প্রতিশব্দ হল, বার্হস্পত্য, চার্বাক ও লোকায়তিক। যে 'নাস্তি' শব্দ থেকে নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি, তার তিনটি অর্থ হতে পারে: যে ঈশ্বর মানে না, যে পরলোক মানে না এবং যে বেদের প্রামাণ্য মানে না। দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর, পরলোক ও বেদে বিশ্বাস পরস্পর-নিরপেক্ষ; তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, এ তিনটিই ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তিনটি মূল স্তম্ভ। পরবর্তীকালে বুদ্ধের আগে যে সব বেদবিরোধী প্রস্থানের উদ্ভব হয়েছিল, তারা সকলেই বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের অস্তিত্বেও আস্থাহীন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই পরলোকে বিশ্বাসী; এর সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিকরাও আছেন। অথচ এই পরলোক নিয়ে ব্রাহ্মণসাহিত্য, আরণ্যক ও উপনিষদে নানা সংশয়। শাস্ত্রমতে এ সংশয়ও নাস্তিক্য, তবে এ নাস্তিক্যের সংজ্ঞা শুরু হয় উপনিষদে।

ধ্রুপদী নাস্তিক

এই কালবিন্দুতে ধ্রুপদী নাস্তিক আবির্ভূত হন। তাঁদের সম্পর্কে সমাজের তীব্র তিক্ততাতেই বোঝা যায় কোনও একটি সুসংহত ছকে এঁরা আর পরস্পর-সাপেক্ষতায় সম্পৃক্ত নন। এর প্রাথমিক সূত্রপাত কিন্তু পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতা থেকে। নাস্তিক্যের ইংরেজি 'এথিইজম্', এ শব্দটির ব্যুৎপত্তি, a-theos থেকে অর্থাৎ 'অনীশ্বর' বা 'ঈশ্বর না মানা'। একেশ্বরবাদী খ্রিস্টধর্মে আত্মা ও পরলোক ঈশ্বর-সমর্থিত তত্ত্ব, অতএব ঈশ্বরকে না

মানার সঙ্গেই এগুলো সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তিনটি তত্ত্ব: বেদ, ঈশ্বর ও পরলোক পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কেউ এর মধ্যে দুটিকে বিশ্বাস করে, কেউ একটিকে, কেউ-বা কোনওটিকেই বিশ্বাস করে না; যদিও এখানেও পরবর্তী যুগে এই তিনটি পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এবং বেদ বলতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ-উপনিষদই বোঝাত না, তার সঙ্গে যজ্ঞও বোঝাত, যেটা বেদের প্রায়োগিক দিক। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে সংশয় এবং অনীহাও নাস্তিক্যেরই একটি প্রকাশ বলে মনে করা হত। যজ্ঞের নানা প্রবক্তা ছিল, নানা গোষ্ঠী ও তার নানা রূপভেদ ও বিবর্তন ঘটেছিল; কিন্তু এ সবের বাইরে উত্তর ভারতে নানা বিকল্প রূপের মধ্যেও একটি বিমূর্ত 'যজ্ঞ' ব্যাপার মানুষের চেতনায় ও আচরণে ছিল। নাস্তিকের ঔদাস্য ও অনাস্থা এই যজ্ঞ ব্যাপারটাকে অবলম্বন করেই।

'যজ্ঞতত্ত্ব অপরিহার্যরূপে বেদের প্রতীকী, এমনকী বেদের বিবক্ষিতের সারবস্তু বলেই স্বীকৃত ছিল। তাই বেদোক্ত যজ্ঞক্রিয়াকে না মানাও নাস্তিক্য। তখন আস্তিক গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে নানা যজ্ঞক্রিয়া করবে, এইটেই ছিল সামাজিক অনুশাসন; তার বিরুদ্ধাচরণ সমাজ সম্পর্কে একটা প্রতিস্পর্ধা, এবং সে-সমাজ তো শাসিত হত এই বেদ দিয়েই। কাজেই এই বিরুদ্ধাচরণ নাস্তিক্য বলেই অভিহিত হত। ক্রমে পরস্পর সংঘর্ষে উত্তীর্ণ হওয়া। যজ্ঞকারী ও নাস্তিক উভয়েই (যজ্ঞ) কর্ম অর্থে গোষ্ঠীগত আনুষ্ঠানিক আদানপ্রদান-নির্ভর কর্মকে পরিহার করে, উভয়ের পার্থক্য হল, বেদের ব্যক্তিগত কর্মের সত্য মিথ্যা বিষয়ে বেদের সার্বভৌম অনুজ্ঞা।... যজ্ঞকারী (ও তার আস্তিক বংশধর) মানুষের লোকাতীত স্তরে উত্তরণের জন্যে লোকাতীত অনুশাসনের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা সমর্পণ করে। অপরপক্ষে, নাস্তিক্য লোকাতীতকেই বিসর্জন দেয়— ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যে।'[১] কর্মকাণ্ডের শেষ দিকে বৈদিক সাহিত্যে দেহাতীত আত্মা দেখা দেয়; যজ্ঞেও পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রীর অনেকটাই ভাগ হত পুরোহিত ও যজমানের মধ্যে। পরে যখন আত্মার কল্পনা উদিত হল তখন যজ্ঞকারীরা যজ্ঞতত্ত্বের দ্বারা লোকাতীত সত্তায়— আত্মায় উত্তরণ করলেন এবং এইখানে ঘটল নাস্তিকের সঙ্গে তার মৌলিক বিচ্ছেদ। বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করতে গিয়ে সে তার ব্যক্তিসত্তার অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার অধিকার বিসর্জন দিল লোকাতীত তত্ত্বের কাছে। আর নাস্তিক সেই

১. 'It is no longer a question of denying a particular person's (or group's) sacrifice, but of denying the abstract institution of sacrifice The doctrine of sacrifice is either true or false It is at this point that the classical *nastika* makes his appearance The utter acerbity of their relations signifies the fact that they are no longer bound together in a complementary pattern. The initial point is, however, the breakthrough out of mutual dependence in the contest for the goods of life Both ritualist and *nastika* reject *karman* in the sense of the (sacrificial) "work" of agonistic exchange between two parties. What divides them is the truth or falsehood of the doctrine of individual karman regulated by transcendent Veda injunction... . The ritualist (and his *astika* progeny) in order to safeguard man's transcendence subjects his freedom to transcendent injunction The *nastika*, on the other hand, surrenders his transcendence in favour of man's freedom.'— J. C. Heesterman, p. 184

লোকাতীতত্ত্বকে বিসর্জন দিল ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব চিন্তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। ব্যক্তিচিন্তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার দুটি প্রধান অর্থ: বেদের প্রামাণ্য যেহেতু প্রত্যক্ষ নয়, অর্থাৎ দেবতা, যজ্ঞ, ধর্মাচরণ নিয়ে বেদ যত কথা বলছে তা যেহেতু প্রত্যক্ষ নয় তাই তা বিসর্জিত হল এবং পরে এরই সঙ্গে বিসর্জিত হল দেহব্যতিরিক্ত আত্মা। বিনিময়ে তার চিন্তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকল, অর্থাৎ যে-বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে অনায়াসে পরিহার করা হল। উপনিষদে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে স্বপ্নে মানুষ বহু অবাস্তব বিষয় দেখে। পরে জেগে উঠে জানতে পারে যে, সে-দেখাগুলো সম্পূর্ণ অলীক এবং যে-জগতে জেগে ওঠে সেটাই বাস্তব। তা হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের আপেক্ষিক সত্যতাই স্বীকার করা হল।

আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়ী

প্রত্যক্ষ মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে স্বীকার করতে গেলে বেদের অতিলৌকিক অনুজ্ঞা স্বীকার করা যায় না। বহু প্রস্থানই বেদের প্রামাণ্যতা মানতে পারেনি। এগুলির মধ্যে প্রধান হল বৌদ্ধমত। আত্মা ও পরলোক মানলেও বৌদ্ধধর্ম বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেনি, যজ্ঞকেও অস্বীকার করেছে। 'যখন ঐতিহ্যের অভ্যন্তরীণ প্রাস্থানিক বস্তু বিপর্যস্ত হচ্ছে তখনই বাইরের (বাহ্য) ও বিরুদ্ধ (নাস্তিক) বৌদ্ধমতের প্রতিস্পর্ধার বিরুদ্ধে বেদকে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।... ঐতিহ্যগত (আস্তিক) ও ঐতিহ্যবহির্ভূত (নাস্তিক) মতের পার্থক্য হল ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে মৌলিক ও পরিচিত লক্ষণ। ঐতিহ্যবাহিত ভারতীয় স্তোত্রসাহিত্যে যেমন, তেমনই অধুনাতন ভারতীয় দর্শনের সমীক্ষাতেও স্পষ্ট।'[২] 'প্রাচীন গ্রিক ভাষাতেও নাস্তিকতার সংজ্ঞা আদিতে শুধু ঈশ্বরে (অর্থাৎ দেবদেবীতে) অবিশ্বাসীকেই বোঝাত না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক বা না করুক, রাষ্ট্রের সর্বস্বীকৃত দেবতাদের (অস্তিত্বে) অবিশ্বাসীকেও বোঝাত। রোম সাম্রাজ্যে (নাস্তিক) খ্রিস্টান অজ্ঞেয়বাদীদের বোঝাত।'[৩] দর্শনের কোশগ্রন্থ বলে: 'সংশয়বাদ একটি সমালোচনাশ্রয়ী দার্শনিক মনোভাব হিসেবে জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে দার্শনিকদের ও অন্যদের যে দাবি, তাকে প্রশ্ন করে।'[৪] গ্রিক

২. 'It (Veda) is invoked against the internal sectarian disintegration of the tradition, as well as against the "external" (*bahya*) and heterodox (*nastika*) challenges of Buddhism ... The distinction between "orthodox" (*astika*) and "heterodox" (*nastika*) systems is among the most basic and familiar traditional Indian doxographies as it is in modern surveys of Indian philosophy.'— Halbfass: p 16 and p. 237

৩. '(Greek (ĀθEOS) atheos originally used in Greece of all those who whether they believed in god or not, disbelieved in the official gods of the state.. In Roman empire (the word) was used by pagans to denote Christian agnosticism.'— *The Oxford Dictionary of the Christian Church*, p. 100)

৪. *Macmillan Encyclopaedia of Philosophy· Skepticism*, Vol VII, p 499

'স্কেপটিকস্' শব্দটি অনুসন্ধিৎসু এই অর্থ বহন করে; সংশয় শব্দটির অর্থ অনুসন্ধান। কোনও নিশ্চিত বিশ্বাসের অভাবই সূচিত করে 'সংশয়'। ইংরেজি doubt শব্দটি ব্যুৎপত্তির দিক থেকে double শব্দটির সঙ্গে অন্বিত, অর্থাৎ এর মুখ্য অর্থ দ্বিত্ব, 'এটাও হয়, হয়তো ওটা-ও হয়'— এই মনোভাব। লাতিন dubits প্রাচীন লাতিন dubo, জার্মান zweifel-এ সবের অর্থ দ্বিত্বতা, অর্থাৎ স্থির সিদ্ধান্তের অভাব, দোলাচলতা। তা হলে প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, জার্মান সংশয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, দ্বিধা, অর্থাৎ নিশ্চয়তার অভাব। এর এক প্রান্তে আছে বিশ্বাস, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, স্থিরতা, অসংশয়িত প্রত্যয়। অপর প্রান্তে আছে ঠিক তার বিপরীত মনোভাব: অবিশ্বাস ও নাস্তিক্য; এর মধ্যেও আছে দৃঢ়তা ও অসংশয়। আস্তিকের যেমন দ্বিধা নেই যে, ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, বেদ সবই আছে এবং সবই প্রামাণ্যক, অসংশয়িত, ঠিক তেমনই নাস্তিকের চিন্তাতেও কোনও যথার্থ দ্বিধা নেই। আস্তিকের মতোই নাস্তিকেরও কোনও সংশয় নেই; সে সংশয়ী নয়, বরং নিশ্চিতই জানে বেদ, আত্মা, পরলোক, ঈশ্বর বা দেবতারা কেউই, কিছুই বাস্তবিক পক্ষে নেই বা প্রমাণসিদ্ধ নয়। এ কল্পনাগুলি তার জীবনচর্যায় অকিঞ্চিৎকর, নিরর্থক এবং বাস্তবে নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ আস্তিক ও নাস্তিক দুজনেরই তত্ত্বগত অবস্থান ইতিবাচক, এবং স্পষ্ট; শুধু সংশয়ীর অবস্থান ইতি-নেতিবাচক, অতএব অস্পষ্ট। অজ্ঞেয়বাদীর অবস্থানও ইতি-নেতির মধ্যবর্তী, কিন্তু স্পষ্ট। সে বলে, কিছু আছে কি না বা কেউ আছে কি না আমি জানি না, জানা যায়ও না। তার জ্ঞানে দোলাচলতা নেই, থাকা-না-থাকা সম্বন্ধে তার না জানাটা খুবই দ্ব্যর্থহীন: সে নিশ্চিত জানে যে, সে নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানে না। থাকা ও না-থাকার উভয়মুখী সম্ভাবনাকে সে স্বীকার করে মাত্র; এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে সে নিশ্চিত ভাবে জানে না, কিছু আছে কি না, থাকলেও জানা সম্ভব কি না। ঠিক এই অবস্থান প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে কোথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে 'কে জানে' এ ধরনের বাক্যাংশ থেকে অজ্ঞেয়বাদের আভাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে স্পষ্ট আস্তিক্য, স্পষ্ট নাস্তিক্য এবং স্পষ্ট সংশয়ের প্রকাশই বেশি পাওয়া যায়।

গ্রিসের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষেও যজ্ঞক্রিয়াই ধর্মাচরণ ছিল বলে যজ্ঞে ও তৎসংশ্লিষ্ট দেবদেবীতে অবিশ্বাসই ছিল নাস্তিক্য। নাস্তিক্য খুব ব্যাপক শব্দ, এক দিকে কোনও একজনের মনে বিশ্বাসের জগতের সমগ্র ব্যাপারটা নিয়ে আমূল অবিশ্বাস জন্মায় কদাচিৎই। কিন্তু খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত ব্যাপারে, যজ্ঞপ্রক্রিয়ায়, বিশেষ বিশেষ দেবতা সম্বন্ধে, তাঁদের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, কার্যক্ষমতা, যজ্ঞক্রিয়ার যাথার্থ্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস বহু মানুষের মনেই জাগতে পারে। এ ধরনের সংশয় সংহিতা ব্রাহ্মণে, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বহুবার ব্যক্ত হয়েছে; এগুলি সংশয়, যদিও এর মধ্যে কিছু কিছু নাস্তিক্যের ধারঘেঁষা। নেম ভার্গব যখন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র সম্বন্ধে অসংশয়িত উচ্চারণ করেন, ইন্দ্রকে কে জন্মাতে দেখেছে? বলছেন, ইন্দ্র বলে কেউ নেই— তখন সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খণ্ড সংশয় থেকে অখণ্ড নাস্তিক্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কারণ তখন ধর্ম হল যজ্ঞ এবং যজ্ঞের মুখ্য দেবতাই ইন্দ্র, কাজেই 'ইন্দ্র নেই' বলা সংশয়কে ছাড়িয়ে নাস্তিক্যের পর্যায়ে চলে যায়।

এ দেশে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব থেকেই সাহিত্যে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি নানা অংশ নিয়ে সংশয়ের প্রকাশ দেখা গেছে। বেদে যা আছে তার বাইরেও অন্যান্য সংশয়ের প্রকাশ গণমানসে নিশ্চয়ই ছিল, কারণ বেদে সমগ্র গোষ্ঠীর বিশ্বাস বা সংশয়ের সমস্ত অনুপুঙ্খ নিশ্চয়ই বিধৃত নেই, মোটের ওপর বেদ জনসাধারণের ধর্মাচরণ ও তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পটভূমিকার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্য। তবু তার মধ্যেও অবিশ্বাসের নানা চিহ্ন আছে— দেবতাদের স্বরূপ, আচরণ, অভিপ্রায়, ক্ষমতা এবং যজ্ঞকর্মের যাথাযথ্য সম্পর্কে সন্দেহে। সংহিতা থেকে উপনিষদে পৌঁছোনোর পথ-পরিক্রমায় সংশয়গুলি বাড়ছিল— সংখ্যায়, প্রকারে, গভীরতায় এবং ব্যাপকতায়। যদিও বিশ্বাস ও তত্ত্বের বিবর্তনের নিজস্ব ক্রম থাকে, তবু মোটের ওপরে জীবন ও জীবিকার ভিত্তি— উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে তার একটি অঙ্গাঙ্গি যোগ থাকে, কারণ উৎপাদন অর্থাৎ সমাজের অবগঠন বহুলাংশে সমাজের মানসিক অধিগঠনকে নিরূপণ করে। মানুষের অবচেতনে প্রত্যাশা থাকে যে, 'তার জীবনের ভিত্তিগত গঠনে পুরো অথবা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলি তার বোধগম্য হবে এবং তার কর্মপ্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।'[৫] এই প্রত্যাশাকে চূর্ণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা। মানুষ আবিষ্কার করে যে, তার জীবনের অবগঠনের অনেকটাই তার বোধের এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তখনই দেখা দেয় সংশয়— তার জানা জগতের অংশবিশেষ সম্বন্ধে এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে; সে সংশয় সমগ্র জগৎ সম্পর্কে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রিসে তার্কিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য, 'যে পৃথিবীটা সকলের পক্ষেই একই রকমের সেটি কোনও দেবতা বা মানুষ সৃষ্টি করেনি; সেটি বরাবরই ছিল, এখনও আছে এবং চিরকালই থাকবে।'[৬] এমন কথা মনে করলে সৃষ্টিকর্ম ও সৃষ্টিকর্তার প্রশ্নটা চলে যায়, থাকে শুধু সৃষ্টিটাই, এবং সেটা প্রত্যক্ষ অতএব সংশয়াতীত।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংশয়

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ছাড়া আর কোনও দর্শনপ্রস্থানই প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেনি। এরাও স্বপ্নকে অলীক ও অবাস্তব এবং জাগ্রৎ অভিজ্ঞতাকে বাস্তব বলে স্বীকার করে প্রত্যক্ষকে অন্তত একটা আপেক্ষিক স্বীকৃতি দিয়েছে। ভূতবাদী (যারা প্রত্যক্ষ জীবন ও জীবিতকেই স্বীকার করে, আত্মাকে নয়), পরমাণুবাদী (বৈশেষিক, যারা পরমাণুকে সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদান বলে), লোকায়ত, সাংখ্য ও ন্যায়-প্রস্থান সকলেই প্রত্যক্ষকে অবিসংবাদিত সত্তা বলে স্বীকার করে। বেদের যুগে দৃশ্য বা দৃষ্ট বস্তু নিয়ে কারও কোনও সংশয় ছিল না।

৫. 'The assumption that all or the most significant features of these structures are knowable and controllable by human effort...' —Guy E Swanson, p 188

৬. 'The World which is the same for all, has not been made by any god or man: it has ever been, is now, and ever shall be.. ' Orphic Fragments, 334 EBc 30, quoted in George Thomson. Vol. II, p. 227

যা অতীতে ঘটেছে বলে মনে করা হত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচরে, সেই সব ব্যাপার নিয়ে সংশয় ছিল, যেমন বিশ্বসৃষ্টি বা দেবতাদের উৎপত্তি।

এ ছাড়া সংশয় ছিল যজ্ঞ নিয়ে; কোন্ যজ্ঞে কী ফল পাওয়ার কথা তা বলাই ছিল। যজ্ঞ করেও প্রত্যাশিত ফল না পেলে স্বভাবতই সংশয় জাগে যজ্ঞের প্রক্রিয়া, দেবতাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা, দেবতাদের যজ্ঞফল দেওয়ার ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং শেষত, তাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও। অবশ্যই, কাকতালীয় হিসেবে কিছু কিছু যজ্ঞের ফল পাওয়া যেত। কাজেই এ নিয়ে সংশয় ব্যাপক, গভীর বা সার্বত্রিক হতে পারত না। তবু যত দিন যাচ্ছিল তত নিষ্ফল যজ্ঞের সংখ্যা বাড়ছিল এবং সংশয়ও বাড়ছিল। যজ্ঞে ফল দেওয়ার প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব দেবতাদেরই, সেই ভরসাতেই অত স্তোত্র হব্য দিয়ে তাঁদের আরাধনা। 'ফল না হলে জন্মায় একটা আততি (tension); (সৃষ্ট হয়) দিব্য অঙ্গীকার এবং এর প্রকাশ্য ব্যর্থতা, অন্য আততিটি হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর দিব্য পথনির্দেশ ও মানবিক স্বাধীনতা। মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা... পরিনির্দিষ্ট ছক ও বিশৃঙ্খলা, দিব্য নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা— এ দুটি দ্বান্দ্বিকতা।'[৭] দৈব শৃঙ্খলা, দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ এ সব মানতে হলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এ সবের ব্যত্যয়, অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা, নানা ধরনের বিপর্যয় এ সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; ফলে মানুষ সুপরিনির্দিষ্ট দিব্য আকল্পের পৃথিবীতে দেবতাদের প্রতিশ্রুত যজ্ঞফল না পেলে ধাক্কা খায়, তার জানার জগতে এর ব্যাখ্যা মেলে না, তখনই জাগে সংশয়।

শুধু প্রত্যাশিত যজ্ঞফল না পাওয়া নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় নানা বিরুদ্ধ, ক্ষতিকর অভিজ্ঞতাও তো আছে: খরা-বন্যা-পঙ্গপাল, ব্যাধি-জরা-মৃত্যু, প্রিয়বিচ্ছেদ, ইষ্টলাভে বঞ্চনা, ইত্যাদি বিভিন্ন অপ্রীতিকর তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষ বুঝে যায় যে, বিশ্ববিধান তার পক্ষে সততই মঙ্গলময় নয়, প্রায়ই দুঃখজনক। দেবতা-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপ্রকৃতির ওপরে ভরসা রাখা চলে না। 'প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ যদি সর্বব্যাপী হয়, তা হলে যা কিছু ক্ষতি ও যন্ত্রণা ঘটায় তাকে (এ ভাবে) ব্যাখ্যা করতে হবে যে, সব কিছু জানা থাকলে সেটিকে মানুষের পক্ষে হিতকর বলে মানতে হবে।'[৮] অথচ মানুষের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে, কাজেই সর্বমঙ্গলময় বিধাতা, বিধাতৃগোষ্ঠী অথবা সর্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধান কোনওটাই নিজের উপলব্ধিতে বা বুদ্ধিতে মানুষ পায় না; তাই জাগে সংশয়, যার একটি পরিণতি নাস্তিক্য। সংশয়মাত্রই নাস্তিক্যের জন্ম দেয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বহু মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে বহু যজ্ঞের নিষ্ফলতা, বহু সামাজিক বঞ্চনা, দারিদ্র্য, অত্যাচারের পুঞ্জিত স্মৃতি কোনও কোনও চিন্তাশীল মানুষের মনে

৭. '(the tension) between the divine promise and its ostensible failure to be fulfilled; the other is a tension between God's will, His providential guidance and human freedom, the refractory nature of man... the double dialectic between design and disorder, providence and freedom.'— Robert Alter, p 141

৮. 'If Nature's providence is all inclusive, then any event which causes injury or suffering has to be integrated as something which, if all the facts were known, would be recognized as beneficial by man.'— A.A Long, p 170

সৃষ্টি করত সমস্ত বিশ্ববিধান সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা; বিধাতা বা যজ্ঞে-আরাধ্য দেবদেবীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাপক সর্বাত্মক সংশয়ের একটি পরিণতি নাস্তিক্য।

সংশয় ও নাস্তিক্যের অন্তর্বর্তী একটি অবস্থার নাম অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism), অর্থাৎ বিধাতা বা দেবদেবীরা আছেন কি না সে-বিষয়ে নিজের জ্ঞানের ও বিশ্বাসের অভাব, এবং জ্ঞানের এই অভাবের প্রকাশ্য স্বীকৃতি: 'কেউ কোথাও আছেন কি না জানি না, অর্থাৎ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে কিন্তু আমি নিশ্চিত নই।' এ অবস্থা সংশয়ের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে, কিন্তু পূর্ণ নাস্তিক্য এটা নয়। গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের ভাষায়: 'দেবতাদের বিষয়ে আমি জানতে পারি না, তাঁরা আছেন কী নেই, কিংবা কেমন তাঁদের আকৃতি; কারণ জ্ঞানকে প্রতিহত করে অনেকগুলি বিষয়: জ্ঞেয় বিষয়টির দুর্বোধ্যতা এবং মনুষ্যজীবনের স্বল্পায়ুতা।'[৯] অজ্ঞেয়বাদের ভিত্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এতে দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে; প্রথমত, নিশ্চিত বিশ্বাসের অভাবে মর্মযন্ত্রণা এক ধরনের আত্মিক নিরালম্বতা; দ্বিতীয়ত, সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কেই অনীহা ঔদাসীন্য। অর্থাৎ আমি যখন খেয়েপরে ভাল ভাবেই বেঁচে আছি তখন ভগবান থাকুন বা না থাকুন আমার কিছু এসে যায় না। এ ঔদাসীন্য সংশয়ের অন্তরালেও প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, নাস্তিক্যেও থাকতে পারে। কিন্তু যে-মানুষ জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে গভীর ভাবে দ্বিধাগ্রস্ত এবং এ দ্বিধায় যার মর্মযন্ত্রণা আছে তার পক্ষে ঔদাস্য তো সম্ভব নয়, তার পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত জীবনমরণের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। তবে সংশয়, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্য এ তিনটির ভিত্তিভূমি শুধু জ্ঞান নয়, বিশ্বাসও, যেটি উপলব্ধির স্তরে অনুভূতির প্রান্তবর্তী। এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের দুইয়েরই সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। এবং ঠিক এই কারণেই এই পুরো ব্যাপারটাই জীবনের গভীরতম অংশ থেকে উদ্ভূত, এবং মর্মের স্পর্শকাতর তন্তুগুলিতে প্রবল যন্ত্রণার স্পন্দন তোলে। বেঁচে থাকার মানে কী, এ নিয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ তীব্র ভাবে অনুসন্ধিৎসু। এ সন্ধান শুধু বুদ্ধিগত হলে তা এমন মর্মন্তুদ হত না, শুধু আবেগনির্ভর হলেও হত না, কিন্তু যেহেতু আবেগ এবং মনন এতে সমান ভাবে সম্পৃক্ত, তাই এ ব্যাপারটা সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া এত জরুরি। আবেগ (emotion), মনন (intellection) এ দুটিই তো ইচ্ছাশক্তি (volition)-কে প্রণোদিত করে, অর্থাৎ মানুষ তার সত্তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় যে-গভীর স্তর থেকে সেখানে সে হয় বিশ্বাসী, নয় অজ্ঞেয়বাদী, নয় নাস্তিক। এবং এ তিনটি বিকল্পই নিরূপণ করে তার বেঁচে থাকার অর্থের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা কী। যজ্ঞের যুগে তার জীবনের সমস্ত সংঘাতের, অভাবের, অভিযোগের প্রতিকার চাইবার জায়গা ছিল দেবতাদের অনুগ্রহ এবং সেখানে পৌঁছোবার পথ ছিল যজ্ঞ।

৯. 'About the gods, I am not able to know whether they exist or do not exist, nor what they like in form, for the factors preventing knowledge are many: the obscurity of the object, at the shortness of human life.'— Protagorus for 4 *The Sophist*

যজ্ঞের যুগের শাস্ত্র রচনার শেষ পর্যায়ে আর্যাবর্তে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। শাস্ত্রগুলি রচিত হচ্ছিল আর্যাবর্তে, গঙ্গার উত্তরে হস্তিনাপুরে। সেখানে কৌরব রাজা নিচক্ষুর আমলে একটি প্রকাণ্ড প্লাবনে আর্যাবর্তের অনেক অংশই বিধ্বস্ত হয়ে যায় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে। সেই সময়ে যজ্ঞ-সম্পর্কিত শাস্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং সংহিতার শেষাংশ রচিত হচ্ছিল। ওই সময়ে রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে যমুনার পারে কৌশাম্বীতে সরিয়ে আনা হয়। 'এ ঘটনার পরে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সৃষ্টিশীল পর্যায়ের যেন অবসান ঘটে; (এর পরেও) আচার্য পরম্পরার নাম পাওয়া যায় এবং নিশ্চয়ই কিছু কিছু বৈদিক শাস্ত্রাংশের পুনরনুশীলন চলছিল... কিছু স্বতন্ত্র রচনা যেন নিবদ্ধ রইল গৌণ শাস্ত্রচর্চায়, যজ্ঞকর্ম, অর্থশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও জ্যামিতিতে।'[১০] এর অর্থ, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্ব পরিনিষ্ঠিত হয়ে যায়, খুব বড় রকমের কোনও পরিবর্তন আর ঘটেনি। ছোট ছোট যজ্ঞের অঙ্গে সামান্য আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। কিছু কিছু ছোট যজ্ঞ উদ্ভাবিতও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত গোষ্ঠীর পক্ষে অনুষ্ঠিত যে সব বৃহৎ শ্রৌতযাগ, রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, অগ্নিচয়ন, সত্র— এগুলি এর আগেই তাদের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক রূপ ও হোতার আবৃত্তি, উদ্‌গাতার গান এবং অধ্বর্যুর উপাংশু (মৃদু স্বরে) আবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তার অর্থ, এর পরে যে সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছিল সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। এর ফলে মানুষ একটু দূর থেকে মিলিয়ে দেখতে লাগল যজ্ঞ থেকে যে-ফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায় কি না। যখন হিসেব মিলছিল না তখন নানা ভাবে নানা সংশয় মানুষের মনে উদ্রিক্ত হচ্ছিল এবং তৎকালীন ও তার পরবর্তী শাস্ত্রে— সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে— উচ্চারিত হয়ে স্থায়ী ভাবে বিধৃত রইল।

পরের যুগে জ্ঞানকাণ্ডে, আরণ্যক উপনিষদে পূর্বতন সংশয়ের উত্তর আর মিলল না, বরং যজ্ঞ তখন ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও ক্রমশ যেন গৌণ একটি ধর্মক্রিয়ায় পর্যবসিত হল এবং আত্মব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে চর্চাই হয়ে উঠল মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে পরিবর্তিত সমাজজীবনের দ্বারা প্রভাবিত মননজগতে যে সব নতুন সমস্যার উদয় হল, তার মধ্যে জন্ম নিল নবতর সংশয়। এগুলির সঙ্গে পূর্বতন সংশয়ের অনেক পার্থক্য চোখে পড়ে। বিশেষ কোনও দেবতা, তার উদ্ভব, আচরণ, ক্ষমতা, অভিপ্রায় বা যজ্ঞকর্ম ও তার যাথাযথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন আর তেমন নেই। তার বদলে এবং বিশ্বচরাচর মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং এগুলির সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন অনেক বেশি। তা ছাড়া— নতুন কিছু সংশয় আসে আত্মা ও ব্রহ্ম এবং তাদের সম্পর্ক নিয়ে, মরণোত্তর অবস্থান নিয়ে (অবশ্য এ বিষয়ে

১০. 'After this event the creative period of Brahmanism appears to have come to and end. lines of teachers are recorded and there was clearly some revision of Vedic texts... but original composition seems to have been confined to the subsidiary studies. actual law, linguistics, astronomy and geometry.'— A K. Warder. p 28

কিছু সংশয় আগেও দেখা গেছে)। এখন সমাজপতি, শাস্ত্রকার ও পুরোহিতদের সমবেত চেষ্টায় মানুষের জীবনদর্শন ও ধর্মাচরণের লক্ষ্য একেবারে বদলে যায়: পরলোকের অস্তিত্ব এখন স্বীকৃত, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ জানে মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না, আত্মা থাকে, অতএব পরলোক আছে, স্বর্গ, নরক ও পুনর্জন্ম আছে। স্বভাবতই এখনকার প্রশ্ন মুখ্যত এইগুলি নিয়েই। এই সব উপাত্ত নিয়ে যে-বিশ্ববিধান লোকের মনে দেখা দিল, এ পর্যায়ের প্রশ্নগুলি সেই নিয়ে এবং সে-বিশ্ববিধানের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার বস্তুনিচয়— শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও বহির্বিশ্ব, ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একাধিকবার পড়ি, ' "মৃত্যুর পর চেতনা নেই সে কথা বলছি" এমন বলেন যাজ্ঞবল্ক্য।'[১১] এটি সংশয়ের উক্তি নয়, নাস্তিক্যের; কঠোপনিষদে নাস্তিকের একটি সংজ্ঞা হল, যে পরলোকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। এখন উপনিষদের বিশিষ্ট তত্ত্বগুলির এক মুখ্য প্রবক্তা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি স্বয়ং বলছেন, মৃত্যুর পরে আর জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানই যদি না থাকে তো আত্মা থাকলেও তেমন আত্মা সুখ-দুঃখের অনুভবের বাইরে। কাজেই স্বর্গনরকও তেমন আত্মার পক্ষে নিষ্ফল, পুনর্জন্মও সেই কারণে নিরর্থক। অথচ এই যাজ্ঞবল্ক্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই একটির পর একটি উপমা সাজিয়ে আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমা বর্ণনা করেছেন, নানা ভাবে আত্মব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। আবার তিনিই বলছেন, মৃত্যুর পরে চেতনা থাকে না। এই যাজ্ঞবল্ক্যই (এমন মতও অবশ্য আছে যে, একাধিক যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রবক্তা) শতপথব্রাহ্মণে অনেক কারণ দেখিয়ে গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, এবং বলেই প্রায় এক নিশ্বাসেই বলেছেন, 'আমি কিন্তু খাব যদি রান্নাটা ভাল হয়'। ইনি ব্রহ্মোদ্যে ব্রহ্মোদ্যে আত্মব্রহ্ম-তত্ত্ব নিয়ে বহু পণ্ডিত ও জিজ্ঞাসুর সঙ্গে তর্ক করেছেন, দৃশ্যমান জগৎ মায়াস্বরূপ ঘোষণা করেছেন, আবার জনকের সভায় উপস্থিত হলে রাজা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, 'কী মনে করে ঠাকুর, ব্রহ্মজ্ঞান না গোধনের জন্যে এসেছেন?' তখন অসংকোচেই বলেছেন, 'দুটোরই জন্যে, মহারাজ।' জনক ব্রহ্মিষ্ঠের (ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের) পুরস্কার হিসেবে যে বহুসংখ্যক সোনায়-মোড়া শিং গাভি সাজিয়ে রেখেছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য বিনা ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় পরিতর্কে ওই গাভিগুলি নিয়ে বাড়ি চললেন। সমবেত পণ্ডিতরা প্রশ্ন করলে বললেন, 'যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তাঁকে আমরা নমস্কার করি, কিন্তু আমরা এখন এখানে সকলে গাভীর কামনায় এসেছি।' কথাটা সত্যও ছিল, তাই প্রতিপক্ষ তেমন আপত্তিও করেনি, তবু তর্ক হয়েছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ উপনিষদের বিশিষ্ট আত্ম-ব্রহ্মতত্ত্বের তিনিই মুখ্য প্রবক্তা, তা সত্ত্বেও ঐহিক প্রয়োজন— গাভি অর্থাৎ বিত্ত সম্বন্ধে তাঁর কোনও ঔদাসীন্য নেই। জনকের কাছে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুও বটে আবার গোধনপ্রার্থীও বটে, গোমাংসভক্ষণ সমাজে নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, 'আমি কিন্তু খাব'। অর্থাৎ তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনে

---

১১. ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ইতি আরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহদ. (২:৪:১২; ৪:৫:১৩)

অসংগতি তাঁকে পীড়া দেয় না। তাই উপনিষদের আত্ম-ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করেও বলেন, মৃত্যুর পরে চেতনা থাকে না। বলছেন দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের স্বরে, ঘোষণার ভাষায়। এই উক্তিতে আত্মা পরলোক জন্মান্তরের সযত্ন রচিত ইমারত যে বিধ্বস্ত হয়ে যায় তা কি তিনি জানেন না? জানেন, কিন্তু তবু যে বলছেন এটা তাঁর তত্ত্ব নয়, উপলব্ধি বা মননজাত তত্ত্ব, একে তিনি অস্বীকার করেন কী করে? মরণোত্তর আত্মার সংজ্ঞা তাঁর যুক্তিবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, তাই দৃঢ়স্বরে তা অস্বীকার করলেন। সমাজের বহু মনীষীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এই রকম ছিল: কোথাও প্রত্যয়, কোথাও সংশয়, কোথাও স্পষ্ট নাস্তিক্য।

শুধু বৃহদারণ্যক উপনিষদেই নয়, সব-কটি উপনিষদ মিলেও একটি সুসংহত দর্শন একেবারেই পাওয়া যায় না। 'উপনিষদগুলি স্বতন্ত্র ভাবে অথবা সমগ্র ভাবে কোনও সম্পূর্ণ, সংহত কিংবা যুক্তিপূর্ণ ভাবে সংগঠিত বিশ্বতত্ত্ব উপস্থিত করে না।'[১২] একটু ভাবলেই বোঝা যায় উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে, প্রায় দু-আড়াইশো বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে, কালে, বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার সংকলন এই উপনিষৎ সাহিত্য; ফলে এর মধ্যে যুক্তির সংহতি খোঁজা বাতুলতা। যে যার অভিজ্ঞতা অকুণ্ঠ ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁরা অধিকাংশই আচার্য ও শিক্ষার্থী; তাঁরা জানতেনও না যে তাঁরা উপনিষদ রচনা করছেন এবং তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞাও করেননি যে, নতুন একটি দর্শনপ্রস্থান তাঁরা সৃষ্টি করতে বসেছেন। ফলে বহু পরস্পরবিরোধী উক্তির সমাহার এর মধ্যে রয়ে গেছে। দেশে চিন্তার জগতে আত্মা, পরলোক ও জন্মান্তরকে অবলম্বন করে যে নতুন হাওয়া বইছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা প্রত্যেকে নিজের উপলব্ধি ও মনন গ্রন্থনা করে রেখে গেছেন। তাতে সৌষম্য ও সংহতি বজায় রইল কি না সেটা লক্ষ্য করার দায়ও তাদের ছিল না, কারণ খুব সম্ভব তাঁদের সকলে পরস্পরকে চিনতেনও না। যজ্ঞ থেকে মানুষের মন সরে গেছে, এমনই একটা পরিবেশে মনীষীরা সমাজে সংহতি রক্ষার জন্যে যজ্ঞের একটা বিকল্প নির্মাণ করছিলেন।

যুক্তির কাঠামো গড়ে উঠেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর পরে শংকরাচার্যের হাতে। উপনিষদে যা পাই তা তত্ত্বের দিকে শিথিল, পরস্পর-অসংলগ্ন, কখনও-বা পরস্পরবিরোধীও। তাই তখন যাঁরা জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন তখন সে-প্রশ্নগুলিও কোনও স্পষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে উদিত হয়নি, ফলে সমগ্র উপনিষদে তত্ত্বের দিকে নানা অসংগতি রয়ে গেছে এবং এইটেই স্বাভাবিক। নানা বিষয়ে নানা অঞ্চলে ও সময়ে বিভিন্ন লোকের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। এগুলি পরস্পর-অসম্পৃক্ত, একই ধরনের প্রশ্ন বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রশ্নের মধ্যে যেগুলি যজ্ঞ বা যজ্ঞীয় দেবতা সম্পর্কে নয়, সেগুলি এই বিশেষ যুগের চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত, জ্ঞানকাণ্ডের নিজস্ব চরিত্র সেগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ সবের মধ্যে যা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় তা হল, প্রশ্নের বৈচিত্র্য, সংখ্যা ও কৌতূহলের ব্যাপক বিস্তার। সংশয় শুধু একটি স্বাভাবিক মননপ্রক্রিয়াই নয়; সংশয়, অবিশ্বাস ও নাস্তিক্য মানুষের

১২. 'The Upanisads either individually or as a whole do not offer a complete, consistent and logically systematized conception of the world.'— Hajime Nakamura, p. 79

জীবনে একটি যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাও বটে। যখন কোনও সংশয় থাকে না, নিজের দেহমন ও বহির্জগৎ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সর্বজনস্বীকৃত ছক মানুষ মেনে নিতে পারে তখন সে-অবস্থাটা মানুষের মানসিক শান্তি ও স্থৈর্যের অনুকূল, জীবন সম্বন্ধে একটা আশ্বাস ও স্বস্তি খুবই আরামের অবস্থা। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাওই সম্ভবত সামগ্রিক ভাবে এ-অবস্থা সত্য ছিল না; কিছু সজাগ মনের মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে, সে সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি, ফলে অনুত্তরিত প্রশ্ন যন্ত্রণা দিয়েছে সংশয়ে, বিশ্বাসহানিতে, নাস্তিক্যে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে ইহুদি ধর্মের সৃষ্টিশীল পর্বের অবসান ঘটে। এই সময়ে নানা সংশয়, প্রশ্ন উচ্চারণ করেন মনীষীরা। এজরা ও নেহেমায়াহ এঁদের অন্যতম। এজরা ভগবানকে অনুযোগ জানিয়েছেন, 'তুমি কাউকেই দেখিয়ে দাওনি তোমার আচরণ কেমন করে বুঝতে হয়।'[১৩] যাঁর আচরণই দুর্বোধ্য, হীনবল ক্ষীণবুদ্ধি মানুষ যদি তা অবধারণ না করতে পারে তবে তা নিয়ে মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না। যে-ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টিকর্তা বিশ্ববিধানের নিয়ন্তা, তিনি মানুষকে এনে ফেলে রেখেছেন এমন এক পৃথিবীতে যেখানে কেন কখন কী ঘটে তা মানুষের বোধের অতীত। অথচ মানুষ বুঝতে চায় ও বারে বারে অন্ধগলিতে মাথা ঠুকে মরে। তাই এই অনুযোগ, কেন মানুষকে বুঝিয়ে দিলে না কোনও দিন, এই ভুবন যে-নিয়মে চলে তার প্রকৃতি কী? মানুষ বুঝতে চাইছে, পারছে না; কারণ তুমি দুর্বোধ্য আচরণও করবে আর সে-নিয়ে মানুষের মনে বহুবিধ প্রশ্ন যখন উদিত হবে তখন তুমি তাকে কিছুই বুঝিয়ে দেবে না— কী হয়, কেমন করে হয়, তা কেন তেমন ভাবে ঘটে? চারিদিকে তাকিয়ে মানুষ কোথাও তার সংশয়ের সমাধান খুঁজে পায় না। এমন বোধাতীত ভুবন-ব্যবস্থায় মানুষ কী রকম অসহায় এবং মনের জগতে কী পরিমাণ পীড়িত ও বিধ্বস্ত তা কি তুমি জান না? এ যেন 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে/আমায় বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'। এজরার অনুযোগ আরও গভীর, এমনই দুর্বোধ্য বিশ্ববিধানের মধ্যে যদি আমাকে ফেলে রেখে দেবে, তা হলে, স্রষ্টা, আমাকে এমন করে সৃষ্টি করনি কেন যেন আমার মধ্যে কোনও প্রশ্ন না জাগে? 'প্রভু আমার, আমি তোমাকে মিনতি করছি (জানবার জন্যে), কেন তুমি আমার মধ্যে বোধশক্তি দিয়েছিলে?'[১৪] এই মর্মযন্ত্রণা থেকে বেদের মনীষীরাও প্রশ্ন করছেন এবং অনুরূপ নিরুত্তর স্তব্ধতার সম্মুখীন হয়েছেন।

সর্বত্রই প্রশ্ন, সংশয়, নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্য সমাজবিধায়কদের উষ্মার উদ্রেক করেছে। কেন? কারণ তাঁরা ভেবেচিন্তে যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন জীবনের, বিশ্ববিধানের, প্রকৃতির, মানবেদেহের এবং যে বিধান দিয়েছেন মানুষের সম্ভাব্য বিপদ-আপদের থেকে মুক্তির জন্যে, যে-পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে এনে সুস্থ, সুখী, দীর্ঘজীবন লাভ করবার জন্য, মানুষের সংশয় স্পষ্ট উচ্চারিত হলে সে-বিধানের ভিত টলে

১৩. '(Thou) has not shown anyone how thy way is to be comprehended.'— Ezra 3 3

১৪. 'I beseech you, my lord, why have I been endowed with the power of understanding.'— Ezra 4:22)।

যায়। পরবর্তীকালে, যখন সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান চললেও বহু মানুষের মনে যজ্ঞ সম্বন্ধে অনীহা দেখা দিয়েছে তখন সমাজে তৎকালীন শাস্ত্রকাররা অন্য কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পক্ষে এই নতুন তত্ত্বগুলি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। দেখতে পাচ্ছি রাজা, রাজন্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য কিছু ব্রহ্মসন্ধানী ব্যক্তিই এই নতুন তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আগ্রহী। এই কালপর্বে সংশয় উচ্চারণ করেছেন এঁরাই, সমাধান দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন এঁরাই, তবে প্রায়ই প্রশ্নের সঙ্গে সমাধানের কোনও সংগতি থাকেনি। প্রশ্নকর্তারা কখনও-বা ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়াও জনমানসে সঞ্চরমাণ অন্য প্রশ্নও উচ্চারণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত শ্রমিকরাও আছেন, তাঁরা নিজেরা যে-প্রশ্ন করলে ওপরমহলে উত্তর দেওয়ার কোনও তাগিদ থাকত না, সেই প্রশ্নই কখনও কখনও অন্যান্য মনীষীরা করেছেন। যেমন নচিকেতা। উত্তর বা সমাধান বহু ক্ষেত্রেই সমাজের সুবিধাভোগী, বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে; যেমন জন্মান্তরবাদ। যে-মানুষ দুঃখে, অভাবে, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ইহজীবন যাপন করে গেল, তার পক্ষে জন্মান্তর তো অভিশাপ। যতই তাকে বোঝানো হোক, এ জন্মে শাস্ত্র-অনুমোদিত ধর্মাচরণ করলে পরজন্মে সুখী জীবন পাওয়া যাবেই। তবু তার এ সংশয় ঘোচে না যে, পরজন্ম এ জন্মেরই পুনরাবৃত্তি হতে পারে, এবং সে-সম্ভাবনা তার পক্ষে ভয়াবহ আতঙ্কের। তা ছাড়া পরজন্মের অস্তিত্বটা তো সংশয়িত। এদের হয়ে কেউ কেউ বলেছেন, 'এ জন্ম থেকে পরজন্মে যাওয়ার কোনও পথ নেই', কিংবা 'মৃত্যুর পরে কোনও চেতনা থাকে না'। এ সব সংশয় সমাজের বিধায়কদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং অপমানকর: তাঁরা যে-বিধান ও যে-সমাধান দিয়েছেন, সংশয়ী তা মেনে নিচ্ছে না, অতএব সে পাপী। সমাজের প্রত্যন্ত দেশে তখন বহু নামে যজ্ঞবিরোধী, বেদবিরোধী নানা প্রস্থানের উদয় হয়েছে, তারা বেদ ও যজ্ঞ বাদ দিয়েও দিব্যি আছে। যেহেতু যজ্ঞকারীদের তারা উপেক্ষা করেছে, তাই সমাজও তাদের নিন্দা করেছে।

লোকায়ত সংশয়

তখনকার সমাজের বোধহয় সবচেয়ে বড় নিন্দাসূচক শব্দই ছিল 'নাস্তিক'। নাস্তিক বেদ স্বীকার করে না, পরলোক ও পুনর্জন্ম স্বীকার করে না এবং কেউ কেউ আত্মাও স্বীকার করে না। এই শেষোক্তারা চার্বাকপন্থী, এরা বলত, 'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ'। অর্থাৎ স্বর্গ নেই, মোক্ষ নেই এবং পরলোকে কোনও আত্মা নেই। উপনিষদে ক্ষীণ ভাবে মোক্ষের কথা আছে, কিন্তু স্বর্গ আত্মা এবং পরলোকের কথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে আছে; অতএব বেদের কিছু মৌলিক তত্ত্বকে এরা অস্বীকার করল। যারা এ সব বিশ্বাস করে, তাদের সম্বন্ধে এরা বলল, তারা 'বুদ্ধিপৌরুষহীন', অর্থাৎ তারা নির্বুদ্ধি এবং নিষ্পৌরুষ অর্থাৎ কাপুরুষ। কাপুরুষ বা নির্বুদ্ধি কেন? কারণ তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে না বলেই শাস্ত্রকাররা জীবন সম্বন্ধে যা তাদের বুঝিয়েছেন তাই তাঁরা মেনে নিয়েছে। শুধু চার্বাক নয়, বার্হস্পত্য, জৈন, বৌদ্ধ এবং আজীবিকরাও বেদের বহু মৌলিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে

পরিহার করে নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত করেছেন। যজ্ঞের উপযোগিতা এঁরা কেউই মানেননি, এবং বেদ মূলত যজ্ঞনির্ভর। মুণ্ডক উপনিষদেই একবার মাত্র স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে যে যজ্ঞগুলি অদৃঢ় নৌকো, পারে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তাদের নেই। এ ছাড়া পুরো জ্ঞানকাণ্ডে কিন্তু ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, সমাজে যজ্ঞ চলছে এবং চলবে। তারই মধ্যে এক বিরুদ্ধশক্তি নানা নামে, নানা প্রস্থানে চিহ্নিত হয়ে সমাজে বিদ্যমান। কৌতুকের বিষয় হল, অবৈদিক প্রস্থানগুলিকে পরবর্তী সাহিত্যে সাধারণ ভাবে লোকায়ত বলা হয়েছে। লোকায়ত শব্দের অভিধানগত অর্থ, 'লোকে আয়ত' অর্থাৎ যা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যজ্ঞের পরে ফলের অপ্রাপ্তি যজ্ঞযুগে সংশয়ের সবচেয়ে বড় ভিত্তি রচনা করেছিল। তারই সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুষ্মান মানুষের অভিজ্ঞতা যখন তার অন্তর্নিহিত ন্যায়ের বোধের বিপরীত হয়, যখন সে দেখে দুর্জনের প্রতিপত্তি বাড়ছে, সজ্জন দু' বেলা অন্নসংস্থান করতে পারছে না, যে-মানুষ বিবেকবান, সৎ-কর্মচারী, সে নিরন্তর দুঃখই পাচ্ছে, তখন তার জীবন ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে এবং পূর্বতন 'ঋত'র বোধের সম্বন্ধে অন্তর্নিহিত প্রত্যাশা গুরুতর ধাক্কা খায়; দেখা দেয় সংশয়। লোকায়ত চার্বাকমত যজ্ঞ, আত্মা, দেবদেবী, স্বর্গনরক, পরলোক ও জন্মান্তর স্বীকার করে না, বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে না। এই মত ও বিশ্বাস লোকে আয়ত বা সমাজে গণমানসে বিস্তৃত ছিল?

এটা স্বীকার করলে বোঝা যায়, শাস্ত্র লোকায়ত মত সম্বন্ধে কেন এত অসহিষ্ণু, কেন চার্বাককে *মহাভারত*-এ (ও পরে *বেণীসংহার* নাটকেও) রাক্ষস বলা হয়েছে। দুর্যোধনের বন্ধু বলা হয়েছে। কেন 'ধার্মিক' ব্রাহ্মণেরা তাকে তাড়া করে বধ করে। লোকায়তিক চার্বাক তা হলে সেই সব কথাই বলেছেন যা জনসাধারণের মনে সন্দেহের আকারে ছিল; তাঁর ভাষায় তা প্রত্যয়ের রূপে প্রকাশিত হল। বোঝা যায় কেন পরস্পরবিরোধী দর্শনপ্রস্থানও (যেমন মীমাংসা, যার অপর নাম পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত, যার প্রতিশব্দ উত্তরমীমাংসা) এবং সব-কটি দর্শনগ্রন্থই চার্বাক মত আগে খণ্ডন করে পরে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর থেকে সূচিত হয় যে, চার্বাক মত আসলে শুধু জনপ্রিয়ই ছিল না; সমাজে এ মতের বহু অনুগামী ছিল, তাই প্রয়োজন হয়েছিল সে-মতকে খণ্ডন করার— যাতে তার প্রসার রোধ করা যায়। মানুষ যখন তার অভিজ্ঞতায় ও মননে স্বর্গনরক, দেবদেবী, আত্মা, পরলোকের অস্তিত্বের কোনও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ না পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়, তখন বেদে নির্দেশিত তত্ত্বগুলিতে সে আর বিশ্বাস রাখতে পারে না। তখনই তার ওপরে নেমে আসে শাস্ত্রকারদের অজস্র কটুবাক্য এবং অভিসম্পাত। জনসাধারণ্যে যখন এ সব সন্দেহ— যার অন্তিম রূপটি হল নাস্তিক্য— প্রসার লাভ করছিল তখন তাকে 'লোকায়ত' বলে গাল দেওয়া ছাড়া শাস্ত্রকারদের গত্যন্তর ছিল না। লোকে, লোকমানসে এর বিস্তার ছিল বলেই লোকায়তের সম্বন্ধে আতঙ্কটি এত বাস্তব, এবং তাই এত অসহিষ্ণুতা।

মহাভারত-এর শান্তিপর্বে একটি উপাখ্যানে পড়ি:

> এক ধনী বণিক রথে চড়ে যাচ্ছিলেন, পথে এক ব্রাহ্মণ চাপা পড়েন; ব্রাহ্মণটি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে এক শৃগাল তাঁকে নিবৃত্ত করে বলে যে, 'আত্মহত্যা

নাস্তিকোচিত কাজ, এটা করা ঠিক নয়। গতজন্মে সে নিজে নিরর্থক আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত ছিল, হৈতুক অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে সব কিছুর হেতু নির্ণয় করতে চেষ্টা করত, বেদনিন্দক ও নাস্তিক ছিল, তাই এজন্মে শৃগাল হয়েছে।'

এখানে লক্ষ্যণীয় তর্ক, আন্বীক্ষিকী (যুক্তিবিদ্যা) ও নাস্তিকতা এক নিশ্বাসে উচ্চারিত; এগুলি গর্হিত পাপ, যার ফলে বক্তার শৃগালজন্ম হয়েছে। এখানে পুরোহিততন্ত্রের ও শাস্ত্রকারদের উষ্মা যুক্তিবাদের ওপরে— বেদের নিন্দা, নাস্তিকতা, হেতুবাদিত্বের ওপরে। অর্থাৎ পরিষ্কার দুটি বিকল্প: এক দিকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে শাস্ত্রকার পুরোহিতদের নির্দেশ মতো যজ্ঞ করা, দেবদেবী, আত্মা, পরলোক, স্বর্গনরক, জন্মান্তরে চোখ বুজে বিশ্বাস করা; অন্য দিকে এ সব সম্বন্ধে মনে সন্দেহের উদয় হলে যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্যাপারটা যুক্তিগ্রাহ্য কি না, অর্থাৎ বিশ্বসনীয় কি না বুঝে দেখার চেষ্টা করা এবং যদি যুক্তিতর্কে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না মেলে, তবে খোলাখুলি তাকে স্বীকার করা এবং বিশ্বাসের বদলে সংশয় পোষণ করা। শৃগালের উপাখ্যানে উল্লিখিত পাপগুলি একই গোত্রের অর্থাৎ চোখ বুজে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না করে সাধারণ বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক, হেতুবিদ্যা (অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে কার্যকারণ সম্বন্ধের খোঁজ করা) এ সবের ওপরে ভরসা রাখা। এতে সমাজপতিদের এত উষ্মা কেন? বেদনিন্দক, হৈতুক, তর্কাশ্রয়ী মানুষ বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার না করে তার নিজস্ব চিন্তা যুক্তিতর্কের ওপরে ভরসা করে চললে শাস্ত্রকাররা সমাজের সংহতির জন্যে যে-ছকটা তৈরি করেছেন সেটা ঝরে পড়বে। এই অবাধ্যতা তো আধ্যাত্মিক স্তরে একটা প্রতিস্পর্ধা এবং জাগতিক স্তরে অসহযোগ, সমাজের ওপরতলার লোকের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। পৃথিবীতে কোনও সময়ে কোনও সমাজের অধিকর্তারা সাধারণ লোকের আনুগত্যের এই অভাবকে স্বীকার করেননি, উপেক্ষাও করেননি। এখানেও তাই নানা হুমকি, অভিশাপ, পরজন্মে হীন অস্তিত্বের ভয় দেখানো।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-তে তাই সাংখ্য, যোগ ও আন্বীক্ষিকীকে একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুতে আন্বীক্ষিকীকে পরিহার করা হয়েছে; দণ্ডনীতি, অর্থনীতি, ত্রয়ী (বেদচর্চা) ও বার্তাকে (কৃষি, ইত্যাদি) স্বীকার করা হয়েছে। শংকরাচার্য মনুকে বারবার উদ্ধৃত করেন এবং সবচেয়ে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বলে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র হিসেবে স্বীকার করেন। মনুই প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের নিরিখ নির্মাণ করেছেন। এবং মনুতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার শাস্ত্রগুলিকে পরিহার করা হয়েছে। যুক্তির চর্চা না থাকলে সমাজে আপ্তবাক্য, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞাই চূড়ান্ত ভাবে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে, অপর পক্ষে যুক্তিতর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট কোনও বিদ্যা বা শাস্ত্রকে স্বীকার করলেই সমূহ বিপদ। তখন মানুষ নিজের দেহমন, বহিঃপ্রকৃতি, বিশ্বচরাচর, যজ্ঞ, এ সবের সমর্থন যখন যুক্তির মধ্যে পায় না এবং সন্দিহান হয়ে ওঠে, এবং প্রকাশ্যে সে সংশয় যখন ঘোষণা করে, তখন সে বৈপ্লবিক সন্দেহ সংক্রামক হয়ে যায়। অন্য লোকের মনে যদি বীজাকারেও কোনও সংশয় চাপা থাকে তখন প্রকাশ্যে অপরের ঘোষিত সংশয়ে সে আপন সন্দেহের সমর্থন পায়; এমনই করে বিস্তার লাভ করে অবিশ্বাস, ফলে সমাজপতিদের সযত্ননির্মিত সংহতি বিপন্ন হয়। 'বেদের

বক্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের যথার্থ আগ্রহ নেই। তার পরিবর্তে তাদের উৎসাহ বেদকে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখায়— যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরলোক ও দেবতার ভয় দেখিয়ে জনসাধারণকে সার্থক ভাবে বশীভূত রাখা যায়; অতএব তাঁরা সদর্পে ঘোষণা করতে পারেন যে, বেদেই সর্বোত্তম প্রজ্ঞা বিধৃত আছে।'[১৫] কাজেই ব্যাপক সংশয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপন্ন হতে পারে বলেই বেদের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করা এত জরুরি, এবং পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। সন্দেহ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংহতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে বলেই সন্দেহ সম্পর্কে সমাজপতিদের সদাজাগ্রত আশঙ্কা এবং উদগ্র রোষ।

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থা ও তার ধর্মাচরণ ভেঙে গেলে নতুন একটি সমাজের গঠনের সূচনাকালে রচয়িতারা বেদের ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞের সংখ্যা, অনুপুঙ্খ, ব্যাপ্তি, ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন; আশঙ্কা ওই একই, সামাজিক সংহতি পাছে নষ্ট হয়। যুক্তির বেশি প্রয়োগ ঘটলে আপ্তবাক্য প্রামাণ্যতা হারায়, সংশয়ের সংখ্যা, গভীরতা ও ব্যাপ্তি বাড়ে। তা বলে সমাজপতিরা কি যুক্তির কোনও ভূমিকাই স্বীকার করেননি? করেছিলেন বই-কি, শাস্ত্রবাক্য যে অভ্রান্ত, মান্য এবং চূড়ান্ত ভাবে প্রামাণ্য, এইটে প্রমাণ করার জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণসাহিত্য, দর্শনপ্রস্থানগুলি, টীকা, ভাষ্য, ধর্মশাস্ত্র ও নিবন্ধ রচনা হয়েছে। এবং শুধু ভারতবর্ষে নয়, খ্রিস্টান, ইসলাম ও অন্যান্য সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটা একই ভাবে ঘটেছে।

এত আয়োজন সত্ত্বেও যদি সংশয়ী বলে, 'তোমরা যা বলছ তা আমার বিশ্বাস হয় না, কে দেখেছে দেবতাদের উৎপত্তি, কে বলেছে যজ্ঞে ফল হয়, কেন মানতে যাব যা দেখতে পাইনে, বুদ্ধিতে যুক্তিতে যার কোনও হদিস মেলে না তাঁকে?' এ তো সর্বনাশ সমাজের পক্ষে। কাজেই নাস্তিক, বেদনিন্দক, ইহলোকবাদী, লোকায়তিক ভূতবাদ, সাংখ্য, প্রধানবাদ, পরমাণুবাদ ও ন্যায়— এদের যারা স্বীকার করে তারা এবং এদের ভিনদেশি বিকল্পরা সর্বদেশের শাস্ত্রে ধিকৃত। কিন্তু মুশকিল হল, 'যদি ভারতীয় দর্শনে কোনও কিছু সার্থক ভাবে প্রাগ্রসর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে তবে তা হল লোকায়ত মত, অর্থাৎ (সেই মত যা বলে) চেতনা, যাকে সাধারণত আত্মা বা মনের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা হয়, তা কেবলমাত্র বস্তু থেকেই উদ্ভূত।'[১৬] এই মত ছিল লোকায়ত। লোকে তো জানত যে আত্মা

১৫. ' the lawgivers are not really interested in the actual contents of the Veda What they are interested instead in is the Veda as a political instrument which can be effectively used to keep the people under control with the fear of the other world and gods etc which, because they boldly proclaim as supreme wisdom supposed to be contained in the Veda '— Chatterjee, p. 180

১৬. ' ..if there is anything in traditional Indian philosophy that has successfully stood the test of advanced scientific knowledge, it is the proposition of the Loka-yatas viz. that consciousness— ordinarily understood as the differential of the spirit or the soul— is only a product of matter.'— Chatterjee, *op cit.*, p 610

বলে কোনও কিছুকে দেখা যায় না, অতএব সেটা আছে কি না, মৃত্যুর পর থাকবে কি না এ বিষয়ে তা স্বাভাবিক ভাবেই লোকের সন্দেহ হবে। চার্বাক যেমন বলেন, শাক থেকে সুরা হয়, অথচ শাকে সুরার কোনও গুণই নেই; রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই বস্তুর এমন গুণগত, আকৃতিগত, প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়; কাজেই শরীরে বিশিষ্ট ধরনের অবয়বসংস্থান ঘটলে আপনিই তার থেকে চেতনার উদ্ভব হয়। যেমন চুন সাদা, হলুদ হলদে রঙের, অথচ এ দুটি মেশালে লাল রং হয়, অথচ লাল রং হলুদেও ছিল না, চুনেও ছিল না। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই উপাদানে অবিদ্যমান গুণ বা লক্ষণ পরিণত পদার্থে উদ্ভূত হয়। তেমনই করে মানুষের শরীরের ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ধরনের সমাবেশ ঘটলে, ইন্দ্রিয়গুলিতে অনুপস্থিত নতুন ব্যাপার, চেতনার উদয় হয়, এই চেতনাতে আছে মনন, ইচ্ছা ও অনুভব। এর বাইরে চেতনার কোনও প্রকাশ লোকায়ত দর্শন মানেনি। এই দিয়েই মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যা হয়; হয় না শুধু মরণোত্তর আত্মার। সাধারণ মানুষের সে আত্মায় কোনও প্রয়োজনই নেই, এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির কাছে তার কোনও প্রমাণ মেলে না, চিন্তায় কল্পনায় কেউ কেউ তাকে শাস্ত্রকারদের নির্দেশিত রূপে অবধারণ হয়তো করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষের এমন আত্মার কোনও প্রয়োজনও নেই এবং দেহবিনির্মুক্ত এই অবস্তুকে তারা সম্যকরূপে ধারণাও করতে পারে না, চায়ও না। অতএব একটি লোকায়ত অনাস্থা বৈদিক সমাজে ব্যাপক ভাবেই ছিল।

বিশ্বাসের পরম্পরা

অনাস্থা কীসে? আগেই দেখেছি, বেদের প্রামাণ্যতায়, দেবদেবী, স্বর্গনরক, পরলোক, আত্মা ও জন্মান্তরে। অনাস্থা নেতিবাচক; কিন্তু আস্থা বা বিশ্বাস যে সাধারণ মানুষের এ সব তত্ত্বে কোনও দিন ছিল, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই। সেই ঋগ্বেদের আদিপর্বের ঋষিমণ্ডলগুলি (২-৭) থেকেই তো বহু অনাস্থার প্রকাশ রয়েছে। তা হলে সর্বজনীন বা ব্যাপক ভাবে বিশ্বাস কোনও দিন ছিল তা প্রমাণ করা যাবে না, বরং যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটা হল, কিছু মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে বিশ্বাস না করে বাঁচতে পারে না; তাদেরকে সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা যা বিশ্বাস করতে বলত তারা তাই বিশ্বাস করত। সম্ভবত এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তাই সমাজে সংহতি রক্ষিত হত, যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হত, বিশেষ কোনও বৈপ্লবিক চিন্তা প্রশ্রয় পেত না। এরা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আপনিই প্রমাণিত হয় যে, সমাজে সংখ্যালঘু মানুষ অন্য রকম ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করার দরকারই বোধ করত না; তাদের মননে ও আচরণে এ সব সম্বন্ধে একটা সহজাত ঔদাসীন্য ও অনীহাই ছিল। চিরকালই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই হয়তো সক্রিয় ভাবে যজ্ঞক্রিয়ায় যোগ দিত। কিন্তু সে-ব্যাপারে বিশ্বাসের বদলে যা তাদের প্রণোদিত করত, তা দীর্ঘকালের ঐতিহ্য থেকে সঞ্জাত একটা জড়, অসচেতন অভ্যাস, যেমনটি আজও অধিকাংশ পুজোআচ্চার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সত্য। আর সর্বদেশে সর্বকালে যা সত্য তা হল

সমাজে স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষ ছিল যারা বিশ্বাস করতে চাইত, কিন্তু পারত না। এদের চিত্তবৃত্তি অতিশয় জাগ্রত ছিল, তাই যুক্তিতে মননে যাকে সিদ্ধ করতে পারত না তা বিশ্বাসও করতে পারত না। এদের সাধ্য ছিল না মননের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে শুধু চিরাচরিত, ঐতিহ্যগত আপ্তবাক্য বলেই কোনও কিছুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও সেই অনুসারে আচরণ, অর্থাৎ সচেতন ভাবে, স্বেচ্ছায়, সক্রিয় ভাবে যজ্ঞকর্মে অংশগ্রহণ করার।

আর্যদের যজ্ঞনির্ভর সমাজের বাইরে তখনই ছিল বৃহৎ প্রাগার্য গোষ্ঠী, যাদের ধর্মবিশ্বাস এবং আচরণ ও অনুষ্ঠান অবশ্যই ভিন্ন ছিল। বেদ এদের মধ্যে কাউকে তুচ্ছ করে 'যতি' বলেছে এবং খবর দিয়েছে যে দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকদের (wolf-hounds?) কাছে সমর্পণ করেছেন। আবার কোনও কোনও অবৈদিক, সম্ভবত প্রাগার্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ভরে বলা হয়েছে যে, তারা শিশ্নদেব, অর্থাৎ হয়তো একান্ত ভাবে যৌনতাপরায়ণ অথবা লিঙ্গপূজক। এ ছাড়াও নানা রকমের মতবাদ অবশ্যই ছিল কারণ যজুর্বেদের 'শিবসংকল্পসূত্র' এবং অথর্ববেদের বহু সূক্তে উল্লেখ পাই 'যাদের বিশ্বাস ও আচরণ ভিন্ন'। তাই নানা মত ও পথ তখনই সমাজে সহাবস্থান করত, যদিও সম্ভবত, অধিকাংশের না হলেও মুখ্য অংশের ধর্মাচরণ ছিল যজ্ঞকেন্দ্রিক। কিন্তু সমাজের মানুষ যারা কৌতূহলী, স্বাধীনচেতা, নিজের গোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচরণে অতৃপ্ত তারা সেই অনুসন্ধিৎসা বা নানা ধরনের মত, পথ ও আচরণের যাচাই করত। সমাজে প্রচলিত আপ্তবাক্যনির্ভর ধর্মাচরণে এরা অসহিষ্ণু। এরা সন্দেহ প্রকাশ করত কথায় এবং সম্ভবত আচরণেও। প্রথাসিদ্ধ ধর্মাচরণকে নিয়ে এরা কখনও ব্যঙ্গকৌতুক করেছে, কখনও-বা জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারীর মতো অধিক বিদ্বান বা মনস্বীর কাছে আপন সংশয় ব্যক্ত করে সমাধানের সন্ধান চেয়েছে। তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে যেটা প্রতিপন্ন হয় তা হল, একটি প্রধান মত ও বহুজন-আচরিত একটি ধর্মপন্থা থাকা সত্ত্বেও তখনই সমাজে বহু বিশ্বাসের আকল্প চালু ছিল, এবং কালের গতিতে এ সব আকল্প বহু ধর্ম ও দর্শনপ্রস্থানের আকারে নানা বিকল্পের রূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। ফলে চোখ বুজে বেদরচয়িতাদের বিশ্বাস মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা অনেকেরই ছিল না। প্রতিবাদী বা অবিশ্বাসীকে সব দেশেই চিরকাল সমাজের শক্তিমান গোষ্ঠী অবজ্ঞা করেছে। বাইবেল-এ বারবার বলা হয়েছে, 'মূঢ় মনে মনে বলেছে ঈশ্বর নেই।'[১৭] ইসলামি ধর্মতত্ত্বে নাস্তিকের পরিণাম খুব যন্ত্রণাময় একটি নরক 'হাবিয়া দোজখ'-এ। ভারতবর্ষেও বারবারই বলা হয়েছে নাস্তিক, চার্বাকপন্থী, লোকায়ত, বার্হস্পত্যপন্থী, ইত্যাদি মানুষের পরিণতি শোচনীয়। সমাজের শৃঙ্খলা, যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্মবোধে যাদের অন্তরাত্মা শান্তি পায়নি, যারা সৃষ্টিতে, বিশ্বচরাচরে এবং সমাজে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজেছে কিন্তু পায়নি— শাস্ত্রে তাদের প্রতি অতি পরুষ অভিশাপবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে প্রতিরোধী; অন্তরে প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী। শাস্ত্রকর্তারা যে-শৃঙ্খলা রচনা করেছেন, তাদের কাছে সেটা শৃঙ্খল বলে প্রতিভাত হয়েছে, কারণ তার মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরার শৃঙ্খলা নেই। এই কার্যকারণের সন্ধান করে

১৭. 'The fool hath said in his heart, there is no god Psalms ' 14.1, 53·1, etal

যে-যুক্তিপ্রস্থান, তা-ই পরবর্তীকালে আন্বীক্ষিকী— তর্কশাস্ত্র বলে অভিহিত হয়েছে এবং এগুলির চর্চাকে শাপশাপান্ত করা হয়েছে।

ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিতেরা মোটামুটি একমত যে, এর উৎসে আছে ভয় ও বিস্ময়। বিশ্বচরাচরে পূর্বাভাস ছাড়াই বহু বিপদ আসে— ঝড়, বজ্রপাত, খরা, বন্যা, মহামারি, অভাব, অনাহার, ঈতি (শস্যের ক্ষতিকারী ঘটনা), শোক, মৃত্যু এবং বিচ্ছেদ। এ ছাড়াও ছিল হিংস্র শ্বাপদ ও শক্তিমান অত্যাচারী গোষ্ঠী এবং বহু আকস্মিক দুর্বিপাক। এগুলির ওপরে মানুষের হাত ছিল না, তাই ভয় জাগত প্রাণে। সে-ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই মুখ্যত সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান দেবতার কল্পনা। এ ছাড়া ছিল বিস্ময়: ঋতুর নিয়মিত আবর্তন, প্রকৃতির শোভা ও বিস্তার, সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র, গিরিনদীসমুদ্রের উদার সৌন্দর্য, আকাশের ব্যাপ্তি, মানবদেহের শোভা— কে এ সব সৃষ্টি করল? যে-ই করে থাকুক সে মহান, শক্তিমান, মঙ্গলময়, শ্রীময়— অতএব নমস্য। এখানে কার্যকারণবোধের কোনও ব্যাপারই নেই; আছে শুধু পৃথিবী ও মানুষের শোভায়, মহিমায় মানুষের মুগ্ধতা। ভয় জাগে মানুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বাইরের ঘটনা থেকে— যে-অশুভ ভয়ংকর, ক্ষতিকর শক্তি বিশ্বে, জীবনে ও সমাজে বিদ্যমান, যার কাছে প্রতিনিয়ত পরাজিত হচ্ছে মানুষের সীমিত ক্ষমতা। স্বভাবতই সে-সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা প্রবল ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এখানেও কার্যকারণ সম্পর্ক মানুষের বোধের সম্পূর্ণ বাইরে থাকে। কেন কী হয়, মানুষ ভেবে পায় না। শাস্ত্রকার সমাধান জুগিয়ে দেন দেবমণ্ডলী নির্মাণ করে; জীবনের সমস্ত বিপদ-বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার যথাবিহিত উপায় নির্দেশ করে। সে-উপায় যজ্ঞ। কেমন করে করতে হবে সে বিষয়েও তাঁরা বিস্তারিত নির্দেশ দেন। কিন্তু সমস্ত বোধের ও বিশ্বাসের জগৎটি নির্মিত হয় কার্যকারণ পরম্পরাকে পরিহার করে। যতক্ষণ এই সব নিয়ে জীবনের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বাস্তবে এবং/বা কল্পনায় নিস্তার পায়, ততক্ষণ সবই ঠিকঠাক চলে। কিন্তু যখন কারও মনে প্রশ্ন আসে, দেবতারা যে আছেন তার প্রমাণ কী? যজ্ঞে যে ইষ্টফল পাওয়া যায় তা যখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছে না তখন তারই বা প্রমাণ কী? যজ্ঞ যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় সেটা যে যথার্থ, অর্থাৎ দেবতাদের প্রীতিজনক, তার প্রমাণ কোথায়? এই অবস্থায় মানুষ না জেনে খোঁজ করে কার্যকারণ সম্পর্কের, এবং এইটিকেই পৃথিবীর সর্বত্রই চিরদিনই অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং সমাজের পক্ষে নাশকতামূলক আচরণ বলে মনে করা হয়েছে।

যজ্ঞ এবং বিশ্বাসের আকল্পের অনুপুঙ্খ নিয়ে সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিশ্বাসের মূল তত্ত্বটি সম্পর্কে সংশয় জাগলে তা নাস্তিক্য বলেই অভিহিত হয়। সংশয়, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্য একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রা ও স্তরে বিন্যস্ত; চূড়ান্ত অবস্থানটি নাস্তিক্য, অর্থাৎ বিশ্বাসের সার্বিক অভাব। কিন্তু 'যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে... সর্বদাই একটি সন্দেহ সংশ্লিষ্ট থাকে।'[১৮]

১৮. 'Authentic religious faith .. must always entail doubt.— *Macmillan Encyclopaedia of Religion* ' Doubt, p. 425

বিশ্বাসে যেমন সন্দেহ অন্তর্লীন থাকে, তেমনই সন্দেহের অন্তরেও একটি বিশ্বাস থাকে। কবি টেনিসন বলেন, 'খাঁটি সন্দেহের মধ্যে অনেক বেশি বিশ্বাস থাকে।'[১৯] কী সেই বিশ্বাস? কার্যকারণ-পরম্পরা; আজ এখনও আমরা না বুঝতে পারলেও সেটা যে আছে এমন বিশ্বাস। সন্দেহ ও নাস্তিক্যের ভিত্তিভূমি মানুষের অবচেতনে এই প্রত্যয় যে, সংসারে নিষ্কারণ কিছুই ঘটে না, সব কিছুই কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত, তার কতক আমাদের জানা। কিছু-বা অজানা, কিন্তু সত্যকার আকস্মিক বলে কিছুই নেই। কোনও না কোনও দিন সেই সব কারণ জানা যাবে, যা এখনও মানুষের অজানা।

প্রশ্ন ও প্রগতি

এই প্রত্যয় সন্দেহের ভিত্তি বলেই সন্দেহ পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণ। আপেল মাটিতে পড়ে কেন, এ প্রশ্ন নিউটনকে যদি বিচলিত না করত তা হলে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কৃতই হত না; জ্ঞানের জগতে অগ্রগতি প্রতিহত হত, ওই সূত্রে গ্রথিত আরও অনেক আবিষ্কারই হতে পারত না। তেমনই, কে দেখেছে ইন্দ্রকে জন্মাতে? এ প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে যে, যেহেতু সব মানুষই একদিন জন্মায় এবং অধিকাংশ দেবতাই যাস্কের মতে মনুষ্যাকৃতি, তাই ইন্দ্রেরও নিশ্চয়ই একদিন জন্ম হয়েছিল, কিন্তু কেউ তো তা দেখেনি। অতএব ইন্দ্রের জন্ম ব্যাপারটাই সংশয়াচ্ছন্ন এবং তার ফলে ইন্দ্রের অস্তিত্বও সংশয়াতীত নয়। নেম ভার্গব বলে: ইন্দ্র নেই। এই উক্তি খণ্ডন করতে একটি সূক্ত জুড়ে ধ্রুবপদ সৃষ্টি করতে হল, 'স জনাস ইন্দ্রঃ'। কিন্তু জনমানসে প্রশ্ন এবং নেম ভার্গবের ইন্দ্রকে অস্বীকার করা ঘোষণাটি রয়ে গেল। পুরোনো বহু দেবতা, ভগ, পর্জন্য, ইলা, ভারতী, মার্তণ্ড, অর্যমা, দক্ষ, অংশ— এরা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল, নতুন অনেক দেবতা স্থান পেল দেবমণ্ডলীতে, দেবমণ্ডলীর বিবর্তন ঘটল, তা আর স্থাণু রইল না। তেমনই পূর্বতন বহু যজ্ঞে ফল হচ্ছিল না দেখে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে, সরে এসেছে, কখনও-বা কোনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে কারণ সমাজের মূল ধর্মধারা তাদের চিহ্নিত করেছে নাস্তিক, বেদবিরোধী বলে। এই বিরোধ প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহের রূপে, কখনও-বা আরও গভীর, ব্যাপক বা মৌলিক হলে, নাস্তিক্যের রূপে। এর ফলে চিন্তাশীল মানুষ নতুন করে চিন্তা করেছে, কখনও উত্তর পেয়েছে, তখন সমাজে জ্ঞানের জগতের পরিসর বেড়েছে। রাহুকেতুর গ্রাসে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহণ মানুষ ততদিনই বিশ্বাস করেছে যতদিন তার চেয়ে সংগততর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেই জ্ঞান বেড়েছে, মানুষ পুরাতন কুসংস্কার ত্যাগ করে কার্যকারণ-পরম্পরার সন্ধান পেয়ে জ্ঞানের জগতের দিক্‌চক্রবালকে প্রসারিত করেছে।

দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্যে, ঐতিহ্যবাহিত কুসংস্কারের পরিবর্তে কার্যকারণ-সংবলিত যথার্থ তথ্য জানবার জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজনই হল সন্দেহ, অস্বীকার

১৯. 'There lives more faith in honest doubt.'— *In Memoriam*, (১৩৫ নং স্তবক)

করা, প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করা, শাস্ত্র-পুরোহিতের দেওয়া ব্যাখ্যাকে পরিহার করা, তাকে ভুল, অযথার্থ বলে ঘোষণা করা। এর পরে যদি কেউ সংগততর, বেশি যুক্তিপূর্ণ কার্যকারণ-পরম্পরায় গ্রথিত কোনও সমাধান পেশ করেন যা সমাজপতিরা তাদের স্বার্থহানি না হলে স্বীকার করে; আর তাদের স্বার্থহানি হলে সরাসরি নাস্তিক, পাষণ্ড, পাপী বলে ব্যাখ্যাত ও প্রশ্নকর্তা দু'জনকেই শাপশাপ্ত করে। কিন্তু যখন সমাধান পাওয়া যায়, তখন সমাজ জ্ঞানের জগতে এক ধাপ এগিয়ে যায়। এটা সম্ভবতই হত না যদি না প্রাথমিক স্তরে প্রশ্ন, সন্দেহ বা নাস্তিক্য ঘোষিত হত। যজ্ঞ ও বেদ সম্বন্ধে সংশয় ঘোষিত হতে হতে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ও আরও বহু বেদবিরোধী প্রস্থান রচিত হয়েছে, ফলে জীবনজিজ্ঞাসা গভীরতর হয়েছে, দর্শন ও নীতি সমৃদ্ধ হয়েছে। যজ্ঞকে অস্বীকার করে জন্ম নিয়েছে জন্মান্তরবাদ, মোক্ষ ও নির্বাণের কল্পনা, এতে সমাজের অগ্রগতি নিশ্চয়ই হয়নি বরং ক্ষতিই হয়েছে; কিন্তু পরম্পরাক্রমে লব্ধ বিশ্বাসের ছকটিকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার এই চেষ্টার (justifying the ways of God to men) মধ্যে নতুন করে চিন্তা করতে হয়েছে মানুষকে, এবং বানপ্রস্থ ও যতি দুটি আশ্রমকে আশ্রমবর্গের অন্তর্গত করতে হয়েছে, এতে কিছুকালের জন্য অন্তত সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয়েছে।

যাস্কের বহু ব্যুৎপত্তি ভুল। কিন্তু শব্দমাত্রেরই যে ব্যুৎপত্তি আছে এই বিশ্বাসই ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের সৃষ্টির মূলে এবং এরই বিশ্বাস এসেছে প্রশ্ন ও সন্দেহের মধ্যে দিয়ে, 'তৎ কাবশ্বিনৌ?' 'তা হলে অশ্বিন্‌রা কারা?' উত্তরে যা বলা হল, তার সব-কটি বিকল্পই ব্যুৎপত্তি হিসেবে অগ্রাহ্য। কিন্তু দেবতাদের একটি বাস্তব পটভূমিকা আছে, এ বিশ্বাসের ওপরেই সব-কটি বিকল্প প্রতিষ্ঠিত, এবং এ উত্তর মিলত না যদি মূলে প্রশ্নটি না থাকত। সমস্ত বেদাঙ্গের সৃষ্টি ওই প্রশ্ন থেকে। (অথর্ববেদে যত উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দিয়ে রোগ সারার কথা আছে তার সবই বিজ্ঞানসিদ্ধ নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় পাওয়া কিছু জ্ঞানের সঙ্গে প্রশ্ন ও সন্দেহ থেকে উৎপন্ন অনুসন্ধিৎসা ওই সব আবিষ্কারের মূলে।) রোগই একটা প্রশ্ন, স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তার থেকে বিচ্যুতিই রোগ; তা কেন হবে এই প্রশ্নই ভেষজশাস্ত্র আবিষ্কারের মূলে। পৃথিবীতে এখনও অনেক জাতি আছে যারা মোটামুটি এক ধরনের চলনসই জীবনযাত্রার উপায় নির্ধারণ করে সেই অনুসারে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তার বাইরে তাদের উন্নতি হয়নি, কারণ তার বাইরে তারা প্রশ্নই করেনি।

যে-জাত যত বেশি তীব্র, দুরূহ, গভীর ও ব্যাপক প্রশ্ন করেছে, নিতান্ত হতদরিদ্র না হলে সে-জাত প্রশ্নোত্তরের কার্যকারণ পরম্পরা অবলম্বন করে তত বেশি এগোতে পেরেছে। আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সুখের বদ্ধ জলাশয়ে বাস করা যায়। অনেকে তা করেওছে। কিন্তু অন্য বিকল্পটি মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদার পক্ষে বেশি গৌরবজনক।

পরিশেষে, মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় আর্যদের প্রথমতম রচনা ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় থেকেই এত সংশয়। একটি সজীব জনগোষ্ঠীই পারে, পদে পদে সংশয় বোধ করতে। এ কথা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে, তদানীন্তন মানুষের মনে যত সন্দেহ এসেছিল তার সবই রক্ষিত হয়নি। হয়তো বহু প্রশ্ন সমাজপতিদের কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক ছিল বলে

সেগুলিকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যে-কারণে চার্বাকের মতবাদ পূর্ণাঙ্গ ভাবে রক্ষিত হয়নি। চার্বাকের প্রভাব যে জনমানসে খুবই বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ, এ মতকে খণ্ডন না করে কোনও দর্শনপ্রস্থান-রচয়িতাই জলগ্রহণ করেননি। তা-ও চার্বাকমতের যেটুকু রক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে শাস্ত্রসুলভ সংহতি নেই, শুধু সেইটুকুই চার্বাকের কৃতি হলে চার্বাকের জনপ্রিয়তা এত বাড়ত না এবং চিন্তাশীল মানুষ তাঁর অনুগামী হতেন না। তেমন মানুষ যে চার্বাকপন্থী হয়েছিলেন তার প্রমাণ হল, এ মতের খণ্ডনে এত গরজ, ঔৎসুক্য ও চিন্তাশ্রম। শুধু নির্বোধরা চার্বাকপন্থী হলে শাস্ত্রকাররা এত ভয় পেত না। বহু বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর মতের অনুসরণ করেছিলেন বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত আতঙ্ক। এবং চার্বাকের মত ধর্মের মূল ধরে টান দিয়েছিল, আত্মা পরলোক ঈশ্বর অস্বীকার করে। নাস্তিক্য সন্দেহের চূড়ান্ত অবস্থান। আনুষঙ্গিক বহু সন্দেহ ধীরে ধীরে এসে ঠেকে নাস্তিক্যে। নেম ভার্গবের 'ইন্দ্র নেই' বলা সেকালে নাস্তিক্য। নচিকেতা যখন বলে, 'কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না' তখন সে সমাজে সঞ্চরমাণ নাস্তিক্যকেই প্রকাশ করে।

অত প্রাচীনকালে অত মৌলিক সংশয় ও নাস্তিক্য যে-জাতির মধ্যে উদ্‌গত হতে পেরেছিল, সে-জাতি নিঃসংশয়ে একটি অত্যন্ত সজীব, নিয়ত মননশীল জাতি, যারা প্রশ্ন-সমস্যা-সংকুল চিন্তাজগতে আপস করতে অস্বীকার করেছিল। প্রচলিত মত ও পথে তাদের চিত্ত তৃপ্তি পায়নি, তাদের চাই ভূমা, কারণ তাদের 'নাল্পে সুখমস্তি'। ঐতিহ্যধারায় প্রাপ্ত বিশ্বাস, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যকে আজ থেকে সওয়া তিন হাজার বছর আগে যে-ভারতীয়রা সন্দেহ করে জীবন সম্বন্ধে নানা মাত্রার, নানা যন্ত্রণাদীর্ণ জিজ্ঞাসাকে এত তীব্র ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছেন, তাঁরা অবশ্যই নমস্য; কারণ তাঁরাই যুক্তিতর্কের সূত্রে নবতর সত্যের পথে এ জাতিকে রওনা করে দিতে পেরেছেন। তাঁদের সংশয় ও নাস্তিক্য আমাদের গর্বের বস্তু—এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। তাই নিয়েই এই লেখা।

বেদ রচনার গোড়ার দিক

সাধারণ ভাবে অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে একটা বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে দীর্ঘকাল ধরেই আছে যে বেদের যুগের মানুষ বেদে বিশ্বাসী ছিল। পরিসংখ্যানগত ভাবে হয়তো কথাটা ঠিকই, অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষ হয়তো বেদে বিশ্বাসী ছিল। এ কথা বললেই যে-দুটি প্রশ্ন আসে তা হল: ১) বেদের যুগ কোনটা? এবং, ২) বিশ্বাস কীসে ছিল? ঐতিহাসিকরা মোটের ওপর খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের ব্যাপ্তি ধরেন। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের মধ্যেই ঋক্‌সংহিতা/ও যজুঃসংহিতা রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। এটা কিছুটা আগেও হয়ে থাকতে পারে, কারণ, বৈদিক আর্যরা এ দেশে আসার সময়ই কিছু পূর্বপরিচিত সূক্ত— কবিতা ও গান সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সামবেদ কোনও স্বতন্ত্র রচনা নয়, ঋগ্বেদের সূক্তগুলির নানা বিন্যাসে এটি রচিত। অর্থাৎ, যজ্ঞে গান গাইবার জন্যে ঋগ্বেদের কবিতাগুলিকে সুবিধে মতো সাজিয়ে এ বেদটি নির্মিত যাতে, সামবেদের গায়ক উদ্‌গাতারা যজ্ঞে গান করতে পারেন। ঋগ্বেদের হোতারা এগুলো যজ্ঞে আবৃত্তি করতেন। অথর্ববেদের কিছু অংশ ঋগ্বেদেরও পূর্বে রচিত, কিন্তু ধর্মাচরণের সম্ভ্রান্ত ধারার মধ্যে সেগুলির স্থান হয়নি। এর কিছু অংশ ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি ধার নেওয়া, সামান্য অদলবদল করে সাজানো।

অন্য কিছু ঋগ্বেদ সামবেদ সংকলিত হওয়ার পরে রচিত। এবং ওই দুটি বেদের সংকলন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় ওগুলিতে স্থান না হওয়াতে কিছু কিছু রচনা অথর্ববেদে সন্নিবেশিত হয়। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ রচনার সামান্য কিছু পরে (কিছু-বা অনেকটাই সমকালে) রচিত হতে শুরু করে এবং ঋগ্বেদ সংকলিত হওয়ার অনেক পরে শেষ হয়; এই কারণে ঋগ্বেদ রচনা খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক নাগাদ শেষ হলেও যজুর্বেদের রচনা ও অথর্ববেদের রচনা ও সংকলন আরও কিছুকাল ধরে চলতে থাকে। যজুর্বেদ রচনা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক নাগাদ শেষ হয়, অথর্ববেদ আরও দু-তিনশো বছর ধরে চলে। যজুর্বেদের মূল ধারা ধরেই ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূচনা। ঋগ্বেদে গদ্য একেবারেই নেই, যজুর্বেদে কোথাও কোথাও গদ্য আছে এবং সেই ধারাতেই অথর্ববেদেও কিছু গদ্য আছে। আর ব্রাহ্মণসাহিত্য পুরোপুরি গদ্যেই রচিত। তবে এ পর্যন্ত সবই— এবং এর পরেও শ-তিনেক বছর পর্যন্ত— বেদের যে-সাহিত্য রচনা হয় তা সম্পূর্ণ 'আস্য', অর্থাৎ বৈদিক আর্যরা নিরক্ষর ছিল তাই তারা মুখে

মুখে রচনা করত, এবং পুত্র-শিষ্য-পরম্পরা সে-সাহিত্য কণ্ঠস্থ করত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই ছশো বছর মুখ্যত বেদ রচনাকাল— বৈদিক যুগ। এর পরে, উপনিষদ। অন্তত মুখ্য উপনিষদগুলি রচনা হওয়ার পরেও বেদের সম্পর্কে অন্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে; তার নাম সূত্র বা বেদাঙ্গসাহিত্য: সে-রচনা চলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত। এর সঙ্গে পূর্বের বৈদিক সাহিত্যের প্রভেদ হল, আগেরটিকে বলা হয় অপৌরুষের অর্থাৎ এটি কোনও মানুষের রচনা নয়, এ সাহিত্য দৈবশক্তির দ্বারা ঋষিদের কাছে প্রতিভাত। যদিও বেদাঙ্গসাহিত্য রচনার কালে দেশে লিপি ও লেখা এসে গেছে, কিন্তু রচনা দেখে বোঝা যায় যে, বেদাঙ্গও আস্য রচনা। কারণ, এটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত, সূত্রের আকারেই সমস্তটা রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ লেখা তখন মানুষের ঐহিক সাংসারিক নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে, শাস্ত্র রচনায় বা ধর্মাচরণে নয়।

বেদের কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক হলেও এর তিনটি ভাগ করা যায়: (ক) ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদের অধিকাংশ সংহিতার রচনাকাল— খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে অষ্টম শতকের শেষ বা সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত; (খ) অথর্ব সংহিতার শেষার্ধ ও ব্রাহ্মণসাহিত্য রচনাকাল (যদিও প্রথমদিকের ব্রাহ্মণগুলির রচনা এর আগেই শুরু হয়ে গেছে), অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে ষষ্ঠের শেষ ও পঞ্চমের পূর্বার্ধ পর্যন্ত; এবং (গ) বেদাঙ্গ-সাহিত্য রচনাকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতককাল।

বৈদিক আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসে যাযাবর সময়ের পশুচারিতা, এবং পথে যেখানে যেখানে দু-এক বছর থেমেছিল সেখানে পেয়েছিল কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা। এ দেশে এসে তারা সম্মুখীন হল কৃষিজীবী এক সুস্থিত নাগরিক সভ্যতার। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে দশম শতক পর্যন্ত মুখ্যত কৃষি ও পশুপালনই ছিল তাদের জীবিকা; এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল যুদ্ধ, মৃগয়া ও লুণ্ঠন। এখানে আসবার পরে পায়ের তলায় মাটি পেতে কিছু সময় লেগেছিল, কিন্তু তার পর থেকেই মোটামুট সব-কটি বৃত্তি অব্যাহত রেখেই বেদের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্ধ এবং দশম মণ্ডল, যজুর্বেদসংহিতা, অথর্ববেদের প্রথম দিকের রচনা এবং একেবারে গোড়ার দিকের ব্রাহ্মণগুলি রচনা চলছিল। এই অধ্যায়টি এইগুলির রচনাকালকে অবলম্বন করেই।

এই সময়ে উৎপাদনব্যবস্থা যা ছিল তা প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। প্রাগার্যদের কাছ থেকে হরণ করা এবং নিজেরা দখল করে পাওয়া জমি, ফসল গোধন, লুণ্ঠন, মৃগয়া এ সব মিলেও প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট খাদ্যসম্পদ জুটত না। নিরন্তর খাদ্যাভাব, অনাহার, ও দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় উৎপীড়িত ছিল জনসমাজ। এর ওপরে শীতের দেশ থেকে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে আসায় নতুন কিছু রোগব্যাধির আক্রমণও ছিল; আর ছিল প্রাগার্যদের দ্বেষহিংসা এবং তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ, এবং নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীকলহ। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাগার্যদের কাছে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা ও অভিজ্ঞতা দুটিই বাস্তব ব্যাপার ছিল। অকালমৃত্যু,

জরা এগুলোও জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল। খরা বা অজন্মা, প্লাবনের মতো পশুপালে মড়কের ফলে পশুনাশ— এ-ও মাঝে মাঝে ঘটত। বহু দূরদেশে থেকে দু-তিন শতাব্দী ধরে ধাপে ধাপে এখানে-ওখানে থেমে থেমে এ নতুন দেশে এসে, সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, দীর্ঘপরমায়ু— এ সব সুনিশ্চিত করার কোনও উপায় তাদের জানা ছিল না। তাই যজ্ঞ। এবং পৃথিবীর সব প্রাচীন সমাজে কোনও না কোনও না আকারে যজ্ঞ ছিল। আর ছিল জাদুবিদ্যা, প্রাচীন পৃথিবীর সব সমাজেই যা চালু ছিল— যজ্ঞের সঙ্গে এর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রভেদ হল, যজ্ঞে দেবতাদের অনুরোধ করা হয় প্রার্থীর মনস্কামনা পূরণ করার জন্যে, আর জাদুবিদ্যায় কোনও দেবতাকে না ডেকে সরাসরি কোনও অতিলৌকিক শক্তির দ্বারস্থ হয়ে ওই প্রার্থনাগুলোই পেশ করা হয়। কোনওটাতেই নিশ্চিত ফল মেলে না, তবু মানুষ যেখানে অন্যথা সম্পূর্ণ নিরুপায়, সেখানে ইষ্টসাধনের জন্যে কোনও না কোনও চেষ্টা সে করবেই। বেদের যুগে যজ্ঞ এবং যাদু যুগপৎ চলিত ছিল। জাদুর কোনও সুসংহত শাস্ত্র আমরা পাই না, কেবল ঋগ্বেদে কিছু কিছু সূক্ত এবং অথর্ববেদে বেশ-কিছু সূক্তে এর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে— যদিও অনুষ্ঠানের কোনও নির্দেশিকা পাওয়া যায় না। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া মোটামুটি স্পষ্ট ও ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, যজ্ঞের মধ্যে বহুলাংশে জাদুবিদ্যা অনুপ্রবিষ্ট ছিল, কারণ যজ্ঞানুষ্ঠান কেমন করে উদ্দিষ্ট ফল দেবে তা জানা ছিল না বলেই 'হিংটিংছট' ধরনের কিছু কিছু অংশ যজ্ঞে ইতস্তত চোখে পড়ে।

তা হলে যে-ছবিটা চোখে আসে, তা হল ব্যাপক নিরাপত্তার অভাব— জীবনের সকল ক্ষেত্রেই— এবং এর প্রতিবিধানের জন্যে নানা বিচিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান। মনে রাখতে হবে পশুচারী জীবনে যজ্ঞ ছিল নেহাতই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান: দেবতার উদ্দেশে স্তবগান ও আবৃত্তির সঙ্গে পশুহত্যা এবং পরে সেটি রেঁধে খাওয়া। কৃষিজীবী সুস্থিত জীবনে বীজ বোনা ও ফসল তোলার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক বেশি এবং এমন স্থিতিশীল সমাজে সমস্যাও অনেক বেশি। ফলে, একটি ছোট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা সমাজের নানা সমস্যা, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে ক্রমাগতই নতুন নতুন যজ্ঞ উদ্ভাবন করবে, নবতর প্রক্রিয়া বানিয়ে তুলবে এবং সমাজের অসহায় মানুষ অনন্যোপায় অবস্থাতে সে সবই মেনে নিয়ে নতুন নতুন অনুষ্ঠান করবে। কাকতালীয়বৎ ফল আসবে কোনও কোনও অনুষ্ঠানে। আবার, সম্ভাব্যতার বিজ্ঞান অনুসারে কোনও কোনওটা নিষ্ফলও হবে। তবু মানুষ ফিরে ফিরে সেই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করবে, কারণ ইষ্টসিদ্ধির জন্যে আর কোনও পথই তার জানা নেই।

এই ছিল বেদের প্রথম পর্যায়ে মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং তার মানসিক পরিমণ্ডল। সে চোখ মেলে দেখে সমস্যা-পরিকীর্ণ জীবনযাত্রা; তার থেকে সে সর্বান্তঃকরণে মুক্তি কামনা করে এবং সমাজের বিজ্ঞ বয়স্ক মনস্বীরা যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে যে প্রতিবিধান প্রবর্তন করেছেন তা-ই অনুষ্ঠান করে চলে— ফল হোক বা না হোক। ফল না হলে সে নিজেকে, নিজের যজ্ঞক্রিয়াকে দোষ দেবে এবং আবার যজ্ঞ করবে, যেহেতু আর কোনও প্রতিবিধান তার

জানা নেই, জাদু ছাড়া। এমন মনে করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে যজ্ঞ আর জাদু সমাজের বিভিন্ন স্তরে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হত (যেমন এখনও হয়। শিক্ষিত বাড়িতে বিপদে পুরোহিত ইষ্টদেবতার অথবা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের দেবতার পুজো করে, এবং ফল না হলে বা দেরি হলে পরিবারের অন্য স্তরে ওঝা, গুণিন ডেকে ঝাড়ফুঁক করা হয়। দেবতা মারফত পূজার ইষ্টসিদ্ধির প্রয়াস, আর দেবতাকে বাদ দিয়ে অতিলৌকিকের সাহায্যে ওই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করার চেষ্টা— এ দুটিই যুগপৎ আচরিত হয়)। অথর্ববেদের যে সব জাদু-অংশ ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী তা সেই সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যখন সমাজের বেশি শক্তিমান অংশ যজ্ঞ করছিল; কাজেই কালগত ভাবে এ দুটি সমকালীন ছিল।

এই মানসিক বাতাবরণের মধ্যে সৃষ্ট খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক পর্যন্ত কালে রচিত ঋগ্বেদ সংহিতা। এ সাহিত্যের অধিকাংশটাই যজ্ঞকেন্দ্রিক, যদিও অনুষ্ঠানের কথা এতে সরাসরি তেমন নেই যেমন আছে দেবতাদের উদ্দেশে স্তব ও গান, যার নাম সূক্ত। এর অধিকাংশেই দেবতাকে বলা হচ্ছে: 'তোমাকে এই দিলাম, তুমি আমাদের এই দাও।' এক কথায়, ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, যেটা প্রকৃতিকে মানুষের স্বার্থের অনুকূলে জয় করার দ্বারা পাওয়া যায়, সেই জয় করার কাজটা দেবতার হাতে দেওয়া হচ্ছে, হব্যের বিনিময়ে। এ সব প্রার্থনাই তখনকার সমাজে জীবনমরণের সমস্যা; প্রাগার্য ঈর্ষার পরিমণ্ডলে টিকে থাকার সমস্যা, প্রকৃতির নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার সমস্যা। এটা মনে রাখলে প্রার্থনাগুলির আকুতি আমাদের কাছে অর্থবহ হয়। নিশ্চয়ই সে-সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করত যে, যজ্ঞে হব্য ও স্তব দিয়ে দেবতাদের যথাবিহিত ভাবে আহ্বান ও মিনতি করলে তাঁরা ইপ্সিত ফল দেবেন। আগন্তুক উৎপাত না ঘটলে যথাকালে ফসল ফলত, অকস্মাৎ রোগব্যাধি না হলে মানুষ দীর্ঘজীবীই হত, শক্তিতে ও অস্ত্রে উৎকর্ষ থাকলে শত্রুজয়ও অবশ্যম্ভাবী ছিল; সেটা যজ্ঞ করলেও হত, না করলেও হত।

যেহেতু প্রতিবার যজ্ঞে প্রার্থিত ফল মেলে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শত্রুর জিঘাংসার বিরুদ্ধে মানুষ স্বভাবতই অসহায়, তাই ফল ফলুক বা না ফলুক দেবতাদের দ্বারস্থ হলে মনে একটা আশ্বাস জন্মায় যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। মানুষের সার্বিক অসহায়তা এমনই ছিল যে, এ ধরনের আশ্বাস মনে মনে নির্মাণ না করলে সে বেঁচে থাকতেই পারত না। তবু মানুষ যে দিন চোখ খুলে বহির্জগৎকে দেখতে শুরু করেছে সে দিন থেকেই সে হিসেব মেলাতে চেষ্টা করেছে: দেবতাকে যথোচিত স্তব ও নৈবেদ্য দিয়েই প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কেন সর্বদা ফল পাওয়া যায় না? এ চিন্তা অন্য জীবের নেই, সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষ দেবতার আরাধনা করে না, কাজেই বঞ্চিত বোধ করার কোনও কারণই তার নেই। মানুষের আছে। ফলে ঋগ্বেদের আদিপর্ব থেকে তার হিসেবে গরমিল দেখা দিয়েছে। যখনই দুই আর দুয়ে চার হয়নি, তখনই সে প্রশ্ন করেছে; এ প্রশ্নের উদ্ভব এক ধরনের যন্ত্রণায়, হিসেব না মেলার অর্থ বিশ্বাসের ভিত টলে যাওয়া। হিসটারম্যান যেমন বলেছেন, 'তখন ব্যাপারটা আর একটি বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যজ্ঞকে অস্বীকার করা নয়, বরং যজ্ঞ নামক

নিরবয়ব প্রতিষ্ঠানটিকেই অস্বীকার করা। যজ্ঞতত্ত্ব হয় সত্য নয় মিথ্যা।'[১] যত দিন যাচ্ছিল ততই হিসেব না মেলার অভিজ্ঞতা বাড়ছিল, অতএব বাড়ছিল প্রাণপণ শক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা; এবং এখানে যে অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা তারই অনুপাতে বাড়ছিল সন্দেহ। মানুষ বাক্‌নির্ভর জীব, তাই সে যুগের বহুতর সন্দেহ বেদেই বিধৃত আছে। যজ্ঞের যুগে মানুষ কী বিশ্বাস করত? এর উত্তর কোথাও স্পষ্ট উচ্চারণে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে যা বোঝা যায় তা হল, জনসাধারণ মোটের ওপরে বিশ্বাস করত: ১) দেবতারা আছেন; ২) তাঁরা মানুষের হিতৈষী অর্থাৎ মানুষের কষ্টের প্রতিকার করতে চান; ৩) তাঁরা শক্তিমান অর্থাৎ মানুষের অভীষ্ট পূরণের ক্ষমতা তাঁদের আছে; এবং ৪) যজ্ঞে স্তোত্র ও হব্য পেলে তাঁরা প্রীত হন ও ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন। ধীরে ধীরে আরও একটা বিমূর্ত ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল: এ বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা অমোঘ শুভশক্তির দ্বারা, যাকে তারা পরে 'ঋত' নাম দিয়েছিল। দিনরাত্রির পর্যায়ক্রমে বা ঋতুগুলির নিয়মিত আবর্তন এই ঋতেরই প্রকাশ। চরাচরের অন্তর্নিহিত সত্য হল এই ঋত, যা দেবতাদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয় না, যার বিপরীতে অবস্থান 'অনৃত' বা মিথ্যার। এ সব বিশ্বাস ছিল তাদের পায়ের তলায় মাটি, মাথার ওপরের আকাশ। এগুলো টলে গেলে তাদের ভুবনে দেখা দেয় চূড়ান্ত বিপর্যয়। ধর্ম তাই সংহতি আনে; বার্জারের কথায়, '...মানুষের ইতিহাসে ধর্ম হল নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী প্রাচীরগুলির অন্যতম।'[২] এই 'ঋত' বা বিশ্বের অন্তর্গত এক নৈতিক ভিত্তি যার প্রকাশ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় এবং মানুষ সেই ভাবে প্রকৃতির অনুসরণ করে যাতে তার সমাজ চলতে পারে নিয়ম মেনে। ঋতের মতোই এক অদৃশ্য নীতিনিষ্ঠ আবর্তন ও আচরণের অনুসরণে মানবসমাজ নিয়ন্ত্রিত হলেই মানুষের মঙ্গল, এ-ই ছিল উপপাদ্য।

মুশকিল বাধে দু-জায়গায়: প্রথমত, প্রকৃতি বারবার নিজেই নিজের নিয়মকে ভাঙে— কখনও কখনও বর্ষাকালে দেখা দেয় খরা, অথবা অতিবৃষ্টি আসে, হঠাৎ ঘটে ভূমিকম্প, পশুপালে মড়ক লাগে, তৃণভূমি শুকিয়ে ওঠে, অথবা ছুটে আসে পঙ্গপাল, দেখতে দেখতে যত্নে লালিত ফসল ধ্বংস হয়ে যায়, বিদেশি শত্রু আক্রমণ করে, মানুষের সমাজে দেখা যায় মহামারি, ঘটে ব্যাপক অকালমৃত্যু। এ সব সময়ে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলে যায়। সহসা সে আবিষ্কার করে যে, প্রকৃতি, জীবন, সমাজ যেমন ভাবে চলার কথা, তেমন ভাবে চলছে না। হঠাৎ সে দেখে সংসারে অশুভ, অমঙ্গল, পাপ, অনৃত আছে; তার সহজ বোধবুদ্ধিতে জীবনের ছক যা হওয়া উচিত তেমন হয় না, ধাক্কা লাগে যখন তার সাধারণ

১. 'It is no longer a question of denying a particular person's (or group's) sacrifice, but of denying the abstract institution of sacrifice. The doctrine of sactifice is either true of false '— J C Heesterman, *On th origin* etc.

২. '...religion has been one of the most effective bulwarks against anomy throughout human history.'— Peter Berger, p 87

বুদ্ধিতে জীবনের জটিলতার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। ক্লিফোর্ড গির্জ তাই বলেন, 'ধর্মকে দেখতে হবে অন্তত সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে অনুভূত একটা ন্যূনতার পরিপ্রেক্ষিতে; জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক একটা মনোভঙ্গির প্রেক্ষাপটে। সাধারণ বুদ্ধির ওপরে একটা প্রতিঘাতের রূপেও (ধর্মকে) দেখতে হবে।'[৩] বৈদিক আর্যরা জীবন বা সমাজ সম্বন্ধে যে একটি ছক বা নকশা তৈরি করেছিল, তার মধ্যে নিয়মের ভূমিকা ছিল সর্বব্যাপী। সেখানে ব্যত্যয় দেখা গেলে সমস্ত সংহতি টলে যায়। মানুষ সর্বদাই কামনা করে তার ব্যক্তি ও সমাজজীবন চলবে একটা স্বীকৃত, পরিচিত নিয়ম ধরে, যেমন চলে চন্দ্রসূর্য, শীতগ্রীষ্ম। সাধারণ ভাবে চলেও তাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শৃঙ্খলা ভেঙে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা বা সুসংহত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব শক্তি দেখা দিত, তার নানা রূপ: ভিন্ন গোষ্ঠীর বা আগন্তুক গোষ্ঠীর শত্রু, যার হাতে পরাজয় এমনই এক অবাঞ্ছিত অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা; আর ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অজন্মা এবং মহামারি— মানুষ ও পশুর। এ সবের মধ্যে মানুষ দেখতে পেত তার জীবনে ও সমাজে হিসেবের বাইরে এক অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ। আকাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্যে সে মনে মনে কল্পনা করল দেবতার। নিজেরই শক্তিমত্তার এক প্রতিরূপ হিসেবে। যাযাবর অবস্থা থেকে আর্যরা প্রাগার্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এসে দেবতাদের দেখল রাষ্ট্রশক্তি, বিশেষত সে-শক্তির নিয়ন্তার প্রতিভূ রূপে। আর্থার উল্‌ফের কথায়, 'দেবতারা রাষ্ট্রের শক্তির রূপক, এ রূপক হল, রাষ্ট্র পরিচালক ও ন্যায়াধীশের।'[৪]

মানুষ কোন নিরিখে তার দেবতাকে নির্মাণ করেছিল? বুদ্ধিমান, শক্তিধর, সক্রিয়, সাহায্যপরায়ণ। এমন একটিই জীব তার জানা ছিল: মানুষ। কাজেই মানুষ নিজের রূপেই অধিকাংশ দেবতাকে কল্পনা করেছিল; অবশ্য কিছু কিছু উপকারী এবং/বা ক্ষমতাশালী নিসর্গবস্তুকেও সম্ভ্রমে বা আতঙ্কে সে দেবায়িত করেছিল। যেমন সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, পর্জন্য, ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ দেবতাতেই সে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি আরোপ করে নির্মাণ করল। প্রতীচ্যে এ নিয়ে পরিহাসবিজল্পনা আছে, 'ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন নিজের প্রতিরূপ হিসেবে। কিন্তু মানুষও তো ভদ্রলোক, তাই সে ঈশ্বরকে নির্মাণ করল নিজের প্রতিরূপে।' এর মধ্যে একটি সত্যও নিহিত আছে।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দেই এই দেবনির্মাণকার্য অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছিল; তবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আনাতোলিয়ার বোঘাজ-কো-ঈ শিলালিপিতে ইন্দ্র, বরুণ, নামত্য, ইত্যাদি

৩. 'Religion must be viewed against the background of the insufficiency, or anyway the felt insufficiency, of common sense, as a total orientation toward life and it mut also be viewed in terms of formative impact upon common sense '— Clifford Geertz, p 96

৪. '...gods are a metaphor for the system of authority, the state. The metaphor in one of rulers and judges...'— Arthur Wolf, p 19

কয়েকজন বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞে দেবতাদের বিগ্রহ থাকত না, তবু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যাস্ক তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থে প্রশ্নটা তুলেছেন। দৈবতকাণ্ডে আগে বললেন, দেবমণ্ডলীর অবস্থান 'নররাষ্ট্রের মতো—তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব।' (৭:৫:৯) অর্থাৎ দেবতারাও একটি সংহত সমাজে বাস করেন যার গঠন মানুষের রাষ্ট্রেরই মতো। পরে প্রশ্ন তুললেন, দেবতাদের আকার বিষয়ে— 'অথাকারচিন্তনং দেবতানাম্।' (৭:৬:১) এর উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে বললেন, 'কেউ কেউ বলে পুরুষের মতোই হবে— পুরুষবিধাঃ সুরিত্যেকম্।' (৭:৬:১) কিন্তু বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি এগুলি স্পষ্টতই পুরুষাকৃতি নয়। তা হলে? তা হলে স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, কেউ কেউ বলে 'পুরুষবৎ নয়— অপুরুষবিধাঃ সুরিত্যেকম্।' (৭:৭:১) দু'রকম মতের সমাহারে সিদ্ধান্ত করলেন, 'অথবা উভয়বিষয়ই হবে— অপি বোভয়বিধাঃ স্যুঃ।' (৭:৭:৭) অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র তো প্রত্যক্ষ ভাবেই মনুষ্যরূপী নয়, এদের আকৃতি মানুষ নির্মাণ করতে পারেনি, এরা যে-রূপ দৃশ্যমান সেই রূপেই পূজ্য। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে যে সব শক্তিধর সহায়ক ও আশ্রয়রূপী দেবতা মানুষ নির্মাণ করেছে, তাদের তো স্বাভাবিক ভাবেই মনুষ্যরূপে কল্পনা করেছে। তাঁদের কান থাকা চাই ভক্তের প্রার্থনা শোনার জন্যে; মন, সহানুভূতি, দয়া, হিতৈষা থাকা চাই মানুষের মতো; ক্ষমতা থাকা চাই মানুষের প্রার্থনা পূরণ করার। আর চাই বস্ত্রালংকার, মানুষের মতো সজ্জা এবং বাহুতে বল, অস্ত্রশস্ত্র, রথবাহন, যাতে দ্রুত এসে মানুষের সংকট মোচন করতে পারেন। মানুষের বিপদে দুর্যোগে যাতে দেবতারা অনুকূল হয়ে তাদের পরিত্রাণ করেন ও প্রার্থিত বস্তু জোগান সেই জন্যে মানুষও দেবতাকে তার প্রতি সদয় করে তোলবার জন্যে নিজের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য নৈবেদ্য হিসেবে দিত এবং দেবতার শক্তি, মানবহিতৈষার নানা স্তব আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে শোনাত, যাতে দেবতারা তাদের প্রতি অনুকূল হয়ে তাদের ইষ্টসিদ্ধি করেন। এই ভাবে নানা বিপদসংকুল পরিবেশে দেবতাদের সঙ্গে একটা পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়ে মনে মনে বিপদ থেকে ত্রাণের বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। এর জন্যে বিগ্রহধারী দেবতা অত্যাবশ্যক ছিল না, কল্পনায় দেবশক্তিকে সহায়রূপে পাওয়াই ছিল প্রয়োজন— 'লোকায়ত ধর্মে চূড়ান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল কোনও দেব বা দেবীকে অব্যবহিতরূপে কাছে পাওয়া... সে বিগ্রহধারীই হোক অথবা বিমূর্তই হোক।'[৫]

দেবতাকে কাছে পাওয়া বা তাঁর কাছে নিজেদের বিপদের সংবাদ ও ত্রাণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিবেদন পৌঁছে দেওয়ার আকুতি থেকেই ধীরে ধীরে বিধিবদ্ধ ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এর অবশ্যই নানা স্তর ছিল: অত্যন্ত সরল সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক স্তর থেকে প্রার্থনার চরিত্র পবিবর্তিত হতে হতে ধর্মানুষ্ঠান ক্রমে বিচিত্রতর হয়ে উঠছিল, 'দেবতারাও সংখ্যায় বাড়ছিলেন

৫. '.. a crucial ingradient in folk religion is the immediate presence of and access to a god or a goddess...which may be iconic or aniconic '--- G.D. Sontheimar & Herman Kulke (ed). p. 4

চক্রবৃদ্ধিহারে, বাড়ছিল পুরোহিতের সংখ্যা, যজ্ঞের সংখ্যা এবং সার্বিক জটিলতা। বহু প্রাচীন দেবতা পরিত্যক্ত হচ্ছিলেন, কারও বা চরিত্র পরিবর্তন ঘটছিল, এবং ধীরে ধীরে বহু নতুন দেবতা দেবমণ্ডলীতে স্থান পাচ্ছিলেন। শেষ দিকে দেবতারা সংখ্যায় এত বেশি হলেন যে, মাঝে মাঝেই তাঁদের নাম ধরে না ডেকে এক সঙ্গে 'বিশ্বে দেবাঃ' বলে সম্বোধন করা হচ্ছিল। জীবনে হার মানতে হচ্ছিল আগন্তুক নানা প্রাকৃতিক বিপদ-আপদের কাছে, রোগব্যাধি ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা বিপর্যস্ত হতে হচ্ছিল, ফলে নতুন নতুন বিপদে পরিত্রাণের জন্যে নতুন নতুন দেবতা উদ্ভাবন করা হচ্ছিল।

দেবমণ্ডলীর অনেকেই আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, অনেকেই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে এবং পরে ব্রহ্মাবর্তে।[৬] আরও কিছু এসেছিল প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণকালে এবং পরে এখানকার প্রাগার্য নানা নৃগোষ্ঠীর সংস্রবে এসে; তাদের দেবমণ্ডলী থেকে আত্মসাৎ-করা নতুন কিছু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে আর্য দেবমণ্ডলীতে। মনে রাখতে হবে, এ দেশে আসবার সময়ে আর্যরা একটি সংহত গোষ্ঠী ছিল না, এবং এখানেও কোনও সংহত প্রাগার্য প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটেনি। 'পশ্চিম এশিয়ার মতো আগন্তুক আর্যরা পরাক্রান্ত শত্রু অথবা বৃহৎ সাম্রাজ্যের সম্মুখীন হয়নি, হলে তারা সংহত হয়ে উঠে অনেক শক্তিশালী একটি নিজস্ব সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য হত।'[৭] তা যখন হয়নি তখন ছোট ছোট গোষ্ঠীর আর্যদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল অনুরূপ প্রাগার্য গোষ্ঠীর সঙ্গে। জয়-পরাজয়ের পরে অধিকাংশ প্রাগার্য গোষ্ঠী সন্ধি করল আর্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে মিশে গেল। এই সন্ধির অনিবার্য শর্ত এবং ফল ছিল দু-পক্ষের ধনসম্পত্তি, জমি, ফসল, পশুপাল ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম সম্পত্তির আদানপ্রদান এবং অন্তর্বিবাহ; এর ফলে একটি মিশ্র নৃগোষ্ঠী গড়ে উঠল, আর্য-প্রাগার্যদের সমাহারে। এরই সূত্র ধরে আদানপ্রদান ঘটে উপাস্য দেবতা ও উপাসনা-পদ্ধতির। এই ভাবেই আর্য দেবমণ্ডলীতে ক্রমে ক্রমে বহু প্রাগার্য দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটল। সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় পূর্বতন দেবমণ্ডলীর বেশ-কিছু আর্য দেবতা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হচ্ছিল। এর মধ্যে, বিশেষত ছিলেন সেই দেবতারা যাদের, বিশিষ্ট সংজ্ঞা, ভূমিকা বা তাৎপর্যের স্মৃতি তত দিনে ধূসর হয়ে এসেছে— যেমন ভগ, অংশ, দক্ষ, তার্যমন্ এবং আপ্রীসূক্তগুলিতে উল্লিখিত অগ্নিবাচক এবং বিস্মৃত তাৎপর্যের অন্য দেবতারা, 'দ্বারো দেব্যঃ উষাসানক্তা', ইত্যাদি। দেবমণ্ডলীতে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত একটি প্রক্রিয়ায় এদের বিবর্তন ঘটছিল: পূর্বের কিছু দেবতাকে বর্জন, কিছু দেবতার তাৎপর্যে পরিবর্তন এবং নতুন কিছু দেবতার আবির্ভাব। এই শেষোক্তরা বেশির ভাগই আসছিল প্রাগার্য গোষ্ঠীর উপাসিত দেবমণ্ডলী থেকে।

৬. সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে। মনুসংহিতা; (২:১৭)

৭. 'Unlike in Western Asia the immigrating Aryans did not encounter mighty enemies and big empires which would have forced them to unite and to establish a more effective political organization of their own.'— Herman Kulke & Dietmar Rothermund, p. 45

মানুষের সমাজে ও দেবতাদের সমাজে যখন এই সংমিশ্রণ ঘটে তখন সে সময়ের মানুষের প্রত্যয়ের জগতে যা কিছু ধ্রুব অবলম্বন ছিল, সেগুলি হল দেবতাদের অস্তিত্ব, তাদের সর্বশক্তিমত্তা ও মানবহিতৈষা। আর বিশ্বাস ছিল, বিজেতা গোষ্ঠীর বাহুবল ও অস্ত্রবলের উৎকর্ষে; অতএব বিজিতের ন্যূনতায়। এরই ফলে একটি নৈতিক মানদণ্ড তৈরি হল: প্রাগার্যের সম্পত্তিতে আর্যের ন্যায়সংগত অধিকার। লুণ্ঠন অব্যাহত ভাবে চলেছিল— বহু সূক্তে দেবতাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, প্রাগার্য সম্পত্তি লুঠ করে এনে আর্যদের দেওয়ার জন্যে। অবশ্যই লুঠ একতরফা ছিল না, প্রাগার্যরাও আর্যদের সম্পত্তি লুঠ করত। ফলে আর্যরা তাদের 'রাক্ষস' (কথাটার আদি অর্থ ছিল, 'যাদের থেকে রক্ষা করতে হয়— যেভ্যো রক্ষ্যতে') বলত। এ ছাড়া আর্যদের কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ছিল, সেখানেও পরস্পরের সম্পত্তি লুঠতরাজ করা চলত। অনুপ্রবেশকারী আর্যদের অধিকার বাহুবল ও অস্ত্রবলের জোরে, প্রাগার্যদের জোর ছিল আদিম স্বত্ববোধে; কাজেই সংঘর্ষ কতকটা অনিবার্যই ছিল।

এ সব ও অন্যান্য নানা জাতের অশুভ, ক্ষতিকর অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে তাদের বিশ্বাসের ভূমিতে আলোড়ন জাগাত: দেবতারা মানবহিতৈষী, সর্বশক্তিমান তবু এত অমঙ্গল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শত্রুর হানা, রোগব্যাধি, লুঠতরাজ কেন হয়? অশুভ বা মন্দকে তারা বলত পাপ, কিল্বিষ, কলুষ, পাপ্মন্, ইত্যাদি। মঙ্গলময় দেবতাদের সঙ্গে একই বিশ্বে এত অমঙ্গল কেমন করে থাকতে পারে? অথর্ববেদের একটি প্রার্থনা, সারা পৃথিবীর সর্বকালের একটি প্রার্থনা হল: 'যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবম্। সর্বমেব শমস্তুনঃ ॥— এখানে (পৃথিবীতে) যা কিছু ঘোর, যা কিছু নিষ্ঠুর, যা কিছু পাপ, তা শান্ত হোক, মঙ্গলে পরিণত হোক, এখানে সব কিছু শান্তিপূর্ণ হোক।' (১৯:৯:১৪) এই প্রার্থনা কখনও কোথাও পূর্ণ হয়নি, তবু সর্বত্রই উপলব্ধ ও উচ্চারিত হয়েছে। ম্যাকক্লস্কি দেখাচ্ছেন, 'সহজতম আকারে সমস্যাটি হল এই: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়, তবুও মন্দ আছে... এগুলির যে-কোনও দুটো যদি সত্যি হত, তা হলে তৃতীয়টি মিথ্যা হত।'[৮] এই মতের স্বাভাবিক যুক্তিগত সিদ্ধান্তটি উমা গুপ্ত-র কথা থেকে নেওয়া যেতে পারে: 'মন্দের উপস্থিতি থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত করতেই হয় যে, কোনও সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বর থাকা অসম্ভব।'[৯]

ফলে নানা সংশয় দেখা দিল, অভ্যস্ত প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা শুরু হল, কারণ সেন্ট অগাস্টিন যেমন বলেছেন, 'মানুষ তা-ই বিশ্বাস করে যা বিশ্বসনীয়' (*Nullus quippe credit, nisi prius cogitaverit esse credendum*)। স্পষ্টতই বিশ্বসনীয়তার সংজ্ঞার মধ্যে এসে

৮. 'In its simplest form the problem in this· God is omnipotent, God is wholly good; and yet evil exists... if any two of them were true, the third would be false.'— H J M McClosky, p. 46, *God and Evil*, ed. Nelson

৯. 'We must conclude from the existence of evil that there cannot be an omnipotent, benevolent God.'— Uma Gupta, p. 84

গেছে যুক্তি, তাই সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময়ের বিধানে মন্দের, অশুভের অবস্থান যুক্তি দিয়েই অবিশ্বনীয়। অতএব মানুষ অবিশ্বসনীয়কে বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ করল। যদি কোনও সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বর বা দেবকুল না থাকেন তো মানুষের নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও দোলাচলতা আসে; কোন নীতিতে চলা উচিত, সে নিয়েও মনে প্রশ্ন আসে। আর্যদের দীর্ঘ যাত্রাপথে এ ধরনের মন্দের অভিঘাত বেশ দীর্ঘকাল ধরেই তাদের বিশ্বাসকে ধাক্কা দিচ্ছিল। ক্লিফোর্ড গির্জের ভাষায়, 'বিপর্যস্ত হওয়া, দুঃখ এবং নৈতিক দ্বিধার অজ্ঞেয়তার বোধ... যদি সেগুলি যথেষ্ট তীব্র হয় অথবা দীর্ঘকাল ধরে সেগুলিকে বহন করতে হয় তা হলে জীবন যে বোধগম্য বা আমরা চিন্তা করে জীবনের ছকে নিজেদের সার্থক ভাবে মানিয়ে নিতে পারি এই ধারণার মূলই প্রত্যাহত হয়।'[১০] অর্থাৎ মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান দেবতাদের কর্তৃত্বের অধীনে বাস করার ভরসাটা টলে গেলেই আসে সংশয়। মানুষ সর্বদাই চেয়েছে নির্ভরযোগ্য একটি বিশ্বপরিকল্পের মধ্যে বাস করতে, কারণ সেখানেই তার ধ্রুব আশ্রয়, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত অবস্থান।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রথম যুগে দেবতাদের মধ্যে ক্ষমতার কোনও আনুপাতিক স্তরবিন্যাস ছিল না, এমনকী বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও কোনও ধ্রুব অপরিবর্তনীয় ভিত্তি ছিল না। প্রথমত, আর্যরা দীর্ঘকাল ধরে ধাপে ধাপে নানা দেশ পেরিয়ে এসেছে, এসেছে অন্যান্য বহু ধর্মবিশ্বাসীর দেশ পেরিয়ে, সেখানে অনিবার্য ভাবেই তাদের নিজেদের বিশ্বাসও বিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই প্রাচীন গ্রিসের মতো এখানেও কোনও অনড় অবশ্যস্বীকার্য বা সর্বস্বীকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি তাদের থাকা সম্ভব ছিল না। প্যাট্রিক দেখাচ্ছেন, 'কোনও ধ্রুব বিশ্বাসের কাঠামো ছিল না, যাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হতে পারে; আর তার চেয়েও যা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় তা হল (দেবতাদের) কোনও উচ্চনীচ ক্রম ছিল না। ধর্ম ছিল উপাসনানির্ভর। এবং পুরোহিতদের ভূমিকা তাঁদের ক্ষমতার চেয়ে সম্মানই বেশি দিয়েছিল।'[১১] উপাসনানির্ভর ধর্মের ভিত্তি হল উপাস্যদের সম্বন্ধে আস্থা। কী সেই আস্থা? যেমন আগেও বলেছি, তাঁরা আছেন, তাঁরা সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময়, মানবহিতৈষী এবং উপাসনা যদি যথাযথ রীতিতে নিষ্পন্ন হয় তা হলে তাঁরা প্রার্থীর অভিষ্ট সিদ্ধ করেন।

১০. 'Bafflement, suffering and a sense of intractable ethical paradox are... if they are intense enough or are sustained long enough radical challenge to the proposition that life is comprehensible and that we can by taking thought orient ourselves effectively within it.'— Clifford Geertz p 100

১১. 'There were no dogmas to confuse the mind, and what was still more remarkable, there was no hierarchy. The religion was one of worship and the position of the priesst conferred more honour than power.'— M M Patrick, p. 4

সংশয়ের বীজ

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে একাদশ-দশম শতক পর্যন্ত যে-কালপর্যায়ের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনাকাল সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে মনে করা হয় সে সময় বৈদিক আর্যদের বিশ্বাসের ছকটা আসলে কী ছিল, ঋগ্বেদের পাঠ ছাড়া তা জানবার আর কোনও উপায় নেই। আর কোনও প্রমাণ বা দলিল তো পাওয়াই যায় না। অতএব ঋগ্বেদে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই আমাদের বৈদিক আর্যদের ওই কালপর্বের বিশ্বাসের তথ্য বলে মেনে নিতে হবে। এই ঋগ্বেদ সংহিতার অধিকাংশই, অর্থাৎ প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সূক্তেই দেবতার সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদানের কথা আছে, অর্থাৎ 'হে দেব, তোমাকে আমরা এই স্তোত্র, এই হব্য নিবেদন করছি, এটা গ্রহণ করে প্রীত হয়ে তুমি আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করো।' এই ধরনের প্রার্থনার অন্তরালে কিন্তু ওই সব বিশ্বাসই বর্তমান, অর্থাৎ দেবতা আছেন, প্রার্থনা শুনতে পান, স্তোত্র, নৈবেদ্য ও যথাযথ যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি প্রীত হন, প্রার্থী যা চাইছে তা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং ইচ্ছাও আছে। সর্বশক্তিমান, মানবহিতৈষী দেবতারা আছেন এবং তাঁরা যজ্ঞকারীর নিবেদন শুনে তাকে তৃপ্ত করবেন এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সূক্ত দাঁড়িয়ে আছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে, তখন অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী ছিল। এ সিদ্ধান্তে কিছু ফাঁক আছে, কারণ তখনকার যা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তাতে ওই বিশ্বাস না থাকলেও তাদের যজ্ঞ করা ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির কোনও পথই জানা ছিল না। কাজেই যজ্ঞে প্রার্থিত বস্তু পাওয়া না গেলেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, স্তব ও প্রার্থনার সূক্ত রচিত হত, যজ্ঞে সেগুলি আবৃত্তি ও গান করাও হত। এবং এর নেপথ্যে কিছু মানুষের সংশয়ও জন্মাচ্ছিল, কোথাও কোথাও তা বাড়ছিলও, কিছু সূক্তে তা প্রকাশও পাচ্ছিল। আমাদের বর্তমান এই রচনাটির ভিত্তি এই সূক্তগুলি।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, এ সব সংশয় কাদের মনে উঠেছিল? প্রশ্নকর্তারা কোনও বিশেষ একটি অংশের মানুষ নন, বরং এঁরা তৎকালীন সমাজের বৃহৎ একটি বৃত্তাংশে ছড়িয়ে ছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন ব্রহ্মচর্যের শেষে সমাবর্তনের পরে গৃহে প্রত্যাবৃত ছাত্র, ব্রহ্মচারী; আছেন রাজা, ঋষি, ভ্রাম্যমাণ নানা মতের প্রবক্তা ও গুরু; সাধারণ ক্ষত্রিয়, তরুণ বালক, প্রখ্যাত আচার্য ও আরও অনেকে; অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বহু মানুষ। এখন একটি সঙ্গত প্রশ্ন আপনিই আসবে: যে-সমাজে দেবতাদের ওপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই

তখনকার একমাত্র ধর্মানুষ্ঠান— যজ্ঞ— আচরিত হত, সে-সমাজের সাহিত্যে সেই দেবতাদের অস্তিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, মঙ্গলময়ত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ও মানবহিতৈষা এবং যজ্ঞের প্রণালী ও তার উপযোগিতা নিয়ে যদিও বা কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠে থাকে, তবু সে সব প্রশ্ন ধর্মগ্রন্থে সংরক্ষিত হল কেন? এ সব প্রশ্ন তো সমকালীন ধর্মাচরণের মূলে আঘাত করছে, এগুলো তো অগ্রাহ্য করে বিলোপ করাই হত সমাজস্বার্থের অনুকূল।

এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর বেদ থেকে পাওয়া যায় না, অতএব আমাদের নির্ভর করতে হবে যুক্তিযুক্ত অনুমানের ওপরে। দুটি সম্ভাব্য অনুমান করা যায়: প্রথমত, সংশয়-সূচক ঋক্ বা সূক্ত বা অংশগুলির রচয়িতা বলে যাঁদের নাম পাচ্ছি, তাঁদের বাইরেও সমাজের বৃহৎ একটি অংশের মধ্যেও এ-জাতীয় সংশয় পরিব্যাপ্ত ছিল। এঁদের সংখ্যাটা উপেক্ষনীয় নয় বলেই এ সব সংশয়কে তৎকালীন ঋষিমণ্ডলী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যাঁদের নামে সংশয়সূচক অংশগুলি শাস্ত্রে বিধৃত হয়ে আছে তাঁরা তখনকার সমাজে এতটাই সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, তাঁদের রচনা, তাঁদের সংশয় ও প্রশ্ন অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া তখনকার শাস্ত্রে অর্থাৎ ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত সাহিত্যে এমন অনেক কথা সংরক্ষিত আছে যা আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের তাৎক্ষণিক স্বার্থের প্রতিকূল, তবুও এগুলি রক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে এক ধরনের মৌলিক সত্যনিষ্ঠার প্রমাণ আছে: মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত এত স্তব যদি স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা, তাহলে সেই সময়েরই মানুষের সংশয়ের প্রকাশই বা কেন থাকবে না? ঠিক এই কারণেই দ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, স্বার্থপরতা, অন্যের ক্ষতি, সম্পত্তিনাশ, এমনকী মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা এবং দেবতাদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাতের বহু প্রমাণ বেদে রয়ে গেছে। ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদে এই সংরক্ষণ প্রাচীন মনস্বীদের উদারতার একটি নজির, এবং এর উত্তরাধিকারীদের, অর্থাৎ আমাদের একটা গর্বের বস্তু।

সংশয়ের আলোচনা করার আগে দেখা দরকার কীসে তাদের সংশয় ছিল না। প্রকৃতির সুনিয়ন্ত্রিত আচরণে— দিনরাত্রি ও ঋতুর নিয়মিত আবর্তনে— একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তার চিহ্ন এ সাহিত্যে প্রায় সর্বত্র। প্রকৃতির ব্যতিক্রমী আচরণ যেমন খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, পঙ্গপাল নিয়ে তাদের স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বিস্ময় ছিল; কিন্তু সেটার কারণ তারা ধরে নিয়েছিল যে, প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে। সে-নিয়ম, প্রকৃতিতে ও সমাজে, ঋত; বরুণ ঋতের অধিদেবতা এ কথাও যেমন শুনি, তেমনই ঋত একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তি এ বিশ্বাসও তাদের ছিল। এ ছাড়া সমাজে উচ্চনীচ ভেদেও তাদের বিশ্বাস ছিল। ঋগ্বেদেই বর্ণভেদ দেখা দেয় এবং তখন থেকে উচ্চতার মানদণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য— ত্রিবর্ণের পুরুষের স্থান ওপরে; প্রাগার্য, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, শূদ্র, দাস এবং নারী নীচে। আর্য শ্রেষ্ঠ জাতের মানুষ, বাকিরা অপকৃষ্ট; তাদের চেহারা খারাপ, তারা আচরণহীন, শিশ্নোদর নিয়েই থাকে; আর্য উপাসনা-পদ্ধতিতে তাদের বিশ্বাস নেই। আর্যের উপাসনা-পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট। 'কীকটের (বঙ্গদেশ) লোকেরা যজ্ঞ করে না, ওরা গাভি নিয়ে কী করবে? কাজেই, হে দেবতা, ওদের গাভিগুলো আমাদের

এনে দাও।' এ কথার ভিত্তি ওই আর্য শ্রেষ্ঠত্ব। এবং ওই নীতিতেই আর্যেতর মানুষের সম্পত্তিতে আর্যের অধিকার আছে, এও তাদের বিশ্বাসের একটা অঙ্গ। 'রুদ্র, তুমি আমাদের সন্তান ও পশুপালের ওপরে তোমার অস্ত্র নিক্ষেপ কোরো না; তুমি আমাদের শত্রুদের সন্তান, সম্পত্তি ধ্বংস করে দাও।' দেবতাদের দিয়ে শত্রুনাশ ও শত্রুর সম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্যে প্রার্থনার পাশাপাশি ঘটনা হল যে আর্যরা নিজেরাও প্রয়োজন মতো সে-কাজ করত। কাজেই সমাজে বর্ণগত ও লিঙ্গগত উচ্চাবচতায় সাধারণ ভাবে বিশ্বাস ছিল, এবং এই বিশ্বাসের বশে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের ও বর্ণভেদের (প্রাগার্যদের) বাইরের মানুষদের হীন জেনে প্রয়োজনে তাদের ওপর অত্যাচার করত। আর নারীকে একেবারে প্রথম পর্বের পর থেকেই সাধারণ ভাবে হীন বলে মনে করা হত। সমাজে এ সব বিশ্বাস ভিত্তিস্থানীয় ছিল, এ নিয়ে মতভেদ বা আচরণে ভেদ ছিল না, কারণ এর সবটাই— আর্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নারী, পুরুষ— ঘোরতর প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

সমাজে যেখানে বিপত্তি, অভাব, অসংগতি, যেখানে তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিকার ছিল না, সেখানেই স্থান দেবমণ্ডলীর ও তাঁদের কেন্দ্র করে যজ্ঞানুষ্ঠানের। সংশয়ের ভূমি সেইখানেই। প্রশ্ন, সংশয় কীসে? যজ্ঞে যেহেতু মূর্তি ছিল না তাই আর্যদের কাছে তাদের দেবতার উদ্ভব ছিল তাদের কল্পনায়। যাস্কের নিরুক্তে দেবতাদের আকার নিয়ে আলোচনায় দেখেছি মানুষের আকারে কল্পনা করা একান্ত স্বাভাবিক বলে তাই ঘটেছিল; তাই বেদের দেবতারা— প্রকৃতির শক্তি, যেমন বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, পর্জন্য, অগ্নি বাদ দিয়ে সবাই মনুষ্যরূপী। তবু যে কিছু কিছু সংশয় ছিল তা জানা যায় যাস্কের নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে। যেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'তা হলে অশ্বিন্‌রা (দুজন) কারা?' উত্তরে শুনি, 'কেউ বলে এরা আকাশ ও পৃথিবী, কেউ বলে এরা দিন ও রাত্রি। আবার কেউ-বা বলে এরা পুণ্যবান রাজা (অর্থাৎ উচ্চবর্গের মহান মানুষ)।'[১]

এর থেকে বোঝা যায়, দেবতাদের মৌলিক সত্তা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল এবং ভাল কাজ করেছে এমন মানুষও দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন। ঋগ্বেদ রচনা শেষ হওয়ার শ-চারেক বছর পরে যাস্ক এ কথা বলেন। কিন্তু, এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই ধরনের বিকল্প ভাবনা সমাজে আগে থেকেই ছিল, না হলে 'কেউ বলে' বলে যাস্ক তিনটি বিভিন্ন মত উদ্ধার করতে পারতেন না। এই সব বিকল্প মত ঋগ্বেদের সময়েই ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়েছিল এবং প্রচলিত ছিল, যাস্ক সেগুলিকে একত্র করে বলছেন মাত্র। দেবতাদের আদিসত্তা বা স্বরূপ নিয়ে তখনই মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল।

দেবতাদের স্বরূপের চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত যে-প্রশ্নটি তা হল, দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস। সমস্ত যজ্ঞপ্রক্রিয়ার ভিত্তিই, দেবতারা আছেন— এই বিশ্বাস।

১. তৎ কাবশ্বিনো দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে অহোরত্রাবিত্যেকে সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৈতিহাসিকাঃ। (১২:১:৫-৮)

যজ্ঞে তো দেবতারা বিমূর্ত, তাঁদের আহ্বান করে প্রার্থনা করা হয়। কখনও সে-প্রার্থনা পূর্ণ হয়, কখনও হয় না। স্বভাবতই চিন্তাশীল মানুষ ভাববে, 'আমরা যে হব্য সাজিয়ে, স্তবগান করে এই সব দেবতাদের আহ্বান করে প্রার্থনা জানাই, এঁদের তো দেখতে পাই না, এঁরা কোথায় থাকেন?' হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলছেন, 'সূর্য এখন কোথায়, কে তা জানে, কোন্ আকাশে এখন তিনি তাঁর রশ্মিজাল বিকীর্ণ করছেন?'[২] মনে হয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে এ প্রশ্ন ঋষির ও অন্য অনেকেরই মনে জেগেছিল: 'যে-সূর্যকে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দেখা যায়, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সেই সূর্য কোথায় যায়, কে তা জানে?' অর্থাৎ, কেউই তা জানেন না। বামদেব ঋষি বলছেন, 'কোন পথটি দেবতাদের কাছে পৌঁছেছে, কে তা জানে, কে তা বলবে?' দেবতাদের যে আবাসগুলি অধোমুখী দেখা যায়, সে সব আবাস কে জানে, কোন গোপন উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠানে (তা জানা যায়?)।' (ঋগ্বেদ ৩:৫৪:৫) ঋষি ঋণঞ্জয় বলছেন, 'কোথায় থাকেন ইন্দ্র? কোন্ বীর ইন্দ্রকে দেখেছে?'[৩] বামদেব ঋষি প্রশ্ন করেন, 'কোথায় তোমার বাসস্থান? কেন আমাদের আনন্দিত করছ না?'[৪] অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে ঋষি আত্রেয় ইষ জিজ্ঞাসা করছেন, 'সেই অগ্নি কোথায় থাকেন, যাঁর আগমনে হৃষ্ট ভক্তজনেরা অগ্নিস্থানে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন?'[৫] অরণি দুটির সংঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এটা তারা চোখেই দেখত। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসত, যখন মানুষ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করছে না, তখন অগ্নি কোথায় থাকেন? তেমনই অন্য এক ঋষি, মান্য, প্রশ্ন করছেন, 'হে আদিত্যগণ, এই জীবিত যে আমরা, আমাদের অভিমুখে দ্রুত চলে এসো। মৃত্যুর আগে কোথায় থাক তোমরা, আমাদের হবন শোন তো?'[৬] যজ্ঞকালে যাঁদের আহ্বান করে রহূগণপুত্র গোতম ঋষি অগ্নিকে বলছেন, 'তুমি (আসলে) কে, কোথায় আছ?'[৭] স্তব ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হচ্ছে, তাঁরা যজ্ঞকারীদের মানসলোকে বাস করেন, বা অবতীর্ণ হন যজ্ঞের সময়ে। কিন্তু অন্য সময়ে? কোথায় থাকেন তাঁরা? গূঢ়, অনুচ্চারিত যে-প্রশ্নটি এর অন্তরালে আছে তা হল: কোথাও তাঁরা সত্যিই আছেন তো?

প্রশ্নটা খুবই জরুরি, কারণ এরই সঙ্গে জড়িত তাদের অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাগুলি যেগুলির সমাধানের জন্যে তারা যজ্ঞ করে। তাই যজ্ঞের উপযোগিতা, পদ্ধতি নিয়ে সংশয় আসবেই, 'কে সেই যজ্ঞকারী, হে অগ্নি, যে তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ সাধন করে সমৃদ্ধি পেয়েছে? হে অগ্নি, কেমন মন নিয়ে আমরা যজ্ঞ করব?'[৮] এর পশ্চাতে একটা হতাশাজনিত সংশয়

২. ক্বেদানীং সূর্য: কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান॥ ঋগ্বেদ (১:৩৫:৭)
৩. ক্ব স্য বীরঃ কো অপশ্যদিন্দ্রম্। ঋগ্বেদ (৫:৩০:১)
৪. কা তে নিষত্তিঃ কিমু নো মমৎসি। ঋগ্বেদ (৪:২১:৯)
৫. কুত্রা চিদস্য সমৃতৌ রণ্বা নৃষদনে। ঋগ্বেদ (৫:৭:২)
৬. জীবান্নো অভি ধেতনাদিত্যাসঃ পুরাহ্ থাৎ। কদ্ধ স্থ হবনশ্রুতঃ॥ ঋগ্বেদ (৯:৬৭:৫)
৭. কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ। (১:৭৫:৩)
৮. কা ত উপেতির্মনসো বরায় ভুবদগ্নে শংতমা কা মনীষা। কো বা যজ্ঞৈঃ পরি দক্ষং ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম। (১:৭৬:১)

আছে; যে-মন নিয়ে ভক্ত উপাসনা করছে তাতে অভীষ্ট ফল পাচ্ছে না; তাই এই আর্ত আকুতি। অর্থাৎ যজ্ঞে হব্য ও স্তোত্র দিয়েও প্রার্থী জানে না কেমন মনোভাব নিয়ে যজ্ঞ করলে সেটা সফল হবে। তারই সঙ্গে প্রশ্ন আসে ইন্দ্র— যজ্ঞে যিনি অদৃশ্য— তাঁকে আহ্বান করলে তিনি কেমন করে শুনবেন? 'স্তোতার (স্তব) ইন্দ্র কেমন করে শোনেন? শুনেও বা কেমন করে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন? ইন্দ্রের কোন সব প্রাচীন দানের কথা জানা যায়, এই সব হব্য পেয়ে ইন্দ্র কেমন করে স্তোতার বাসনা জানবেন?'[৯] এ প্রশ্ন যজ্ঞকারীর থেকেই যায়— প্রার্থী স্তব নৈবেদ্য দিয়ে দেবতার উপাসনা করলে দেবতা কেমন করে প্রার্থীর মনোভাব জানবেন? না জানলে তো প্রার্থনা পূরণের প্রশ্নই ওঠে না। ঋষি ত্রিত কুৎস বলেন, 'তোমরা (হে দেবতারা) যারা আলোকিত ত্রিলোকে আছে, তোমাদের ঋত, অনৃত কোথায় থাকে? পূর্বকালে আমরা যে-আহুতি অর্পণ করেছিলাম, সেগুলো কোথায় আছ? তোমরাই তা জান, হে আমার আকাশ ও পৃথিবী।'[১০]

প্রার্থনা করে, স্তব করে, নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ করেও যখন ফল ফলে না তখন এক গভীর নৈরাশ্য ভক্তকে আচ্ছন্ন করে, সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্নও আসে। এর ঠিক পরেই তাই দেখি, 'হে দেবতারা, পুরাতনকালে যে সব উপকার করতে, সেই উপকার করার ক্ষমতা তোমাদের কোথায় গেল? কোথায় গেল হে বরুণ ঋতকে ধারণ করার, (ভক্তকে) রক্ষা করার সেই ক্ষমতা? হে অর্যমা, ভক্তকে দুর্গম দেশে পথ দেখাবার ক্ষমতা কোথায় গেল? হে আমার আকাশ-পৃথিবী, তোমরাই তা জান।'[১১] ভক্তরা একাগ্রচিত্তে দেবতাদের স্তব করেন, তার পর কী হয় সে সব স্তোত্রের? সেগুলি কি কোথাও পৌঁছোয়? কক্ষীবান বলছেন, 'হে অশ্বিদ্বয়, কোন সেই স্তব যা তোমাদের প্রীত করে? এমন কোনও স্তোতা কি আছে যে তোমাদের তুষ্ট করতে পারে? তোমাদের ভক্তরা যারা তোমাদের শৌর্য জানে না, তারা তোমাদের কোন্‌ভাবে তুষ্ট করবে?'[১২] সব কিছু সাধ্য মতো করেও, দেবতাদের স্তব, খাদ্য দিয়েও যখন অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না তখন সেই দেবতার উদ্দেশে প্রশ্ন নিবেদন করে ভক্ত: 'তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হচ্ছ না, কেন তুমি আমাদের তুষ্ট করার জন্য আমাদের প্রার্থিত দান দিচ্ছ না?'[১৩]

৯. কথা শৃণোতি হূয়মানমিন্দ্রঃ কথা শৃণ্বন্নবসামদ্য বেদ। কা অস্য পূর্বীরুপমাতয়ো হ কথৈনমাহুঃ পুশুরিং জরিত্র। (৪:২৩:৩)
১০. অমী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ। কদ্ধ ঋতং কদনৃতং ক্ব প্রত্না ব আহুতির্বিত্তং মে অস্য গোদসী। (১:১০৫:৫)
১১. কদ্ধ ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণম্। কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো, বিত্তং মে অস্য রোদসী। (১:১০৫:৬)
১২. কো রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বাং কো বাং জোষ উভয়োঃ। কথা বিধাত্যপ্রচেতাঃ। (১:১২০:১)
১৩. কিমু নো মমৎসি কিং নো দুদু হর্ষদে দাতবা উ। (৪:২১:৯)

যজ্ঞ তো নিষ্কাম কর্ম নয়, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ অবস্থায় মানুষ যজ্ঞ করত। সে-অবস্থা হয় বিপদের, রোগশোকের অথবা কোনও কোনও বস্তুর অভাবের। এ সব অভাব মেটাবার জন্যে, আতঙ্ক, অনিশ্চয়, অভাব বা বিপত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যজ্ঞ; বিধিমতে সে-যজ্ঞ করেও যখন প্রার্থীর আশা পূর্ণ হয় না, তখন সে অন্ধগলির প্রান্তে এসে ঠেকে। কারণ, প্রকৃতিকে জয় করার ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে একটি উপায়ই তার জানা আছে: যজ্ঞ সম্পাদন। সে-উপায় যখন নিষ্ফল হয় তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে। বহু সূক্তের বহু ঋকেই এই গভীর হতাশা প্রতিফলিত। এই হতাশাতেই অন্তর্নিহিত থাকে প্রশ্ন ও সংশয়। দেবতারা মঙ্গলময়, এমন একটা বিশ্বাস হল সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের, সমস্ত যজ্ঞবিধির ভিত্তিভূমি। যখন মানুষ মনে করে যে, বিশ্বচরাচরে ঋত আছে, তার অধিষ্ঠাতা বরুণ আছেন, আছেন অন্যান্য মানবহিতৈষী সর্বশক্তিমান দেবতারা, অথচ তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্বে আছে নানা অশুভ শক্তি, যেগুলি নানা ভাবে মানুষকে ব্যর্থ করে, পীড়া দেয়, তখন সমস্ত বিশ্ববিধান সম্বন্ধেই একটা গভীর সংশয় দেখা দেয়। 'মন্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দেবসার্বভৌমবাদ প্রথমে সেই সব তত্ত্বকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয় যেগুলি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কেমন করে একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বর পৃথিবীতে মন্দকে স্থান দিতে সম্মত হন।'[১৪]

সংসারে মন্দের নানা রূপ; তবে সাধারণ ভাবে বলতে গেলে যা-কিছু ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থকে আঘাত করে, তা-ই মন্দ। এ মন্দ প্রকৃতির যে-শক্তি মানুষের অনিষ্টসাধন করে তাতেও যেমন স্পষ্ট, মানুষের দ্বেষহিংসা, ক্ষতিকারক কার্যকলাপ, তাতেও তেমনই প্রকাশিত। আবার যখন দুরারোগ্য রোগ, যন্ত্রণা, অকালমৃত্যু, প্রতিবন্ধিত্ব মানুষকে আঘাত করে শরীরে মনে, তখন সে-ও মন্দের এক রূপ, সহজ বুদ্ধিতে যার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। তখনই মানুষের মনে গভীর সংশয় দেখা দেয়: দেবতারা যদি মঙ্গলময় ও মানবহিতৈষী হন, তাঁরাই যদি বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রণ করেন তবে যা মানুষের স্বার্থের প্রতিকূল, যা তাকে পীড়া দেয় তার ক্ষতি করে, এমন শক্তিকে তাঁরা এ সংসারে প্রবেশ করতে দিলেন কেন? এই বিরোধ আস্তিক্যের মর্মমূলে টান দেয়, বিশ্বাসকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়।

মানুষের মনে দেবতাদের সম্পর্কে সংশয় অনেকগুলি রূপে দেখা দিতে পারে। দেবতাদের সঙ্গে মানুষের প্রথম সম্পর্ক যজ্ঞে: অনুষ্ঠানে প্রার্থনাপূরণ না হলে মানুষ ভাবতে বসে, গোলমালটা কোথায়? যজ্ঞের নৈবেদ্যটা কি ঠিকঠাক হয়নি, মনোমতো হয়নি দেবতাদের? যজ্ঞের প্রক্রিয়া কি তাঁদের অভিমত নয়? আমাদের স্তব কি তাঁদের প্রীত করেনি? এগুলিই যদি কারণ হয়, তাহলে সমস্যা হল, এ সব বিষয়ে তাঁদের অভিরুচি কী তা কেমন করে জানা যাবে? এইখানে ভক্ত ও তার ভগবানের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মহাশূন্যের ব্যবধান থেকেই যায়।

১৪. 'Theodicy originally referred to theories that sought to explain how an all-powerful and all-good God can permit evil in the world.'— Peter Berget, p. 36

ঋষি গৌতম প্রশ্ন করেন: 'দেবতাদের বিধিমতে আরাধনা করার পরেও কোন (ঋত্বিক) জানতে পারেন কার কাছে পৌঁছোল (সেই হবি, ঘৃত ইত্যাদি), কে জানতে পারে সেই উদ্দিষ্ট দেবতা (ইন্দ্র) কে?'[১৫] ত্রিত কুৎস প্রশ্ন করেন অগ্নিকে, 'সমস্ত যজনীয়দের আদিভূত (অগ্নি)-কে প্রশ্ন করি, যিনি (দেবতাদের) দূত তিনি (আমাকে) বলুন, আমাদের (প্রতি বর্ষিত) তাঁর পুরাতন প্রসাদগুলি কোথায় গেল? বর্তমানে তাঁর নূতন প্রসাদ কে ভোগ করছে? আমার আকাশ পৃথিবী তা জানেন।'[১৬] দেবতারা আমাদের বলুন, এ প্রার্থনা নানা ভাষায় বারে বারে আছে। আমরা বুঝতে পারছি না, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিতে, যুক্তিতে যেমনটি হওয়ার কথা তা হচ্ছে না, মিলছে না হিসেব; অতএব দেবতারা আমাদের বলুন। আমরা সন্দেহ করতে চাই না, কিন্তু যখন দুই আর দুই মিলে বারেবারেই তিন কিংবা পাঁচ হয়, তখন শুধু খটকা লাগে না, সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে টান পড়ে। প্রশ্ন উদ্যত হয় দেবতাদের উদ্দেশে। অথচ দেবতারা তো সংশয় নিরসন করেন না, ভক্তের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না, কাজেই প্রশ্ন থেকেই যায়। ঋষিরা যখন স্তব রচনা করেন তখন সে সব প্রশংসার উৎস তাঁদের বিশ্বাস এবং প্রয়োজন; স্তবের সঙ্গে যুক্ত থাকে বহুবিধ প্রার্থনা, সুস্থ, বিজয়ী, নীরোগ, দীর্ঘজীবী, প্রাচুর্যপূর্ণ, সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে যা যা প্রয়োজন তার জন্যে প্রার্থনা। অনেক সময়ে প্রার্থনার সঙ্গে থাকে দানস্তুতি অর্থাৎ কোন দেবতা কোন কোন পূর্বতন প্রার্থীকে কী কী দান করে কৃতার্থ করেছেন তার তালিকা। জ্ঞানের জন্যে, পারিবারিক শান্তির জন্যেও প্রার্থনা থাকে; জীবনের অজ্ঞেয়, রহস্যময় দিক, যা চিরকাল মানুষকে ভাবিয়েছে তাকে বোঝবার জন্যেও চেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে বহু সূক্তে।

সারা পৃথিবীতেই জীবনের রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা একটা দুর্লভ সম্পদের মতো মুষ্টিমেয় কিছু মনীষী সংগোপনে রক্ষা করেন। ঋগ্বেদ-অথর্ববেদে এমন কিছু সূক্ত আছে যার ব্যাখ্যা প্রশ্নাতীত নয়, নানা ভাষ্যকার নানা ভাবে অর্থ করার পরেও যেগুলির বিবক্ষিত বিষয়টি রহস্যাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। অর্থাৎ এগুলি যেহেতু জীবনের মৌলিক রহস্য সম্বন্ধে রচয়িতা ঋষির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, যা তিনি স্বভাবতই কতকটা রহস্যাবৃতই রাখতে চেয়েছিলেন, তাই অভিধাগত অর্থ দিয়ে তাঁর উপলব্ধির গহনে প্রবেশ করা যায় না। তেমনই খিলসূক্তে কিছু কিছু সূক্ত আছে যার পশ্চাৎপট হারিয়ে গেছে বলে সেগুলির যথাযথ অর্থ আজ আর জানা যাবে না। এগুলি কতকটা ইচ্ছে করেই ধাঁধার আকারে রচিত, হয়তো এগুলিরও অন্তর্গূঢ় অভিপ্রেত অর্থের মধ্যে আদিতে কিছু প্রশ্ন নিহিত ছিল, যার সমাধান না করতে পেরে রচয়িতা তাঁর ওই সব অনুত্তরিত প্রশ্ন প্রহেলিকার আকারে সংরক্ষণ করেছেন। এ সব প্রশ্ন স্পষ্ট আকারে নেই বলে এদের আজ আর স্বরূপে চেনা যাবে না। কিছু আছে যা

১৫. কস্মৈ দেবা আ বহানাশু হোম কো মাংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ। (১:৮৪:১৮)

১৬. যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং স তদ্দুত বি বোচেতি। ক্ব ঋতং পূর্বং গতং কস্তদ্বিভর্তি নূতনং বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ (১:১০৫:৪)

আজকের পণ্ডিতরা ভূমি, পশু ও নারীর প্রজনিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্যে— সম্ভবত কিছু সুচিরলুপ্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে— আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন; এগুলির মধ্যেও কিছু জিজ্ঞাসা আছে যা জিজ্ঞাসার আকারে উপস্থাপিত নয়, প্রতিপাদিত তথ্যের আকারে রক্ষিত আছে। যা বলতে চাই তা হল সরাসরি প্রশ্ন ছাড়াও গৌণ ভাবে তৎকালীন মনীষীদের নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয় নানা আকারে রয়ে গেছে যেগুলিকে অভিধাগত অর্থে চেনা যাবে না. তাই সেগুলির যথার্থ স্বরূপ হয়তো কোনও দিনই উদ্‌ঘাটিত হবে না।

আমাদের আলোচনা অবশ্য উচ্চারিত প্রশ্ন নিয়েই। আর্যদের দেবমণ্ডলীতে প্রধান দেবতা ছিলেন তাঁদের অভিযানের দেবায়িত সেনাপতি ইন্দ্র। এই দেবায়ন তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটেছিল এবং তখন তিনি তাঁর ভক্তদের সব রকম সমস্যার সমাধান করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ধনদাতা, অন্নদাতা, ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্তের এক-চতুর্থাংশের বেশি অংশের দেবতা ইন্দ্র। প্রথম দিকে দেবমণ্ডলীর প্রধান, পরবর্তীকালে তিনিই হলেন দেবরাজ। ইন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট আধিপত্য প্রয়োগ করলে অন্যান্য দেবতারা যথাযথ আচরণ করবেন, সমস্যা থাকবে না। সেই জন্যে ইন্দ্র সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ভক্তদের, তাই তাঁকে নিয়েই নানা সংশয়। এত ক্ষমতাবান যে ইন্দ্র 'কোন বোধে সেই পরমদেবতাকে মানুষ অবধারণ করবে? সেই মহান দেবতা এক নিমেষেই তাঁর মনীষা দিয়ে আশ্চর্য (কর্ম) সম্পাদন করেন। তিনি (ভক্তের) পাপ ক্ষমা করেন এবং স্তোতাকে দান করেন।'[১৭] প্রশ্ন বামদেব ঋষির, এবং শুধু তাঁর নয়, বহু ভক্তেরই: 'এমন যে মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র, কোন মনীষা দিয়ে তাঁকে জানবে মানুষ?' অর্থাৎ ইন্দ্রকে ধারণা করে বোধের অন্তর্ভুক্ত করা মানুষের সাধ্য নয়।

এখানে প্রশ্ন মানুষের জ্ঞানের বা বোধের সীমা নিয়ে, মানুষের বোধের বাইরে ইন্দ্র; তাঁকে ধারণা করা মানুষের সাধ্য নয়। কিন্তু নেম ভার্গব ঋষির প্রশ্ন আরও মৌলিক। 'যারা সংগ্রাম (মতান্তরে অন্ন) পেতে চাও, সেই যজ্ঞকারীরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তবে পূর্ণ করো— যদি সত্যই তিনি থাকেন।' বলা হচ্ছে, 'ইন্দ্র নেই, কে তাঁকে দেখেছে? কার উদ্দেশে স্তব করব?'[১৮] নেম ভার্গব বলছেন, 'যজ্ঞকারীরা কিছু প্রার্থনা করে ইন্দ্রকে তুষ্ট করুক, যদি সত্য বলে কিছু থাকে'। এটা পুরোহিত-যজমানের মধ্যে চিরন্তন দেনাপাওনার সম্পর্ক যা তারা যজ্ঞ করে, দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, প্রার্থনা পূরণের আশা করে বহুকাল ধরে বজায় রেখেছে। যজ্ঞে স্তব হব্য ও অনুষ্ঠানের পেছনে যে বিশ্বাসের প্রণোদনা তা হল ইন্দ্রের অস্তিত্বে আস্থা। ইন্দ্র বলে কোনও শক্তিমান ভক্তহিতৈষী দেবতা থাকলে তবে তো ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ হবে? এখানে নেম ভার্গব বলছেন, 'ইন্দ্রই নেই।' আগেই বলে নিয়েছেন, 'যদি সত্যই তিনি থাকেন'। এখানে সম্ভাবনা দুটো: তিনি আছেন বা তিনি নেই।

---

১৭. কয়া তচ্ছৃণ্বে শচ্যা শচিষ্ঠো যয়া কৃণোতি মুহু কা চিদৃষ্বঃ। পুরু দাশুষে বিচয়িষ্ঠো অংহোঽথা দধাতি দ্রবিণং জরিত্রে॥ (৪:২০:৯)

১৮. প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সতমস্তি। নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমাভি ষ্টবাম॥ (৮:১০০:৩)

ন্যায়শাস্ত্রে প্রথম প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা। লোকেরা যদি চোখে ইন্দ্রকে দেখে থাকত, তা হলে নেম ভার্গবের আপত্তি টিকত না; সেই জন্যে ইন্দ্রে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে এই প্রত্যাহ্বান, 'তোমরা যে ইন্দ্রকে বিশ্বাস করে তাঁর উদ্দেশে যথাবিধি যজ্ঞ করে আশা করে বসে থাক যে, তিনি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনও দিন কি সেই ইন্দ্রকে দেখেছে?' এর উত্তর স্বভাবতই চুপ করে থাকা, কেউ সত্যিই ইন্দ্রকে কোনও দিন দেখেনি। আর ইন্দ্র হলেন দেবশ্রেষ্ঠ, তাঁকেই যদি কেউ কোনও দিন না দেখে থাকে তা হলে বাকি দেবতারা যাঁরা তাঁর তুলনায় নীচে, তাঁদের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে সমস্ত যজ্ঞক্রিয়াটাই শুধু নিরর্থক হয়ে গেল না, বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে প্রত্যয়ের ভিতটাই ভেঙে গেল, শূন্য বেদির সামনে উচ্চারিত প্রার্থনা বাতাসে মিলিয়ে গেল। প্রতিধ্বনি সংশয়ের ধ্বনিতেই ফিরে এল স্তোতার কাছে।

ঋষি গৃৎসমদ এ সংশয়ের এক ধরনের একটা উত্তর দিয়েছিলেন, 'যে ঘোর দেবতার বিষয়ে প্রশ্ন করে তিনি কোথায়, কিংবা যারা বলে ইনি নেই, ইনিই তো প্রসন্ন হযে বহুতর পুষ্টি, শত্রুদের সম্পত্তি, আহরণ করে এনেছেন, তাঁকে বিশ্বাস কর। হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।'[১৯] এ ঋক্‌টিতে লক্ষ করবার অনেকগুলি বিষয় আছে। প্রথমত, এটির পূর্বপক্ষ হচ্ছে নেম ভার্গবের স্পষ্ট উক্তি— ইন্দ্র নেই; এতে তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যিনি প্রসন্ন হয়ে বহু শত্রুসম্পত্তি আহরণ অর্থাৎ হরণ করে এনে আর্যদের পুষ্টি জুগিয়েছেন তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা তো বাতুলতা। সেই শত্রুসম্পত্তি, সেই পুষ্টি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, কাজেই যিনি তা শত্রুদের কাছ থেকে হরণ করে আর্যদের এনে দিয়েছিলেন তাঁর অস্তিত্বে কেমন করে অবিশ্বাস করা যায়?

এখানে দুটো বিভিন্ন যুগের দুই বিভিন্ন ইন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে। আর্যদের সেনাপতি ইন্দ্র যখন প্রথম অভিযানে প্রাগার্যদের পরাস্ত করে তাদের শস্য অন্ন খাদ্য সম্পত্তি পশুপাল হরণ করে এনে দিয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক সেনাপতির স্মৃতি তো আর্যদের মনে উজ্জ্বল। কালক্রমে তাঁর মৃত্যু হলে আর্যরা কল্পনায় তাঁকে স্থাপন করে 'দেবরাজ' করে তুললে পর তিনি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রইলেন না। তখন তাঁর স্থান স্মৃতিতে কল্পনাপ্রসূত প্রত্যয়ে। ভূমিকা তাঁর একই রইল, অন্তত প্রথম কিছুকাল তিনি বিজেতা সেনাপতি, পরাক্রান্ত নেতা, আগন্তুক আর্যদের অন্নদাতা। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তিনি আর দৃষ্টিগোচর নন, তখন বিশ্বাসী সংশয়ীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঐতিহাসিক ইন্দ্রের বাস্তব সত্তা, এবং অনুযোগের সঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছে: তাঁকে বিশ্বাস করো জনগণ, তিনিই ইন্দ্র। এই শেষ অংশটি— জনাস ইন্দ্র— চোদ্দোবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এত বার আবৃত্তি করার প্রয়োজনটা বোঝা যায়; সংশয়টা একা নেম ভার্গবের ছিল না। বস্তুত নেম ভার্গবের উক্তিতে সংশয়ের ভাষা নেই, প্রত্যয়েরই ভাষা:

১৯. যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহু র্নৈষো অস্তীত্যেনম্ সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ আ মিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ॥ (২:১২:৫)

ইন্দ্র নেই। এ বোধ বহু মনে সংক্রামিত হয়েছিল বলেই এত বারবার তার খণ্ডন করার দরকার পড়ল।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা গবেষকদের কাছে যা জেনেছি তাতে আবৃত্তি ও গানের বিশেষ বিশেষ অংশে সমবেত জনতা সক্রিয় অংশ নিত। মনে হয় ওই 'স জনাস ইন্দ্রঃ' অংশটিও তেমনই একটা অংশ যা সকলে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করত। এই প্রক্রিয়াকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন আত্মবিশ্বসনের উপায় (autosuggestion), কোনও একটা উক্তি নিজের কাছে বারবার আবৃত্তি করলে ক্রমে অবচেতনে সেটা প্রত্যয়ের স্তরে দৃঢ় হয়ে যায়।

আরও দুটো জিনিস লক্ষ করবার আছে: প্রথম লোকে যখন অদৃশ্য ইন্দ্রের সর্বশক্তিমত্তা এবং আর্যহিতৈষাতে সন্দিহান, তখন গৃৎসমদ এবং তৎপন্থীরা সে সংশয় নিরসন করতে চাইছেন ঐতিহাসিক ইন্দ্রের আর্যদের অনুকূলে ভূমিকা দিয়ে। মাঝে হয়তো কয়েক শতকের ব্যবধান, কারণ প্রথম ইন্দ্র যে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার অন্তত দু-তিনশো বছর আগেই ছিলেন তার প্রমাণ আনাতোলিয়ার বোঘাজ-কো-ঈ শিলালেখে। তিনি সম্ভবত পরাক্রান্ত বিজেতা ছিলেন বলেই আর্যদের পরবর্তী সব পরাক্রান্ত সেনাপতিদের উপাধি দেওয়া হত ইন্দ্র। ইন্দ্র যে একটি পদ তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।[২০] তা হলে নেম ভার্গব অদৃশ্য ইন্দ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন প্রথম ইন্দ্রের তিরোধানের বেশ কয়েক শতাব্দী পরে, প্রথম জনের আহৃত সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। পরিশেষে এ সমস্ত প্রসঙ্গটার পেছনে আছে সমষ্টিগত ভাবে আর্যদের যজ্ঞফলের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় অবসিত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ইন্দ্র থাকলে প্রার্থনা শুনতেন, একদা তো শুনেছিলেন, কিন্তু সে কবেকার কোন ইন্দ্র? তাঁকেই, বা তাঁর স্মৃতিকেই সামনে এনে গৃৎসমদ বলছেন, 'স জনাস ইন্দ্রঃ'। বলছেন, কারণ বলবার খুব মর্মান্তিক প্রয়োজন ঘটেছে। একা নেম ভার্গবই নন, চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী অনেক মানুষই তখন ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দিহান।

'দেবতার অস্তিত্বে, এমনকি দেবরাজ (ইন্দ্র)-এর অস্তিত্বে এই সন্দেহ এবং বিশ্বসৃষ্টির মূল ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেকও নাস্তিক্য নয়। এ সব ধারণাকে এর পরেও যুক্তি দিতে হবে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। এ সব যুক্তি তখনই দেখা দেয় যখন দার্শনিক বিকল্প হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে উদীয়মান ভগবদ্‌বিশ্বাস বিশ্বভুবনের ঐকান্তিক উৎস ও অধিপতি সম্বন্ধে ধারণার মুখোমুখি হয়।'[২১]

২০. আমার *The Indian Theogony*, Penguin, 2000;-এ 'ইন্দ্র' অংশ 'ইন্দ্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১. 'This skepticism is about the existence of a god, even the king of the gods, and the emergence of impersonal conceptions of the ultimate ground of the universe is not yet atheism Such conceptions have yet to advance arguments that belief in god is a false belief Such arguments begin to appear where emerging theistic conceptions of God and conceptions of the absolute source and ruler of the world confront one another as philosophical options over an extended period of time.'— *Macmillan Encyclopaedia of Religion*. 'Atheism'. p. 481

শুধু একজন দেবতার প্রতি অবিশ্বাস, এমনকী তিনি দেবরাজ ইন্দ্র হলেও তাঁর প্রতি অবিশ্বাসও প্রকৃত নাস্তিক্য নয়। দেবতায় বিশ্বাস ও সৃষ্টির মূল বিমূর্ত শক্তির উৎস— এ দুটি দীর্ঘকাল ধরে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে থাকার পর যখন এদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে অর্থাৎ মানুষ যখন তার কল্পনাসৃষ্ট অবয়বী দেবতায় বিশ্বাস হারায়, তার পরেও সৃষ্টির মূল শক্তির ওপরে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে দুটি বিশ্বাসের সংঘাতে যখন সব বিশ্বাস হারাবার যুক্তি সৃষ্টি করে, তখনই দেখা দেয় নাস্তিক্য। সে-বোধ ঋগ্বেদে স্পষ্ট হয়নি, তার উদ্ভব অনেক পরে; তবু তার সূচনা ঋগ্বেদেই।

যজ্ঞ এবং দেবতা সম্বন্ধে তাদের নিশ্চিত জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে ঋষিরা অবহিত ছিলেন: 'কোন্ বিদ্বান ছন্দগুলির প্রয়োগ জানেন? কেই-বা হোতা, প্রমুখদের স্থানের উপযুক্ত বাক্য জানেন? সাতটি ঋত্বিকের পরের অষ্টম স্বতন্ত্র ঋত্বিক্ কাকে বলে? ইন্দ্রে দুটি অশ্ব (হরী)গুলিকে কে জানে?'[২২] যজ্ঞ যখন একমাত্র উপাসনা, তখন মানুষ সে সব কাম্য বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তা পাওয়ার সব সম্ভাবনা নিহিত থাকে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানটির ওপরে। এর তিনটি মূল অংশ: ১) দেবতা, ২) স্তোত্র ও হব্য, এবং ৩) যজ্ঞের প্রক্রিয়া। এর সবগুলিই মানুষ নিজের কল্পনা ও বুদ্ধি থেকে সৃষ্টি করেছে; এখন, এগুলি যে যথার্থ ও বাস্তব তার তো কোনও প্রমাণ নেই। কে জানে, দেবতারা সত্যই আছেন কি না, মানুষ যে স্তব ও নৈবেদ্য তাঁদের সামনে অর্পণ করেন, সেগুলি দেবতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না তা-ই বা কে জানে এবং যে প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পাদন করা হয় তাও-ও তো কোনও এক বিস্মৃত অতীতে মানুষই উদ্ভাবন করেছিল, সে প্রক্রিয়া যে যথার্থ তারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সংশয় মূল ব্যাপার থেকে প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি— যেমন ছন্দের প্রয়োগ, ইন্দ্রের দুটি অশ্ব— এ সব নিয়েও। কোনওটাই তো দেবতারা মানুষকে বলে দেননি: তাঁরা আছেন কী নেই। কেমন স্তবে তাঁরা প্রীত হন, কোন হব্য তাঁদের মনোমতো এবং কেমন ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করলে তাঁরা তুষ্ট হয়ে প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করবেন; এ সবই মানুষের অনুমান। অতএব বড় একটা ফাঁক ওখানেই থেকে গেছে। এই অনুপুঙ্খগুলি যোগ করলে হয় যজ্ঞ, কাজেই, এগুলির যে-কোনও একটা ভুল হলেই যজ্ঞ নিষ্ফল হবে, মানুষের প্রার্থনা অপূর্ণ থেকে যাবে। যত কাল যাচ্ছিল নিষ্ফল যজ্ঞের সংখ্যা বাড়ছিল, স্বভাবতই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছিল গলদটা কোথায়? কারণ তাদের যাবতীয় প্রার্থিত বস্তু যজ্ঞের মাধ্যমেই পাওয়ার কথা, না পেলে বাস্তবজীবনে বহুতর অপূর্ণতা, ক্ষতি, ব্যর্থতা। কাজেই সংশয় যখন আপাত খুঁটিনাটি ব্যাপার— ছন্দ, হব্য, স্তব— নিয়ে তখনও ব্যাপারটা তাদের কাছে জীবনমরণ সমস্যাই। যজ্ঞে অভীষ্ট ফল না পাওয়া গেলে জীবনযাত্রা দুর্বল হয়ে উঠতে পারে, আবার এত ছোট ছোট সব ত্রুটিতেই যজ্ঞ নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। তাই বারেবারে বিভিন্ন অনুপুঙ্খ নিয়ে যে মানুষের মনে সংশয় জেগেছে সেগুলি তুচ্ছ নয়,

২২. কশ্ছন্দসাং যোগমা বেদ ধীরঃ কো ধীরং প্রতি বাচং পপাদ। কমৃত্বিজামষ্টমং শূরমাহুর্হরী ইন্দ্রস্য নি চিকায় কঃ স্বিৎ॥ ১০:১১৫:৯

এবং বস্তুত অনুপঙ্খের চেয়ে অনেক বেশি সেগুলির গুরুত্ব: গোটা যজ্ঞটাকেই নিষ্ফল করে দিতে পারে এই সব আপাত ক্ষুদ্র ত্রুটির যে-কোনও একটাই।

দেবতাদের অস্তিত্ব ছাড়াও যজ্ঞক্রিয়ার যথার্থতা নিয়েও নানা সংশয় ছিল। মানুষ দেবতার প্রসাদ চেয়ে স্তব ও হব্য দিয়ে যজ্ঞে যে অনুষ্ঠান করে তা তো মানুষই ধীরে ধীরে নিজের চিন্তা ও কল্পনা দিয়ে উদ্ভাবন করেছে, সেগুলো দেবতার মনোমতো কি না তা জানবার কোনও উপায়ই নেই। তাই সে অশ্বিনদের প্রশ্ন করেছে: 'উপাসকের স্তব কে শোনে? কাকে তা প্রীত করে? দেবতাদের মধ্যে কে এই সব শোভন প্রশংসার স্তব শোনেন?'[২৩] অথবা '(অশ্বিনরা), কেমন স্তোত্র তোমাদের পক্ষে যোগ্য, (যার দ্বারা) অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরা আমাদের কাছে আসবে? কে তোমাদের ক্রোধ বহন করতে পারে?' (৪:৪৩:৪) এর অর্থ হল: আমরা তো আমাদের অনুমানশক্তির ওপরে ভরসা করে যা তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত মনে করি তেমন স্তব করি। কিন্তু সে স্তব যে সত্যিই তোমাদের উপযুক্ত, গ্রহণযোগ্য ও প্রীতিকর সে বিষয়ে আমরা কেমন করে নিশ্চিত হব? যদি আমাদের স্তব তোমাদের অভিমত বা তুষ্টিজনক না হয় তা হলে স্বভাবতই তোমরা ক্রুদ্ধ হবে; তোমাদের সে-ক্রোধ আমরা সামান্য মানুষ কেমন করে বহন করব? মরুতদের প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'কেমন খাদ্য তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত?' (১:১৬৫:১৫) দেবতাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম যে অগ্নি তাঁকে আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, তিনিই বলুন, এই যে দেবতারা ত্রিলোকে সঞ্চরণ করেন, স্বর্গে ও মর্ত্যে, এঁদের মধ্যে যথার্থ ও অযথার্থ হব্য সম্বন্ধে কে জানেন? (১:১০৫:৪৫)

এর মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষ করবার মতো: মরুতরা বায়ু, তাঁরা কি হব্য আহার করেন, করতে পারেন? তাই মানুষ বিভ্রান্ত বোধ করছে এই ভেবে যে এই যে আমরা মানুষের সুখাদ্য, সুপেয় বস্তু নিবেদন করছি, বায়ু দেবতাদের কাছে কি তা গ্রহণীয়? তাঁরা কি এ সব আহার বা পান করতে পারেন? দ্বিতীয়ত, সূর্য চন্দ্র বায়ু পৃথিবী এ সব দেবতা তো প্রথম থেকেই ছিলেন, কিন্তু মানুষ দু-হাতে অরণি ঘর্ষণ করে সৃষ্টি করল অগ্নিদেবতাকে, তাই সকলের পরে এঁর জন্ম বলে এঁকে কনিষ্ঠতম বলা হচ্ছে। দেখা যায়, জন্মমাত্রই অগ্নি অরণি দুটিকে গ্রাস করে, অতএব, 'এই যে চরু-পুরোডাশ্-মাংস, ইত্যাদি এনে অগ্নির সামনে নিবেদন করছি, এগুলো ইনি আহার করবেন তো? আগুনে যেহেতু অরণি খণ্ড দুটি ভস্ম হয়ে যায়, হব্যও তেমনই ভস্ম হয়ে যায়; কিন্তু কাঠ তো খাদ্য নয়, এগুলো তাঁর খাদ্য বটে তো? ভস্ম করাই কি আহার? যা ভস্মীভূত হয় তা-ই কি যথার্থ আহার্য?' এ সব সংশয়ের তো কোনও সমাধান মেলে না। অগ্নি একমাত্র দেবতা যাঁর প্রচণ্ড শক্তি মানুষ নানা রূপে প্রত্যক্ষ করে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনও কিছুতে অগ্নিসংযোগ করলে অল্প সময়েই তা দগ্ধ হয়, দাবানলে বিস্তীর্ণ অরণ্যানী ভস্মের স্তূপে পরিণত হয়। তাই অগ্নিদেবতা আর্যদের কাছে বিশেষ সম্মানের;

---

২৩. ক উ শ্রবৎ কতমো যজ্ঞিয়ানাং বন্দারু দেবঃ কতমো জুষাতে। কস্যেমাং দেবীমমৃতেষু প্রেষ্ঠাং হৃদি শ্রেষাম সুষ্টুতিং সুহব্যাম্॥ (৪:৪৩:১)

অগ্নি ব্রাহ্মণ, প্রত্যেক মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি বা সূক্তগুলি অগ্নির উদ্দেশে নিবেদিত। সেই অগ্নিকে প্রীত রাখার অনেক দায়, আর্যরা প্রাগার্য বসতি গ্রাস করছিল অগ্নিসংযোগ করে, এ ভাবেই তাদের বাসভূমির বিস্তার ঘটছিল। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড থেকে আত্মরক্ষা করাও তাদের প্রয়োজন হত। অগ্নিপক্ক খাদ্য প্রস্তুত করা, হিংস্র শ্বাপদ থেকে রাত্রে নিরাপত্তার জন্যে প্রজ্বলিত অগ্নির শরণ নেওয়াও অত্যাবশ্যক ছিল। তাই এমন যে বহুধা-সম্মাননীয় অগ্নি, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের নানা প্রশ্ন: যখন আমরা প্রজ্বলিত করি না, তখন তিনি কোথায় থাকেন, আমরা যা দিয়ে তাঁর উপাসনা করি তা তাঁর অভিমত তো?

দেবতাকে উপাসক বারেবারেই প্রশ্ন করছেন, কখন তুমি খাদ্য ও প্রাচুর্য দিয়ে আমার স্তবের ও হব্যের প্রতিদান দেবে? ওইগুলির পিছনের সত্য হল, যজ্ঞ করেও অভীষ্ট ফল না পাওয়া, বা এত বিলম্বে পাওয়া যে, যজ্ঞ ও ফলের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ যুক্তিসিদ্ধ ভাবে স্থাপন করা দুরূহ; তখন স্বভাবতই মানুষের মনে হবে এ ফল আকস্মিক, কাকতালীয়বৎ। ফলে, যজ্ঞ করে প্রার্থিত ফল না পেয়ে স্বভাবতই মানুষ অধীর হয়ে উঠে যজ্ঞের অন্তরালে যে-দেবতাটির কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেছিল তাঁরই কাছে এই অযৌক্তিক বিলম্বের জন্যে নালিশ করেছে, ব্যাখ্যা চেয়েছে। জানতে চেয়েছে তার যজ্ঞক্রিয়ার কোনও ত্রুটির জন্যেই কি এই বিলম্ব, নৈবেদ্যটি কি দেবতার মনোমতো হয়নি? বা স্তোত্রটি? এ সব সংশয় যজ্ঞকারীর পক্ষে অনিবার্য, এর থেকে তার অব্যাহতি নেই, যেহেতু কেন ফল হচ্ছে বা কেন হচ্ছে না এ সম্বন্ধে দেবতারা চিরনিরুত্তর।

মানুষ দেবতাদের সম্বন্ধে অতিকথা রচনার সময়ে সর্বদাই অবচেতনে অবহিত থাকে যে, এখন সে যে সব দেবতাকে আহ্বান করে যে পদ্ধতিতে যজ্ঞ সম্পাদন করে যে-যে প্রার্থনা জানাচ্ছে, দূরবিস্মৃত কোনও এক অতীতে (*in illo tempore*) দেবতারা ঠিক সেই প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ করে সেই সব অভীষ্ট ফল লাভ করেছিল। অর্থাৎ, এই যজ্ঞপ্রণালী পরীক্ষিত, ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করার ক্ষমতা যে দেবতাদের আছে তা-ও পরীক্ষিত। কিন্তু এ তো মানুষের স্বকল্পিত প্রবোধ; বাস্তবে যখন বিধিমতে যজ্ঞ করেও ফল মেলে না, তখন তো সব কিছুতেই সন্দেহ জাগে: যজ্ঞের হব্যে, স্তোত্রে, যজ্ঞ প্রক্রিয়ায়, ভক্তের অভীষ্টসাধনে দেবতার ক্ষমতায়, ইচ্ছায় এবং সর্বোপরি দেবতাদের অস্তিত্বে।

এই শেষের সন্দেহ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব, আপাতত একটি ঋক্ থেকে এ সন্দেহের সার্বিক চরিত্রটিকে দেখা যেতে পারে: 'মানুষের মধ্যে কে তোমার বন্ধু (বা আত্মীয়), অগ্নি, কে তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে? তুমি প্রকৃত (রূপে) কে, কোথায় তুমি থাক?'[২৪] বোঝা যায়, তখনকার মানুষ যে সব দেবতার স্তব করে যজ্ঞ করত, তাদের যথার্থ অস্তিত্ব নিয়ে, নিবাস নিয়ে এবং প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা ও ইচ্ছে নিয়ে তাদের মনে সংশয় ছিল। অবশ্য সংশয় থাকলেও তো উপায়ান্তর ছিল না। ইষ্টসিদ্ধি ও অতিলৌকিক

২৪. কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হি কস্মিন্নসি শ্রিতঃ॥ (১:৭৫:৩)

শক্তির সহায়তা লাভের জন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আদিযুগ থেকে নানা ভাবে যজ্ঞ বা তার অনুরূপ অনুষ্ঠান করে এসেছে। এ সময়ে তাদের মনে যুগপৎ বিদ্যমান থাকত বিশ্বাস ও সংশয়। ইষ্টসিদ্ধি চাই, উপায় যজ্ঞ। দেবতাদের প্রসন্ন করলে তাঁরা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে বশীভূত করে প্রার্থিত বস্তু দান করবেন। কোনও এক ভাবে এ সব বিশ্বাস না থাকলে যজ্ঞই করা সম্ভব হত না। যজ্ঞ সম্পাদন করবার সময় এ বিশ্বাস গৌণ বা অস্থির ভাবে হলেও তাদের চেতনে, অবচেতনে বিরাজ করতই। আবার তারই সঙ্গে থাকত অবিশ্বাস বা তার প্রথম স্তর, সংশয়, হয়তো কতকটা দোলাচলতা।

অথর্ববেদ সংহিতায় নতুন ধরনের একগুচ্ছ প্রশ্ন শুনি। 'স্কম্ভ' নামে একটি দেবতার কল্পনা দেখি, ইনি বিশ্বভুবনকে ধারণ করছেন স্কম্ভ বা স্তম্ভের মতো। এঁর কাছে প্রশ্ন:

> তোমার রূপে বর্ণ কে সঞ্চারিত করল? তার কোন অঙ্গে তপঃ থাকে? আর ঋত? তাঁর বিশিষ্ট ব্রত ও প্রত্যয়ই বা কী? তাঁর কোন্ অংশে সত্য থাকে? তাঁর কোন্ অঙ্গ থেকে উজ্জ্বল অগ্নি দেদীপ্যমান, কোথা থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়? (১১:৮:১৬)

এই ধরনের বহু প্রশ্নের শেষে শুনি: 'তিনি কে?' দেবতাদের স্বরূপই ছিল মৌলিক প্রশ্ন। অবশ্যই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। আদিম মানুষের কল্পনা প্রয়োজন অনুসারে ভৌতিক জগৎ থেকে নানা দেবতাকে মনে মনে নির্মাণ করে, স্তবের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের প্রচার করে, যজ্ঞের দ্বারা তাঁদের কাছে নিবেদন করে— সুস্থ, দীর্ঘায়ু, বিজয়ী ও সমৃদ্ধিমান হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে বিস্তর প্রার্থনা। কিন্তু চিন্তাশীল মনে এ সব প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জেগে থাকে সংশয়।

স্কম্ভেরই মতো ব্রহ্মের উদ্দেশে আরও প্রশ্ন ভক্তের:

> তাঁর কোন অঙ্গে থাকে তপ, কোথায়ই বা থাকে ঋত? কোথায় থাকে ব্রত, কোথায় শ্রদ্ধা, তাঁর কোন্ অঙ্গে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত থাকে? তাঁর কোন অঙ্গ থেকে অগ্নি দীপ্ত হয়, কোন অঙ্গ থেকে প্রবাহিত হয় বায়ু? কোন অঙ্গ থেকে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে চন্দ্রমার। স্কম্ভের অঙ্গের পরিমাপ করে মহ, তাঁর কোন অঙ্গে থাকে ভূমি? কোন অঙ্গে অন্তরিক্ষ? কোন অঙ্গে আকাশ আশ্রিত থাকে, কোন দিকে থাকে আকাশের উত্তরের দিক। কাকে পেতে চেয়ে অগ্নি ঊর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়, কাকে পেতে ইচ্ছে করে বায়ু প্রবাহিত হয়?... অর্ধমাসগুলি কোথায় চলে যায়, কোথায় যায় মাসগুলি সংবৎসরের সঙ্গে? সেই স্কম্ভকে বল, 'কে তিনি?'[২৫]

২৫. কস্মিন্নসঙ্গে তপ অস্যাধি তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতমা ক্ক ব্রতং ক্ক শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্। কস্মাদঙ্গাদ্দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা। কস্মাদঙ্গাদ্বিমীতেঽধি চন্দ্রমা মহ স্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম।। কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিবস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্টত্যন্তরিক্ষম। কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যাহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যুত্তরং দিবঃ।। ক্বং প্রেপ্সন্ দীপ্যতে ঊর্ধ্বো অগ্নিঃ ক্বং প্রেপ্সন্ পবতে মাতরিশ্বা।... কার্ধমাসা ক্ক যন্তি মাসাঃ সংবৎসরেণ সহ সংবিদানাঃ। (১০:৭:২-৫)

এই স্কম্ভ সর্বোচ্চ এক দেবতার প্রতিনিধি, কাজেই চোখের ওপরে যে সব ঘটনা স্থানে-কালে নিরন্তর নীরবে ঘটে চলেছে, মানবদেহে এবং বিশ্বচরাচরে যে সব অবয়বসংস্থান আছে, অথবা থাকার কথা, সেগুলি সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন চিন্তাশীল মানুষের মনে উত্থিত হয় সেগুলি এই স্কম্ভের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে— সমাধানের আশায়। এ সব প্রশ্নের উদ্ভব সংশয় থেকে ততটা নয়, যতটা জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল থেকে।

স্কম্ভের কল্পনা ও অথর্ববেদে এর সংযোজন কিছু পরবর্তীকালের। তত দিনে মানুষ সর্বাতিগ এক দেবতার কল্পনা করতে পেরেছে, যিনি অগ্নি, বায়ু, পর্জন্য, ইত্যাদির উর্ধ্বে। অতএব এত দিন নানা দেবতা সম্বন্ধে নানা পর্যায়ে যত প্রশ্ন জমা হয়েছে তা-ই একগুচ্ছ প্রশ্নের আকারে এখানে উচ্চারিত। লক্ষণীয়, বিমূর্ত কতকগুলি ধারণা, শ্রদ্ধা, ব্রত, তপ এখানে স্থান পেয়েছে। সূক্তটি সম্ভবত উপনিষদ-যুগের, তাই ঔপনিষদিক কিছু প্রশ্ন এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। 'কাল' অথর্ববেদে একট নতুন বিষয়; এখানে কাল সম্বন্ধে অংশত চেতনা ও প্রশ্ন— অর্ধমাস, মাস ও সংবৎসর সম্বন্ধে প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই মহাকাল সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এখানে প্রতিফলিত। প্রশ্নগুলি ক্রমশ দৃশ্যমান বস্তুজগৎ ছেড়ে অদৃশ্য বিশ্বচরাচরে ক্রিয়াশীল কিছু বিমূর্ত শক্তি সম্বন্ধেও। মানুষ এ সব কিছুই বোঝে না, কিন্তু সে অবহিত যে এ সবই বিশ্ববিধানের অন্তর্গত, এবং এ না বোঝার আকুতি এই সূক্তে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত।

দেবতাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মূল প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলে না; তাই কবি প্রশ্ন করেন:

> ইন্দ্র কোথা থেকে (এলেন)? সোম কোথা থেকে, অগ্নি কোথা থেকে জন্মালেন? ত্বষ্টা কোথা থেকে এলেন, ধাতা কোথা থেকে?...
>
> ইন্দ্র থেকে ইন্দ্র, সোম থেকে সোম, অগ্নি থেকেই অগ্নি, ত্বষ্টা জন্মেছিলেন ত্বষ্টা থেকেই, ধাতা থেকে ধাতা।[২৬]

এ প্রশ্নে প্রকারান্তরে ইন্দ্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হল। আর এই ঋকে ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, ত্বষ্টা ও ধাতার জন্ম বা উদ্ভব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই মুখ্য, পুরোনো দেবতা, বহু সূক্তে এঁদের স্তুতি আছে, অতএব এঁরা আছেন ধরে নিয়েই যজ্ঞে এঁদের আহ্বান ও স্তব করা হয়। এঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে গেলে এঁদের উৎপত্তি বা জন্মও স্বীকার করতে হয়। এ ঋকে সেই প্রশ্ন: এঁদের উদ্ভব কোথা থেকে? কৌতূহল নিবৃত্ত করছে পরবর্তী ঋক, সেখানে যে একটি মাত্র উত্তর সম্ভব তাই দেওয়া হয়েছে: যাঁদের উদ্ভব আসলে মানুষের কল্পনাতেই, তাঁরা তো প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভব, নিজেদের থেকেই নিজেরা উৎপন্ন হয়েছেন। অন্য ভাষায় এর অর্থ হল, এঁরা কল্পনাসঞ্জাত।

২৬. কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতো অগ্নিরজায়ত। কুতস্ত্বষ্টঃ সমভবৎ কুতো ধাতাত্বজায়ত। ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত। ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টুর্ধাতুর্ধাতাজায়ত। অথর্ব বেদ (১১:৮:৮,৯)

চক্ষুষ্মান মানুষ চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে প্রকৃতির বহু ঘটনার উত্তর পায় প্রকৃতিকে ভাল করে লক্ষ করেই, ঠিক তেমনই আরও বহু ব্যাপারের কোনও সমাধান সে পায় না, না প্রকৃতিতে, না তার আপন বুদ্ধির জগতে, না সে থাকে প্রাচীন মনস্বীদের স্মৃতিতে। অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা যখন মেলে না তখন মানুষ তার প্রশ্ন তুলে ধরে তার দেবতাদের উদ্দেশে, যে-দেবতাদের সে সৃষ্টি করেছে মানুষের চেয়ে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সত্তা হিসেবে। তাদের শ্রেষ্ঠতা মেনে নিয়েই স্তব, তাদের শ্রেষ্ঠতা জেনেই প্রার্থনা, এবং প্রশ্ন:

> বহুবিধ প্রিয় এবং অপ্রিয় (অভিজ্ঞতা), স্বপ্ন, উৎপীড়ন, শ্রান্তি, আনন্দ, আমোদ এ সব উগ্র পুরুষ কেন বহন করে? আর্তি, অভাব, অমঙ্গল, দুঃখ— এ সব মানুষের মধ্যে কোথা থেকে আসে? সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, সার্বিক অভাব, চিন্তা, যন্ত্রণা— আসে কোথা থেকে?... এই পুরুষে কে রূপ সঞ্চার করল, কে দিল শরীরের ভার, আর নাম? কে (তাকে) দিল অগ্রগতি, বিচিত্র প্রকাশ, পুরুষকে কে দিল চরিত্র? পুরুষে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান কোন দেবতা আশ্রিত করলেন? কে পুরুষকে যজ্ঞ করতে দিল? তার মধ্যে কে দিল সত্য, কে দিল মিথ্যা? কোথা থেকে এল মৃত্যু, কোথা থেকে অমৃত? কে একে দিল বাস, কে দিল আয়ু, কে দিল শক্তি, কে-ই বা দিল গতিবেগ?'[২৭]

মনে রাখতে হবে, এ সব প্রশ্ন যারা করছে তারা কোনও আদিম জনগোষ্ঠী নয়, মোটামুটি সভ্য পরিবেশে বাসকারী মিশ্র প্রাগার্য-আর্য এক জনগোষ্ঠী, যারা শুধু দীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞই করছে না, দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষে যাদের চিত্তে নানা প্রশ্ন স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। প্রশ্নগুলি কী বিষয়ে? মানুষের দেহসংস্থান, মনের বিভিন্ন উপকরণ, বিচিত্র আবেগ, নানা অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত এ সব প্রশ্ন। এগুলির অধিকাংশই দর্শনের ধার ঘেঁষা: সত্যমিথ্যা, মৃত্যু, অমৃত কোথা থেকে এল, মানুষের ওপরে কোন দেবতা? মানুষের পরমায়ু নির্ধারণ করছে কে, তার শক্তি ও গতিবেগ আসে কার কোথা থেকে? প্রথমেই প্রশ্ন বিভিন্ন উপলব্ধি নিয়ে— প্রিয় ও অপ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলি, স্বপ্ন, নিশিজাগরণ, আনন্দ, উগ্র আমোদ এ সব মানুষ কেন বহন করে? অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তব, চিরন্তন ও সর্বজনীন, অথচ এগুলো আসে কোথা থেকে? প্রথম এ সব প্রশ্ন জীবজগতে আর কারওরই নয়, একান্ত ভাবে মানুষেরই; দ্বিতীয়ত, চারদিকে তাকিয়ে মানুষ দেখেছে এ সব অভিজ্ঞতা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, সকলেরই; তৃতীয়ত,

২৭. প্রিয়াপ্রিয়াণি বহুলা স্বপ্নং সবাধমতন্দ্র্যঃ।। আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কস্মাদ্বহতি পুরুষঃ। আর্তিরবর্তির্নির্ঋতি কুতো নু পুরুষেঽমতিঃ। রাদ্ধিঃ সমৃদ্ধির ব্যৃদ্ধির্মতিরুদিতয়ঃ কুতঃ।... কোঽস্মিন্ রূপং ব্যদধাৎ কো মহ্যানং চ নাম চ। মাতুং কোৎস্মিন্ কঃ কেতুং কশ্চারিত্রাণি পুরুষে।। কোঽস্মিন্ প্রাণমবধৎ কো অপানং ব্যানমু। সমানমস্মিন্ কো দেবোঽধি পুরুষে শিশ্রায়।। কোঽস্মিন্ যজ্ঞমদধাৎ কো দেবোঽধি পুরুষে। কোঽস্মিন্ সত্যং কোঽনৃত্যং কুতো মৃত্যুঃ কুতোঽমৃতম্।। কোঽস্মিন্ বাসঃ পর্যদধাৎ কোঽস্যায়ুরকল্পয়ৎ বলং কোঽস্মৈ প্রাযচ্ছৎ কো অস্যাকল্পয়জ্জবম্।। অথর্ব বেদ (১০:২:৯-১৫)

সে লক্ষ করেছে দেহসংস্থান ও মনঃসংস্থান মোটামুটি ভাবে সব মানুষেরই একই রকম। তা হলে এ সব কিছু মানুষে আধান করল কে? কোন সে শক্তি যা নিয়ন্ত্রিত করে তার দেহমন, তার রূপ-অবয়ব, তার সুখদুঃখ, তার পরমায়ুর পরিধি, তার মৃত্যু— এবং তার অমৃত? অর্থাৎ মানুষ মানতে চাইছে না যে মৃত্যুতেই সকল অভিজ্ঞতার ইতি টেনে দেওয়া হয়। এ সব প্রশ্ন যেমন গভীর, তেমনই চিরকালীন। এবং ঠিক তেমনই অসমাধেয়। কোথাও এ সবের উত্তর নেই।

কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকেই এ সব মানুষের মনে উদিত হয়েছে এবং উত্তর পাওয়া যাবে না বলে সে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেনি। ওই অথর্ববেদেই পড়ি: 'চোখ দিয়ে সকলেই দেখে, মন দিয়ে সকলে জানে না— পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ।' (১০:৮:১৪) অর্থাৎ এই যে সব প্রশ্ন মানুষের মনে উদিত হচ্ছে এর কারণ চোখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে সকলেই বাইরের জগতের তথ্যগুলি গ্রহণ করে। কিন্তু তার থেকে অনিবার্য ভাবে যে সব প্রশ্ন উত্থিত হয়, সেগুলির সমাধান মন দিয়ে পায় না। মোটামুটি প্রশ্নগুলি দু' ভাগে বিভক্ত: আমার দেহেমনে যা আছে, ঘটেছে, ঘটছে এবং আমার বাইরে বিশ্বপ্রকৃতিতে যা ঘটছে সে সবের পেছনে কোনও নির্ধারক বা নিয়ন্তা আছে কি? থাকলে তাঁকেই এই প্রশ্ন। তাই স্কন্তের কল্পনা, এই বিশ্বভুবনকে যিনি ধারণ করে আছেন। যেমন করে বাড়ি তৈরির আগে ভারবাহী বড় খিলানটা গাঁথা হয়, সেই থামের কল্পনা আরোপ করা হচ্ছে কল্পিত দেবতা স্কম্ভে। এঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, থামের মাথা যেমন বাড়ির ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে তেমনই এই দেবতার ঊর্ধ্বাগ্রভাগ ভূলোক ছাড়িয়ে দ্যুলোকের দিকে প্রলম্বিত; সেই দ্যুলোক, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পৌঁছোয় না। অতএব দ্যুলোকের রহস্যেও স্কম্ভের অধিকার আছে, তাই তাঁর কাছে কিছু দার্শনিক প্রশ্নও করা যায়: পরমায়ু কে নির্ধারণ করে, জীবন-মৃত্যু-অমৃতত্ব কে নিরূপণ করে? যে প্রশ্ন করছে সে-ও জানে এর উত্তর কোথাও মিলবে না, তবু অনুত্তরিত প্রশ্নের ভার তো মানুষকে নিরন্তর পীড়া দেয়, তাই তার সকল আর্তি নিয়ে সে আসে তার কল্পিত দেবতার কাছে।

এই সব প্রশ্ন কি সংশয়? যে ভাবে উচ্চারিত তাতে এগুলি শুধুই প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা। কিন্তু এগুলির মূলে আছে এক অসহায় নিরুদ্দিষ্ট সংশয়; মানুষ জানে যে সে শুধু প্রশ্নই করবে, সে-প্রশ্ন পৌঁছোবে না কোনওখানে, এখানে যে সব প্রশ্ন দেখলাম, তার বাইরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। যজ্ঞের প্রণালী, স্তব, নৈবেদ্য সব ঠিক হলেও এ সব যাঁদের কাছে পৌঁছোবে তাঁরা যদি সত্যিই থাকেন, তবেই তো যজ্ঞ থেকে যা চাওয়া হচ্ছে তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে? 'দেবতারা তো মানুষের কল্পনা থেকে সৃষ্ট, তার বাইরে বাস্তবে তাঁরা কোথাও আছেন কি না তা জানবার কোনও উপায়ই ছিল না। চারিদিকে চোখ মেললে দেখা যায় সৃষ্টি, মানুষ জানে সব সৃষ্টির স্রষ্টা বা কারণ থাকে। বীজ থেকে শস্য হয়, ডিম থেকে মাছ, পাখি, কীটপতঙ্গ; তা হলে এ সৃষ্টির বীজ কী, কর্তা কে? দেবতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নয় 'যুক্তিতে (অনুমানে) অথবা মনের ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে ধ্যান

থেকেও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় না, বহির্জগৎকে লক্ষ করেও নয়।'[২৮] আমরা দেখেছি, বহু প্রধান দেবতাকে নিয়েই মানুষের মনে সংশয় ছিল। ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্রকে নিয়ে এ সংশয় সংশয়ের স্তর ছাড়িয়ে পৌঁছেছে নেতিবাদের স্তরে নেম ভার্গবের উক্তিতে: ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্য স্তোম নিবেদন করা, হে অন্নকামী (বা সংগ্রামকামী) (ভক্ত) যদি সত্য থাকে। নেম এ কথাও বলছে, ইন্দ্র নেই, কে (তাঁকে) দেখেছে? কার অভিমুখে স্তব করব?[২৯]

দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের যে-সংশয় তার মধ্যে একটি হল: এই বিশ্বচরাচর কে সৃষ্টি করেছেন? বেদে নানা দেবতাকেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে, প্রথমাংশে প্রধানত ইন্দ্রকে, পরের দিকে বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, প্রজাপতি, ব্রহ্মন্, হিরণ্যগর্ভ, ইত্যাদি দানা দেবতাকে। যাই হোক এঁদের মধ্যে কোনও একজনকে সৃষ্টিকর্তা ধরে নিলেও বিপত্তি আছে। যে-যুক্তিতে একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করতে হচ্ছে তা হল, সৃষ্টি যখন আছে তখন কেউ একজন স্রষ্টা থাকতে বাধ্য। এখন একজন সৃষ্টিকর্তা মানলে ওই যুক্তিতেই তাঁকেও সৃষ্ট বলে স্বীকার করতে হবে এবং তখন আবার ওই প্রশ্নই উঠবে সেই সৃষ্টিকর্তাকে কে স্বীকার করেছিল? তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে? কাজেই পিছিয়ে যেতে যেতে কোথাওই পৌঁছোনো যায় না; ন্যায়শাস্ত্রে একে 'অনবস্থা' দোষ বলে। সেই অসুবিধা থেকেই যায় এবং প্রথম স্রষ্টার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। এই কারণেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'যাকে ভগবানের সৃষ্টি বলে মনে করা হয় সেই বেদও যদি বলে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তবুও সে উক্তিতে কোনও গুরুত্ব আরোপ্ করবার কোনও প্রয়োজন নেই।'[৩০] অর্থাৎ সৃষ্টির স্রষ্টা খুঁজতে গেলেই অনবস্থা-দোষ ঘটে, তাই ওই সিদ্ধান্ত অচল।

সৃষ্টি যে মৌলিক, ভৌতিক উপাদান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে— কোনও দৈবশক্তির বা আত্মিক শক্তির সহায়তা ছাড়াই— এটা হল আধিভৌতিক বা ভূতার্থবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব; এর বিপরীতটি অর্থাৎ কোনও দৈব বা আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি— এটা আধ্যাত্মবাদ। যখনকার কথা আলোচনা হচ্ছে, তখনকার মানুষ সচেতন ভাবে কোনও সৃষ্টিতত্ত্বই নির্মাণ করেনি; তবু কোনও দেবতাই স্রষ্টা, এ বোধ আর পাঁচটা প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল; এ নিয়ে যথার্থ দার্শনিক স্তরের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনেক পরের যুগে, দর্শনপ্রস্থানগুলির উত্থানের কালে হয়েছিল। ঋগ্বেদের যুগে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার সন্ধান

২৮. 'Man's knowledge of God was inferential, being not derived either by meditating on the operations of his own mind, or by observing the process of external nature.'— *Dictionary of the History of Ideas*,m p. 302

২৯. প্র সু স্তোমং ভরত, বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি। নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম।। ঋগ্বেদ (৮:১০০:৩)

৩০. 'If the Vedas, considered to be the work of God, say that God is the creator of the world, no value need be attached to the statement.'— D P Chattopadhyaya, 1964, Vol II, p. 25

চলছিল, কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় তারা দেখত, বীজ, অণ্ড বা কারণ ছাড়া কার্য, অর্থাৎ শস্য-বৃক্ষ বা অণ্ডজ প্রাণী হয় না; স্বভাবতই ওই স্তরের চেতনাতে ওই স্তরের প্রশ্ন এবং সমাধানই পাওয়া যাচ্ছিল। এই প্রশ্নটি তীব্রতম রূপ পেয়েছে ঋগ্বেদের একেবারে শেষ পর্যায়ে বিখ্যাত 'অস্যবামীয়' সূক্তে (সূক্তটির প্রথম দুটি শব্দ 'অস্য বামস্য' থেকেই এই নামকরণ)। যে-প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছিল, প্রত্যক্ষের জগতে সৃষ্টিকর্তার কোনও হদিস মেলে না, সেই প্রশ্নই এ সূক্তে এক জায়গায় উচ্চারিত সেই আদিমতম স্রষ্টার প্রসঙ্গে, 'কে তাঁকে প্রথম জন্মাতে দেখেছে?— কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্।' (১:১৬৪:৪) যিনি বিশ্বচরাচরের আদিস্রষ্টা তিনি যদি কোনও ব্যক্তি হন তো নিরুক্তে যাস্ক যেমন বলেছেন, তাঁরও একটা জন্মক্ষণ থাকবে। তখন কে তাঁকে জন্মাতে দেখেছিল? প্রশ্নটা ওই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রত্যক্ষের। উত্তর প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতাদের মনে একটাই: কেউই দেখেনি; অর্থাৎ তাঁর সত্তার সূচনার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তা হলে তাঁর অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। অনুমিতিতেও প্রমাণ হয়; কিন্তু সে একটি দীর্ঘতর প্রক্রিয়া, প্রতিপাদ্য থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত, যে-প্রক্রিয়া এখানে প্রয়োগ করবার কোনও অবকাশই নেই। ওই ঋকেই বলা হচ্ছে:

> যিনি জাত হচ্ছিলেন, নিজে অস্থিমান হয়েও অস্থিহীন কোনও সত্তা থেকে। তাঁর প্রাণ, রক্ত ও আত্মা ছিল। তিনি কোথায়, সেই প্রজ্ঞাবান জ্ঞাতাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে কে গিয়েছিল? অনভিজ্ঞ আমি প্রশ্ন করছি, কারণ আমি আমার মন দিয়ে এটা বুঝতে পারছি না, বুঝতে পারছি না দেবতাদের এই সব গূঢ় পদক্ষেপগুলি।[৩১]

এই ঋক দুটির মধ্যে একটি আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, জিজ্ঞাসু মানুষ নিজের অজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার অভাব খোলাখুলি স্বীকার করছে, বলছে, 'আমি জানি না, আমি আমার স্বল্পবুদ্ধিতে ধারণ করতে পারছি না। কিন্তু আর কেউ কি কোনও মনস্বী জ্ঞাতার কাছে এ সব প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছে, উত্তর পেয়েছে এ সব প্রশ্নের? এই প্রখ্যাত 'অস্যবামীয়' সূক্তটির বাকি অংশ গূঢ় রহস্যের ভাষায় রচিত, যার কোনও সরাসরি অর্থ মেলে না। মেলার কথাও নয়, কারণ এর মধ্যে সৃষ্টি, বিশ্বচরাচর, দেবতারা এবং জীবন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আছে যেগুলো রহস্যের সান্ধ্যভাষায় রচিত। এখানে সমাধান নেই, বিভিন্ন ভাষ্যকার এবং সায়ণাচার্য যাই ব্যাখ্যা দিন না কেন। তা ছাড়া সায়ণাচার্য এ সব রচনার প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে ব্যাখ্যা করছেন, বিজয়নগরে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুত্থানের এবং যজ্ঞক্রিয়ার পুনঃপ্রবর্তনের যুগে; তাঁর ভাষ্যে সব কিছুরই একটা বোধগম্য ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা আছে। ফলে যা দুর্জ্ঞেয়— হয়তো রচয়িতার অভীষ্টই ছিল দুর্জ্ঞেয় রূপেই তাকে সংরক্ষণ করা, কারণ তাঁর বোধেই হয়তো বিষয়টা স্পষ্ট ছিল না— সায়ণ তাকেও সুবোধ্য ব্যাখ্যা দিতে তৎপর। ফলে

৩১. কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি। ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥ পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ দেবানামেনা নিহিতা পদানি। (১:১৬৪:৪,৫)

ব্যাকরণ, অন্বয়, ইত্যাদি নিয়ে নানা কসরত তাঁকে এ নিয়ে করতে হয়েছে। এখন খোলাচোখে দেখলে অর্থ অতটা স্পষ্ট হয় না যতটা সায়ণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেটা খুবই স্পষ্ট সেটা হল, প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব, এ সব প্রশ্ন যে তখনকার মানুষের চেতনার মূলে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল সেটা খুব ভাল করেই বোঝা যায়। ওই রহস্যগূঢ় ভাষায় প্রশ্নগুলির সমাধান দেওয়ার চেষ্টাতেও একটি চেতনার সমস্যা ও তার ব্যক্তিগত উপলব্ধির সমাধান অন্তর্নিহিত রয়ে গেছে। ফলে দীর্ঘ সূক্তটিতে ঋষির উপলব্ধি গৌণ বা গুহ্য ভাষায় রূপ পেয়েছে, সমাধান বা উত্তরের রূপে নয়। ওই সূক্তেই আরও প্রশ্ন আছে:

> তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর শেষ কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর নাভিমূল কোথায়? রেতোবর্ষী অশ্বের রেতঃ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, সমস বাক্যের পরম আধার (স্থান) সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। (উত্তর) এই বেদিই হল পৃথিবীর শেষ ভাগ, যজ্ঞ হল পৃথিবীর নাভি, সোম হল বর্ষণশীল অশ্বের রেতঃ, প্রজাপতিই হল উর্ধ্বতন আকাশে পরম বাক্য।[৩২]

এখানে পর পর ঋক দুটিতে প্রশ্ন এবং উত্তরের ভঙ্গি আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, উত্তরগুলি উত্তরই নয়, রূপক সমাধানমাত্র। এখানে প্রশ্নটি যথার্থই প্রশ্ন, অর্থাৎ কোনও অজ্ঞাত বিষয় জানবার জন্যে উচ্চারিত। কিন্তু এখানে উত্তরগুলি অভিধাগত অর্থে উত্তরই নয়, গূঢ় সংকেতপূর্ণ রূপকমাত্র। অবশ্যই পৃথিবীতে বহু দার্শনিক জিজ্ঞাসার সমাধান কোনও কোনও মানুষের মনে আবছা একটা উপলব্ধির রূপেই প্রতিভাত হয়। আপাতদৃষ্টিতে যাকে উত্তর বলে পেশ করা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে উত্তর নয়।

এই রকম একটি নিগূঢ়ার্থযুক্ত সূক্তের নাম 'নাসদীয়' সূক্ত, অস্যবামীয়ের মতো এটিরও নামকরণ প্রথম শব্দ ক'টির সমাহারে। এটির শুরু 'নাসাদাসীন্নো সদসসীৎ' দিয়ে। সায়ণাচার্য বলেছেন পরমেষ্ঠী নামক প্রজাপতি এ সূক্তটি রচনা করেন, এবং এর উদ্দিষ্ট দেবতা হলেন প্রজাপতি। এ সূক্তের শুরুতে শুনি, 'তখন অসৎ (অবিদ্যমান) ছিল না, বিদ্যমানও ছিল না, আকাশের নীচে কোনও আয়তন ছিল না, আকাশও ছিল না, কোথায় কী কাকে আবৃত করবে, গভীর গহন জলও ছিল না।'[৩৩] এখানে কবি যে-মুহূর্তটি কল্পনা করছেন তা হল সৃষ্টির আগেকার এই মুহূর্ত, যখন সৃষ্টিও ছিল না, সৃষ্টির কোনও উপাদানও ছিল না— সদাত্মকও নয়, অনস্তিত্ববাচকও নয়। তখন মহাকাশের ওপরে নীচে কিছুই ছিল না, আবৃত করবার কোনও বস্তুও ছিল না, কোনও উপাদানও ছিল না, আধারও ছিল না। সৃষ্টির

৩২. পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ। পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমে ব্যোম। ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম।। ঋগ্বেদ (১:১৩৪:৩৪, ৩৫)

৩৩. নাসদাসীনো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রবে নে ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনে গভীরম্। ঋগ্বেদ (১০:১২৯:১)।

প্রাক্কালের সেই মহাশূন্যে সেই সর্বউপাদানরিক্ত একটি অবস্থা কল্পনা করা হচ্ছে। পরের ঋকে সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করে বলা হচ্ছে, 'অন্ধকার দিয়ে প্রথমে অন্ধকার আবৃত ছিল। এ সমস্ত অজ্ঞেয় সলিল ছিল, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান দিয়ে আবৃত ছিল (চরাচর): মহৎ তপস্যার দ্বারা 'এক' সঞ্জাত হলেন।'[৩৪] বলা বাহুল্য, এ কল্পনার মধ্যে একটি বিশ্বচরাচরের রহস্য গূঢ় ব্যঞ্জনার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে, এর মধ্যে কবিত্ব অবিসংবাদিত ভাবেই আছে: অন্ধকার দিয়েই অন্ধকার ঢাকা ছিল,... মহৎ তপস্যার দ্বারা 'এক' সৃষ্টির আদিভূত সত্তার উদ্ভব হল। সমস্তটাই যতটা ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ ততটাই অভিধাবিরোধী; আবছা একটা বোধ জন্মায়, স্পষ্ট কোনও জ্ঞান জন্মায় না। জীবনের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে হয়তো এর বেশি স্পষ্ট ভাবে কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। তবু বলতেই হয় অনুত্তরিত এ প্রশ্নগুলি উচ্চারিত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এত গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসার উদ্ভব যে-কোনও প্রাচীন সভ্যতাকেই গৌরবান্বিত করে।

এই সূক্তে আর তিনটি ঋকের পরে ষষ্ঠ ঋকে আমরা অন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হই। কবি বলছেন:

> কে যথার্থ ভাবে জানে, কেই বা তা স্পষ্ট করে বলেছে, এই সৃষ্টি কোথা থেকে কোনখান থেকে জাত হয়েছে? ওই সৃষ্টির পরে (সৃষ্ট) দেবতারা অর্বাচীন হয়ে গেলেন; তাই কে জানে কোথা থেকে এ সৃষ্টি এসেছে? এই সৃষ্টি যার থেকে হয়েছে সে হয়তো ধারণ করেছিল, হয়তো বা ধারণ করেনি। ঊর্ধ্বতম আকাশ যিনি এ সবের অধ্যক্ষ হয়তো তিনি জানেন, হয়তো বা (তিনিও) জানেন না।[৩৫]

সৃষ্টি নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের মূলই হল স্রষ্টা কে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। এ কথা কে জানে, কার পক্ষে জানা সম্ভব? যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানতে পারেন, কিন্তু ঋষির মনে তা নিয়েও সংশয়: তিনিও কি সত্যিই জানেন? অর্থাৎ সৃষ্টি এমন একটা বিরাট রহস্য, যার বৃত্তান্ত হয়তো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও জানে না। তিনি, সেই আদিম স্রষ্টা এমন মহনীয় যে, তাঁর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বাকি দেবতারা তাঁর থেকে অর্বাচীন হলেন। তাঁর পরে বাকি দেবতারা সৃষ্ট হলেন, অতএব দেবতাদের সকলের ওপরে তাঁর স্থান। এ কথা বলার পরেও বলা হচ্ছে সেই তিনিও হয়তো সৃষ্টিরহস্য জানেন না। এ উক্তির মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে সৃষ্টি নিয়ে মানুষের গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়, যেন কেউ, এমনকী স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও বিষয়টি জানলে তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হয়।

৩৪. তম আসীত্তমসা গূঢ়মগেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বসা ইদম্। তুচ্ছ্যোনাম্বে পিহিতং যদাসীত্তপসস্তৎ মহিনাজায়তৈকম্॥ (১:১২৯:২)

৩৫. কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব॥ ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ (১:১২৯,৬,৭)

এর পরের বিখ্যাত 'প্রজাপতিসূক্ত'টির বিষয়বস্তু হল সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি নিজেকে যজ্ঞে উৎসর্গ করেছিলেন যজ্ঞে হননীয় পশুরূপে। সেই আদিমতম ক্ষণে:

> কী পরিমাপ ছিল সে যজ্ঞের, কী আকৃতি ছিল, আজ্য কী ছিল, উপকরণ কী ছিল, কী ছিল পরিধি (কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞের উপাদান)? সে যজ্ঞের ছন্দ কী ছিল, প্রউগ নামক উক্‌থ (স্তোত্র)-ই বা কী ছিল, যখন সমস্ত দেবতারা দেবতাকে (পশুরূপে হনন করে) যজ্ঞ করেছিলেন।[৩৬]

পৃথিবীর অনেক দেশের অতিকথাতেই এমন একটি যজ্ঞকে সৃষ্টির আদিকারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে যেখানে দেবতারা কোনও এক দেবতাকেই— অনুমান করা হয় তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতাকেই— যজ্ঞে আহুতি দেন। এই মহৎ হব্য দেওয়ার ফলে তার থেকেই এই মহান বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হতে পেরেছিল যেহেতু কার্য (ফল) কারণের (উৎপত্তিহেতু) অনুরূপই হয়। অন্যান্য যজ্ঞে অভীষ্ট ফল গুরুত্বে, স্থায়িত্বে, তাৎপর্যে ছোট মাপের। তাই সে সব যজ্ঞে অশ্ব, বলদ, মহিষ, ছাগ, মেষ ইত্যাদি বলি দিলে চলে, কিন্তু যেখানে যজ্ঞফল হল বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, সেখানে বলির জীবকে তো অনুরূপ ভাবে মহত্তম হতে হবে, অতএব স্বয়ং প্রজাপতিকে এখানে বলি দেওয়ার কল্পনা করা হয়েছে। সে তো হল, কিন্তু ওই মহাযাগের উপাদান, উপকরণ কী ছিল? যেখানে হব্য স্বয়ং প্রজাপতি, শমিতা ঋত্বিক স্বয়ং দেবতারা, সেখানে যজ্ঞের পরিধি, সীমা, পরিমাপ, ছন্দ, উক্‌থ, ইত্যাদি যে কী হতে পারে সে পর্যন্ত সে কল্পনাই পৌঁছোয় না। তাই আবার একগুচ্ছ অনুত্তরিত, অসমাধেয় প্রশ্ন। যজ্ঞে স্তোত্র লাগে, হব্য লাগে, তাই ঋষি হব্যের নির্দেশ দিয়ে যেন বলছেন, এমন মহাবিশ্ব-সৃষ্টিযজ্ঞে, স্বয়ং প্রজাপতি সেখানে হব্য, সেখানে অনুরূপ উক্‌থ, ছন্দ কেমন হবে, কে তা জানে? অর্থাৎ কেউ জানে না। অথচ সেই আদিম মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই আদিমতম মহাযাগ, যার ফল বিশ্বসৃষ্টি— তার উপাদানও অবশ্যই মহত্তম হওয়া চাই। কিন্তু সে অবধি ঋষির কল্পনা পৌঁছোয় না বলেই প্রশ্ন রইল অনুত্তরিত। এবং এর নেপথ্যে অনুচ্চারিত যে প্রশ্ন, তা হল, তেমন কোনও যজ্ঞ কোনও দিন সত্যিই হয়েছিল কি? কে দেখেছে, কে জানে, কে সাক্ষ্য দেবে এই মহাযাগ অনুষ্ঠানের।

যেহেতু বীজ থেকে গাছ হয়, অর্থাৎ কারণ থেকে কার্য হয়, সেহেতু এই বিশ্বচরাচর-সৃষ্টি-রূপ কার্য থেকে অনুমান করতেই হবে যে, মহাকালের আদিম কোনও লগ্নে কোনও একটি 'কারণ' দেখা দিয়েছিল বা সংঘটিত হয়েছিল যার কার্য হল সৃষ্টি। এবং সে যুগে যেহেতু যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকেই সমস্ত কিছুর বীজ বা কারণ মনে করা হত, তাই সেই প্রথম সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল কোনও এক মহা বিশ্ব-যজ্ঞ থেকে। এইটে মেনে নিলেও বাকি

৩৬. কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ ছন্দঃ। কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্‌থং যদ্দেবা দেবমজন্ত বিশ্বে॥ (১০:১০৩:৩)

অংশগুলি আপনাআপনিই এসে যাবে: বিশ্বসৃষ্টির বলির পশুর অনুরূপ মাহাত্ম্য চাই। স্বয়ং প্রজাপতি ছাড়া আর কে-ই বা তা হতে পারে? ওই মহাযাগের ঋত্বিক-পুরোহিত-হোতাও অনুরূপ হওয়া চাই। অতএব, একমাত্র দেবতারাই এই পৌরোহিত্যের জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেন। এর পরে থাকে ছোট ছোট অঙ্গ— ছন্দ, সাম, যূপকাষ্ঠ, বেদির মাপ, ইত্যাদি কিন্তু এত সব কে তখন দেখেছিল, খেয়াল করেছিল? অতএব ওগুলো রইল প্রশ্ন হিসেবেই, উত্তর মিলল না। কিন্তু তার সঙ্গে মূল প্রশ্নও রইল অনুত্তরিত: সমস্ত যজ্ঞটাই বা কবে কখন কীভাবে ঘটেছিল, কে তা জানে?

পৃথিবীর প্রায় প্রাচীন অতিকথাতেই একটি আদিমতম যজ্ঞের কল্পনা আছে; কারণ যজ্ঞই ইষ্টফল সৃষ্টি করে, অতএব সৃষ্টির আদিতে তেমন এক যজ্ঞ না থাকলে এই বৃহৎ বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হল কেমন করে? সেই আদিম যজ্ঞই পরবর্তী সকল যজ্ঞের প্রথমতম আকল্প; এবং দেবতারা তা সম্পাদন করেছিলেন বলে তা স্বভাবতই ফলপ্রসূত হয়েছিল, বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। বেদের ব্রাহ্মণসাহিত্য, যার প্রথম অংশ এই সব সূক্তের সমকালীন, তাতে বারেবারেই দেখি দেবাসুরের যুদ্ধে প্রথমে দেবতারা পরাজিত হচ্ছেন। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাঁরা আসছেন প্রজপাতির কাছে নালিশ করতে। তখন প্রজাপতি তাঁদের একটি নতুন যজ্ঞের নির্দেশ দিচ্ছেন; বলছেন, প্রাচীনকালে দেবতারা অনুরূপ সমস্যার সমাধান করেছিলেন এই যজ্ঞটির অনুষ্ঠান করে, দেবতারা সেই নবলব্ধ যজ্ঞ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করছেন।

যে-সমাজে এই কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, সেখানে মানুষ বিশ্বাস করবেই যে, সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে যজ্ঞ, সকল প্রয়োজনীয় সৃষ্টির মূলেই যজ্ঞ। তাই যদি হয়, তা হলে, বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়নি, তখন সে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল কোনও একটি মহৎ চিরকালীন তাৎপর্যপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা। এমন যজ্ঞে পশু স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ দেবতা, ঋত্বিকরাও দেবতা। এবং সেই শ্রেষ্ঠ দেবতা নিজেকে পশুরূপে উৎসর্গ করে হনন করলে পর সম্ভব হয়েছিল মহাকালের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি— বিশ্বসৃষ্টি। এখানে রহস্যের সমাধান না হোক, কল্পনার মহনীয়তা স্পষ্টই লক্ষ করা যায়।

দশটি ঋকে রচিত 'প্রজাপতিসূক্ত' যার অপর নাম 'হিরণ্যগর্ভসূক্ত'। এর প্রথম ঋকেই বলা হচ্ছে:

> প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, (বা হলেন)। যিনি জাতমাত্রই সমস্ত জীবজগতের অধিপতি হন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। কোন্ দেবতাকে হবি দিয়ে পরিচর্যা করব? তিনি আমার দাতা, বলের দাতা, যাঁর শাসন সমস্ত দেবতারা উপাসনা করেন, অমৃত ও মৃত্যু যাঁর ছায়া, কোন্ দেবতাকে...॥ যাঁরা শ্বাস নেয়, চোখের নিমেষ ফেলে তাদের সকলের উপরে যিনি আপন মহিমায় সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন, দ্বিপদ ও চতুষ্পদদের ওপরে যাঁর প্রভুত্ব, কোন্ দেবতাকে...॥ হিমালয় প্রভৃতি পর্বতগুলি যাঁর মাহাত্ম্য, সমুদ্র-সহ সমস্ত জলাধার যাঁর, দিক ও উপদিকসমূহ যাঁর দুটি বাহু, কোন্ দেবতাকে...॥ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে, স্বর্গকে এবং আদিত্যকেও দৃঢ় করেছেন,

> অন্তরিক্ষে যিনি জলের নির্মাতা, কোন্ দেবতাকে...॥ দীপ্যমান আকাশ ও পৃথিবী যাঁর সুরক্ষায় মনে মনে নিজেদের সুরক্ষিত জেনেছে, উদিত সূর্য যাঁর ঊর্ধ্বে বিভাত হয়, কোন্ দেবতাকে..॥ যিনি দেবতাদের একমাত্র অধিদেবতা ছিলেন, কোন্ দেবতাকে...॥ যিনি পৃথিবীর জনক, যে সত্যধর্মা আকাশের জন্ম দিয়েছেন, যিনি বিপুল উজ্জ্বল জলরাশির স্রষ্টা, কোন্ দেবতাকে... হে প্রজাপতি, তুমি ভিন্ন অন্য কেউই সমগ্র জাত মাত্রের এই বিশ্বকে ব্যাপ্ত করেনি, যে কামনা নিয়ে আমরা হোম করছি, তা আমাদের (অধিগত) হোক আমরা যেন পৃথিবীর ধর্মসমূহের অধিপতি হই।।[৩৭]

এই প্রখ্যাত সূক্তটিকে প্রজাপতি সূক্ত বলা হয়; সম্ভবত এই কারণে যে, এর শেষ ঋকে প্রজাপতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তুমি আমাদের সকল প্রার্থনা পূরণ কর। এখানে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ করবার মতো: সমস্ত সূক্তটির মধ্যে অন্য কোথাও কোনও প্রার্থনা নেই, এবং এই শেষতম ঋকে সূক্তের বাকি ন'টি ঋকে যে ধ্রুবপদ— কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম— সেটি অনুপস্থিত। তা ছাড়া প্রজাপতি বলে এখানে দেবতাকে আহ্বান করা হলেও বাকি অংশের যে দেবতা তিনি পরিচিত প্রজাপতির গুণ ও ক্রিয়ার অনেক ঊর্ধ্বে। সমস্ত সূক্ত জুড়ে যে দেবতার পরিচিতি তিনি মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ এবং একমাত্র অধিষ্ঠাতা, সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। এ কথা সত্য যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের একটি প্রবণতা ছিল যে, যখন যে দেবতাকে উদ্দেশ করে স্তব করা হয় তখনকার মতো সেই দেবতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই অভিহিত করা হয়।[৩৮] তা সত্ত্বেও চোখে পড়ে যে, এমন করে সূক্ষ্ম, প্রায় পারমাণবিক স্তরে তুলে ধরে সর্বস্রষ্টা বলে কোনও দেবতাকে বর্ণনা করা হয়নি। আর বিস্ময় সেইখানেই; রচয়িতা ঋষি যাঁকে এত মহান, সর্বশক্তিমান, আকাশপৃথিবী সমুদ্রপর্বত দ্বিপদ-চতুষ্পদের স্রষ্টা এবং সমগ্র বিশ্বভুবনের একমাত্র অধিপতি (ভূতস্য জাতঃ পতিরেকঃ) বলে জানেন, সেই ঋষিই নটি ঋকের শেষে একটিই ধ্রুবপদ করছেন, 'কোন দেবতাকে হবি দিয়ে উপাসনা করব?' স্বভাবতই মনে হয়, এই দেবতাকেই তো হবির্দান করা চলে, প্রশ্ন কীসের?

৩৭. হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাত পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ...। যঃ প্রাণতো নিমিষতোঽত্র মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদ, কস্মৈ...॥ যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ...॥ যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্হা যেন স্বঃস্তভিং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ...॥ যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে। যত্রাধি সুর উদিতো বিভাতি কস্মৈ...॥ ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ...॥...যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ. ॥ প্রজাপতে ন ত্বদেবতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বযং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্॥ (১০:১২১:১-৮, ১৩)

৩৮. হ্বিন্টারনিৎস তাঁর *Ancient Indian Literature,* Vol I-এ এ প্রবণতাকে herotheism বা Kathenotheism বলেছেন।

এখানে দুটো বিষয় লক্ষ করবার আছে। প্রথমত, এই যে প্রশ্ন, কোন দেবতাকে হবি দেব, তার সঙ্গে ওই ন'টা ঋকের বাকি বক্তব্যের কোনও সংগতি নেই। প্রত্যেক ঋকের প্রথম তিনটি চরণে এক শ্রেষ্ঠ দেবতার স্তব করা হচ্ছে, নানা ভাবে এবং শেষে সমস্ত যুক্তির সংগতি ও ধারাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অকস্মাৎ প্রশ্ন করা হচ্ছে কাকে হবির্দান করব। এই অসংগতি এত মৌলিক যে, সায়ণাচার্য থেকে আরম্ভ করে অনেক ভাষ্যকারই বলেছেন, ওই 'কস্মৈ'-এর অর্থ হল 'প্রজাপতি'কে, অর্থাৎ 'ক' শব্দটির অভিধাগত অর্থই হল প্রজাপতি, কাজেই ওই বাক্যাংশটি কোনও প্রশ্নই নয়, একটি উক্তিমাত্র: 'প্রজাপতিকে হব্য দিয়ে আরাধনা করব।' সুবিধেও আছে: শেষ ঋকে প্রজাপতিকে সম্বোধন করে প্রার্থনা জানানো হয়েছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই, সূক্তটির নামও দেওয়া হয়েছে প্রজাপতি সূক্ত, স্বভাবতই এ সূক্তে প্রজাপতিই দেবতা এবং প্রতি ঋকে তাঁকেই হবি দেওয়ার কথাই আছে। এ সব দুয়ে দুয়ে চার হয়ে মিলে গেলেও কিছু মুশকিল যে ছিল তার প্রথম প্রমাণ, ব্রাহ্মণশাস্ত্রে এই সূক্তটির উদ্ধৃতিতে দেখছি, 'তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম', অর্থাৎ 'সেই দেবতাকে হব্য দিয়ে উপাসনা করব।' এতে কোনও গোলমাল থাকে না; প্রতি ঋকে যে মহান দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে তিনটি চরণে, শেষ চরণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁকেই হবির্দান করো। এই পরিবর্তনটিই কিন্তু প্রমাণ যে, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' নিয়ে কিছু মনীষীর মনে অনুপপত্তির সংশয় জেগেছিল, তাই এই সমাধান। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণসাহিত্যে এ পরিবর্তন কিন্তু ঋগ্বেদের 'কস্মৈ'-কে স্পর্শ করল না, সেখানে অসংগতি রয়েই গেল।

সে অসংগতি কী? এটা ব্যাকরণের: নামপদ বা বিশেষ্য অকারান্তে শব্দের চতুর্থী একবচনের রূপ হত 'কায়' (যেমন নরায়), অর্থাৎ 'ক' মানে যদি প্রজাপতি হত শুধুমাত্র তাহলেই 'ক' নামপদ হত, এবং সে ক্ষেত্রে 'প্রজাপতির জন্যে বা তাঁর উদ্দেশে' এই অর্থে চতুর্থী একবচনে হত 'কায়'। কস্মৈ স্পষ্টতই সর্বনাম শব্দরূপ, যেমন ব্রাহ্মণে তস্মৈ, মানে 'তাঁর জন্যে বা তার উদ্দেশে'। ভাষ্যকারদের ওই কসরত ব্যাকরণের ধোপে টেকে না। এ সূক্তটির কেন্দ্রীয় দেবতা প্রায় নিরাবয়ব উচ্চমার্গের একটি ভাবসত্তা, নিয়ম অনুসারে এ সূক্তটির নাম হওয়া উচিত ছিল 'হিরণ্যগর্ভ' সূক্ত, কিংবা 'নাসদীয়' বা 'অস্যবামীয়' সূক্তের মতো প্রথম পদগুলির সমাহারে 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তত' সূক্ত। তা না করে শেষ ঋকটি, যেটি সমস্ত সূক্তটির সঙ্গে তাৎপর্যগত ভাবে প্রায় অসম্পৃক্ত, সেটির খাতিরে এটিকে 'প্রজাপতিসূক্ত' বলা হয়েছে। ভাষ্যকারদের বিশেষ সুবিধে হয়েছে গায়ের জোরে 'ক' মানে 'প্রজাপতি' বলা ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করে।

এখন প্রশ্ন থাকে, তা হলে ওই ভাবে প্রত্যেক ঋকের প্রথম তিনটি চরণের সঙ্গে অসম্পৃক্ত চতুর্থ চরণটি ধ্রুবপদ হয়ে উঠল কেন? এ প্রশ কি যথার্থই প্রশ্ন? ঋষি কি সত্যিই জানতে চাইছেন, কাকে হবির্দান করব? এ সূক্তটি দশম মণ্ডলের, অর্থাৎ ঋগ্বেদ সংকলনের শেষ পর্যায়ের। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে বিস্তর নতুন নতুন দেবতা যুক্ত হয়েছে, দেবমণ্ডলী ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ও কালিক দেবসমাগমে এত স্ফীত

হয়েছে যে, শেষ দিকের বেশ কিছু সূক্তের দেবতা 'বিশ্বে দেবাঃ' অর্থাৎ 'সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে'। যদিও এ সব সূক্তেই কিছু কিছু ঋকে বিশিষ্ট দেবতার নামও করা আছে তবুও সমাহারে একত্র একটি দেবসমাবেশ কল্পনা করা হয়েছে। দেবতা বেড়েছে, যজ্ঞও বেড়েছে, জটিলতাও বেড়েছে, বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ পশু ও হব্যের বিধানও দেখা দিয়েছে। এই পটভূমিকাতে দেখতে হবে এই সূক্তটিকে, যেটি আদৌ প্রজাপতিসূক্ত নয়। প্রথম মণ্ডলের প্রথমাংশ এবং দশম মণ্ডলের শেষ দিকে বেশ কিছু প্রায় নিরবয়ব ও নির্ব্যক্তিক দেবতা এসেছেন, যেমন পরমাত্মন্, কাল, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি (এই যুগেই অথর্ববেদের স্কম্ভও দেখা দিয়েছেন)। এঁদেরই মধ্যে প্রধান এই হিরণ্যগর্ভ, যিনি মূলত নির্ব্যক্তিক, কিন্তু পূর্বতন সকল স্রষ্টার ওপরে যাঁর স্থান, কারণ তিনি শুধু বিশ্বচরাচর নয় ওইসব দেবতাদেরও স্রষ্টা। তখন যজ্ঞ চলছে, বিশেষ বিশেষ দেবতাকে আহ্বান করে, আবার দলবদ্ধ ভাবে 'বিশ্বে দেবাঃ'কেও আহ্বান করে। এই সময়ে যখন কোনও ঋষির উপলব্ধিতে এমন এক দেবাদিদেব সর্বভূতের আদিস্রষ্টা দেবতা উদিত হন, তখন তাঁর দুটো প্রশ্ন জাগে: যেহেতু ইনি আর সকলের ঊর্ধ্বে, তাই এঁর উপযুক্ত হব্য কী তা কীভাবে অনুমান করব। এঁকে কী দিয়ে তৃপ্ত করব? দ্বিতীয়ত, এত যে দেবতা দেবমণ্ডলীতে, ইনি তো তাঁদের একজন নন, অথচ ইনিই শ্রেষ্ঠ, প্রধানতম, আদিমতম। এমন কোনও দেবতা যেহেতু পূর্ববর্তী ঋষিদের কল্পনায় ছিল না তাই এঁর সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে তো মনে হবেই এমন সর্বাতিগ এক দেবতা থাকতে, যজ্ঞে হবি দেব কোন দেবতাকে? তাই প্রত্যেক ঋকের প্রথম তিন চরণে এঁর নৈর্ব্যক্তিক অথচ সর্বাতিশয়ী গুণ, কৃতি ও ক্ষমতার কথা বলে ঋষি প্রশ্ন করছেন, 'তাহলে হবি দেব কোন্ দেবতাকে?' বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের উত্তর নেই, তাই শেষ ঋকে পরিচিত পদ্ধতিতে প্রজাপতিকে আহ্বান করে তাঁর কাছে অভ্যস্ত ঐশ্বর্যের জন্য প্রার্থনা করা হল।

•

মৃত্যু ও সংশয়

যজুর্বেদ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংহিতা, সেখানে এ-জাতীয় চিন্তা বা প্রশ্নের অবকাশ নেই। তবু তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক জায়গায় পড়ি, 'এই লোক থেকে (মনুষ্যলোক থেকে) ভাল ভাবে আসতে হবে এ কথা বলেছেন (তাঁরা), কে তা জানে যে ওই লোকে (= পরলোকে) (কিছু) আছে বা নেই।'[1] যজুর্বেদের কিছু অংশ ঋগ্বেদের সমসাময়িক, কিছু অংশ হয়তো পরে রচিত। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের শেষটিতে বেশ কয়েকটি সূক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যম সম্বন্ধে অথর্ববেদে বলা হয়েছে, 'মর্ত্য (মানুষদের) মধ্যে যিনি প্রথমে মারা যান— যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাম্।' (অথর্ববেদ ১৮:৩:১৩) তিনি মারা গিয়ে প্রথমে পরলোকে গেছেন, সেখানেই আছেন। এই বিশ্বাসে মানুষ তার সদ্যোমৃত প্রিয়জনের শবদাহকালে যমের কাছে প্রার্থনা করে বলত, এ লোকটি সেই জগতের পথঘাট চেনে না, তুমি এক সঙ্গে করে নিয়ে যাও, অন্যদের সঙ্গে বৃক্ষতলে একে নিয়ে আনন্দ কোরো। মৃতের আত্মীয়দের স্বাভাবিক উদ্বেগ ও মৃতের কুশল, কল্যাণ ও আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করার জন্যে অতি স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা এই ধরনের কথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের চেনা জগৎ থেকে এ চলে গেছে, এখন এর সুখদুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের ওপরে আমাদের কোনও প্রভাব থাকবে না, তাই আমাদের রইল শুধু উৎকণ্ঠা। এটা যেমন অনিবার্য ভাবে স্বাভাবিক, তেমনই মধুর। ধরে নেওয়া যেতে পারে আর্যরা তার আগের কয়েক শতাব্দী ধরেই এ ভাবেই মৃতদেহের সৎকার করত এবং সে সময়ে এ ধরনের প্রার্থনাই উচ্চারিত হত; অতএব মৃত্যুর পরে মানুষ যমের তত্ত্বাবধানে কোনও এক জগতে পূর্বের মৃতদের সঙ্গে ভালই থাকে, যম এবং পূর্ববর্তী মৃতরা 'সধমাদং মদন্তি— এক সঙ্গে আনন্দ করে।' মনে রাখতে হবে, যম তখনও মৃত্যুর দেবতা নন, মৃতদের দেবতা। তাঁকে পরলোকে স্থাপন করায় জীবিত মানুষের বিশেষ স্বার্থ ছিল। মৃত্যুকে মানুষের কোনও প্রাচীন সভ্যতাই জীবনের একান্ত সমাপ্তি রূপে মেনে নিতে যে পারেনি, তার একটা বড় কারণ হল, জীবিত আত্মীয়রা মৃতকে স্বপ্ন দেখত এবং মনে করত যাকে দেখা যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে। কোথায় থাকবে তার সন্ধান তারা জানত না, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তারা মনে করত প্রথম মৃত মানুষ যম যেখানে

১. মনুষ্যল্লোকান্নাস্মাল্লোকাৎ স্বেতব্যমিত্যাহুঃ কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা ন বেতি। (৬:১:১:১)

আছেন সদ্যোমৃতও সেখানেই থাকবে। তাই দশম মণ্ডলের যম-সূক্তগুলিতে ওই আকুতি— এ ওখানে যাচ্ছে কিন্তু পথঘাট চেনে না, একে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, সুখে রাখো।

যজুর্বেদেরই অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে পড়ি, 'এই যে পথগুলি বিপৎসংকুল, যেগুলি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে— এতে হ বা আধ্বানো বারণা য ইমেহন্তরেণ দ্যাবাপৃথিবী।' (২:৩:৪:৩৭) এই ধরনের কথা কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৮:২)-এও আছে। যখন সদ্যোমৃতের অন্ত্যেষ্টির সময়ে তাকে লোকান্তরে যেতে বলা হয় তখন মানুষ কল্পনা করে যে, সে বা তার আত্মা পৃথিবী ছেড়ে অন্তরিক্ষ-পথে পরলোকে যাবে। অন্যত্র বলা আছে দেবলোক মর্ত্যলোক থেকে 'অন্তর্হিত' অর্থাৎ আড়ালে— অদৃশ্য। হয়তো সেই কারণেই মানুষ ভেবেছিল পরলোকে যাওয়ার পথটি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের অন্তরিক্ষ-পথ ধরেই। কিন্তু শাস্ত্র বলছে, সে পথ বিপৎসংকুল; এ বিপদ যে ঠিক কী তা কোথাও বলা নেই। তবে তখনকার শাস্ত্র, ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ থেকে আমরা জানতে পারি, নানা নামের ও গোত্রের মন্দ আত্মা, অপদেবতা ও প্রেতাত্মাতে তখন মানুষের বিশ্বাস ছিল, এবং এ বিশ্বাসও ছিল যে এরা অন্তরিক্ষবাসী। অতএব ইললোক থেকে পরলোকে যাওয়ার যে পথ অন্তরিক্ষ দিয়ে সেগুলি তো প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরদের জগতে। তারা মানুষের ক্ষতিই করে এমন কথা প্রায় সর্বত্রই শোনা যায়। তা হলে মৃত্যুর পরের ওই বিপৎসংকুল পথ পেরোনোটাও অনিশ্চয়ে ও আশঙ্কায় আকীর্ণ।

যমলোকে ঢুকলে যম না হয় পথ দেখিয়ে পূর্ব মৃতদের সঙ্গে আরামে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে, কিন্তু ঢোকার পথেই তো নানা বাধা। যমের দুটি ভয়ংকর কুকুর আছে, নাম শ্যাম ও শবল। কোনও মৃতের আত্মা যমলোকে ঢুকতে এলেই এরা তাকে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করে এমন আশঙ্কা ছিল বলে, একটা গরুকে মেরে চিরে ফেলে, মৃতদেহের ওপরে উপুড় করে শুইয়ে তার দুই হাতে মরা গরুর নাড়িভুঁড়িগুলো দিয়ে দিতে হবে। শ্যাম ও শবল যখন ওই নাড়িভুঁড়িগুলো খেতে থাকবে ততক্ষণে আত্মাটি ঢুকে যাবে যমলোকে। সেখানে যে মৃত গরুটি পার করে দেয়, শাস্ত্রে তার নাম অনুস্তরণী গৌঃ। শ্যাম ও শবল, মন্দ আত্মা, রোগব্যাধির সঙ্গে সম্পৃক্ত অশুভ শক্তি, প্রেতাত্মা, তথা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর এত সব বিপদে আচ্ছন্ন পরলোকে যাওয়ার পথ। কাজেই পরলোকে পৌঁছোনোটা বেশ বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকল্পনায় সে পথ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নানা আত্মার রাজত্বের অঞ্চল অন্তরিক্ষ পেরিয়ে। যেহেতু ওই পথে পরলোকে পৌঁছে সেখান থেকে আবার ফিরে এসে কেউ কোনও দিন পথ এবং গন্তব্যস্থল সম্পর্কে যথাযথ হদিস দেয়নি, তাই সমস্ত ব্যাপারটাই সংশয়ে আকীর্ণ। কে তার যথার্থ খবর জানে? অর্থাৎ কেউই জানে না। জীবন নিয়েই যেখানে নানা অনুত্তরিত প্রশ্ন সেখানে পরলোক পর্যন্ত যাওয়ার পথ মানুষের অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত, অতএব নিরতিশয় বিপৎসংকুল। কাজেই মৃতের জন্য জীবিতের প্রার্থনা, 'হে যম, তুমি আগে সেখানে গিয়েছ, এদের পথঘাট চিনিয়ে দিয়ো, যত্ন কোরো, দেখো এরা যেন আনন্দে থাকে।' যার প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেছে তার পক্ষে এমন প্রার্থনা করা

তো খুবই স্বাভাবিক। আর এই ধরনের প্রার্থনা করতে করতে ধীরে ধীরে একটি বিশ্বাস লোকের মনে রূপ নিচ্ছিল: মৃত্যুর পরে মানুষ স্থূলদেহে না হলেও সূক্ষ্মদেহে— যে-দেহে সে স্বপ্নে দেখা দেয়— কোথাও না কোথাও থাকে; সেখানে যম থাকেন এবং মৃতদের সূক্ষ্ম দেহে অবস্থানের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে প্রতি অন্ত্যেষ্টিতে উচ্চারিত প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরম্পরাগত ইচ্ছাপূরক কল্পনায় মৃত্যুর পরে থাকবার একটি জগৎ নির্মাণ করে নিয়েছিল।

এর বাইরে বেদের অন্যত্র মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থান একটি অন্ধকার নিরানন্দ লোকে, এমন কথাও পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরে এ জীবনের ভোগসুখ কিছু থাকে না, এমন একটি বিশ্বাস ছিল বলেই বেদে বারংবার প্রার্থনা করা হয়েছে: 'জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্— দীর্ঘকাল ধরে যেন সূর্যকে উদিত হতে দেখি'; অথবা, 'পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, সুখিনঃ সাম শরদঃ শতম্— একশো শরৎ (= বৎসর) দেখব, একশো শরৎ বাঁচব, একশো শরৎ সুখী হব।' তখন মানুষ বিশ্বাস করত 'শতায়র্বৈ মনুষ্যঃ'— মানুষের পরমায়ু হল একশো বছর, এবং এই একশো বছর পৃথিবীতে আনন্দে, সুস্থ, সমৃদ্ধ ভাবে বাঁচারই আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। এ আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ছিল একটি আতঙ্ক: মৃত্যুর পরে তো সে আবছা অন্ধকারে দুঃখময় স্থানে থাকে। তাই মৃতব্যক্তির জীবিত আত্মীয়রা মৃতের জন্যে যমের অধীনে সুখে থাকবার একটি কল্পস্বর্গ নির্মাণ করেছিল, যাতে জীবিতরা স্বস্তি পায় এই ভেবে যে, যে সব সুখ আমরা এখানে পাচ্ছি, ওরাও অনুরূপ একটি সুখের জগতে বেঁচে থাকে। এমন চিন্তায় প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে ইহলোকের সুখভোগ করতে কোনও দ্বিধা বা কুণ্ঠা জাগে না। না হলে অনুক্ষণ একটি কুণ্ঠা ও অপরাধবোধ এখানকার সমস্ত ভোগসুখকে ক্লিষ্ট করবে।

কিন্তু প্রত্যক্ষের বড় প্রমাণ নেই— তাই ওই জগৎটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনে কোনও নিশ্চয়তা আসে না। তার আরও একটা বড় কারণ হল, প্রত্যেক মানুষই তো মরবে এবং তার মরণের পরে তার কী হবে তা নিয়ে যা জল্পনা সে তো সম্পূর্ণ ভাবে তার ইচ্ছাপূরক কল্পনারই সৃষ্টি। কে কবে পরলোকে গিয়ে ফিরে এসে সাক্ষ্য দিয়েছে যে সত্যিই তেমন একটা জগৎ আছে, যেটা সুখের, যেখানে মৃত্যুর পরে মানুষ ভালই থাকে? যদি সবটাই নিছক কল্পনানির্ভর হয়, যদি সত্যিই তেমন কোনও জগৎ না থাকে? এই বিষম মর্মান্তিক আশঙ্কার প্রকাশ তৈত্তিরীয় সংহিতার ওই উক্তিতে: 'কে তা জানে যে পরলোকে কিছু আছে কি না আছে?' কেউ তো প্রত্যক্ষ দেখেনি, মানুষ মৃত্যুর পরে কোনও আকারেই, কোথাওই থাকে কি না। মরণোত্তর ইহলোকের ওপারের আর-এক ভুবনের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ যেখানে নেই, সেখানে এই-যে সংশয় কেউ যা দেখেনি কেউ যা জানে না, যেটার একমাত্র ভিত্তি অনুমান, সেটা যদি সত্যিই না থাকে তা হলে? তা হলে মৃত্যুই অন্তিম পরিণাম, ইহলোকই একমাত্র লোক— মৃত্যুর পরে, ইহজগতের পরে আর কিছুই নেই। ওই বিরাট কালো শূন্য গহ্বরটার মুখোমুখি হওয়াটা একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। এই মারাত্মক সংশয়ের

প্রথম উচ্চারণ তৈত্তিরীয় সংহিতায়, পরে আরও আছে। কিন্তু এই উক্তিটি খুব-একটি সাহসী উক্তি এবং নিশ্চয়ই এটি আরও অনেকের গভীর ও মর্মান্তিক সংশয়ের উচ্চারণ। কল্পনায় সযত্ন-রচিত একটি আরামপ্রদ পরলোক থাকলে এবং থাকার নিশ্চিত প্রমাণ মিললে কী আনন্দেরই না হত! কিন্তু প্রমাণ যেখানে নেই সেখানে না থাকার সম্ভাবনাটাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব বহু মানুষের মর্মন্তুদ সংশয় উচ্চারণ করার মধ্যে একটা বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও প্রত্যয়ের সীমাবোধের সচেতনতার পরিচয় আছে। প্রত্যয় নিশ্চিত হতে গেলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা তদনুরূপ সিদ্ধ অনুমান প্রয়োজন। যেখানে সেগুলির একান্ত অভাব সেখানে প্রত্যক্ষ তো নয়ই, গ্রহণযোগ্য অনুমান বলেও সিদ্ধ হয় না। তা হলে বাকি থাকে সংশয়। মরণের পরে অতলান্তিক ওই গহ্বরের শূন্যতা ও অন্ধকারকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হচ্ছে এই সংশয়ের উচ্চারণে। অন্যান্য সংশয়ের তুলনায় ওই সংশয়টির গুরুত্ব বেশি, কারণ এর সমস্তটাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ওপারে। 'সংশয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের সঙ্গেই অন্বিত।'[২] সহজেই লক্ষ্য করা যায়, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি এ সব নিয়ে কোনও সংশয় নেই, কারণ এগুলো প্রত্যক্ষ। যা সরাসরি প্রত্যক্ষ নয়, যেমন বীজ থেকে গাছ হওয়া, ভ্রূণ থেকে শিশুর বা শাবকের জন্ম, খাদ্য থেকে পুষ্টি, অনাহারে-রোগে দুর্বলতা, এ-ও প্রত্যক্ষ এবং সহজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধ। মৃত্যু প্রত্যক্ষ, অতএব অনস্বীকার্য, সর্বজনীনও বটে, এ নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। সংশয় আছে মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে।

অনেকে বলেছেন, এই আমাদের পৃথিবী থেকে ভাল ভাবে আসা উচিত (স + এতব্যম্ = স্বেতব্যম্)। সে-কথা মনে রেখেই ঋষি বলছেন, আসা তো উচিত কিন্তু আসব কোথায়? কেউ কি জানে, মৃত্যুর পরে যাওয়ার কোনও জায়গা আছে কি না। প্রিয়জনের মৃত্যুর পটভূমিকায় আমরা তার অদৃশ্য ভবিষ্যতের জন্যে যে একটি নিটোল কল্পনা করে নিয়ে যম এবং পূর্ব মৃতদের সঙ্গে সুখে থাকবার জন্যে তাকে রওনা করিয়ে দিই, মুখে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে, তার পর? যদি সত্যিই তার যাওয়ার কোনও জায়গা না থাকে? তা কেউ জানে না, কেউ দেখেনি, দৃঢ় ভাবে কেউ বলতে পারে না তেমন কোনও জগৎ মৃত্যুর ওপারে আছে কি না। এ সংশয় উচ্চারণ করায় সাহস আছে। যে বিশ্বাসটুকু— ধারণা, কল্পনা যাই হোক— অবলম্বন করে মানুষ প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে; নিজেকে বলে— 'ওর ভবিষ্যতের একটা সুখের, স্বস্তির নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিলাম'; সেই বিশ্বাসের ভূমিতেই এই সংশয়। এ কথা উচ্চারণ করা মানে যারা পূর্বে প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করেছে, যারা এখন করছে, পরে যারা করবে তাদের সকলেরই পায়ের তলার মাটি টলিয়ে দেওয়া। কাজটি এক অর্থে নিষ্ঠুর, অমানবিক, তবু যিনি এমন উচ্চারণ করছেন এ তাঁর

২. 'Doubt is inseparable from all inquiry into and discoveries about the empirical world.' *Macmillan Encyclopaedia of Religion* p. 427

একক উপলব্ধি নয়; তাঁর পূর্বের ও তাঁর সমকালীন বহু মানুষের মনে এ সংশয় উদিত হয়েছে। পরে যারা মৃত আত্মীয়দের অগ্নিকৃত্য করবে ওই সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ করে, অনিবার্য ভাবে তাদেরও মনে ওই সংশয় জাগবে। এরা স্থানে কালে ছড়িয়ে, এবং সংখ্যায় ভারী। ফলে তিনি এ সংশয় উচ্চারণ করেছেন, তিনি অতীতের সমকালের এবং আগামীকালের বহু মানুষের সংশয় উচ্চারণ করেছেন— না করে উপায় ছিল না। কেউ যা দেখেনি, যে জগতের অস্তিত্বের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই, তেমন একটা জগতে প্রিয়জনকে পাঠানো হচ্ছে, তা কি এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে? তাতে তো প্রিয়জনের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। পরে যারা এসে এই সব কথা বলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করবে তারাও তা হলে অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের রূপে আবৃত করে আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে শঠতা করবে?

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের কেন্দ্রে মৃত্যু। অন্যান্য সামাজিক অভাব মেটানো যায়, অসুবিধার প্রতিকার হয়, অভাব ঘোচে, রোগও সারে; কিন্তু মৃত্যুই একমাত্র যা চূড়ান্ত, নিষ্প্রতিকার, একান্ত। কাজেই মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে যে-সংশয় তার আক্রমণ অমোঘ। তাই তখনকার সমাজ এই সংশয়কে ভাষায় উচ্চারণ করেছে এবং ঋষিরা সে-উচ্চারণকে বেদের মধ্যে সংরক্ষণও করেছেন। মধুর সান্ত্বনা ও ইচ্ছাপূরক আশ্বাসবাণীর মধ্যে যদি যথার্থ সত্য না থাকে, তা হলে প্রকাণ্ড যে সংশয়ের কালো পর্দাটা চোখের সামনে দুলতে থাকে, তা জীবনমরণকে আচ্ছন্ন করে একান্ত হয়ে ওঠে। কোনও নিশ্চয় বোধ দিয়ে একে খণ্ডন করা যায় না, তাই এ উচ্চারণ এত তাৎপর্যপূর্ণ, এত মারাত্মক ভাবে ভয়াবহ এবং এত অনুত্তরণীয়। বেদের ঋষিদের সততার ও সাহসিকতার প্রমাণ তৈত্তিরীয় সংহিতার এ অংশ। বেদকে এক ভাবে এটি মহিমান্বিতও করেছে, কারণ আজও এ সংশয়ের কোনও সমাধান মেলেনি, এইখানে দাঁড়িয়ে আজকের মানুষ একই রকম অসহায় বোধ করে।

জীবনটাই প্রত্যক্ষ, মৃত্যুর পরের সবটাই অনুমাননির্ভর। সেই জন্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলে, 'মানুষের উচিত প্রতি মাসে যথাবিধি যজ্ঞ করে যাওয়া, কারণ মানুষের কথা কেই-বা জানে?'[৩] জীবনে যতটুকু তা করা যেতে পারে, তার পরে সবটাই দুর্জ্ঞেয়, 'কে-ই বা জানে?' অর্থাৎ কেউই জানে না। মৃত্যুর পরে যজ্ঞ করা যায় কি না সেটা যেহেতু অনিশ্চিত, তাই ইহজীবনে নিয়ম মেনে মাসে মাসে যজ্ঞ করা উচিত। হয়তো তার ফল সুদূরবিস্তৃত। তবে সেটা তো ঘোর অনিশ্চিত; কে জানে মানুষের জীবন সম্বন্ধে শেষ কথাটা? এই অনিশ্চয়ই বহু সংশয়ের মূলে।

৩. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১:৮:৪:৩); এই কথাই পড়ি শতপথ ব্রাহ্মণেও (৫:২:২)

অবৈদিক সংশয়

যজ্ঞ তার সমস্ত কিছু আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে অন্তত দু-হাজার বছর ধরে প্রচলিত। যখন আর্যরা ভারতবর্ষে আসে তখন তারা প্রধানত পশুচারী, তবে কিছু কৃষিও জানত; পশুচারী স্বভাবত যাযাবর বলেই স্থায়ী ভাবে কোথাও বসবাস করে চাষ করার সময় কখনও কখনও পেলেও, পশুপাল নিয়ে দীর্ঘপথ পরিক্রমার সময় পেত না। সেই যাযাবর-জীবনে যজ্ঞ ছিল স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত ও সরল, যদিও জীবনের মূল প্রশ্নগুলো এক রকমেরই ছিল। তারা যখন আর্যাবর্ত দখল করে কৃষিকাজ পাকাপাকি রকমে করতে শুরু করল তখন সেই সব প্রশ্নই অনেক জটিল চেহারা নিল। যজ্ঞ দীর্ঘায়ত হল; পুরোহিতের সংখ্যা বেড়ে সতেরো (যাগবিশেষে আরও অনেক বেশি) হল; যজ্ঞের উপকরণের তালিকা ও পরিমাণ বাড়ল; দক্ষিণা বাড়তে লাগল চক্রবৃদ্ধি হারে, যজ্ঞের কালসীমাও বাড়তে বাড়তে সোমযাগের সত্র বারো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হল (শাস্ত্রে এক হাজার বছর ব্যাপ্ত সোমযাগের কথাও আছে!)। ফলে যজ্ঞের মহিমা গরিমা বেড়েই চলল। অবশ্য এ সব অল্প সময়ে বা হঠাৎ হয়নি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিতে কয়েকশো বছর ধরে এর প্রস্তুতি চলছিল। আমরা প্রথমে এর কারণ নির্ণয় করব, পরে এর তাৎপর্য, ফল ও এ অবস্থা থেকে উদ্ভূত সংশয়গুলির আলোচনা করব।

খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে ভারতবর্ষে প্রথম লোহা দেখা যায়, কিন্তু তখন তা পরিমাণে অল্প ছিল বলে প্রথম শ-তিনেক বছর অলংকার ও অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর কাজেই লোহা ব্যবহার করা হত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে প্রথম বেশি পরিমাণে লোহা দেখা গেল, তখন মানুষ লোহার লাঙলের ফলা তৈরি করতে শুরু করল। এর আগে চাষের জন্যে লাঙলে কাঠের ফলা লাগানো হত। কাজেই পরিশ্রম বেশি করতে হত, আর তাতে অল্প জমি চাষ করতে বেশি সময় লাগত। লোহার ফলার লাঙলে অল্প পরিশ্রম ও সময়ে অনেক বেশি জমি চাষ করা যেত। এর ফল হল সুদুরপ্রসারী; বেশি ফসল উৎপন্ন হলে প্রয়োজনের বেশিটা উদ্বৃত্ত হত। অবশ্যই সেটা জমা হত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে; তারা এই উদ্বৃত্তের বিনিময়ে কুটিরশিল্পের সামগ্রী তৈরি করাতো গরিব শিল্পীদের দিয়ে, কিছু ফসল সরাসরি রপ্তানিও করত। খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক থেকে মধ্যপ্রাচ্য, আরব, পারস্য, মিশর হয়ে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত প্রাগার্যদের যে-বাণিজ্য ছিল, যা আর্যরা এখানে আসার পরে বন্ধ হয়েছিল, সে-পথে

আবার বাণিজ্য শুরু হল। ফসল বা শিল্পবস্তু রপ্তানি থেকে— এবং দেশের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্য থেকে যে-সম্পদ আসত তা জমত ওই মুষ্টিমেয় একট শ্রেণির হাতে। ফলে দেশে বেশ স্পষ্ট একটা শ্রেণিবিভাজন হল, যেখানে অল্প কিছু লোক বিত্তবান এবং অধিকাংশ লোকই বিত্তহীন। যে-চাষি অন্যের জমিতে খাটত, যে-মজুর ধনীর ব্যবসার জন্য শিল্পবস্তু নির্মাণ করত— তারা সে কাজ করত পেটভাতায়। ফলে ব্যবসার লাভের বড় অংশটাই মুনাফা হয়ে জমত ওই অল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে।

এ ছাড়া দেশে ঋগ্বেদের আমল থেকেই বর্ণবিভাগ তো ছিলই। চারটি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যই ছিল বিত্তবান: ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য এবং আচার্যত্বে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষাকর্মে এবং রাজার প্রসাদে, বৈশ্য কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যে। ধনী ব্রাহ্মণ হত পুরোহিত ও আচার্য। ধনী ক্ষত্রিয় হত যজমান, যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক, যাদের নামে যজ্ঞগুলি করা হত এবং যারা যজ্ঞের সমস্ত খরচ জোগাতো। এই সময়ের মধ্যে যজ্ঞের সংখ্যা বিস্তর বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা যজ্ঞেই অনেক পশু বধ করতে হত, অথচ এখন লোহার লাঙলের ফলার প্রচলন হওয়ার ফলে অল্প সময় ও পরিশ্রমে অনেক বেশি জমি চাষ করা যাচ্ছিল। ফলে লোকে দেখল যজ্ঞে যদি শ-য়ে শ-য়ে পশুহত্যা করা হয় তা হলে হালের বলদে টান পড়বে। তাই পশুধনের অনাবশ্যক অপচয় বাঁচাবার জন্যে মানুষ সচেষ্ট হল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের রচনা শতপথ ব্রাহ্মণে শুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, এই সব কারণে গোমাংস ভক্ষণ ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, ষষ্ঠ শতকে মহাবীরের প্রবর্তিত জৈনধর্মে এবং গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মে অহিংসাকে ধর্মের একটি মৌলিক উপাদান বলে ঘোষণা করা হল। যজ্ঞে পশুবধ অপরিহার্য, এ দিকে চাষের জন্যে গোধন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও সম্ভবত একটা বিতর্ক চলেছিল, যার চিহ্ন রয়ে গেছে মহাভারত-এ। এখানে ঋষিদের সঙ্গে তর্ক হয় দেবতাদের: যজ্ঞে গো-বধ করা উচিত কি না। দেবতারা তো যজ্ঞের হব্য পেতেন, কাজেই তাঁরা গোমাংসের পরিবর্তে ছাগ ও মেষ মাংসের সপক্ষে মত দেন এবং ঋষিরা শস্যজাত হব্যের সমর্থন করেন। দু-পক্ষই বসু উপরিচরকে মধ্যস্থতা করতে বললে তিনি পশুহত্যার পক্ষে মত দেন, তবে সেটা ছাগ ও মেষ মাংস হতে হবে। এখানে দেখা যায়, চাষের ক্ষতি সকলেই এড়াতে চেয়েছেন। তাই বিকল্প হয় শস্য অথবা ছাগ বা মেষ, যেগুলো দিয়ে চাষ হয় না। এদিকে বহু যজ্ঞে বলদ, মোষ, ইত্যাদি জন্তু বধ করার নির্দেশ আছে। ফলে সত্যকার একটা সমস্যা দেখা দিল এবং ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ নিয়ন্ত্রিত হল অর্থনীতির দ্বারা। গো-বধ অপ্রচলিত অথবা অল্প প্রচলিত হল, বিকল্প পশু এবং শস্য ক্রমে প্রাধান্য পেল।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রেণিবিভাজনের সঙ্গে শ্রমবিভাজনও কঠোরতর হল। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় (এর শ-খানেক বছর আগেকার রচনা মনে হয়) বহু কর্মবৃত্তির নাম পাই। অর্থাৎ সমাজে চারটি বর্ণের শ্রমবিভাজন ছাড়াও জীবনযাত্রার উন্নততর মান রচনার চাহিদায় বহুবিধ শিল্পের ও বৃত্তির উদ্ভব হয়েছিল। স্বভাবতই এরা কৃষিগ্রামে বাস

করত না। বরং বিভিন্ন বৃত্তির ছোট ছোট দলে (শ্রেণি বা পূগ) ভাগ হয়ে এক-একটি বৃত্তির মানুষ এক-একটি অঞ্চলে একত্র হয়ে কাজ করত; সে সব শিল্পপ্রধান অঞ্চল গ্রামের বাইরে থাকত, যেখানে রাজা, রাজন্য ও বণিক তাদের বৃত্তি (= মাইনে) দিয়ে কাজে নিযুক্ত রাখতেন। এই রকম বহু শিল্পের গোষ্ঠী যেখানে রাজন্য ও বণিকদের সান্নিধ্যে থাকত, সেগুলির চরিত্র গ্রাম থেকে ভিন্ন: জনসংখ্যা ও কর্মব্যস্ততা বেশি, চাষ কম, কারণ তাদের খাদ্য জোগান দিত কৃষিগ্রামগুলি। এই নতুন জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীর নগর; এক-একটি নগর এক-একটি জনপদের কেন্দ্র। এই সময়ে ষোলোটি বিখ্যাত জনপদের উদয় হয়। ইতিহাসে এগুলির নাম শুনি, মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী, বজ্জি, লিচ্ছবি, কাশী, মল্ল, কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, চেদি, গান্ধার, অশ্মক, শূরসেন ও কম্বোজ— ষোড়শ মহাজনপদ। এই হল ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নগরায়ণ (প্রথমটি সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন)। আর্যরা যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-পূর্বের দিকে এগোচ্ছিল, উত্তরের অঞ্চল জয় করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সে-কথা জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে পাই (৩:১৪৬); আর তাদের পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে এগোনোর কথা পাই কাঠক ব্রাহ্মণে (২৬:২)। এই অগ্রগতির ফলে ধীরে ধীরে প্রায় পাঁচশো বছরে আর্যাবর্তের অধিকাংশই আর্যদের অধিকারে আসে এবং ক্রমে বহির্বাণিজ্যের ফলে যখন সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে নগরায়ণ ঘটে তখনই ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। আগে জিনিসের দাম নিরুপিত হত গরু দিয়ে। এখন থেকে শুরু হল মুদ্রা দিয়ে। এই সময়ে তাই লেখারও প্রচলন ঘটে, লেখা ছাড়া বাণিজ্য হতে পারে না, হিসেব ও বিবরণ লেখা দিয়েই হয়।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় পরিবর্তন দেখা দিল, যেগুলির ফল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, লোহার লাঙলের ফলার প্রবর্তনের সঙ্গে স্বল্পতর পরিশ্রম ও সময়ে বিস্তৃততর জমি চাষ করা সম্ভব হল, ফলে ফসলে উদ্বৃত্ত দেখা দিল। এ উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হল অল্প কিছু ধনীর হাতে যারা পেটভাতায় লোক খাটিয়ে জমিতে ফসল উৎপাদন এবং কুটিরশিল্পজাত বস্তু নির্মাণ করাতে লাগল। উদ্বৃত্ত ফসল ও শিল্পদ্রব্য দেশের মধ্যে এবং নৌবাণিজ্যের দ্বারা বিদেশে রপ্তানি করে ধনিকরা অনেক ধন অর্জন করতে লাগল। এই বাড়তি সম্পদ ভোগ করতে ও জমাতে লাগল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। এদের তুলনায় শতকরা আশি-নব্বই ভাগ মানুষ খুবই গরিব, যাদের অধিকাংশই পেটভাতায় খাটত, জমিতে বা শিল্পের কারখানায়। ফলে সমাজ স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল ধনী ও দরিদ্রে, শ্রেণিবিভাজন প্রকট রূপে দেখা দিল। মুদ্রা ও লিপির প্রচলন এ সবের সঙ্গে সম্পৃক্ত— এ দুটির মধ্যেও সমাজের অগ্রগতি সূচিত হল এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ল। শ্রেণিবিভাজনের একটা তাৎক্ষণিক ফল হল, বাড়তি টাকায় ধনিক শ্রেণি বেশি বেশি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে লাগল। ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোহিত-শাস্ত্রকারশ্রেণির উদ্ভব হল। এরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে কোনও পরিশ্রম করত না, সম্পূর্ণ পরোপজীবী ছিল। বাকি সমাজ এদের অন্নবস্ত্র, বাড়িঘর, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যয় বহন করত, সমাজে এদের খাতির প্রতিপত্তি ছিল সর্বোচ্চ স্তরে। ফলে আর-একটি বিভাজনও

দেখা দিল— কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের তারতম্য।

সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত যারা মাথার কাজ করে সমাজ তাদের উন্নততর মানুষ বলে গণ্য করে, এবং যারা গা-হাত-পা খাটিয়ে পরিশ্রম করে খায়, তারা নিচু শ্রেণির মানুষ বলে গণ্য হয়। কায়িক শ্রম থেকে ছুটি পাওয়া এই পুরোহিতশ্রেণি অধ্যাপনা, শাস্ত্র নির্মাণ এবং বহু প্রকারের দীর্ঘস্থায়ী জটিল প্রকরণের বহু যজ্ঞ উদ্ভাবন ও অনুষ্ঠান করতে লাগল। প্রথম দিকের রচনার চেয়ে পরের দিকে রচিত ব্রাহ্মণগুলিতে আমরা অনেক বেশি নামের নানা যজ্ঞের কথা শুনি, যেগুলিতে বহু সংখ্যক পুরোহিতের কাজ থাকে। স্বভাবতই পুরোহিতরা তাদের স্বশ্রেণির মানুষকে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করবেনই, বিশেষত দেশে যেখানে উদ্বৃত্ত বিত্ত আসছে— রাজা, রাজন্য, ধনী ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের হাতে। পুরোহিতরা বিভিন্ন সংকটের জন্যে বিভিন্ন যজ্ঞ উদ্ভাবন করেই চলল। এ সব যজ্ঞে শুধু বেশি সংখ্যায় পুরোহিতই নিযুক্ত হল না, যজ্ঞের উপকরণ সামগ্রীর বহু প্রকারভেদ দেখা গেল; হব্যের পরিমাণ বাড়তে লাগল, যজ্ঞের কালগত ব্যাপ্তি বাড়ল। আর বাড়ল দক্ষিণার সামগ্রীর প্রকারভেদ ও পরিমাণ। ফলে এখন শুধু ধনীরই সাধ্য রইল যজ্ঞ করবার।

সাধারণ মানুষ যাদের সংখ্যা সমাজে যজ্ঞকারীদের তুলনায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ, তারা দূর থেকে দুটো জিনিস দেখল। প্রথমত, যা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল তা হল যজ্ঞের আড়ম্বর, প্রাচুর্য, ধূমধাম, ঘটা। যজ্ঞান্তে দেওয়া পুরোহিতকে ও ঋত্বিকদের প্রচুর দান ও দক্ষিণা। এরা দূরের দর্শক হিসেবে ষোড়শ মহাজনপদের নানা স্থানে যুগ যুগ ধরে এই সব সাড়ম্বর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে দেখছিল। সম্ভ্রম, বিস্ময়, মুগ্ধতার সঙ্গে কি কিছু বিরূপতাও মিশত না— যেটা ঘটা খুবই স্বাভাবিক বাইরের দরিদ্র দর্শকের পক্ষে? দ্বিতীয়ত, শতকের পর শতক সাধারণ মানুষ জন্ম-পরম্পরায় শুনে শুনে মেলাতে লাগল যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। বলা বাহুল্য, রাশিবিদ্যার নিয়ম অনুসারেই কোনও কোনও যজ্ঞে কাকতালীয়বৎ ফল দেখা যেত এবং অনেক সময়ে কোনও কোনও যজ্ঞ নিষ্ফলও হত। এটাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই যজ্ঞে অভীষ্ট ফল পাওয়া না গেলে পুরোহিতরা যজমানের কিংবা ঋত্বিকদের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা অথবা দৈবদুর্ঘটনাকে দায়ী করত, যেমন এখনও মানুষ করে থাকে। কাকতালীয়বৎ যে সব যজ্ঞে প্রার্থিত ফল মিলত, সেগুলি দিয়ে পুরোহিতরা সমর্থন করত সমস্ত যজ্ঞবিধানকে, আর যেগুলি মিলত না সেগুলো প্রকরণগত ত্রুটি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হত।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কি এই ত্রুটির ব্যাখ্যাগুলিকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করত? কোথাও, কখনও কি করে? না করেনি। তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে। অন্তত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে দেশে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী মত ও সেই সব মতাবলম্বী দলের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটে আর্যাবর্তে। কারণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতমবুদ্ধ যে সব ব্রাহ্মণ্যবিরোধীদের দেখা পান, তখনই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব শিষ্যসহচর নিয়ে দল গড়েছেন। তাই মনে হয়, যজ্ঞ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, অনীহা সেই অষ্টম শতক থেকেই সমাজে বেশ স্পষ্ট হচ্ছিল। গৌতমবুদ্ধ তাঁর সাধনার সময়ে আনাড় কালাম, রুদ্রক রামপুত্র, অজিত কেশকম্বলী, পূরণ কাশ্যপ, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র,

মস্করী গোশাল, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরাটীপুত্র, এঁদের দেখা পান। এঁদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মত, কিন্তু এঁরা সকলেই বেদবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী, অনেকেই কর্মফলবিরোধী, কেউ কেউ নিয়তিবাদীও। এঁরা নিজেদের দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরে বেড়াতেন, এঁদের কথা শুনে নতুন নতুন লোক দলে যোগ দিতেন, দল ভারী হত। এমন করেই নানা বিরুদ্ধবাদ সমাজে প্রসারলাভ করেছিল।

এই সব দলের উৎপত্তি কিন্তু সংশয়ে: বেদ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দেবতা পুরোহিতদের ভূমিকা— এ সবের যথার্থতা সার্থকতা নিয়ে সংশয়। এ মতগুলির উৎপত্তির ইতিহাস আলাদা করে জানা না গেলেও এটা জোর করেই বলা চলে যে, ব্রাহ্মণ্যযুগের ধর্মাচরণে এঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় তখন প্রথম তিন বর্ণের পুরুষকে বাল্যকৈশোরে ব্রহ্মচর্য পালন, অর্থাৎ গুরুগৃহে গিয়ে বেদাধ্যয়ন করতে হত। যজুর্বেদীদের সম্ভবত যজ্ঞ করার পাঠও নিতে হত, ঋগ্বেদীদের স্বরে মন্ত্র আবৃত্তি এবং সামবেদীদের সুরে বেদগান করার তালিম নিতে হত। প্রায়োগিক দিকটা হয়তো পরে যজ্ঞের পুরোহিতদের অধীনে শিক্ষানবিশির ভিতর দিয়ে করত, কিন্তু বেদপাঠটা ব্রহ্মচর্যের আবশ্যিক কার্যক্রম ছিল। অবভৃথস্নান অর্থাৎ স্নাতক হওয়ার পরে বিবাহ এবং তার পর বাকি জীবনটা গার্হস্থ্য; তার মধ্যে গৃহীর অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে ছোটখাটো যজ্ঞ সম্পাদন করাও ছিল।

সংহিতাব্রাহ্মণযুগে এই দুটি আশ্রমই চলিত ছিল, অর্থাৎ সমাজের উচ্চ ত্রিবর্ণের প্রত্যেককেই যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত; বড় বড় যজ্ঞ অবশ্য ধনী যজমান নৈমিত্তিক ভাবে, অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে অনুষ্ঠান করতেন। তার মানে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং একাদশ-দশম শতক থেকে বিস্তারিত ভাবে সমাজে যজ্ঞ চালু ছিল। প্রত্যক্ষ ভাবে যজ্ঞের সঙ্গে যোগ ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের। ফলে সমাজের নিরানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ— ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, নারী ও প্রাগার্যরা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান বাইরে থেকে দেখত। এই দেখা স্বাভাবিক ভাবেই দূরের থেকে দেখা, সমালোচকের চোখে, অর্থাৎ কারণের সঙ্গে কার্যকে মিলিয়ে দেখা: এ ক্ষেত্রে কারণ হল যজ্ঞ, কার্য যজ্ঞফল। এ দুটো যখন মিলত না তখন স্বভাবতই সংশয় আসত। অনেক যজমান নিশ্চয়ই বিস্তর খরচ করে যজ্ঞ করেও ফল পায়নি, অনেক পুরোহিতও একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ করেও সে যজ্ঞকে নিষ্ফল হতে দেখেছে। শুধু কি এরাই? জাঁকজমকে একটা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে চারপাশের সাধারণ মানুষও তা দেখে এবং সে যজ্ঞ থেকে প্রত্যাশিত ফল যে পাওয়া গেল না সেটাও লক্ষ্য করে। বারে বারে এ ঘটনা ঘটলে লোকের মনের সংশয় দৃঢ় হতে বাধ্য। কতকগুলো যজ্ঞ যেমন পুত্রকামনায় অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বা বৃষ্টিকামনায় করা কারীরী ইষ্টি, এগুলোর ফল তো মানুষ সদ্য সদ্যই মিলিয়ে দেখে। না পেলেই জাগে সংশয়। না পাওয়া সত্ত্বেও সমাজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। প্রথমত, যজ্ঞ ছাড়া প্রকৃতিকে বশীভূত করার বা ইষ্টসিদ্ধির কোনও পন্থাই তাদের জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, কাকতালীয়বৎ কয়েকটা যজ্ঞের পরে ইষ্টসিদ্ধি হত এবং তাতে যজ্ঞ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হত। তৃতীয়ত, পুরোহিতশ্রেণি যজ্ঞ

নিষ্ফল হলে তার ব্যাখ্যা দিত, অন্য ভাবে অন্য যজ্ঞ করার বিধান দিত। সমাজে এই পরগাছা পুরোহিতশ্রেণির কাম্যই ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকুক, এর সঙ্গে তাদের জীবিকা ও সামাজিক প্রতিপত্তি দুই স্বার্থই সম্পৃক্ত ছিল।

তা সত্ত্বেও যে যজ্ঞ বারে বারে নিষ্ফল হত, মীমাংসাশাস্ত্রের ভাষ্যেও এ কথা আছে। অতএব সাধারণ নিষ্ক্রিয় দর্শকের মনে সংশয় জাগত ও দৃঢ় হত। এদেরই মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান চিন্তাশীল মানুষ সমগ্র যজ্ঞক্রিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে যজ্ঞকে অস্বীকার করে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করত। তখন অন্যান্য সংশয়ীরা তার সহচারী হত। এমন বহু প্রস্থানের অনুসারী— যাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু বেদ ও যজ্ঞের বিরোধিতায় যাঁদের মিল ছিল— তাঁরা যজ্ঞ ছেড়ে নিজেদের মতের অনুশীলন করতেন। দুটি ব্যাপারে এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করতেন, বেদ ও যজ্ঞকে অস্বীকার করে এবং নিজেরা গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ানোর ফলে গৃহীর করণীয় যজ্ঞগুলিও না করে। এ সব প্রস্থানের অনেকগুলিই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু অনেকগুলিই থেকে গেল; তাদের মধ্যে প্রধান হল নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্রের প্রবর্তিত জৈনধর্ম, গৌতমবুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম এবং মস্করী গোশালের নিয়তিবাদ। এই সব বেদবিরোধীদের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে বেশ খানিকটা পাওয়া যায়। এখানে জাতকগুলির ৫২৮ নং 'মহাবোধি জাতকে' ২৪ নং শ্লোকের পরে 'উচ্ছেদবাদী' বলে সাধারণ ভাবে এদের সকলের কথার সারসংগ্রহ দেওয়া হয়েছে:

> 'দান নেই, যজ্ঞ নেই, হোম নেই, ভালমন্দ কর্মের ফলের পরিণাম নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই— ন অত্থি দিন্নং, ন অত্থি যিট্‌ঠং অত্থি হুতং, ন অত্থি সকটদুক্‌কটকমনং ফলং বিপাকো, ন অত্থি মাতা ন অত্থি পিতা, ন অত্থি অয়ং লোকো ন অত্থি পরলোকো।'

এখানে প্রথমেই কর্মকাণ্ডকে অর্থাৎ যজ্ঞ ও দানদক্ষিণা, ইত্যাদি যজ্ঞসংশ্লিষ্ট তথাকথিত পুণ্যকর্মকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তার পরে তত দিনে সমাজে যে মতবাদটি প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সেই কর্মফলকে অস্বীকার করা হচ্ছে। সমাজে অবশ্যকরণীয় সৎকর্মের মধ্যে পিতামাতার পরিচর্যা নির্দিষ্ট ছিল, তাকেও অস্বীকার করা হচ্ছে, এবং শেষ অস্বীকার ইহলোক-পরলোক। ইহলোককে অস্বীকার করা যায় না কারণ তা প্রত্যক্ষ, কিন্তু পরলোকের পরিপ্রেক্ষিতে যে ইহলোক, অর্থাৎ যেখানে জীবনের অন্ত ঘটলে আত্মা পরলোকে যায় সেই ইহলোককে— পরলোকের সঙ্গে যুক্ত ইহলোককে, পরলোকের সঙ্গেই অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি, যজ্ঞ ও দানদক্ষিণাকে নিষ্ফল বলা হয়েছে এবং শেষ জীবনের অন্তে মানুষের স্বপ্ন যে পরলোক, তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, জাতকে এই মতবাদগুলিকে সামগ্রিক ভাবে 'উচ্ছেদবাদী' বলা হচ্ছে; এরা উচ্ছেদ করছে বেদের ধর্মকে।

বুদ্ধের সময়েও সমাজের যজ্ঞানুষ্ঠান হত। প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত বুদ্ধের যৌবনের তিনটি অভিজ্ঞতা তাঁকে বৈদিক ধর্মাচরণের প্রতি বিমুখ করে তুলল। যজ্ঞ সব কাম্যবস্তু দেওয়ার

প্রতিশ্রুতি দেয়: সুখ, বিজয়, ধন ঐশ্বর্য মানুষ ভোগ করবে তো শরীর দিয়েই? সেই শরীরের তিনটি সবচেয়ে বড় সংকট— ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু— এগুলি নিবারণের তো কোনও বিধান বেদে নেই। তখনকার সমাজ জন্মান্তরে বিশ্বাস করত, অতএব জন্মান্তরেও মানুষকে এ তিনটি সংকটের সম্মুখীন হতে হবে? সংশয় জাগল সিদ্ধার্থের মনে: তা হলে, বেদের নির্দেশিত পথে যখন এ তিনটি মহাসংকটের কোনও আত্যন্তিক প্রতিবিধান নেই, তখন বেদের পথে স্থায়ী সুখের কোনও পথনির্দেশ নেই। বুদ্ধের সংশয়ের প্রায় অনুরূপ সংশয় ছিল মহাবীরের, এবং সম্ভবত অন্য বেদবিরোধী মতের প্রবক্তাদেরও।

শ্রেণি ও সংশয়

আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, তবুও এই অবৈদিক প্রতিপক্ষদের নিয়ে আলোচনা করলাম দুটি কারণে। প্রথমত, এঁরাও বৈদিক যুগেরই সংশয়ী, দ্বিতীয়ত, এঁদের প্রতিবাদের যে-সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছিল তা বেদের যুগকে অন্য প্রকারে, কিন্তু গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত, তখন সমাজে লোকসংখ্যা কম ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এতগুলি বিরোধী দল ও তাদের বেশ ভাল সংখ্যায় অনুগামী, এটা সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকটের সৃষ্টি করেছিল। লোকে দেখল এত বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষরা সমাজে যজ্ঞ না করেও তো দিব্যি খেয়ে-পরে বেঁচে আছে, এদের মড়কও লাগছে না, মাথার ওপরে বাজও পড়ছে না; কাজেই যজ্ঞ না করেও বেঁচে থাকা যায়। এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই ক্রমে স্ফীত হচ্ছিল, তাই এদের অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করাও যাচ্ছিল না। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথম যে-প্রতিক্রিয়া হল তা হল ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে শাস্ত্রকারদের আরও দুটি (হয়তো প্রথমে তৃতীয়টি ও পরে চতুর্থটি) আশ্রম সংযোজন। তারা বলল, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গার্হস্থ্য আশ্রম পালন করবার পরে বনে বাস করতে পার, তখন অগ্নিহোত্র-র মতো নেহাত স্বল্প উপকরণের ও স্বল্প সময়সাপেক্ষ ছোট ছোট হোমগুলি ছাড়া আর কোনও বড় যজ্ঞ করতে হবে না। এ আশ্রমকে তারা নাম দিল বানপ্রস্থ, বনে প্রস্থানের কাল। সাধারণ মানুষ দেখল গৃহীজীবনের অন্তে এক সময়ে মধ্য বয়সের সূচনাতেই যজ্ঞ থেকে তাদের ছুটি মিলবে। হয়তো কিছু লোকের তাতেও মন ভরেনি, তাই যোগ করতে হল চতুর্থ একটি আশ্রম সন্ন্যাস বা যতি। মনে রাখতে হবে, প্রাগার্য সমাজে বেদবিরোধী একটি দল ছিল 'যতি', যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরোধ ছিল এ-কথা আগেও বলেছি। ঋগ্বেদে পড়ি 'ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকদের কাছে দিয়েছিলেন।'[১] বৃক মানে নেকড়ে। সালা মানে বাড়ি, সালাবৃক সম্ভবত গৃহপালিত কোনও নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর (wolfhound?), যারা এত হিংস্র যে অচিরে যতিদের ছিঁড়েখুঁড়ে মেরে ফেলেছিল। সম্ভবত ঋষিরা নানা নামে বেদের

---

১. ইন্দ্রো যতীন্ সালাবৃকেভ্যো অদাৎ। তৈত্তিরীয় সং (৬:২:৭); তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; (৭:২৬); তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ (৮:১:৪)

সময় থেকেই ছিল। এই যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম এই সব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত করল। হয়তো শাস্ত্রকারদের এমন আশা ছিল এতে দলে দলে বেদবিরোধী সম্প্রদায়ে যোগ খানিকটা কমবে, এবং সম্ভবত তাঁদের সে-আশা কতকটা পূর্ণও হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের গঠনের মধ্যে বানপ্রস্থ ও যতিকে স্বীকার করে ও-দুটিকে সংশয়ীদের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা করা হল।

সংশয় কি তাতে গেল? না, সেটা অন্য চেহারায় দেখা দিল। মানুষের প্রধান সন্দেহ দেবতায় ও যজ্ঞে। দেবতারা সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে তেত্রিশেরও বেশি হয়েছিল; আঞ্চলিক প্রাগার্য দেবতা ক্রমেই আর্য দেবমণ্ডলী মধ্যে অনুপ্রবেশ করছিল। সুতরাং মানুষের কতকটা বিভ্রান্তি জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া শেষের দিকে কিছু প্রায়-বিমূর্ত দেবতা দেখা দিচ্ছিলেন, তার আগের বিস্তর দেবতা তো ছিলেনই, ফলে শেষ দিকে দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের সংশয় তো জাগবেই: কোন দেবতাকে হব্য দেব? যে সব দেবতাকে যজ্ঞে হব্য দান করাটাই ছিল ধর্মাচরণ, তাঁরা তো আছেনই, তাঁদের সঙ্গে জুড়ছেন নতুন সর্বাতিগ দেবতারা। এদের মধ্যে হবির্দান করব কাকে? প্রশ্নটা সমাজে অনুত্তরিতই রইল কিন্তু যজ্ঞবিধির শেকড়ে টান লাগল। ফলে ওই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলির অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যেই ক্রমবর্ধমান সংশয়— এ দুইয়ে মিলে ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই অভ্যন্তরে নতুন একটি ধর্মধারা প্রবর্তিত হল।

সংহিতাব্রাহ্মণে যজ্ঞ নিয়ে যে-কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় নতুন ধারার মধ্যে তার প্রথম দিকের সাহিত্য আরণ্যক। এগুলি এবং এগুলির পূর্ববর্তী কিছু ব্রাহ্মণের শেষ দিকে একটা নতুন প্রবণতা হল যজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া। যেমন তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩:১)-এ বলা হয়েছে, 'ওম্, বুদ্ধিই হল চমস, চিন্তা হল ঘৃত, বাক বেদি, কুশ ধ্যান, অগ্নি কামনা...' ইত্যাদি। এই ধরনের বহু কথা আরণ্যকে আছে। আরণ্যকসাহিত্য খুবই ক্ষীণকলেবর, মাত্র তিনটি: ঋগ্বেদের একটি ঐতরেয়, যজুর্বেদের দুটি, শাঙ্খায়ন (বা কৌষীতকি) আর তৈত্তিরীয়। প্রাণ এখানে খুব প্রাধান্য পেয়েছে। তাকে নানা দণ্ড, অগ্নি ও যজ্ঞীয় বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। স্বভাবতই মনে আসে, এর পেছনে কী তাগিদ কাজ করছিল? যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের জন্য যজ্ঞীয় বস্তুগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের কোনও প্রয়োজন নেই, তবে কেন এই ধরনের সমীকরণ বারে বারে দেখা দিচ্ছে এখন? স্পষ্টতই যজ্ঞ যখন তার অভিধাগত অর্থে নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়েছে, তখনও তাকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে এই ভাবে তাকে ভিন্নতর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আগে কয়েকশো বছর যজ্ঞ তার সাধারণ আক্ষরিক অর্থেই মানুষের কাছে চলিত ছিল, যজ্ঞ ও যজ্ঞফলে মানুষের কতকটা বিশ্বাস ছিল বলে অন্য রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ছিল না। এখন যজ্ঞের সার্থকতা নিয়ে জনমানসে সংশয় দেখা দেওয়ার ফলে সাধারণ শব্দার্থকে পেরিয়ে অন্য ভাবে দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গোচর, বুদ্ধিগোচর যে-যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করা হচ্ছিল সেগুলি শুধুমাত্র সেই অর্থেই পর্যবসিত নয়, তার এক গূঢ়তর অর্থই তাদের মর্মবস্তু। ব্রাহ্মণসাহিত্যেও

মাঝে মাঝে যজ্ঞীয় বস্তুগুলির সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর সমীকরণ আছে, কিন্তু সেখানে অন্যান্য বস্তু দার্শনিক হয়; বস্তুজগতের থেকেই তা অনেক বেশি সংকলিত এবং তাতে যজ্ঞ প্রচলিত অর্থে যজ্ঞই থাকছে। কিন্তু এমন একটা সময় নিশ্চয়ই এসেছিল যখন ওই অভিধাগত অর্থে মানুষ আর যজ্ঞকে মানতে পারছে না, অথচ পুরোহিততন্ত্র যজ্ঞকে সচল রাখতে চায়। সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে যজ্ঞ সম্বন্ধে একটা দুর্বোধ্য সম্ভ্রমবোধ রয়ে গেছে, তাই সেইটেকে কাজে লাগিয়ে শাস্ত্রকাররা বলতে চাইলেন, 'যে-যজ্ঞ চোখে দেখছ, কানে শুনছ, প্রকৃত প্রস্তাবে যজ্ঞ তাকে অতিক্রম করে অন্য এক ভাবলোকে এক অতীন্দ্রিয় স্তরে সত্য।'

এ ব্যাখ্যার অন্তরালেও এক ধরনের সংশয় সক্রিয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল অথচ তার থেকে প্রতিশ্রুত ফল যে পাওয়া যাচ্ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় যজ্ঞ নিয়েই যে দর্শনপ্রস্থান— জৈমিনির মীমাংসা, যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গড়ে উঠেছিল প্রায় হাজার বছর পরে (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে) তার ওপরে কুমারিলভট্ট ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর বড় গদ্যগ্রন্থটি *তন্ত্রবার্তিক* আর ছোট ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থটি *শ্লোকবার্তিক। তন্ত্রবার্তিক*-এর প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের তৃতীয় সূত্র বলছে, 'যদি (বৈদিক) শাস্ত্রাংশগুলি বর্তমানকালের ঘটনা সম্বন্ধে বলছে এমন না ধরা হয়, (কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে ফল দেখা দেয় এ জন্য বিধান নির্দেশ করছে ধরে নেওয়া হয়) তা হলে সেগুলি খণ্ডিত হয়। এটা এই কারণে যে, তেমন ফল কেউ দেখে না।' ওইখানেই চোদ্দো-সংখ্যক সূত্র বলে, 'যজ্ঞ থেকে সেই সব মহৎ ফল যে ফলবে এ কথা কে জানে?' শ্লোকবার্তিকের দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদের পঞ্চম সূত্রটি বলে, 'চিত্রা, যাগ, ইত্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রাংশগুলি যে বলে, সে সব থেকে পশুলাভ, ইত্যাদি ফল পাওয়া যাবে, তা মিথ্যা; কারণ যদিও সেগুলি (শাস্ত্রাংশগুলি) দৃশ্যমান ফল সম্বন্ধে বলে তবু বাস্তবে তেমন কোনও বস্তুই দেখা যায় না।' দর্শনটির একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে মোক্ষের আলোচনা একেবারেই নেই; যজ্ঞ এবং ঐহিক যজ্ঞফলই এর বিষয়বস্তু। যজ্ঞকর্মকে অবলম্বন করে যে একটিমাত্র দর্শনপ্রস্থান গড়ে উঠেছে তা হল মীমাংসাদর্শন, তারই ভাষ্য করেছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত কুমারিলভট্ট এবং এই ভাষ্য দ্ব্যর্থতাহীন ভাবে ঘোষণা করছে যে, যজ্ঞ যে সব ফলপ্রাপ্তির আশা দেয় বাস্তবে তা ঘটে না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যেই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধারার অন্তর্গত শাস্ত্রই স্বীকার করছে যজ্ঞ থেকে যে-ফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে বেদবিরোধী ও যজ্ঞবিরোধী যে সব মতবাদ, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক, ইত্যাদির অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার সবগুলিরই পিছনে এই ধরনের ব্যর্থতাবোধের অভিজ্ঞতা ছিল। মানুষের সব প্রয়োজন যদি যজ্ঞে মিটত তা হলে যজ্ঞ সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও অবকাশই থাকত না। কিন্তু যজ্ঞ করে যখন গোধনপ্রাপ্তির আশা জাগে, তখন যজ্ঞের কিছুকাল পরেও যদি গোধন না পাওয়া যায়, তা হলে যে-কোনও মানুষের মনেই সংশয় জাগবে। ব্যাপক ভাবে এমন সংশয় সমাজে না থাকলে বেদে তার উল্লেখ রক্ষিত হত না। একাধিক উচ্চারণে যে-সন্দেহ ব্যক্ত হয়েছে তার ভিত্তিতেই মীমাংসাদর্শনের ওই সাহসী

ঘোষণা। যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের মধ্যে স্বল্প কিছুকালের ব্যবধান থাকলে মানুষ ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষাই করত, হতাশ বা সন্দিহান হত না; কিন্তু সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যখন প্রতিশ্রুত যজ্ঞফলের দেখা মিলত না তখন অনিবার্য ভাবেই দেখা দিত সংশয়।

আরণ্যকে প্রথমবার স্পষ্ট করে মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা আছে (ব্রাহ্মণসাহিত্যেই এর সূত্রপাত, তবে সেখানকার উল্লেখগুলি খুব স্পষ্টও নয়, বিস্তৃতও নয়)। শাঙ্খায়ন আরণ্যকে দেখি, মৃত্যুর পরে আত্মা পরলোকে গেলে তার কী রকম অভ্যর্থনা হয়: তার পাপ ও পুণ্য কর্ম তার প্রিয়জন ও বিদ্বেষভাজনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তার পর সে ব্রহ্মার দিকে এগোয় (পথের ভূদৃশ্য, গাছপালা, নদী, এ সবের স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে)। ব্রহ্মা তাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কে?' সে উত্তর দেয়। তখন ব্রহ্মা তাকে বলেন, 'তুমি যে আমিও সেই' এবং তাকে ব্রহ্মলোকে আমন্ত্রণ জানান। এ পর্যন্ত পরলোক সুখের স্থান; ঋগ্বেদে যম (যিনি তখনও মৃতদের অধিদেবতা, মৃত্যুর নন) পরলোকগত আত্মার দেখাশোনা করেন ও পূর্বাগতদের সঙ্গে তাকে আনন্দে রাখেন। এখানে ব্রহ্মা তাকে আহ্বান করে ব্রহ্মলোকে সমাদরে স্থান দেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ এক ইচ্ছাপূরক অস্তিত্বের সন্ধান পায়, যেখানে আছে আনন্দ ও অভ্যর্থনা। নরকের কল্পনা তখনও আসেনি। সকলেই স্বর্গে স্থান পায়। জন্মান্তরের জন্যে প্রার্থনা আছে, 'চন্দ্রের মতো যেন আমি পুনর্জাত হই'। (ঐতরেয় আরণ্যক ৫:১) জন্মান্তরের ক্ষয় বা মোক্ষের কোনও কল্পনা এখনও নেই। 'যদি কেউ অ-সৎকে (অবিদ্যমান) ব্রহ্ম বলে জানে, যদি কেউ সৎকে ব্রহ্ম বলে জানে...'। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৯:১৯) অর্থাৎ অস্পষ্টতার দিকে, অনির্দেশ্যতার দিকে একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

পূর্বের যজ্ঞ ও দক্ষিণার সঙ্গে রূপকস্তরে একটা আপস লক্ষ করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, আরণ্যকের গ্রন্থগুলি অরণ্যে পাঠ করতে হত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটা অংশের নাম 'কুবের সংহিতা' (কুবের বৈদিক সাহিত্যে সদ্যসমাগত)। সেখানে কুবেরের উপাসনা অরণ্যে করার বিধান আছে, কারণ তা সমস্ত কামনা পূরণ করে; এর দক্ষিণা হয়, একটি গাভি, পিত্তল, ক্ষৌমবস্ত্র অথবা সূক্ষ্ম শুভ্র বসন।' (১:৩২:৩) আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে তৈত্তিরীয় আরণ্যক রচিত হয়। এ সময়ে দেশে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল, নানা ভাবে দেশে সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি আসছে; কাজেই এ পটভূমিকায় কুবেরের উপাসনা প্রবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। যেটা চোখে পড়ে তা হল, আরণ্যকে বা অরণ্যে পাঠ করতে হবে ছত্রকে, সেখানে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কুবেরের উপাসনাও একটি পাঠ্য বিষয়। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋষি কাবষেয় বলছেন, 'কেন আমরা স্বাধ্যায় অভ্যাস করব, কেন যজ্ঞ করব? তার চেয়ে বরং বাক্‌কে প্রাণে বা প্রাণকে বাকে আহুতি দেব।' (৩:২:৬) এখানে লক্ষণীয় যে স্বাধ্যায় ব্রহ্মচর্যের এবং যজ্ঞ গার্হস্থ্য আশ্রমের, ঋষি এ দুটির উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, এবং নিজেই সমাধান দিচ্ছেন: বাক স্বাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আহুতি দেওয়া যজ্ঞকর্মের অন্তর্গত। তাই বাস্তবে ব্রহ্মচর্য পালন এবং যজ্ঞ করার রূপক বিকল্প দিচ্ছেন, যেটা মানুষ কেবল মনে মনেই করতে পারে। তা হলে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য

আশ্রমে পালনীয় কর্তব্য এখন দুটো মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই সাধন করা যাবে। এই ভাবে কর্ম থেকে জ্ঞানে উত্তরণ ঘটছে।

মনে রাখতে হবে যে, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য ছিল সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ধর্মাচরণ। এবং এই পর্যায় সম্বন্ধে অনেক সাধারণ মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, অথচ সহসা এত শতাব্দীর আচরণকে বাতিল করা যাচ্ছে না; তাই রূপক আকারে সেগুলির অনুষ্ঠান করবার বিধান দেওয়া হচ্ছে। এখন লক্ষ করতে হবে, বিকল্পগুলি কী ধরনের: যজ্ঞ, যা কায়িক ভাবে বাস্তবে সম্পাদন করা হত তার বিকল্প প্রাণকে বাক্-এ, এবং বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেওয়া, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর্মসাধ্য যজ্ঞের বিকল্প হল পরোক্ষ মানসক্রিয়া। উপকরণ দিয়ে, কায়িক প্রয়াস দিয়ে যা করবার কথা ছিল, সংহিতা ব্রাহ্মণের সেই পর্বকে বলা হত কর্মকাণ্ড; মন, চিন্তা, ধ্যান, কল্পনা দিয়ে যে-প্রয়াস তার বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হল এ বার তার নাম হল জ্ঞানকাণ্ড। মৃত্যু নিয়ে এখানেও যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আছে বরং তা বেড়েছে বলা যায়, 'মৃত্যুর পরেও মানুষের আবার মৃত্যু হয়, তার নিজের কর্মগুলি তাকে গ্রাস করে।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১:৮:৩) তা হলে মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে সংশয়ও আছে। পুনর্বার মৃত্যু একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা। অতএব স্বভাবত এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আগ্রহ আরণ্যকে প্রবল এবং এর আগ্রহ প্রবলতর হয় জ্ঞানকাণ্ডের শেষ ভাগ উপনিষদে।

বিশ্বচরাচর নিয়ে কৌতূহল ও সংশয়ও আরণ্যকে ব্যক্ত হয়েছে:

> আকাশ কীসে আশ্রিত? সংবৎসরের গূঢ় রহস্যটি কী? দিন কোথায়, হে দেব, এই রাত্রিই-বা কোথায়? মাস ও ঋতুগুলি কোথায় বিধৃত? সলিলের নিবাস কোথায়? সে কোন্ সত্তা, যার মধ্যে এই দুটি (আকাশ ও পৃথিবী) আধৃত? আমি তোমাকে প্রশ্ন করি: মৃত্যুর পরে কী থাকে সে সম্বন্ধে... যম কোথায় পাপীকে নির্যাতন করে? (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১:৮:১-৪)

এখানে মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে সংশয় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় যে, খুব আবছা ভাবে হলেও নরকের একটি কল্পনা এখানে আছে— নরকে যম পাপীকে শাস্তি দেয়, অত্যাচার করে। অর্থাৎ এখানেই প্রথম দেখছি, মৃতদের রাজা যম, পৃথিবীর রাজারা যেমন অপরাধী এবং/বা অসহায় প্রজাকে পীড়ন করে তেমন করেই যমও অপরাধীকে দণ্ড দেন। এ অংশে যে-প্রশ্নগুলি উচ্চারিত সেগুলির প্রথম প্রকাশ সংহিতাতেই; অতএব মনে হয়, যুগে যুগে এইসব সংশয় মানুষকে উত্তরোত্তর বিচলিত করেছে। প্রজাপতির পুত্র আরুণি সুপর্ণেয় পিতার কাছে এসে প্রশ্ন করে, 'কাকে আপনারা শ্রেষ্ঠ (মহত্তম) বলেন?' পিতা উত্তর দিলেন, 'সত্য, তপঃ, সংযম, দান, ধর্ম এবং সন্ততি।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০:৬৩:১) এখানে কর্মকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের যে-স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে: এ উত্তরগুলির অধিকাংশেরই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও যোগ নেই— সন্ততি ছাড়া। আরণ্যকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে নৈতিকতা, জ্ঞানকাণ্ডে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেখা

যায়, তপ ও ধর্মের কারণ এখন দৈহিক প্রয়াসসাধ্য যজ্ঞের চেয়ে মানসিক প্রচেষ্টাসাধ্য জ্ঞানেরই তাৎপর্য বেশি।

এই যুগে দেখা গেল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবিভেদ। মানসিক শ্রম প্রাধান্য পেল কায়িক শ্রমের ওপরে, এ-ও আর-একটা বিভাজন। এই সঙ্গেই আর-একটা বিভাজন ঘটেছিল সমাজে: পাকাপাকি একটি পুরোহিত-শ্রেণির অভ্যুত্থান। এরা পরোপজীবী, এই সঙ্গে ধর্ম বা শাস্ত্র হয়ে উঠল প্রাথমিক ভাবে জ্ঞানলভ্য। 'যখন নগরসভ্যতা বিভক্ত হয়ে একটি পুরোহিত-শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে-শ্রেণি চিন্তাজগতের বস্তুকে শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করে তখন তার ফল হয় ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব।'[২] মানসিক শ্রম এক বিশেষ অর্থে পুরোহিতরা করে, তাই এই সময় থেকে পুরোহিত-সম্প্রদায়ও বিশেষ করে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণসাহিত্যের শেষ অংশ থেকে আরণ্যক উপনিষদ পর্যন্ত এই ধরনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বিশেষ একটি মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই যুগে দেহ ও আত্মার পৃথক সত্তার স্বীকৃতিও নতুন একটি বিভাজন। আত্মা শব্দটি প্রথম দিকে দেহকেই বোঝাত, (জার্মান ভাষায় atmen মানে শ্বাস নেওয়া। ওই ধাতুর থেকে নিষ্পন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় একটি শব্দ আত্মা)। কিন্তু পরে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটি সত্তাকে অভিহিত করল আত্মা শব্দ। এই বিভাজনটি এ যুগের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিভাজন। আত্মাই সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে লাগল। এর পর থেকে দেহ গৌণ, নশ্বর ও হীন বলে গণ্য হল, পুরোহিত শাস্ত্রকারদের সমস্ত ঝোঁকটা পড়ল আত্মার ওপরে। ফলে মানসিক শ্রমের তুলনায় কায়িক শ্রমের ন্যূনতা ও হীনতা সমর্থিত হল। সমাজে এ সময়ে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের মধ্যে, লিপি, মুদ্রা, জ্যোতিষ ও বেদাঙ্গে আলোচিত নানা নতুন বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয় এবং এর পশ্চাতে সমাজে ধীরে ধীরে মৌলিক কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তনও ঘটছিল। তার মধ্যে প্রধান একটি হল প্রাচীন গোষ্ঠী (tribe)গুলি ভেঙে প্রথমে কৌম (class) ও পরে কুলের (বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে তিন-চার প্রজন্ম একই বাড়িতে বাস করে) উদ্ভব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাচীন এককগুলি ক্রমশ কৃষিভূমি ও গোচারণভূমিনির্ভর ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছিল। এই সব প্রক্রিয়া যখন সমাজে চলছে তখন মানুষ তার আশপাশের জগৎকে যে ভাবে দেখত সে-দেখা বদলাতে লাগল। সমাজে এই যে নানা বিভাজন ঘটছিল এর একটা দৃঢ় ও স্থায়ী প্রতিক্রিয়া মানুষের মনোজগতে অনিবার্য ভাবেই ঘটছিল। 'এতে প্রতিফলিত হচ্ছিল প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের চেতনার একটা বিভাজন, যেটির উৎস... সমাজে অনুরূপ একটি বিভাজন।'[৩]

২. 'When urban society is differentiated to include also a priestly class which dogmatizes the concepts the result is the theological phase.'— Mogens Bronsted, 'The Transformations of the concept gate in literature'. p. 173

৩. 'It reflects a cleavage between man's consciousness of nature, which springs... from a corresponding cleavage in society.'— George Thomson, Vol II, p. 133

সারা পৃথিবীতেই এই যুগে মননের জগতে একটা প্রকাণ্ড তোলপাড় লক্ষ করা যায়। গ্রিস, মিশর, চিন, পারস্য, ভারতবর্ষ— সর্বত্রই এই যুগে পুরোনো চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দিল, পূর্ব যুগের তুলনায় এ পরিবর্তনগুলি যেমন মৌলিক, তেমনই আপেক্ষিক ভাবে দ্রুত। বৃহৎ ভূমধ্যসাগরীয় মধ্যপ্রাচ্যে, চিন ও ভারতবর্ষে এটা দেখা গেল। ব্যাপারটা তুলনামূলক ভাবে দ্রুত ঘটলেও বাস্তবে আকস্মিক নয়। এটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ওই বৃহৎ ভূখণ্ডে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অবগঠনে (infrastructure) যে সব মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, মানুষের অধিগঠনে (superstructure) তারই প্রতিফলন হিসাবে। সমাজের মানুষ দেখেছে গোষ্ঠী ভেঙে কৌম হয়েছে; খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আগে থেকেই কৌম ভেঙেছে, সৃষ্টি হয়েছে 'কুল', বৃহৎ একান্তবর্তী পরিবার; অর্থাৎ সমাজের এককটি ক্রমেই ছোট হচ্ছে। শ্রৌতযাগ যখন চলিত ছিল তখন সমস্ত গোষ্ঠী এবং পরে বহু কৌম একত্রে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত, গৃহ্যযাগ হয় প্রতি পরিবারে, অর্থাৎ সেখানে পরিসর ছোট। বাণিজ্য, বিশেষত বহির্বাণিজ্যের প্রসারের সময়ে মুদ্রার প্রচলন হয়। আগে কেনাবেচা হত প্রধানত গাভি এবং অন্যান্য বস্তু ও দ্রব্যের বিনিময়ে, এখন মুদ্রা, লিপি প্রবর্তন হওয়ায় সব কিছুরই লিখিত হিসাব বা দলিল থাকে। এ সব কিছুরই গভীর ও স্থায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটে সাধারণ মানুষের মনে। সংখ্যায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ তাদের অধিকাংশই গ্রাসাচ্ছাদনের বেশি কিছু পায় না, ফলে বিপদে-আপদে ধনী মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়; সুদ দিতে হয়, না পারলে কঠোর শাস্তি। তাই অথর্ববেদে প্রার্থনা আছে: আমাকে এমন লোকে নিয়ে যাও মৃত্যুর পরে যেখানে খাতকের ওপর উৎপীড়ন নেই।

যে সমাজে ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবিভাগ ঘটেছে সেখানে অধিকাংশ দরিদ্রের ওপরে ধনীর পীড়ন আছে। যেখানে মননশ্রমিক প্রভুত্ব করে কায়িক শ্রমিকের ওপরে, সেখানেও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের প্রতাপের অধীন সংসারের বহু সংখ্যক লোক। আত্মা নিয়ে পুরোহিত-শাস্ত্রকাররা যখন আলোচনায় মগ্ন, তখন সাধারণ মানুষ দেহের পুষ্টি, ক্ষুধার খাদ্য, পরনের বস্ত্র, রোগের ওষুধ, বিপদের সমাধান, ঋণের বোঝা ও শোধ না করতে পারার যন্ত্রণা কমাতে পারছে না। এ জীবন তার পক্ষে ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছে।

এই আবহাওয়াতে, এই সময়ে দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে জন্মান্তরবাদ— কী ব্রাহ্মণ্য, কী বৌদ্ধ, কী জৈন, কী আজীবিক সব ধর্মমতই জন্মান্তরকে স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে জীবন যতই মূল্যবান হোক, এই ঋণ-ব্যাধি-দারিদ্র্য-সংকুল জীবনের পুনরাবৃত্তি কেমন করে লোভনীয় হবে? যমের সন্নিধানে পরলোকে পূর্বমৃতদের সঙ্গে আনন্দে থাকার পরিবর্তে আবার পৃথিবীতে এসে মালিকের মারধর, মহাজনের অত্যাচার, মনিবের গঞ্জনার সঙ্গে আবার আধপেটা খাওয়া, অধিকাংশ অভাব না মেটা, রোগব্যাধিতে নিষ্প্রতিকার যন্ত্রণা সহ্য করে তিলে তিলে অচরিতার্থ জীবনের অবসান— এ সম্ভাবনা কেন তাকে প্রলুব্ধ করবে? সমাজ সব দিকেই পালটাচ্ছিল এবং প্রত্যেক পরিবর্তনে নিচের তলার মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল।

সংহিতাব্রাহ্মণের যুগে যে জীবনের ছকে, সমাজের যে অবগঠনে মানুষ পরিচিত ছিল, উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত যে মানবিক সম্পর্কগুলির সম্বন্ধে তাদের যে বোধ ছিল সেগুলি প্রবল ভাবে আলোড়িত হল। ফলে চিন্তার জগতে প্রাচীন মূল্যবোধ ও প্রত্যয়গুলি আর পূর্বের মতো রইল না। গোষ্ঠী থেকে কৌম থেকে কুল— এ পরিবর্তনে সামাজিক একক ক্রমেই আয়তনে হ্রস্ব ও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে মানুষের অভ্যন্তরীণ একাকিত্বের বোধ বাড়ছিল। আরণ্যকেই পূজার প্রাথমিক চিহ্নগুলি পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় নানা নতুন দেবদেবীর নাম, যাঁরা পূর্বের যজ্ঞবিধির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত; আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের অনিবার্য ফল হল, দুটি দেবমণ্ডলীর পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া এবং একটির মধ্যে অন্যটির ধীরে ধীরে অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া। এরই ফলে ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডলী খুব দ্রুত স্ফীত হয়ে উঠছিল, সৃষ্টি হল 'বিশ্বে দেবাঃ' সংজ্ঞা, উদিত হল প্রশ্ন: কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। 'একটি সমাজের আদিমতম সাংবিধানিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হয়ে পড়াটা মানুষকে সেই সব অভিজ্ঞতাতে অংশগ্রহণ করতে দেয় না যেগুলি থেকে অতিলৌকিক বিশ্বাস উৎপন্ন হতে পারে বা সমর্থিত হতে পারে। মানুষ যে সব সংগঠনের সবটা অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এটা ধরে নিলে তত্ত্বগত ভাবে কতকগুলি সামাজিক সংগঠনের বহু লক্ষণকে ধ্বংস করা হয় যা এ সংগঠনগুলিকে একটা অতিলৌকিক মহিমা দান করে— এগুলির অদৃশ্যত্ব, অমরত্ব, ব্যাপ্তিত্ব, অজ্ঞাতত্ত্ব, অলঙ্ঘ্যত্ব এবং উদ্দেশ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে (মানুষের) আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।'[৪] এই উদ্ধৃতির রচনাকাররা যে-মূল কথাটি বলতে চান তা হল, সমাজ-সংগঠনের অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন এবং এগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-মানবিক সম্পর্কগুলি, তার ওপর থেকে যখন সমাজের সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের অধিকার একেবারে চলে যায় তখন মানুষের মধ্যে এমন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মায় যাতে অতিলৌকিকে তার বিশ্বাস টলে যায়। মানুষ যে সমাজ-সংগঠনের মূল চরিত্রগুলি জানতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এ কথা মেনে নিলে সমাজের কিছু সংগঠনে— যেমন— ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণে— যে একটা অতিলৌকিকের মহিমা আরোপিত আছে তা নষ্ট হয়ে যায়। এই অতিলৌকিকতা হল অদৃশ্যত্ব, ইত্যাদি। যে কালপর্বের আলোচনা হচ্ছিল, সেই সময়ে এই ধরনের বিশ্বাস টলে যাচ্ছিল; গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে অবস্থানের যে সমবেত নিরাপত্তাবোধ তা কৌমে ও কুলে এসে ভেঙে গেল। মানুষ এক ধরনের একাকিত্ব ও হতাশার

৪. 'Isolation and alienation from a society's primordial and constitutional structures prevent one from having experiences from which beliefs in the supernatural can arise or gain support. To assume that humans can know and control all, or the most important aspects of such structures, is to destroy, in principle, many of the features which give certain social organisations a supernatural aura— their properties of invisibility, immortality, pervasiveness, unknownness, inescapability, and their control over conduct thorugh what seems to be the direct indirection of purpose.'— Guy & Swanson, p. 188)।

সম্মুখীন হল, যার প্রতিকার তৎকালীন সমাজ-সংগঠনে ছিল না। সে সমাজে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী একটি শ্রেণিই প্রধান, যাদের বাড়তি সুবিধাগুলি আসছিল সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত রাখা থেকেই। এই সময়ে শ্রেণিবিভাজন ও পরে নগরায়ণে সমাজে যে বিন্যাস দেখা দিল তাতে সমাজের ওপরতলার মুষ্টিমেয় লোক নীচের তলার অগণ্য মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠল, ফলে সমাজের গতিপ্রকৃতি নিরূপণে বা নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের আর কোনও যোগ বা অধিকার রইল না। এ দিকে নানা কারণে— যেগুলি আলোচনা করা হল— সাধারণ মানুষের জীবন কষ্টকর ও নানা ভাবে আপৎসংকুল হয়ে উঠল। তখন সমাজের সব স্তরেই জন্মান্তরবাদ প্রবল ভাবে গৃহীত, ফলে হতাশা। ভবিষ্যৎ জন্মান্তর সম্বন্ধে অনীহা খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পেল। সমাজের ওপরতলায় যারা চাষি-মজুরের মালিক, নিজেরা কায়িক শ্রম করে না কিন্তু কায়িক শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত, প্রাচুর্য ও সুখ ভোগ করে তাদের পক্ষে জন্মান্তর কাঙ্ক্ষণীয়। ফলে সে-মহলে জন্মান্তরবাদ যে সাদরে গৃহীত হবে তা তো খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু জীবনের অর্থ যাদের কাছে আধপেটা খেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও নানা কারণে ওপরওয়ালার কাছে নিগ্রহ ভোগ করা তাদের কাছে জন্মান্তর যে বিভীষিকারূপে দেখা দেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এ ছিল অনিবার্য কিন্তু ধীরগতির এক প্রক্রিয়া, '...প্রাথমিক এক প্রকৃতিনিষ্ঠ সমন্বয়ের মনোভাব, যাতে মানুষের অন্তরাত্মা তখনও প্রবল ভাবে পৃথিবীবিরোধী মনোভাব থেকে চূড়ান্ত ভাবে বিশ্ববিদ্বেষী, দেহবিদ্বেষী অবস্থানে পৌঁছোয়নি এবং সে-অবস্থান থেকে স্বভাবত দ্বৈততা ও নৈরাশ্যে পৌঁছোয়নি, (কিন্তু) ধীরগতিতে সেই জ্ঞানমার্গের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে...।'[৫] এই অংশে দুটো শব্দ লক্ষ করা প্রয়োজন: বিশ্ববিদ্বেষী ও দেহবিদ্বেষী। বিশ্ব, যা তাদের সামাজিক সত্তার কাছে প্রকৃতির রূপে প্রতিভাত হত, তার প্রকাশ কতকগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যার বিরুদ্ধে সাধারণ দরিদ্র মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়: খরা, অজন্মা, প্লাবন, অকালবর্ষণ, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এ সবে সকলেরই ক্ষতি, কিন্তু গরিব মানুষ এ সবে সর্বস্বান্ত হয়। তাই বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে সন্ত্রম বিস্ময়ের চেয়ে এর থেকে সম্ভাব্য বিপদ ও আতঙ্কতেই মানুষ বিপর্যস্ত হয় বেশি। দ্বিতীয় শব্দটি, দেহবিদ্বেষী। প্রথমত, মানুষ মোটাদাগের দুঃখকষ্টগুলি দেহ দিয়েই অনুভব করে, তাই দেহ এদের কাছে দুঃখভোগের আধারমাত্র। (লক্ষণীয়, সংস্কৃতে দেহবাচক শব্দগুলির মধ্যেই একটা হতাশা অন্তর্নিহিত: দিহ্যতে, কষ্ট পায়; (দেহ) চীয়তে, চিতায় চয়ন করা হয়; (কায়) শীর্যতে, শীর্ণ হয়; তা ছাড়া ব্রাহ্মণসাহিত্যের শেষ অংশ থেকে দেহাতিরিক্ত আত্মা সম্বন্ধে একটি ধারণা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্বে দেহ গৌণ হয়ে যাচ্ছে, আত্মাই হয়ে উঠছে মুখ্য। অতএব এ সময়ে দেহবিদ্বেষ খুবই স্বাভাবিক। যারা তত্ত্ব

৫. '...a gradual passing from an initial naturistic-harmonistic attitude where the human soul is not yet violently, opposed to the world, to a final anti-cosmic and anti-somatic and as such dualistic and pessimistic which is peculiar to gnosis.'— Corranda Pensa, *The Field of Indian Religions*, p. 107

প্রতিপাদন করেছিলেন, দেহ এবং দেহ দিয়ে ভোগ্য সমস্ত আরাম ও বিলাস তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে। কাজেই আত্মার প্রাধান্য স্বীকার করলে তাঁদের কোনও ক্ষতি নেই, ভোগ্যবস্তু তাঁদের হাতছাড়া হবে না এবং জন্মান্তরে ওই সব ভোগ করার সম্ভাবনা থাকায় তাঁদের দেহবিদ্বেষ ঘোষণা করার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু তত্ত্বটা শুনছে যারা, তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের এমনই দেহবিমুখ করে রেখেছে। কাজেই আত্মা থাক বা না থাক, দেহ যে কষ্টভোগের আধার এ নিয়ে তাদের কোনও দ্বিমত নেই। আত্মার তত্ত্বটা মনন দিয়ে বুঝবার; তা এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ মানুষ সহজে বোঝে না, বুঝলেও যে আত্মা কোনও আশু প্রয়োজন সিদ্ধ করে না, যন্ত্রণা লাঘব করে না, তা-ই যদি জীবের শ্রেষ্ঠ সত্তা হয়ও, তা হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার তাতে কোনও হেরফের হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণা, রোগব্যাধি, কশাঘাত ও নানা রকম অত্যাচার, যা গরিব মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী একে তো আত্মা ভোগ করে না, করে দেহ, অতএব তেমন এক ক্লেশবোধবিনির্মুক্ত আত্মা থাক বা না থাক তাতে এদের কিছু এসে যায় না।

এই পরিস্থিতিতে বিগত তিন-চারশো বছর ধরেই মানুষের জীবনবোধে বেশ-কিছু আমূল পরিবর্তন ঘটছিল, সাহিত্যে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী এবং তা হয়েওছিল। ঋগ্বেদে, যেখানে, একশো বছর এই পৃথিবীতে সুখী হয়ে বাঁচবার এবং উদীয়মান সূর্যকে দীর্ঘকাল ধরে দেখবার জন্যে প্রার্থনা, ঐহিক সুখসমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পশু, ধন, খাদ্য, শস্য ও দীর্ঘপরমায়ুর জন্যে শত শত প্রার্থনা, সেখানে স্পষ্টতই মানুষের দৃষ্টি ঐহিক, জীবনমুখী। সংহিতাব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডের শেষ দিকেই যখন মানুষের চেতনায় জন্মান্তরতত্ত্ব কায়েম হয়ে গেল, তখন স্বাভাবতই মানুষ জীবনের মূল্যায়ন করতে উদ্যত হল নতুন করে: পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বাঁচাটা কাম্য কি না। প্রশ্ন উঠল, বিকল্প কী? প্রথমত, ঋগ্বেদেই মানুষের ইচ্ছাপূরক কল্পনা মৃত্যুর পর একটি মোটামুটি সুখকর অবস্থান যম ও পূর্বে মৃতদের সান্নিধ্যে সৃষ্টি করেছিল। সেটাতে এক ধরনের সান্ত্বনা ছিল, কারণ সেখানেও ঐহিক সুখভোগের অনুবৃত্তি থাকবে এমন আশ্বাস ছিল। কিন্তু তখনই দুটি সংশয় দেখা দিয়েছে: প্রথমত, 'ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়া সহজ নয়— মনুষ্যল্লোকান্নাস্মাল্লোকাৎ স্বেতব্যমিত্যাহুঃ'; দ্বিতীয়ত, 'কে তা জানে যে ওই লোকে (=পরলোকে) কিছু আছে বা নেই— কো হি তদ্বেদ যদমুষ্মিল্লোকেঽস্তি বা ন বেতি।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬:১:১:১) এ ছাড়াও পরলোক নিয়ে নানা সন্দেহ ছিল; এটা আমরা পরে দেখতে পাব।

কিন্তু এ সংশয়ের থেকে দুটি সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমত, পরলোকের অস্তিত্ব এবং সেখানে গিয়ে সুখে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, তা হলে ইহলোকেই একমাত্র জীবন। অতএব এখানেই যথাসম্ভব জীবনকে ভোগ করা উচিত। কিন্তু মুশকিল হল, শতকরা নব্বইজন লোকের পক্ষে ইহলোকের এই জীবনটাও মোটেই সুখের বা ভোগের নয়। ভোগের বাসনা থাকলেও তার উপকরণগুলি একে একে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, কাজেই বাসনা ও তার পূরণের মধ্যে ব্যবধান যতই দুস্তর হতে লাগল, সাধারণ মানুষের অবস্থা ততই ত্রিশঙ্কুর মতো হয়ে উঠতে লাগল। ইহলোকে সুখ নেই, চাইলেও

পাওয়া যাবে না; সুখকর পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এমন অবস্থায় শাস্ত্রকাররা তাঁদের মোক্ষম অস্ত্রটি নির্মাণ করলেন: জন্মান্তরবাদ। এই তত্ত্ব বলল, ইহলোকে অচরিতার্থ বাসনা অনেক রইল, স্বর্গে গিয়ে পাবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, বেশ তো পরজন্মে ওই সব অপূর্ণ বাসনা পূরণ কোরো। সাধারণ মানুষের কাছে এ সমাধানও কোনও যথার্থ সমাধান যে নয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। প্রথমত, যে সংশয়ের বশে সুখের পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রমাণই মেলে না, সেই সংশয়ের বশে পরজন্ম সম্বন্ধেও কোনও যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নিই, মৃত্যুর পরে মানুষ আবার জন্মায়, তা হলেও সেটা তো এ জীবনেরই পুনরাবৃত্তি হবে, কে জানে যে সেখানে অচরিতার্থ বাসনাগুলির পূরণ হবে? আবার যে সেখানে এই রকম দারিদ্র্যদীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, নিরাপত্তাহীন, অত্যাচারপীড়িত জীবনযাপন করতে হবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কী? সে-ক্ষেত্রে এক জীবনের যন্ত্রণাভোগ এই জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়ে যাক, আর তার পুনরাবৃত্তিতে প্রয়োজন নেই।

মুশকিল হল, পুনর্জন্মতত্ত্ব যখন সমাজে প্রবর্তিত হল তখন সাধারণ মানুষ কী চায় না-চায় তা নিয়ে তো তত্ত্বের হেরফের ঘটানো চলে না। তা হলে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম যে, মানুষ চা'ক বা না-চা'ক তাকে আবার জন্মাতে হবে। এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চাইবে বারংবার এ যন্ত্রণাভোগের জীবনের পুনরাবর্তন নিবারণ করা, পুনর্জন্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করা। ঋগ্বেদ থেকে মননের জগতে প্রকাণ্ড বিবর্তন ঘটেছে: 'সুখিনঃ স্যাম শরদঃ শতম্— একশো শরৎ (= বর্ষ) সুখে থাকব', থেকে 'মৃত্যুর পর সুখের স্বর্গে যমের তত্ত্বাবধানে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সুখে বাস করা' এবং 'এ জীবনের অপূর্ণ বাসনা পরজন্মে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা' পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিই এর ফাঁকটা ধরে ফেলেছিল: পরজন্ম যে এ জন্মের চেয়ে সুখের হবে এমন দৃঢ় আশ্বাস কে দিতে পারে? অতএব উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠাপন্ন ধনীর কাছে যা কাম্য অগণ্য দুঃখী মানুষের কাছে তা পরিহার্য মনে হবেই।

এই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ভব— আরণ্যক ও উপনিষদে। আরণ্যকে যজ্ঞকে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা ও প্রবণতা আছে। যজ্ঞ শুধু যে ধনী, রাজন্য যজমানের ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, তা নয়, সাধারণ মানুষও তো যজ্ঞ ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির কোনও উপায় জানত না। বাস্তব জীবনে যেমন একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ ইষ্টসিদ্ধির জন্যে অন্য একটা বিকল্প উদ্ভাবন করে, সে যুগে ঠিক তেমনই যজ্ঞের বিকল্প ও প্রকারভেদ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'প্রাচীন গোষ্ঠীগত সমাজবিধান ধ্বংস হওয়ার পরে তার থেকে উৎপন্ন একটি নতুন সামাজিক বিধানকে ব্রাহ্মণসাহিত্যের শাস্ত্রকাররা যজ্ঞের এই সব খুঁটিনাটি দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছিলেন।'[৬] এতে যজ্ঞ

'Ritual trivialities) in terms of these the authors of the Brahmans also try to validate a new social norm that emerges on the runs of the ancient tribal one.'— D P Chatterjee, p. 112

সমর্থিত হলেও তা মানুষের ইষ্টসিদ্ধির অভ্রান্ত উপায় বলে গৃহীত হল না। মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধের সমকালীন ধর্মগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে দু-তিন শতক পর থেকেই যুক্ত হচ্ছিল মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক মতের বৌদ্ধ প্রস্থান, দিগম্বর জৈনরা, বার্হস্পত্য এবং চার্বাক ও তাঁর অনুগামী অন্যান্য লোকায়তিক প্রস্থান। এরা বলত, 'নাস্তি যজ্ঞফলং নাস্তি পরলোকঃ— যজ্ঞে ফল হয় না, পরলোক নেই।' সাধারণ ভাবে এদের বলা হত পাষণ্ড, ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদী বা বেদাপ্রামাণ্যবাদী অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামাণ্যতায় অবিশ্বাসী। এদের সন্দেহ বৈদিক যজ্ঞের উপযোগিতায় ও পরলোকে। যে-বেদ বিভিন্ন সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে নানা যজ্ঞের বিধান দিয়েছে, মানুষ যখন বিধিপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সে সংকট থেকে ত্রাণ পায়নি তখন সে শুধু যজ্ঞেই বিশ্বাস হারায়নি, যে-বেদ যজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছে সেই বেদেই বিশ্বাস হারিয়েছে। আর বিশ্বাস হারিয়েছে পরলোকে। জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে বলছে শাস্ত্রকাররা, কিন্তু যে-বিশ্বাসের সঙ্গে বর্তমানের চেয়ে সুখের কোনও ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, জনসাধারণের ওপরে শাস্ত্রকারদের চাপিয়ে দেওয়া সে বিশ্বাসে মানুষ কোনও সান্ত্বনা বা মানসিক আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। বিশ্বাস করলে পরজন্মে এই দুঃখময় জীবনের অনুবর্তন— সে একটা ত্রাস, একটা আতঙ্ক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের চাওয়ার চেহারা বদলে গেল। বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা সুখের নয়, কাজেই একশো বছর বাঁচা মানে একশো বছর মালিক-মহাজনের কাছে লাথিঝাঁটা খাওয়া। সে-বাসনা সাধারণ মানুষের কেন হবে? তাই স্বভাবতই সে চাইবে এ যন্ত্রণা এ জন্মেই শেষ হোক। জন্মান্তর যদি থাকেও তবু তা কাম্য নয়, তার থেকে ছুটি পাওয়াই কাম্য। এই পরিস্থিতিতে শাস্ত্রকাররা প্রতিকার বাতলে দিল: 'ছুটি চাও? মুক্তি, মোক্ষ? তা তো পেতেই পার যদি বাস্তব জীবনে ধ্যানে একাগ্র ভাবে অনুভব করতে পার, যে তুমি নিজেকে যা অনুভব করছ সে আসল তুমি নও। আসল তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। এইটি উপলব্ধি করলেই জন্মান্তর থেকে ছুটি।' লক্ষণীয়, এ যুগে বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক সকলেই মোক্ষের বিধান দিচ্ছে। আজীবিক বলছে, তোমার করবার কিছু নেই, যাই কর না কেন চুরাশি লক্ষ বার তোমাকে জন্মাতে হবে। সে সব জন্মে পাপই কর আর পুণ্যই কর, চুরাশি লক্ষ বারের পরে আপনা-আপনিই জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল খসে যাবে। জৈন, বৌদ্ধরা ধ্যানে, মননে নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করলে নির্বাণ বা মুক্তি মিলবে।

তা হলে কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে এসে দেখছি জীবনের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় দুই-ই বদলে গেছে। এটা অনিবার্যই ছিল। এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল সুখে, স্বাস্থ্যে, সমৃদ্ধিতে বেঁচে থাকার পথে যা বিঘ্ন তা মোচন করার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত জ্যোতিষ্টোম, ইত্যাদি কিছু কিছু ছোটখাটো যজ্ঞের ফল হচ্ছে স্বর্গলাভ, এমন কথা থাকলেও সে সব যজ্ঞ কখনও প্রাধান্য পায়নি। সুখে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার জন্যেই সব যজ্ঞ। ঋগ্বেদ-যজুর্বেদের প্রথম অংশে এই ছিল জীবনের লক্ষ্য। আমরা দেখেছি, এ যুগের মানুষের মনে নানা সংশয় ছিল, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ইন্দ্র তিনি যে আসলে নেই, এমন কথাও ঋষিরা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। যজ্ঞ, নৈবেদ্য, প্রক্রিয়া এ সব নিয়ে সৃষ্টি, দেবতাদের অস্তিত্ব এ সব নিয়ে বহু প্রশ্ন প্রথম শ-তিনেক বছরের মধ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। তবু এ ছিল সমাজের আভ্যন্তরীণ সংশয়, সমাজের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। কিন্তু সংশয় সংক্রামক: শ-তিনেক বছরের মধ্যেই এ সংশয় যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ হল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের মধ্যেই বহু সংশয়ী মানুষ সমাজের বিধিবন্ধন উপেক্ষা করে বাইরে চলে গিয়ে নানা মত ও দল তৈরি করে। এবং সংশয় সংক্রামক বলেই এ সব

দলে সমমতাবলম্বী লোক বহু সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। যজ্ঞ করতে হয় না, ফলমূল সংগ্রহ করে, ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করত এরা, বেদের প্রামাণ্যতা, যজ্ঞের উপযোগিতা, পরলোক, ইত্যাদি নিয়ে এরা সন্দিহান ছিল, যদিও জন্মান্তরে এদের বিশ্বাস ছিল। যজ্ঞ করে পরজন্মের জীবনটাকে সুখিতর বা পূর্ণতর করবার কোনও আশ্বাস নেই বলে যজ্ঞে এরা আরও বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া যজ্ঞ করে যা পাওয়ার কথা তাও কদাচিৎ, কাকতালীয়বৎ মেলে। ফলে সমগ্র কর্মকাণ্ডে এদের অনীহা। তবু এরা বেঁচে রইল; সর্পাঘাতে মরল না, বজ্রপাতেও না। এবং, মূলত এদের এই ভাল ভাবে বেঁচে থাকাটাই ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি একটা প্রতিস্পর্ধা, যার উদ্ভব কিন্তু সন্দেহে।

সমাজে তখন দু-ধরনের ধর্মাচরণ চলিত ছিল, বেদনিষ্ঠ এবং বেদবিরোধী। এ দুটি মতের অন্তর্নিহিত বিরোধে একটা আততি (tension) তৈরি হয়েছিল: দু-দিকে দুটি সম্ভাবনা, এবং দুটিই সমান কার্যকর, দুটি মতের লোকেরাই বেঁচেবর্তে আছে। এই দোলাচলতা সত্ত্বেও যজ্ঞ আরও বেশ কয়েক শতাব্দী চলেছিল কারণ প্রথম সংকট মোচনের ওই একটি সর্বজনগ্রাহ্য পন্থাই মানুষ জানত এবং বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে তার অনুষ্ঠান করতে তারা অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, যেমন সংকটের সংখ্যা ও প্রকারভেদের সংখ্যা বাড়ছিল তেমনই পুরোহিতদের উদ্ভাবিত যজ্ঞের সংখ্যা ও প্রকারভেদও বাড়ছিল, কাজেই ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত মানুষ প্রাচীন যজ্ঞ নিষ্ফল হলে নতুন যজ্ঞ সফল হতে পারে এমন আশা করার একটা ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছিল, ফলে যজ্ঞানুষ্ঠান অব্যাহত ছিল। তা ছাড়া ধনী যজমানের সমাজে আত্মপ্রচারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা উপায় ছিল ধুমধাম করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। সাধারণ মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে জাঁকজমক ও ধুমধামে আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়। অতএব, বৈদিক যুগের শেষ পর্বে যখন দেশে উৎপাদন ও বাণিজ্য এবং বিদেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে সম্পদ বাড়ছিল এবং রাজা, রাজন্য, ক্ষত্রিয় এবং বণিক বৈশ্যের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তখন সম্পত্তিমানের নিত্যসঙ্গী ধননাশের আশঙ্কা কিম্বা অকালে প্রাণ হারানোর, বিদেশে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ও ত্রাস বাড়ছিল। অতএব এ সব সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে পুরোহিতরা নিয়মিত নিত্যনতুন যজ্ঞ উদ্ভাবন করে চলেছিল। তাতে ফল হোক বা না হোক, সাময়িক একটা নিরাপত্তাবোধ আসে, কল্পিত দৈব অভিভাবকের হাতে আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করার একটা নিশ্চিন্ততা পাওয়া যায়— সেও একটা ফল, যার জন্য যজ্ঞবিধির পরমায়ু দীর্ঘায়িত হয়েছিল, যদিও তার বিশ্বাসের ভিত্তি টলে গিয়েছিল অনেক আগেই।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের অনেক আগেই আর্য-প্রাগার্য অন্তর্বিবাহের ফলে যে মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তার মধ্যে যজ্ঞের পাশাপাশি প্রাগার্যদের মধ্যে চালু পুজাও ধীরে ধীরে স্থান পেয়েছিল। প্রাগার্যদের মধ্যে প্রচলিত উপাসনা দু-ভাবে আর্যধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রথমত, বেশ-কিছু আঞ্চলিক প্রাগার্য দেবতা শেষ দিকের যজ্ঞে আর্য দেবমণ্ডলীতে স্থান পায়। এরা পূর্বতন আর্য দেবতার পাশাপাশি রইল এবং আর্য প্রণালীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হব্য পেতে লাগল। অর্থাৎ এরা বিধিমতে আর্য দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, আর্য যজ্ঞের পাশাপাশি প্রাগার্য

পূজাপদ্ধতিও সমাজে স্থান পেল এবং দীর্ঘকাল ধরে এ দুটি উপাসনা-পদ্ধতি যুগপৎ চালু ছিল। যজ্ঞে পদ্ধতিগত ভাবে যে সব সন্দেহ ছিল পূজায় তার একটা বিকল্প সমাধান দেখা দিল, কিন্তু পূজাও তো নিয়মিত ফল দেয় না, তাই জনমনে সন্দেহের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হল।

এই যুগে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষ ভাগ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত, দেশের ধর্মীয় বাতাবরণ অত্যন্ত অস্বচ্ছ, জটিল ও সংশয়সংকুল। বর্ণবিভক্ত সমাজ তো খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক থেকেই ছিল; যজুর্বেদের সময় থেকে ধীরে ধীরে বর্ণের স্থানে দেখা দিল জাতি— বর্ণ ছিল চারটি, জাতি হল অগণ্য। বৃত্তিভেদে এবং অন্তর্বিবাহে এগুলি চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছিল, আর তার সঙ্গে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত গ্রিক, পারদ, পহ্লব, কুষাণ, শক, হূন, প্রভৃতি নানা বিজাতীয় আক্রমণকারীদের সমাজে স্থান দিতে হওয়ায় সমস্ত পরিস্থিতিটা অনেক জটিল ও পরিবর্তনশীল হয়ে রইল। জাতিভেদ সম্বন্ধে একটা অনুচ্চারিত সংশয় নিশ্চয়ই জনমনে প্রবল ভাবেই বিদ্যমান ছিল, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে অনিবার্য গতিতে অবদমিত ও অবনমিত করা হচ্ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও রাজন্যের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্যে। সম্পদশালী কৃষক ও ধনী বণিক হিসাবে সমাজে কিছু বৈশ্য বিত্ত-কৌলীন্য অর্জন করেছিল। বাকি নির্ধন বৈশ্য হয়ে সমাজে ক্রমেই নেমে যাচ্ছিল।

শূদ্র চাষও করত, শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত, গোপালন করত এবং ধনীর গৃহদাসও ছিল, কিন্তু তার গুণ, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজে তার স্থান ছিল সকলের পায়ের তলায়। এখানে সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নৈতিক অবিচার সম্বন্ধে শূদ্র সন্দিহান না হয়েই পারে না। আর শুধু কি শূদ্র? বিনাযোগ্যতায় সমাজে প্রাচুর্য ও সমাদর ভোগ করত যারা তারাই কি মনে মনে বুঝত না যে এ ব্যবস্থা অন্যায়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। শূদ্রের স্থান এমন নীচে এবং সাধারণ ভাবে অসংগঠিত ছিল বলেই সমবেত ভাবে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য তার ছিল না। তাই জাতিভেদের নৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শূদ্রের সংশয় বা প্রতিবাদ তেমন ভাবে উচ্চারিত হতে পারেনি। তা হলে আমরা কীসের ভিত্তিতে অনুমান করছি যে সামাজিক ন্যায়বিধানে বঞ্চিত শূদ্র সন্দেহ করত, প্রতিবাদ করত? আমাদের এ অনুমানের যথেষ্ট দৃঢ় ভিত্তি আছে: প্রথমত সাহিত্যে গুহক, শম্বুক, ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-চারটি নজির আছে। আর আছে শাস্ত্রের অন্যায় বিধান, শূদ্র সম্বন্ধে যা যুগের গতিতে কঠোরতর এবং নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছিল— সেটা এতটাই যে মনুতে শূদ্র উনমানব, ন্যূনতম মানবিক অধিকারে বঞ্চিত উচ্চ ত্রিবর্ণের পদতলে পিষ্ট এক জীব। আরও প্রমাণ আছে, ধর্মগ্রন্থে অপরাধী শূদ্রের অমানবিক দণ্ডবিধানে। বেদ পাঠ করলে শূদ্রের জিভটা টেনে উপড়ে ফেলা হবে, কানে বেদের ধ্বনি প্রবেশ করলে সিসা গলিয়ে কানে ঢেলে দিতে হবে। তা হলে কিছু কিছু শূদ্র বেদের নির্দেশে সন্দেহ পোষণ করত এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণ করত, যেমন শম্বুক তপস্যা করেছিল। সব শাস্ত্রের কারাগারেই বন্দির নিষ্ক্রমণের ফাঁক থাকে, বন্দি বহু যন্ত্রণায় সে-ফাঁকটা তৈরি করে বেরোবার জন্যে। অর্থাৎ কারাবিধির ধর্মীয়তায়, উপযোগিতায় তার বিশ্বাস নেই, সন্দেহ আছে এবং সন্দেহের বশেই সে প্রতিবাদী আচরণ করে।

এই যেখানে সমাজ, সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ ধর্মাচরণের বিশ্বাসের পাশাপাশি ছিল নানা বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন বহু মানুষের মন। 'দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত একটি নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালীর পাশাপাশি সংশয় থাকলে এ দুয়ের আততি থেকে উদ্ভূত হয় অবিশ্বাস।'[১] বেদের উত্তরার্ধে এ অবিশ্বাস নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে, সংশয়ের উক্তিতে এবং বিকল্প ধর্মাচরণে। এ ছাড়াও প্রাগার্য বিশ্বাসগুলো দেবতা এবং অনুষ্ঠানকে আত্মসাৎ করার ফলে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে প্রকারান্তরে স্বীকৃতি জানানো হয় বানপ্রস্থ ও যতি বলে দুটি আশ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অন্তর্ভুক্তি, আরণ্যকে যজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা এবং কর্মকাণ্ড থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে জ্ঞানকাণ্ডের দিকে অগ্রসরণেও এ অবিশ্বাসের প্রকাশ। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ: কর্মকাণ্ডের অসম্পূর্ণতা, অনুপযোগিতা ও ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেওয়া। আবার বলছি, জ্ঞানকাণ্ড যখন প্রবল আকারে সমাজে প্রচলিত তখনও কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান সমানে চলছে, এর কারণ আগেই আলোচনা করেছি। মানুষের ইতিহাসে অধিগঠন (superstructure) কখনও রাতারাতি পালটায় না, যদিও যুদ্ধ, সংঘর্ষ, বিপ্লব এবং রাতারাতি ক্ষমতার হস্তান্তরে অবগঠন, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে রাতারাতি পালটাতে পারে। অধিগঠন নির্মিত হতে সময় লাগে, পরিবর্তিত হতেও সময় লাগে। আমাদের কাজ হচ্ছে তার ঝোঁকটা কোন দিকে সেইটে অনুধাবন করা। তাই জ্ঞানকাণ্ডের যুগে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে জনমানসের না হলেও সমাজবিধাতা পুরোহিত শাস্ত্রকারদের প্রবর্তিত ধর্মাচরণের ঝোঁকটা যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান থেকে সরে জ্ঞান ও মননের দিকে পড়েছে— এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। ঘটনাটা একদিনে এবং সহজে ঘটেনি, পথে পথে বিছিয়ে এসেছে মানসিক ভাবে বহু রক্তাক্ত ইতিহাস। কিন্তু সেটা অনিবার্য ভাবে ঘটেছে।

জ্ঞানকাণ্ডের পটভূমিকা রচিত হল আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত। দীর্ঘ পাঁচ শতকের অভিযাত্রা বহির্জগতে এবং মনোজগতে; এর ফলে মননজগতে যেমন পূর্বানুবৃত্তির মতো অনেক প্রাচীন উপাদান রইল তেমনই প্রাচীনকালে যা অভাবনীয় ছিল এমন বহু লক্ষণ ও উপাদানও দেখা দিল। দুই অংশই বাস্তবে সহাবস্থান করলেও ঝোঁকটা নতুন উপাদান ও নতুন লক্ষ্যে। মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রকাররা সমগ্র বেদকেই অর্থাৎ সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ চারটি অংশকেই অপৌরুষেয় বলছে, অর্থাৎ এই পুরো শাস্ত্রসম্ভার সবটাই দৈব আদেশ বা প্রকাশ, মানুষের রচনা নয়। আজ আমরা জানি, এর সবটাই মানুষের রচনা, কিন্তু যে প্রশ্ন উদ্যত হয়ে ওঠে তা হল বেদ বলতে আমরা যে যজ্ঞনির্ভর ধর্মাচরণ বুঝি তার শাস্ত্র তো সংহিতা ব্রাহ্মণ, সেই পর্যন্তকে অপৌরুষেয় বললেই তো হত; যে অংশ ধীরে ধীরে অন্তত তত্ত্বগত ভাবে যজ্ঞকে অস্বীকার করছে সেই আরণ্যক উপনিষদকেও অপৌরুষেয় বলার কী

১. '(Disbelief.) may spring from the tension between a sceptical mind and a religious heart.'– Kirkegaard, p. 3

দরকার ছিল? দরকার সত্যিই ছিল: বহু আয়াসে, কঠোর প্রযত্নে আর্যসমাজ বহু বিরোধী মতবাদকে খণ্ডন করে আত্মসাৎ করে, আগন্তুক ধর্মমতকেও অধিগ্রহণ করে সমাজে একটি সংহতি নির্মাণের চেষ্টা করে চলেছিল। তাই প্রাগার্য দেবদেবী, উপাসনা-পদ্ধতিকে ভেতরে টেনে নেওয়া, বেদবিরোধী প্রস্থানের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বানপ্রস্থ ও যতি নামে আশ্রমধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা, যজ্ঞকে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রহণযোগ্য ও আচরণীয় করে তোলা এবং উপনিষদের প্রশ্ন ও অবিশ্বাসকে সম্মানিত ঋষি প্রবক্তাদের মুখে বসিয়ে সেগুলিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্ভ্রম দেওয়া ইত্যাদি কারণে সম্পূর্ণ ইহমুখীন সংহিতা-ব্রাহ্মণের ধর্মে আপাত ভাবে হলেও ঐহিকতাবিদ্বেষ দেখা দিল। এখানে জন্মান্তরতত্ত্ব দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া, এবং যেহেতু বহু পূর্ব থেকেই মৃত্যু ও মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে জনমানসে প্রবল সংশয় উচ্চারিত হয়েছিল, তাই জন্মান্তরবাদের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর আত্যন্তিকতা অস্বীকার করা হল। এই ভাবে আত্মসাৎ করা, ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন প্রলম্বিত করা, বাহিরকে নিজসীমার অন্তর্ভুক্ত করা— এই প্রক্রিয়াটা চলেছিল অন্তর্জগতের একটা মরণান্তিক সংগ্রামের রূপে। কাল, সমাজের বিবর্তন, অনিবার্য সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক, সংশয়ে দীর্ণ মানুষ যাকে ক্রমান্বয়ে বাতিল করে পেছনে ফেলে যেতে চেয়েছে, যার থেকে ক্রমাগত সরে সরে যেতে চেয়েছে, অনিবার্য পরিবর্তনকে অনুবর্তন বলে ব্যাখ্যা না করলে সমাজ তাকে গ্রহণ করবে কেন? এবং এ ব্যাখ্যাকে দৈব প্রকাশ, অপৌরুষেয় আখ্যা না দিলে মানুষ তাকে মানবে কেন? না মানলে বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর, মতবাদের, ধর্মবোধের ও আচরণের সমাহারে গঠিত এই-যে সমাজ ও তার ধর্ম, সে তো অতি সহজেই বহু বিরুদ্ধ মতবাদের সম্মুখীন হয়ে স্খলিত হয়ে পড়ে যেত, চূর্ণ হত তার অধিগঠন। তাই পুরো আপসের, মেনে নেওয়ার, মানিয়ে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসটাকেই অপৌরুষেয় বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ার যা অভিলষিত ফল ছিল, সামাজিক সংহতি রক্ষা, তা পূর্ণ ভাবে না হলেও বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে। এই হল সমাজ-কলেবরের ইতিহাস; এর অভ্যন্তরে মর্মকীটের মতো ছিল বহু সংশয়, সন্দেহ, উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত অবিশ্বাস। দ্বিতীয় পর্বে এ সব অন্য একটি মাত্রা পায়, কারণ তখন বহু বেদবিরোধী প্রস্থান স্বতন্ত্র ভাবে সমাজে বিদ্যমান।

জন্মান্তরবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে মৃত্যুভয় ও পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞানের একটা ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকেই এটা লক্ষ করা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে পড়ি, যজ্ঞের জন্যে আনা একটা দুগ্ধবতী গাভীকে বাঘে নিয়ে গেলে যজমান রাজা পুরোহিত, খণ্ডিক ও ঔদ্‌গারিক তার প্রায়শ্চিত্ত কী জানতে চান। পুরোহিত ভাবলেন, বলে দিই প্রজারা রাজার অনুগত হবে আর পরলোকে আমি সম্মানের আসনে থাকব। না বললে এর বিপরীতটা হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলে দেওয়াই ঠিক করলেন, 'কারণ ওপারে বহু রাত্রি'। (১১:৪:৪:৫) এখানে দুটো কথা লক্ষ্য করা দরকার: মরণোত্তর অস্তিত্ব দীর্ঘ (বা চির)-স্থায়ী এবং পুরোহিত দিনের কথা ভাবেননি, রাত্রির কথাই ভেবেছেন। ঋগ্বেদেও পরলোক সম্বন্ধে ধারণা ছিল সেটা একটা নিরালোক, নিরানন্দ লোক। এবং যেহেতু তখনও পরজন্মের কল্পনা দেখা দেয়নি

তাই সেইটেই তাদের কাছে ছিল চিরদিনের আভাস। তাই এক অর্থে জন্মান্তরবাদ এই নিরবসান দুঃখলোক থেকে পরিত্রাণ হিসেবে দেখা দিল। একেবারে অজ্ঞাত দুঃসময়মণ্ডিত জগতের চেয়ে পরিচিত এই সুখদুঃখের জগৎ অনেকের কাছেই কাম্য মনে হল। বোঝা যায়, মরণোত্তর জীবন নিয়ে ত্রাস বা আশঙ্কা মানুষকে এক অনিশ্চয়ের অস্থিরতার মধ্যে রেখেছিল। '...ব্যক্তিগত অমরত্ব তার পূর্বতন বিপরীত অবস্থান (আত্মার অমরত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হল। এ সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যার পরে ...যজ্ঞীয় ধর্মানুষ্ঠান থেকে পরজন্মের ধারণা উদ্ভূত হয় না।'[২]

এ ছাড়াও জীবন, সমাজ, ঔৎপাতিক সংকট, রোগব্যাধি, প্রভৃতি নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন তো ছিলই; যজ্ঞ, তার উপকরণ প্রণালী এবং দেবতাদের অস্তিত্ব, চরিত্র, মনোভাব এ সব নিয়েও বহু প্রশ্ন উদ্যত ছিল। প্রশ্ন ও সংশয় সম্বন্ধে সমাজে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব চলিত ছিল। স্পষ্টত, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা কারোরই ছিল না, তাই মাঝে মাঝেই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঋষিদের অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। কয়েক জন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'যে দেবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায় না, তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না; অমুক তিথিতে তোমার মৃত্যু হবে, এবং তোমার অস্থিগুলি তোমার বাড়িতে পৌঁছবে না।' (জৈমিনীয় উপনিষদব্রাহ্মণ; ১:৬:৩) অস্থিচয়নের উপযোগিতায় যে সমাজ বিশ্বাস করে, সেখানে এটি একটি গুরুতর অভিশাপ। এর কারণ কী? দুর্জ্ঞেয় দেবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। তা হলে প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা ছিল, সম্ভবত মানুষ ক্রমেই বেশি বেশি প্রশ্ন করছে তখন, এবং বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রশ্নোপনিষদের শুরুতেই একগুচ্ছ প্রশ্ন, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে; এঁরা এলেন আচার্য পিপ্পলাদের কাছে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিয়ে। মনে রাখতে হবে, এই জিজ্ঞাসাটিই নতুন এবং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণাও এর আগে ছিল না। আগে যজ্ঞে বহু সংখ্যায় দেবতার উপাসনা হত, তার মধ্যে পরব্রহ্ম ছিলেন না। এই জিজ্ঞাসু (সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়নী, কৌশল্য, ভার্গব ও কবন্ধী)দের পিপ্পলাদ বললেন, তোমরা এক বৎসর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধায় অতিবাহিত করো। তার পরে এসো। এখানে দুটো ব্যাপার চোখে পড়ে, এঁরা সকলেই মনস্বী তবু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যে এঁদের ঋষিত্ব বা মনীষা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হল না, এটা বিশেষ ধরনের জ্ঞান, তাই এর জন্যে চাই বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি। কী সে প্রস্তুতি? ব্রহ্মচর্য আশ্রম নয়, সংযম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা। এটাও নতুন। কর্মকাণ্ডে ধর্মাচরণ ছিল যজ্ঞ, তার উপকরণ ও প্রকরণ দুই-ই পরিচিত, তার অভীপ্সিত ফল ছিল ঐহিক সুখ, দীর্ঘ জীবন। এখন উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান, উপায় মনন, তপস্যা।

২. '. .the idea of personal immorality has only been divorced from the preceeding one (i.e., the non-death of the soul) after a philosophical elaboration, .a concept of another life does not have its origin in the institution of sacrifice.'— Herbert and Mauss, p. 64

সংবৎসর তপস্যায় অতিবাহিত করে কবন্ধী এসে প্রশ্ন করলেন: 'প্রজা কোথা থেকে জাত হয়?— কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।' (প্রশ্নোপনিষদ ১:১:৩) উত্তরে পিপ্পলাদ বললেন, 'প্রজাপতি প্রজা কামনা করলেন, তিনি তপশ্চরণ করলেন, তিনি তপস্যা করে মিথুন এবং ধন ও প্রাণ উৎপন্ন করলেন; এরা (মিথুন) আমার বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করবে।'[৩] সেই সংহিতা যুগের প্রশ্ন: প্রজা কোথা থেকে এল; উত্তর, মিথুন থেকে, এবং মিথুন এল তপস্যা থেকে; তপস্যাকে ধর্মজগতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এই ভাবে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর পরে ভার্গব প্রশ্ন করলেন, 'ভগবন্ ক'জন দেবতা প্রজাকে ধারণ করেন? কারা শরীরকে প্রকাশিত করেন? এদের মধ্যে বরিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) কে?'[৪] উত্তরে পিপ্পলাদ বলেন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র— এঁরা প্রকাশ্যে বলেন, 'আমরা এই শরীরকে দৃঢ়তর করে বিশেষ ভাবে ধারণ করব। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণ। তাঁদের মধ্যে বরিষ্ঠ প্রাণ।'[৫] এখানে যে প্রশ্ন তাও অনেক পুরোনো, উত্তরেও খুব নতুন কিছু বলা হল না: পঞ্চভূত, বাক্, মন, চক্ষু ও কর্ণ, অর্থাৎ পঞ্চভূতের সঙ্গে মানুষের বিশিষ্ট দুটি উপাদান— বাক্য ও মন— এবং প্রধান দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু ও কর্ণ এরা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

লক্ষ্যণীয়, প্রশ্ন ছিল, কোন দেবতারা প্রজাকে ধারণ করে? উত্তরে যাঁদের নাম করা হল তাঁরা কেউই দেবতা নন, শ্রেষ্ঠ হল প্রাণ; প্রচলিত অর্থে প্রাণও দেবতা নয়। এর আগে সংহিতায় ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বহু দেবতাকে স্রষ্টা বলা হয়েছে। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি পৃথক, এখানে মানুষের দেহমনের উপাদানগুলিকেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উপাদানগুলিই বিপরিণত হয়ে মানুষের দেহমন নির্মাণ করেছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এ সব থাকলেও যেহেতু সে মানুষ হত না, তাই বলা হয়েছে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। এ উপলব্ধি বেশ সাধারণ পর্যায়ের এবং একটি বস্তুবাদী অবস্থানকেই সূচিত করে। যদিও এই প্রশ্নের বাকি অংশে নানা ভাবে প্রাণের গরিমাকীর্তন করা হয়েছে, যেমন আগের প্রশ্নের উত্তরেও 'রয়ি' (= ধন) ও প্রাণের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। তৃতীয় প্রশ্ন করলেন কৌশল্য:

> ভগবন্, প্রাণ কোথা থেকে জাত হয়? কেমন করে তা এই শরীরে আসে। নিজেকে বিভক্ত (বিচ্ছিন্ন) করে কেমন করেই বা চলে যায়? কীভাবে উৎক্রান্ত হয়? বাহ্য ও অধ্যাত্ম শরীরেন্দ্রিয়গুলিকে কীভাবে ধারণ করে?

৩. প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যাত, স তপসস্তপ্তা স মিথুনমুৎপাদয়ত রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি। এতৌ সে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। প্র. উ. (১:৪)

৪. ভগবন্, কত্যেব দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ? (২:১)

৫. আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতাদ্বাণবষ্টভৎ বিধারয়ামঃ॥... বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ। প্র. উ. (২:২,৩)

উত্তর এল:

> তুমি অতিপ্রশ্ন (গভীর বা দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন) করছ। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তোমাকে বলব। আত্মা থেকেই প্রাণ জাত হয়। মানুষের যেমন ছায়া তেমনই পুরুষে প্রাণ ব্যাপ্ত। মানস সংকল্প থেকে এই শরীরে আসে।[৬]

এখানে প্রশ্নগুলি মৌলিক; আগের অংশে প্রাণের ভূমিকার প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে, এ প্রশ্নে সেই প্রাণের উৎপত্তি এবং নিষ্ক্রান্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন, বাহ্য এবং আন্তর পদার্থ প্রাণ কেমন ভাবে ধারণ করে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। উত্তরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাণকে অতিক্রম করে আত্মায় পৌঁছতে হল এবং এইখানে ভাববাদের আশ্রয় নেওয়া হল, মানুষের যেমন ছায়া, তেমনই আত্মা; মনের কামনা থেকেই জীব সৃষ্টি এবং তার দ্বারাই সৃষ্টিকালেই আত্মা জীবে অনুপ্রবিষ্ট হয়। পরে দেহ থেকে আত্মা কী ক্রমে বিনির্গত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা আছে। যেটা সহজেই চোখে পড়ে তা হল, উপমাটির দৈন্য; ছায়া মানুষের শরীরের ভেতরে থাকে না, থাকে বাইরে। আত্মাও কি তাই? সেটা অভিপ্রেত অর্থ নয়, তাই এই উত্তর প্রশ্নের মূল বিবক্ষিত বস্তুটিকে এড়িয়ে গেছে। কেন? কারণ আগে যেমন আলোচনা করেছি, এই যুগে প্রথম চেষ্টা করা হচ্ছে দেহব্যতিরিক্ত হিসেবে আত্মাকে দেখাতে। চেষ্টা সফল হয়নি, কারণ ছায়ার উপমাতে আত্মা দেহের একেবারে বাইরেই রয়ে গেল, তাকে দেহের মধ্যে ঢোকানোই গেল না। অর্থাৎ দেহ-আত্মার বিভাজনটি এখনও ভাল করে মানুষের, এমনকী ঋষিদের চেতনাতেও স্থান পায়নি।

চতুর্থ প্রশ্ন সৌর্যায়নীর:

> ভগবন্, এই পুরুষে কারা নিদ্রা যায়? কারা স্বপ্ন দেখে? কারা জেগে থাকে? কোন সেই দেব যিনি স্বপ্ন দেখেন। এই সুখ কার হয়? কীসের (বা কার) মধ্যে সব কিছু সংপ্রতিষ্ঠিত থাকে?'

তাঁকে উত্তর দিলেন:

> 'গার্গ্য, অস্তগামী সূর্যের সমস্ত কিরণ তেজোমণ্ডলে একীভূত হয়। বারবার সূর্যোদয়কালে প্রসারিত হয়, এই ভাবে সেই সব পরম দেব মনে একীভূত হয়।'[৭]

৬. ভগবন্, কুত এষ প্রাণো জায়তে? কথমায়ত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মনেং প্রবিভজ্য কথং প্রতিষ্ঠতে? কোনোৎক্রমতে? কথং বাহ্যমভিধত্তে? কথমধ্যাত্মমিতি।... তস্মৈ স হোবাচ— অতিপ্রাশন্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি। আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষেচ্ছায়া এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে। প্র. উ. (৩:১-৩)

৭. ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্যেতৎ সুখং ভবতি? কস্মিন্নু সর্বে সপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি।। তস্মৈ স হোবাচ— যথা গার্গ্য! মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি; এবং হ বৈ সর্বং তৎ পরে দেবে একীভবতি। প্র. উ. (৪:১-২)

প্রশ্ন ছিল, পুরুষ নিজেই ঘুমোয়,— স্বপ্ন দেখে, না তার অন্তঃস্থ কেউ? দেহের সুখ কে ভোগ করে? কার মধ্যে মানুষের সব অভিজ্ঞতা আশ্রিত থাকে? লক্ষ করা যায় যে, এ সব প্রশ্নের কোনও সরাসরি উত্তর দেওয়া হয়নি। সুখের অনুভূতি কার হয় তারও উত্তর নেই। অস্তগামী সূর্যের রশ্মিসমূহ সন্ধ্যায় গুটিয়ে আসে, প্রভাতে প্রকীর্ণ হয়। তেমন ভাবেই সেই সব পরম দেব মানুষের মনে একীভূত হন। এর মধ্যে নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, সুখবোধের আধার কী, তার কোনও উত্তর নেই। অস্পষ্ট ভাবে বলা আছে সেই সব পরম দেবরা মানুষের মনে একীভূত হন; বস্তুত এটা উত্তর নয় বরং আর-একটা প্রশ্নের বীজ: পরম দেব কাঁরা, কেন তাঁরা মানুষের মনের মধ্যে একীভূত হন? অন্য নানা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু মূল প্রশ্নটি অনুত্তরিতই রয়ে গেল। এখানে যেটা চোখে পড়ে তা হল, মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে, তার পরিপার্শ্ব নিয়ে ভাবছে, প্রশ্ন করছে, উত্তর মিলুক বা না-ই মিলুক। শেষ প্রশ্ন করে সত্যকাম: 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রণবমন্ত্রের উপাসনা করে, সে কোন লোক জয় করে?' উত্তরে পিপ্পলাদ বললেন, 'সত্যকাম, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম হল ওঙ্কার বা প্রণব, অতএব বিদ্বান এই দুটির মধ্যে একটি ব্রহ্মের আশ্রয় পান।'[৮] যে মানুষ সারা জীবন প্রণবমন্ত্রের উপাসনা করে সে মৃত্যুর পরে কোন লোকে স্থান পায়, এই ছিল প্রশ্ন। প্রশ্নটি প্রণিধান করে দেখবার মতো, কারণ ইতোমধ্যেই প্রণবমন্ত্র এমন মহিমা অর্জন করেছে যে তার দ্বারা মৃত্যুর পরে সুবিধা হওয়ার আশা রাখে মানুষ। একটি মন্ত্র অন্য হাজার হাজার মন্ত্রকে ছাপিয়ে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য অর্জন করেছে। কিন্তু এ প্রার্থনায় জীবনভর নিবিষ্ট থাকবার জন্যে মৃত্যুর পর কিছু ফল পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই ফল? উত্তরে পিপ্পলাদ যা বলছেন তা পরে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে— মৃত্যুর পরে দুটি মাত্র সম্ভাব্য পরিণতি, প্রথম পিতৃযান, অর্থাৎ পুনর্জন্ম, দ্বিতীয় দেবযান বা পরমাত্মা দর্শন; প্রথমটি পুনর্জন্মের পথ, দ্বিতীয়টি কৈবল্যপ্রাপ্তির। অবশ্য দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উক্তি নেই, তবে দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি যখন পুনর্জন্ম অন্যটি স্বভাবতই পুনর্জন্ম না হওয়ার অবস্থা মনে করা যায়। কিন্তু এখানে প্রশ্নটি তাৎপর্যপূর্ণ: যজ্ঞ নয়, শুধুমাত্র প্রণম বা ওংকার মন্ত্রের উপাসনা এবং এই একটি অক্ষরকে এক-অক্ষর, দ্বি-অক্ষর, ত্রি-অক্ষর এই তিন ভাবে বোঝার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে সহজ বুদ্ধির অগম্য, রহস্যগূঢ় একটি তত্ত্বের কথা আভাসিত।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের পুরো আগম-প্রকরণে প্রণব অর্থাৎ ওম্ শব্দটিকে ভেঙে অ-উ-ম ধরে নিয়ে এ অক্ষরগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে গূঢ় তত্ত্বের মাহাত্ম্য আরোপ করে শব্দটিকে

৮. স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মানুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি তস্মৈ স হোবাচ॥ এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি। প্র. উ. (৪:১-২)

একই সঙ্গে দুর্বোধ্য ও উচ্চমার্গের একটি ভাবসত্তা হিসেবে আনা হয়েছে। সামবেদের সংহিতায় স্তোভ নামে হা-উ, হোই, হোয়ি, হা-বু, ইত্যাদি, বা হিঙ্কার, ওংকার এ সব সমবেত ভাবে উচ্চারিত ধ্বনিকে অতিলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করবার যে চেষ্টা, প্রণবেও তাই। ইহুদিরা যেমন 'আমেন্'কে অন্য ভাবে মাহাত্ম্য দেয়, তেমনই সংস্কৃতে পরবর্তী সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট দেখি ওম্-এর অর্থ 'হ্যাঁ'। যেমন বাঢ়ম্। আমেনও তাই। অর্থাৎ পুরোহিত যে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন উপস্থিত জনগোষ্ঠী তাতে সমর্থন জানাত হ্যাঁ বা ওম্ বলে। যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক পটভূমিকা থেকে তুলে এনে কর্মকাণ্ডে যখন প্রণবকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করার চেষ্টা চলছে, তখন স্বভাবতই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে, ওম্ শব্দটি তো যজ্ঞে জনতার সমর্থনসূচক ধ্বনিমাত্র, তাকে এত আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা কেন? আগম প্রকরণে ও অন্যত্র ওম্ নিয়ে বিস্তৃত রহস্যগম্ভীর ব্যাখ্যার চেষ্টা এই উদ্যত প্রশ্নেরই উত্তরমাত্র। মনে রাখতে হবে, কর্মকাণ্ডে ওম্ যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ ছিল, সেটা লোকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে যজ্ঞের বিকল্প হচ্ছে মনন। যে মননে আত্মব্রহ্ম একাত্মতা প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ কর্ম থেকে বিনির্মুক্ত শব্দে পরিণত হল ওম্; যজ্ঞ একে আর মহিমা দেয় না, তবে কীসে আসবে এর গুরুত্ব? একে অতিলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত করা সে বিকল্প প্রক্রিয়া। ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকে শুরু করে উপনিষদেও একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, 'পরোক্ষপ্রিয়া বৈ দেবাঃ'— দেবতারা পরোক্ষ ভাষণ অর্থাৎ অস্বচ্ছ ভাষাই পছন্দ করেন, তাই তাঁদের কথাতে রহস্য আরোপ করা ও অলৌকিক অর্থের আভাস দেওয়া খুবই সহজ।

ঐতরেয় উপনিষদে একটি প্রশ্নমালা দিয়ে শুরু হয় তৃতীয় অধ্যায়: 'কে তিনি যাঁকে আমরা আত্মা বলে উপাসনা করি, কে সেই আত্মা যার দ্বারা লোকে রূপ দেখে শব্দ শোনে, গন্ধ আঘ্রাণ করে, বাক্য বলে, স্বাদু, অস্বাদুকে বোঝে?'[৯] এর উত্তর হল, 'এই যে হৃদয়, এই যে মন (এরাই)— যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ।' (৩:১:২) এখানে প্রশ্ন ছিল, ইন্দ্রিয়গুলি যে সব কর্ম করে তা কোন্ আত্মার নিয়োগে? অন্য ভাবে বললে ইন্দ্রিয়কর্মগুলির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কী? উত্তরে আত্মার উল্লেখ না করেই বলা হয় ইন্দ্রিয়কর্মগুলি সাধন করে হৃদয় ও মন, এবং এ উত্তর বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু এর মধ্যে আত্মার স্থান নেই; অথচ এ উপনিষদের শেষ হচ্ছে এই বলে, 'তিনি (বামদেব) উক্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার দ্বারা এই জগৎ অতিক্রম করে ওই স্বর্গলোকে সব কামনা লাভ করে অমৃত হয়েছিলেন।'[১০] আগেরটির সঙ্গে এ কথার বিশেষ কোনও সংগতি নেই; হৃদয় ও মন তো আত্মা নয়, তারাই ইন্দ্রিয়কর্মের প্রবর্তক। অথচ বামদেব চৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা এই পৃথিবী অতিক্রম করে স্বর্গে গেলেন ও সেখানে

৯. কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধামাজিঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু বিজানাতি। ঐ. উ. (৩:১:১)

১০. স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদ্ উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামান্ আপ্ত অমৃতঃ সমভবৎ॥ ঐ. উ. (৩:১:৩)

তাঁর সর্বকামনা চরিতার্থ হল, অর্থাৎ আত্মাই স্বর্গের সোপান এবং পরলোকে কামনা চরিতার্থ হয় আত্মার দ্বারাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাবল্লীতে আচার্য শিষ্যের একটি সংশয়ের কথা নিজেই তুলেছেন, 'যদি তোমার করণীয় কর্ম বা আচরণ সম্বন্ধে কোনও সংশয় জাগে, (তা হলে) সদসৎ-বিচারক্ষম তরুণ ধার্মিক যে পণ্ডিতরা আছেন তাদের মতো আচরণ কোরো।'[১১] সংশয়ের সম্ভাবনা এখানে ধর্ম সম্বন্ধে নয়, আচরণ সম্বন্ধে, এবং সমাধানও ধর্মীয় নয়, নৈতিক। সমস্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদেই নীতি একটি মুখ্য আলোচ্য বস্তু এবং এটাও লক্ষ্যণীয়, কারণ কর্মকাণ্ডে নীতি অপ্রাসঙ্গিক। আরও লক্ষ্যণীয় যে নীতির প্রশ্নে উত্তরটা ধর্মগ্রন্থ বা বেদ থেকে আসছে না: সমাবর্তনে অবভৃথস্নানের পর বেদপাঠার্থী ব্রহ্মচারী যখন পাঠ সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে চলেছে তখন তাকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছে এরই ঠিক আগে সেই কথাই আবার বলা হয়েছে, 'যে সব কাজ অনিন্দনীয় তা-ই আচরণ কোরো, তা-ই সেবনীয়; যা আমাদের (আচার্যদের) সুচরিত, সেগুলিই অনুষ্ঠান কোরো, অন্যগুলির (অনুসরণ) কোরো না।'[১২] উপদেশে দু'বার বলা হল, যা আচার্যদের ভাল আচরণ নয়, তার অনুসরণ কোরো না। তার পর এল সংশয়ের কথা, অর্থাৎ এর পরেও যদি ব্রহ্মচারীর মনে আচরণ সম্বন্ধে সংশয় আসে তা হলে— শাস্ত্রের কোনও নির্দেশ নেই, আচার্যদের সুচরিত অনুসরণ করারই অনুজ্ঞা। কেমন আচার্য? যাঁরা পণ্ডিত, সচ্চরিত্র, অরুক্ষ (অর্থাৎ কোমলস্বভাব)— তেমন আচার্যরা অনুরূপ সংশয়িত ক্ষেত্রে যেমন আচরণ করেছেন সেইটিই আদর্শ। নীতির সংশয়ে পূর্বাচার্যদের সদাচরণই নিরিখ। এ শাস্ত্র সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের; সমাজে নানা পরিবর্তন, পরিবারে ও মানুষে-মানুষে সম্পর্কে এবং যজ্ঞ-পরবর্তী চিন্তার প্রসারে, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির প্রাদুর্ভাবে আচরণের নিরিখ সম্বন্ধে সংশয়ের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তাই এই ধরনের নীতিগত সংশয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি।

কেনোপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন, 'কেন' শব্দ দিয়ে সে প্রশ্ন শুরু, সেই থেকেই উপনিষদের নামকরণ। প্রথম প্রশ্ন হল:

> মন কার ইচ্ছায় প্রেরিত (চালিত) হয়? শ্রেষ্ঠ প্রাণ কার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে চলে? মানুষ কার ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে বাক্য উচ্চারণ করে? চক্ষু ও কর্ণকে কোন্ দেবতা তাদের কর্মে নিযুক্ত করে?'[১৩]

১১. অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তা। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। তৈ. উ. (১:৩-৪)

১২. যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি॥ তৈ. উ. (১:২:২)

১৩. কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ কে. উ. (১:১)

প্রশ্নগুলি এক কথায় বললে, 'ইন্দ্রিয়দের কর্মপ্রেরণা কোথা থেকে আসে?' উত্তরে বলা হচ্ছে:

> যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু স্বরূপ। এই জন্য পণ্ডিতরা ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মা মনে করেন না বলে মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন।[১৪]

এটি এবং এর অনুরূপ বহু অংশ কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ: এখানে প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয়গুলি যে কাজ করে তা কি স্বয়ংক্রিয় ভাবে না অন্য কোনও শক্তি এগুলিকে অলক্ষ্য থেকে পরিচালনা করে? দার্শনিক ভাষায় বললে দেহ কি দৈহিক ক্রিয়া নিজে সম্পাদন করে না তার অতিরিক্ত কোনও শক্তি দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে? উত্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: চক্ষু, কর্ণ, বাক্‌শক্তির ওপারে, এমনকী প্রাণ ও মনেরও ওপারে থেকে যিনি এগুলিকে প্রবর্তিত করেন, সে-ই আত্মাকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ চালক হিসেবে এবং দেহের নিয়ন্তা হিসেবে স্বীকার করে, সে-ই মৃত্যুর পরে অমৃতত্ব লাভ করে। এখানে প্রশ্নটি পুরাতন, আমরা দেখেছি আগেও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে প্রশ্ন সেই সংহিতা ব্রাহ্মণের যুগ থেকেই আছে। উত্তরটিতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল: ওই পুরাতন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল, আবার জ্ঞানকাণ্ডের একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্যকেও— দেহ-দেহী বিভাজন— প্রতিষ্ঠিত করা হল।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, ষোড়শ মহাজনপদের উত্থানের পরে সমাজে নানা রকম বিভাজন দেখা দিয়েছে: ধনিক-শ্রমিক, কায়িক শ্রম, মানসিক শ্রম, ইত্যাদি। এ সবেরই আনুষঙ্গিক দার্শনিক তত্ত্বের দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হল তা হল দেহ ও আত্মার বিভাজন। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে ইন্দ্রিয়ের প্রাথমিক প্রবর্তনা আসে স্নায়ুমণ্ডলী থেকে এবং স্নায়ুমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত হয় মন দ্বারা, যে-মন ইন্দ্রিয়-সমাবেশের অব্যতিক্রমী ফল। কিন্তু তা হলে তো দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করা হয় না, এবং তা না হলে জন্মান্তর, অমরত্ব, মোক্ষ এ সব প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ জন্মান্তর বা স্বর্গভোগ বা মোক্ষলাভ করবে কে? আত্মা চাই তো তার জন্যে। মনে রাখতে হবে, সংহিতাব্রাহ্মণেও মরণোত্তর স্বর্গ, যমের তত্ত্বাবধানে সুখে থাকা, এ সব বলা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো ইচ্ছাপূরক ভাবনার প্রকাশ, তার মধ্যে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না এবং উপায়ও ছিল না। এখন জ্ঞানকাণ্ডে আত্মাই সর্বেসর্বা, এবং তা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। দেহের ধ্বংসের পরেও তাই তাকে বেঁচে থাকতে হবে, স্বর্গ, অমৃতত্ত্ব বা মোক্ষ পাওয়ার জন্যে। অতএব তাকে দেহবিনির্মুক্ত হতে হবে। এখন থেকে আত্মা দেহী, দেহ পঞ্চভূতের সমাহার। দেহের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণ বা মন নয়, আত্মা; কারণ প্রাণ-মনের অবসান ঘটে

১৪. শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্‌, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ কে. উ. (১:২)

মৃত্যুতে, মরণোত্তর অস্তিত্ব থাকে শুধু আত্মারই। এখানে যেটি প্রশ্নোত্তরের আকারে দেখা গেল, সমগ্র উপনিষদসাহিত্যের আধাআধি জুড়ে আছে তারই বিস্তারিত বিবরণ, তার লক্ষণ, দেহ থেকে তার সর্বতো ভাবে ভিন্নতা, তার মরণোত্তর অস্তিত্ব এবং ব্রহ্ম-স্বরূপতা।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই দেখি তিন জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সামবেদ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদটি সামবেদেরই অন্তর্গত, তাই এঁদের প্রস্তাব খুবই সংগত। এঁদের মধ্যে একজন অন্যদের আলোচনা করতে বললেন, তিনি শুনবেন। এঁদের একজন অপরকে প্রশ্ন করলেন:

—সামের আশ্রয় কী?

—স্বর।

—স্বরের আশ্রয়?

—প্রাণ।

—প্রাণের... ?

—অন্ন।

—অন্নের... ?

—জল।

—জলের... ?

—ওই স্বর্গলোক।

—স্বর্গলোকের... ?

—সামকে কেউ স্বর্গলোকের ওপারে অন্য আশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারে না, যেহেতু স্বর্গরূপে সামের স্তব করা হয়, তাই আমরা সামকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত বলেই জানি।[১৫]

শুনে তৃতীয় জন বললেন, 'আপনার সাম অপ্রতিষ্ঠিত থেকে গেল— অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তো দালভ্য— সাম॥' (১:৮৬) তখন তৃতীয় জন প্রশ্ন করলেন, 'এই লোকের আশ্রয় কী?' বললেন, 'আকাশ। পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই আকাশ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।'[১৬] যেটা চোখে পড়ে তা হল, এই যে ব্যাপারটা শুরু হল সামগানের আশ্রয় কী তা নিয়ে এবং উত্তরও খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'স্বর' বলা হল, তেমনই সহজ স্বরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের অন্ন, অন্নের জল এবং জলের আকাশ। পরের অংশটা অপ্রত্যাশিত,

---

১৫. কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাঁণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচআন্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ। অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদ্দতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামভি সংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি॥ ছা. উ. (১:৮:৪,৫)

১৬. অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি। (১:৯:১)

আকাশ থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়, এবং আকাশেই সব কিছু বিলীন হয়। আকাশ থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়, এমন কথা অন্যত্র প্রায় নেই। উপনিষদে বরং জল থেকে, স্বেদ থেকে, কামনা থেকে, দ্বিধাকৃত মিথুন থেকে, ইচ্ছা থেকে সৃষ্টির উদ্ভবের কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; এখানে শোনা গেল, আকাশ থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। হয়তো ছান্দোগ্য সামবেদের উপনিষদ বলে ও সামবেদে সুরের অতএব স্বরের প্রাধান্য বলে এবং সুর-স্বর বায়ুতে আশ্রিত ও বায়ু আকাশে আশ্রিত বলেই আকাশকে সৃষ্টির এবং বিলয়েরও কারণ হিসেবে বলা হল। এবং এখানে সুর আকাশের বায়ুতে মিলিয়ে যায় বলেই সামবেদী জিজ্ঞাসু আকাশকে এত প্রাধান্য দিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয়, প্রশ্নগুলির পারম্পর্য এবং আপাত-নিরন্তরতা। কোনও উত্তরই চূড়ান্ত বলে যেন স্বীকার করা হচ্ছে না, এবং মূল প্রশ্নটি হল আধার নিয়ে। মানুষ দৃশ্য-জগৎকে বুঝতে চাইছে আধার-আধৃত সম্বন্ধে। সামবেদীর কাছে যে-আধার চূড়ান্ত, সেই আকাশে এসে প্রশ্ন ক্ষান্ত হল। প্রশ্নের পরম্পরা একটি অতৃপ্ত জ্ঞানান্বেষাকেই সূচিত করছে. এ দুটি এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। সংহিতাব্রাহ্মণ মিলিয়ে যে-কর্মকাণ্ড তা ব্রাহ্মণ-অংশে যজ্ঞকর্মের অসংখ্য অনুপুঙ্খ নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন আছে; কিন্তু উত্তরগুলি কোনওটিই যথার্থ উত্তর নয়, একটা ব্যাখ্যাবিমুখ রহস্য দিয়েই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে শ্বেতকেতুকে পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছ তো?' শ্বেতকেতু বললেন, পেয়েছেন; তখন প্রবাহণ প্রশ্ন করলেন:

—প্রাণীরা এই পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে কোথায় যায় তা জান?

—শ্বেতকেতু বললেন, না, ভগবন্!

—কেমন করে তারা ফেরে জান কি?

—না, ভগবন্!

—দেবযান ও পিতৃযান নামের পথ দু'টি কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে, জান?

—না, ভগবন্।

—চন্দ্রলোক কেন ভরে ওঠে না, জান?

—না, ভগবন্।

—পঞ্চম আহুতিটি দেওয়া হলে জল কেন পুরুষ বলে অভিহিত হয়, জান কি?

—না, ভগবন্।[১৭]

এর পরে শ্বেতকেতু পিতার কাছে গিয়ে অনুযোগ করলেন তাঁকে অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, যার ফলে তিনি প্রবাহণের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেননি। তখন পিতা

১৭. বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি ন ভগব ইতি বেত্থ যথা পুনরাবর্তন্ত ইতি ন ভগব ইতি বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্তনা ইতি ন ভগব ইতি॥ বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্যত ইতি ন ভগব ইতি বেত্থ যথা পঞ্চম্যাহুতাবাদঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি॥ ছা. উ. (৫:৩:২.৩)

গৌতম পুত্রের সঙ্গে প্রবাহণের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে এলেন। প্রবাহণ প্রথমে তাঁদের ধন দান করতে চাইলেন। গৌতম প্রত্যাখ্যান করলেন, তিনি ওই প্রশ্নগুলির উত্তরই চাইলেন। তখন প্রবাহণ তাঁদের দীর্ঘকাল বাস করতে বললেন। তার পরে বললেন, 'এই বিদ্যা আপনার পূর্বে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবেশ করেনি— ইয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মাণান্ গচ্ছতি।' (৫:৩:৭) এখানে কয়েকটি ব্যাপার প্রণিধান করে দেখা উচিত: পিতাপুত্র যে সব উত্তর জানবার জন্যে প্রবাহণের কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, প্রবাহণ প্রথমে তাদের উত্তরের বিনিময়ে ধন দিতে চাইলেন। তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলে পর প্রথমে দীর্ঘকাল তাঁদের ওখানেই অপেক্ষা করতে বললেন। এতে ওই বিদ্যার মহত্ত্বই সূচিত হল। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার আগে একটা খবর দিলেন: এ বিদ্যা এর আগে কোনও ব্রাহ্মণের কাছে যায়নি, অর্থাৎ এটি ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব বিদ্যা।

এবার লক্ষ করে দেখা যাক, প্রশ্নগুলি কী। মনে রাখতে হবে, প্রশ্নগুলি ব্রাহ্মণের ছিল না, ক্ষত্রিয় প্রবাহণই শ্বেতকেতুর মাধ্যমে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্রাহ্মণদের; তাঁরা উত্তর দিতে না পারলে তিনিই উত্তর দিলেন। প্রাণীরা এ পৃথিবী থেকে কোথায় যায়— মরণোত্তর অবস্থানের প্রশ্ন; কেমন করে তারা ফেরে— জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রশ্ন; পিতৃযানে চন্দ্রের পথ ঘুরে আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, দেবযানে তারা সূর্যে পৌঁছে মোক্ষ লাভ করে; পুনর্জন্মই বেশি লোকের হয় বলে চন্দ্রের ভরে ওঠার প্রশ্ন ওঠে এবং পঞ্চম আহুতির পরে গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি ঘটে, সে পুরুষ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চম প্রশ্নটি যজ্ঞসংক্রান্ত এবং উত্তর কতকটা রহস্যগূঢ়। বাকি চারটি প্রশ্নই মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে এবং বৈদিক সমাজের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই সব সংশয়ে আক্রান্ত। নতুনের মধ্যে এই যুগে সমাজে জন্মান্তর স্বীকৃত একটি তত্ত্ব, তাই মানুষ কেমন করে পরলোক থেকে পৃথিবীতে ফেরে এবং পুনর্জন্মের পথ ও মোক্ষের পথ কোথায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়েছে এ সব নতুন প্রশ্ন, পুনর্জন্ম মানলে এগুলির সম্মুখীন হতে হয়। পুনর্জন্ম মানলেও এ কথা সকলে স্বীকার করত যে, মোক্ষ অর্জন করা দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, ফলে কম লোকই মোক্ষ লাভ করে। অধিকাংশই পুনর্জন্মের পথে চন্দ্রে পৌঁছোয়, তাই প্রশ্ন, চন্দ্র ভরে ওঠে না কেন।

সমাজে মরণোত্তর অবস্থিতি নিয়ে সংশয় সুদীর্ঘকাল ধরেই ছিল, জন্মান্তরবাদ আসবার পরে নতুন কিছু সম্ভাবনা দেখা দিল এবং সে সম্পর্কে নতুন কিছু সংশয় দেখা দিল যেগুলি এ যুগের বিশিষ্ট প্রশ্ন। সমাধানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বস্তুত সেগুলি সমাধানই নয়। কল্পিত পিতৃযান ও দেবযান এবং কল্পিত তাদের বিচ্ছেদ, ফলে চাঁদ ভরে ওঠার প্রশ্নও যেমন অবাস্তব, সমাধানও তেমনই অবাস্তব। কিন্তু যে-ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে তা হল এগুলি অধিকাংশই যুগোচিত প্রশ্ন।

সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণেও যে-সংশয় ছিল, তা হল পরলোক আছে কি না, এবং সেখানে যাওয়ার ভাল নিরাপদ রাস্তা আছে কি না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যম সম্বন্ধে পরপর ক'টি সূক্তে স্বর্গে পরলোকগত আত্মারা যমের তত্ত্বাবধানে সুখে থাকে এমন একটা ইচ্ছাপূরক

কল্পনায় নির্মিত স্বর্গলোকের খবর পাই; কিন্তু ওই যুগেই রচিত ব্রাহ্মণে সংশয়ের কথা আছে— পরলোক আছে কি না সে-বিষয়ে, সেখানে নিরাপদে যাওয়া যায় কি না সে-বিষয়েও। যারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়কে দ্বিধাহীন ভাবে উচ্চারণ করেছে এবং বলেছে, 'ইন্দ্র নেই', তারা সেই একই যুক্তিতে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে পরলোক সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। লক্ষ্য করার ব্যাপার হল, প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা ক্ষত্রিয় এবং 'এসব প্রশ্নের উত্তর কোনও ব্রাহ্মণ পূর্বে জানেনি' এই কথাটা।

যখন মনে রাখি যে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করত, বণিকবাহিনীর সহযাত্রী রক্ষক হিসেবে দূরদূরান্তে যেত, তখন বুঝি, অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা ক্ষত্রিয়ের যেমন ছিল অন্য কারও তেমন থাকার কথা নয়। অতএব, মৃত্যুর পরে মানুষের কী হয়, এ সম্বন্ধে সংশয় ক্ষত্রিয়কে যে ভাবে বিচলিত করবে, অন্যকে তেমন নয়। তাই ক্ষত্রিয় প্রবাহণ ব্রাহ্মণদের বলছেন, এ বিদ্যা পূর্বে কোনও ব্রাহ্মণের কাছে যায়নি। এ সব প্রশ্নও ব্রাহ্মণের শান্তিকে তেমন করে ব্যাহত করেনি, যেমন করে করেছে ক্ষত্রিয়কে। শাস্ত্র ও তত্ত্ব নির্মাণ করেছে প্রধানত ব্রাহ্মণ, তাই পিতৃযান ও দেবযান নিয়ে তত্ত্বগুলো ব্রাহ্মণরা জানত এবং ধীরে ধীরে এগুলি সমাজের অন্য স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু তত্ত্বগুলি জটিল, তাই শাস্ত্রকারদের গোষ্ঠীর মধ্যেই মূলত আবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলিরই তাৎপর্য বেশি কারণ এগুলির মধ্যে মানুষের কিছু মৌলিক দুশ্চিন্তার চিহ্ন ধরা আছে। এবং যথাযথ উত্তর না থাকায় বুঝতে পারি যে প্রশ্নগুলি রয়েই গেল।

এই সময়কার নতুন যে-বিষয়টি সমস্ত সমাজের ধর্মধারণায় আমূল নাড়াচাড়া দিয়েছিল তা হল আত্মা ও ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে পড়ি, প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন, বুড়িল এই পাঁচ জন ধনী বেদজ্ঞ একত্র হয়ে মীমাংসা করতে চাইলেন, 'আত্মা কে, ব্রহ্ম কী— কো না আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।।' (৫:১১:১) তাঁরা পরামর্শ করে অরুণের পুত্র উদ্দালকের কাছে যাওয়া স্থির করলেন, কারণ বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন। আরুণির মনে হল, তিনি এঁদের সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবেন না, তাই তিনি এঁদেরকে নিয়ে কেকয়রাজ অশ্বপতির কাছে গেলেন। অশ্বপতি এঁদের প্রচুর ধন দিতে চাইলে এঁরা গ্রহণে অসম্মত হলেন, শুধু বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে তাঁদের প্রশ্নের উত্তরই চাইলেন। তখন অশ্বপতি পরদিন উত্তর দিতে সত্যস্বীকার করলে এঁরা উপনয়ন-প্রার্থীর মতো তাঁর কাছে গেলেন; তিনি উপনয়ন না দিয়েই তাঁদের একে একে প্রশ্ন করলেন, তাঁরা আত্মা বলে কার উপাসনা করেন? একে একে উত্তর এল দ্যুলোক, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী। রাজা একে একে প্রত্যেকের উত্তর ক্রটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ বললেন এবং বললেন, তাঁর কাছে না এলে এঁদের কারও মাথা খসে যেত, কারও চোখ অন্ধ হত, প্রাণহানি ঘটত, দেহ খণ্ডিত হত, মূত্রাশয় বিদীর্ণ হত, পা-দুটি শীর্ণ হয়ে যেত। (৫:১২:১,২—১৩:১,২, ১৪:১,২; ১৫:১,২; ১৬:১,২; ১৭:১,২) সকলের প্রশ্নের উত্তরে অশ্বপতি বললেন, প্রত্যেকের দেখার দোষ হল খণ্ডিত ভাবে আত্মাকে দেখা, যিনি বৈশ্বানর আত্মাকে সর্বলোকে সর্বভূতে উপাসনা করেন তিনি এ সকলের মধ্যে অন্ন আহার করেন। (৫:১৮:১)

একবার সনৎকুমারের সঙ্গে নারদের কথা হচ্ছিল, সনৎকুমার বললেন, 'যে কেউ মনকে ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করে, সে, মনের গতি যতদূর পর্যন্ত ততদূর পর্যন্ত স্বেচ্ছাগতি লাভ করে। অর্থাৎ ইচ্ছেমতো যাতায়াত করতে পারে।' তখন নারদ বললেন, 'ভগবন্, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু থাকলে আমাকে ত বলুন।' সনৎকুমার বলে গেলেন সংকল্প মন থেকে শ্রেষ্ঠ; চিত্ত সংকল্প থেকে, ধ্যান চিত্ত থেকে, বিজ্ঞান ধ্যান থেকে শ্রেষ্ঠ; বল বিজ্ঞান থেকে, অন্ন বল থেকে, জল অন্ন থেকে শ্রেষ্ঠ; তেজ জল থেকে, আকাশ তেজ থেকে, স্মৃতি আকাশ থেকে শ্রেষ্ঠ; আশা স্মৃতি থেকে এবং প্রাণ আশা থেকে শ্রেষ্ঠ। (৭:৩—৭:১৫) আলোচনার শুরুতে বলা আছে বাক্— যার মধ্যে সমস্ত বেদ ও সমস্ত বিদ্যা আছে— তার থেকে মন শ্রেষ্ঠ। তার পরে মন কী কী থেকে শ্রেষ্ঠ এই পরম্পরায় প্রাণ পর্যন্ত পৌঁছোল। তখনকার সমাজে মানুষ প্রকৃতি, মানবদেহ মানবমন ও তার বিভিন্ন অবস্থাকে একটা পরিচ্ছন্ন সুপরিনিষ্ঠিত আকল্পের মধ্যে স্থাপন করে বুঝে নিতে চাইছিল। তাই এগুলিকে আপেক্ষিক গুণ ও মান অনুসারে সাজাতে চেষ্টা করছিল কারণ বিশ্বচরাচরে এদের স্থান, গুণ ও মান নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন ছিল।

এক সময়ে দেবতা ও অসুররা আত্মার সন্ধান করতে চাইলেন কারণ তা হলে কাম্যবস্তু লাভ করা যাবে।

> তখন দেবতাদের মধ্যে থেকে ইন্দ্র আর অসুরদের মধ্যে থেকে বিরোচন সন্ন্যাস নিলেন এবং একে অন্যকে না জানিয়ে সমিধ হাতে নিয়ে প্রজাপতির কাছে গেলেন। তাঁরা বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করার পর গেলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাঁরা বললেন যে-আত্মায় পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা নেই, যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প তাঁরই সন্ধান করা উচিত। আপনার মত হল, যিনি আত্মার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উপলব্ধি করেন তিনি সমস্ত লোক ও কাম্যবস্তু পান। আমরা সেই আত্মাকে জানবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেছি। ...প্রজাপতি বললেন, জলপূর্ণ পাত্রে যাঁর প্রতিবিম্ব পড়ে তিনিই আত্মা। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে একটি জলপূর্ণ পাত্রের দিকে তাকাতে বললেন ও প্রশ্ন করলেন তাঁরা কী দেখছেন। তাঁরা বললেন সুসজ্জিত পুরুষের প্রতিবিম্ব দেখছেন। প্রজাপতি বললেন ইনিই অমৃত ও অভয় আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম। দু'জনে শান্তচিত্তে ফিরে গেলেন। প্রজাপতি মন্তব্য করলেন, এরা আত্মাকে না জেনে চলে যাচ্ছে, এমন লোকেরা পরাভূত হয়। বিরোচন গিয়ে অসুরদের বললেন, ইহলোকে এই আত্মা (= দেহ)-কেই উপাসনা ও সেবা করা উচিত, তা হলেই ইহলোক ও পরলোক দুই-ই লাভ করা যায়।

প্রজাপতি বললেন, 'এ-ই হল আসুরী উপনিষৎ, এরই ভ্রমে লোকে মৃতদেহকে উত্তম বস্ত্র-অলংকারে সাজায়, মনে করে ওই সজ্জাতেই পরলোক জয় করা যাবে।... ইন্দ্র কিন্তু আবার ফিরে এলেন। প্রজাপতির প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এ তো দেহকেই আত্মা জ্ঞান করা,

দেহ তো ধ্বংস হয়, সেটা তো আত্মার ধর্ম নয়।' প্রজাপতি স্বীকার করলেন, বললেন, 'ঠিকই। তুমি আরও বত্রিশ বছর এখানে তপস্যা করো।' এর পরে প্রজাপতি বললেন, 'স্বপ্নে যাকে দেখা যায় সে-ই আত্মা।' ইন্দ্র তাতেও তুষ্ট হলেন না। প্রজাপতির নির্দেশে আরও বত্রিশ বছর তপস্যার পরে প্রজাপতি বললেন যিনি সুষুপ্ত তিনিই আত্মা, এতেও ইন্দ্র তুষ্ট না হতে প্রজাপতি আরও পাঁচ বছর পরে তাঁকে বললেন, শরীর মরণশীল, যিনি শরীর ধারণ করেন তিনি শোক দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন। শরীর আত্মা নয়, কিন্তু আত্মার আধার; যিনি অশরীর, সুখদুঃখ মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করে না। (দেহস্থ) যিনি মনে করেন 'আমি চিন্তা করি তিনিই আত্মা'। (৮:৭—৮:১২) এই অংশে দেহ ও আত্মার ভেদ খুব স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। মনে হয়, দেহাত্মবাদী চার্বাকপন্থী লোকায়তিক কিছু মতবাদ তখন সমাজে চলিত ছিল এবং আত্মা কী সে-বিষয়ে নানা ধরনের সংশয়ও লোকের মনে উদিত হত:

দর্পণে যাকে দেখা যায় সে-ই কি আত্মা?

জলে যার প্রতিবিম্ব পড়ে সে-ই আত্মা?

স্বপ্নে যে দেখা দেয়, সে-ই আত্মা?

স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা যার, সে-ই কি আত্মা?

দেহব্যতিরিক্ত আত্মার কল্পনা এ যুগেই প্রথম, তাই তার যথার্থ সত্তা নিয়ে স্বভাবতই জনমনে নানা সংশয়। এ আত্মার সঙ্গে পরলোক ও জন্মান্তর জড়িত, কাজেই এর মৃত্যুতে এর শেষ হলে চলে না। বিষয়টি বিতর্কিত বলে জিজ্ঞাসু ইন্দ্র, যিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁর প্রশ্ন করছেন, এর জিজ্ঞাসা অল্পে বা মাঝপথে তৃপ্তি হয় না যেমন অসুরশ্রেষ্ঠ বিরোচনের হয়েছিল। এতে তত্ত্বটির উৎকর্ষও প্রতিপন্ন হল, আরও বেশি করে হল প্রজাপতি বারবার ইন্দ্রকে নিয়ে বহু বছর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়ে নিয়েছিলেন বলে। এতে বোঝানো হল যে এ তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বুদ্ধির কাছে অগম্য এবং সহজে এ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

•

অজানা উত্তর

এ যুগে একটা ঘটনা বারবার চোখে পড়ে। কিছু জিজ্ঞাসু লোক বিজ্ঞতর প্রবীণ তাত্ত্বিক বা আচার্যের কাছে যাচ্ছেন, আত্মা বা ব্রহ্ম অথবা এ দুই বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে। কর্মকাণ্ডে কিছু প্রশ্নের আলোচনা ছিল যজ্ঞের প্রণালী নিয়ে, কখনও-বা অভীষ্ট ফল নিয়ে। জিজ্ঞাসা ছিল দেবতাদের সম্বন্ধে, কিন্তু তখন আত্মা বা ব্রহ্ম ধর্মজগতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সত্তা বলে স্বীকৃত ছিল না। মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা ছিল অস্পষ্ট, জন্মান্তরবাদ তখনও দেখা দেয়নি। এই সব নতুন তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের যুগে তাই জিজ্ঞাসাগুলি অন্য চেহারায় উপস্থিত হয়ে সমাধান দাবি করল। এ সমাধানের দায় জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদদের। কাজেই মানুষ তাঁদের কাছে আসতে লাগল। মঠ বা আশ্রমের গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ বা সাধারণ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও ভাষ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আস্য বা লিখিত কোনও বাস্তব দর্শনের বিকাশের অনুকূল এমন কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সহকারিত্ব তখন সহজলভ্য ছিল না।[১]

গ্রন্থাগার বা পাঠাগার ছিল না, কিন্তু ধীরে ধীরে বিকল্প এক প্রণালীতে দার্শনিক তত্ত্বগুলি অস্পষ্ট ভাবে এবং মাঝে মাঝে পরস্পরবিরোধী উপাদান নিয়েও সংহত হচ্ছিল। এই প্রণালীতে একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার নাম 'ব্রহ্মোদ্য'— ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক সভা, কখনও পরিকল্পিত ভাবে আয়োজিত, কখনও-বা তাৎক্ষণিক প্রেরণায় অনুষ্ঠিত। ব্রহ্ম ও আত্মা যেহেতু এ যুগের নতুন তত্ত্ব, এবং এ দুটির সমানার্থতা যেহেতু তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য এবং পূর্ববর্তী ধর্মসাহিত্য— সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক— যেহেতু এগুলি নিয়ে আলোচনা করেনি তাই এ চর্চার ঐকান্তিকতা আরও বেশি চোখে পড়ে। চিন্তাশীল সকল মানুষই হয়তো তখন কমবেশি ব্রহ্মবিষয়ে অবহিত, কেউ কেউ বিচলিতও। তাদের কারও কারও কাছে এ দুটি তত্ত্বের স্বরূপ ও এদের সম্পর্কের নিষ্পত্তি জীবনের পক্ষে আত্যন্তিক জিজ্ঞাসার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। খুব বেশি আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মোদ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না,

১. 'Ceci n'a rien de bien suprenant si l' on songe que les grande monasteries aver leur salle d'étude et de réunion etc offraient des conditions plus favorables all development rapide d'une pratique philosophiúque fondée sur la discussion publique d'une part, le commentaire oral ou écrit d'auter part.'— Michel Hulins p 40

তবে অনেকগুলি উপাখ্যানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষের বিজ্ঞতর ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে আলোচনা করতে যাওয়ার কথা শুনি। আবার ছান্দোগ্যোপনিষদে অন্য ধরনের একটি কাহিনিতে দেখি ক্ষত্রিয় রাজা জনকের কৌতূহল হল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর কে তা নির্ণয় করার। এক হাজার গাভির দুটি দুটি শিংয়ে দশ দশ পাদ সোনা বেঁধে রেখে তিনি ঘোষণা করলেন ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই স্বর্ণশৃঙ্গ গাভিগুলি পাবেন। সমবেত ব্রাহ্মণদের বললেনও, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিই এগুলি পাবেন। এটি প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি ব্রহ্মোদ্যের প্রস্তুতি: ব্রাহ্মণরা পরস্পরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবেন, শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পন্ন হলে দান দেওয়া হবে। ঘটনাটা ঘটল একটু অন্য ভাবে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যদের বললেন, গাভিগুলিকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে। এতে সমবেত ব্রাহ্মণরা আপত্তি করলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ যে 'ব্রহ্মিষ্ঠ' তাঁকে আমরা প্রণাম করি। আমরা তো সব গোকাম (গাভির কামনাতেই সমবেত)।[২] তখন সমবেত ব্রাহ্মণরা একে একে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং যথাসম্ভব উত্তরও পেলেন। ফলে যাজ্ঞবল্ক্যই যে ব্রহ্মিষ্ঠ তা এই প্রলম্বিত ব্রহ্মোদ্যে প্রমাণিত হল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যজ্ঞে যেমন দক্ষিণা ছিল, ব্রহ্মোদ্যেও প্রায়ই দক্ষিণা মিলত। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞক্রিয়ার পারিশ্রমিক হল দক্ষিণা আর ব্রহ্মোদ্যে জ্ঞানের পুরস্কার দক্ষিণা।

প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরাই একে একে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরও দিলেন, কিন্তু উত্তরগুলিকে সব সময়ে প্রশ্নের নিরসনের পক্ষে যথার্থ বা যথেষ্ট মনে হয় না।

প্রথমে অশ্বল প্রশ্ন করলেন, 'সব কিছুই যেহেতু মৃত্যু দ্বারা আবৃত, তখন যজমান কোন্ উপায়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করবেন?— যদিদং সর্বং মৃত্যুনাভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যেত।' (ছা. উ. ৩:১:৩)

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'যজমানের বাক্ই হোতা। এই বাক্ অগ্নিদেবতা এবং অগ্নিই হোতা, এই অগ্নিই মুক্তি ও অতিমুক্তির উপায়— হোত্রর্ত্বিজাঽগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্ যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ।।' (৩:১:৩)

অগ্নির দ্বারা কী ভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় তার কোনও ইঙ্গিত দেওয়া নেই। যজমান, হোতা, বাক্, অগ্নি সবই যজ্ঞে বহু পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু মৃত্যুও ছিল, তাকে অতিক্রম করার পথ জানা ছিল না বলেই অশ্বলের প্রশ্ন। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর মৃত্যুর মতো প্রকাণ্ড সমস্যার সমাধানের যথার্থ সমাধান নয়।

অশ্বল তাই প্রশ্ন করেন, 'এই অন্তরিক্ষ যখন নিরবলম্বন মনে হচ্ছে, তখন যজমান কী আশ্রয় করে স্বর্গলোক লাভ করবেন?— যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাক্রমণেন যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত।।' (ছা. উ. ৩:১:৬)

২. নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ম্ স্ম। (ছা. উ. ৩:১:২)

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'ঋত্বিক-রূপ ব্রহ্মা ও মনরূপ চন্দ্রদেবের দ্বারা। ওই চন্দ্রই মুক্তি, ওই মুক্তিই অতিমুক্তি।' এর পরের ক'টি ঋকে স্তুতি করবেন হোতা, অধ্বর্যু ক'রকম আহুতি দেবেন, ব্রহ্মা ক'জন দেবতার দ্বারা যজ্ঞকে রক্ষা করবেন, উদ্‌গাতা কত রকম স্তোত্র গান করবেন, অশ্বল এই সব প্রশ্ন করেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন। সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির দ্বারা যথাক্রমে পৃথিবীর সব প্রাণী, দেবলোক, অনন্তলোক, পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক জয় করা যায় তা-ও বলবেন। দেখা যায়, মৃত্যু অতিক্রম করা যে-প্রশ্নটি তখনকার এবং চিরকালই— সব মানুষকে চিন্তাকুল করে রেখেছে তার কোনও পর্যাপ্ত উত্তর এতে নেই। স্তুতি, আহুতি এবং যজ্ঞরক্ষায় দেবতাদের নিয়োগ, এ সব তো পূর্ব হতেই চলিত ছিল, তাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলেই অশ্বলের প্রশ্ন। এর পরে জরৎকারব আর্তভাগ প্রশ্ন করেন, 'এই সমস্তই যখন মৃত্যুর অন্ন তখন কোন্ সেই দেবতা, মৃত্যু যাঁর অন্ন?' উত্তর, 'অগ্নিই মৃত্যু, অগ্নি জলের অন্ন, যিনি এমন জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।'[৩]

এর আগে আর্তভাগ যজ্ঞের আটটি 'গ্রহ' (আহুতি গ্রহণ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে যাজ্ঞবল্ক্য যথাক্রমে প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষু, শোত্র, মন, হস্ত ও ত্বককে ওই গ্রহের সমার্থক বললেন। চোখে পড়ে, যেহেতু যজ্ঞই তখনও প্রধান ও প্রচলিত ধর্মাচরণ তাই যজ্ঞীয় উপাদানগুলিকে মানুষের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়ে যজ্ঞের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। তার পর আর্তভাগ মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নটি করেন এবং উত্তরে একটি খুব লক্ষ্যণীয় কথা হল, পুনর্মৃত্যু; যে-সমাজে পুনর্জন্মের কল্পনাটি গৃহীত হয়েছে সেখানে মৃত্যুকে উত্তরণ করার প্রসঙ্গে পুনর্মৃত্যু জয় করাটাকে একটা পরমার্থ বলা হচ্ছে। মৃত্যুযন্ত্রণা মানুষ দেখেছে, বারেবারে সে-যন্ত্রণার সম্মুখীন হওয়া ভয়াবহ দুর্ভাগ্য, এবং পুনর্মৃত্যুর পরেই তো পুনর্জন্ম, কাজেই পরিত্রাণ নেই ধারাবাহিক জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্মৃত্যু উত্তরণ করার প্রলোভন খুবই বড় প্রলোভন।

এর পর ভুজ্যু লাহ্যায়নি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন, 'পারিক্ষিতরা কোথায় গিয়েছেন?— ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি।' (৩:৩:১) পারিক্ষিতরা রাজচক্রবর্তী ও অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ছিলেন। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'অশ্বমেধবাজীরা যেখানে যান তাঁরা সেখানে গেছেন।' 'সে কোথায়', প্রশ্ন করলে যাজ্ঞবল্ক্য অনেক ঘুরপথে গান্ধর্ব বায়ুলোকের উল্লেখ করেন। লক্ষ্য করি, যাজ্ঞবল্ক্য যে-উত্তর দিলেন সে তাঁর নিজস্ব মত মাত্র। তার কোনও প্রমাণ নেই, এবং তা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। এর পরে চাক্রায়ণ প্রশ্ন করেন:

—যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা তাঁর বিষয়ে আমাকে বিশেষ করে বলুন।

—সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।

৩. যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি॥ (ছা. উ. ৩:২:১০)

—যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মা সর্বান্তর?

—যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া, অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া, ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া, উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা।

—এ তো বিপরীত নির্দেশ।

—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে, শ্রবণের শ্রোতাকে, মনোবৃত্তির মননকারীকে, বুদ্ধির বোদ্ধাকে কেউ জানতে পারে না; সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা, ইনি ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংসশীল। (ছা. উ. ৩:৪:১-২)

এখানেও আত্মার স্বরূপ-সত্তা সম্পর্কে প্রশ্নের বাস্তব উত্তর হল, দেহের মধ্যে থেকে যিনি দেহমনের সকল ক্রিয়ার যথার্থ কর্তা তিনিই আত্মা। এখানেও ওই দেহব্যতিরিক্ত আত্মা নামের এক সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ চেষ্টা। এবং বেশ চোখে পড়ে যে এ তত্ত্বকে নানা ভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, কারণ সমাজমানসে এর পূর্বে আত্মার অর্থ ছিল দেহ, তাই এখন নতুন যে আত্মাকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে সে দেহব্যতিরিক্ত বলে সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে, তাই বিভিন্ন দৈহিক ও মানস ক্রিয়ার থেকে স্বতন্ত্র বলে উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, এ এক অন্য আত্মা। এর ভিন্নত্ব, পৃথকত্ব ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে একে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলা যাবে কেমন করে?

কহোল এবার প্রশ্ন করলেন, ওই একই প্রশ্ন:

—কোন্‌টি সর্বান্তর আত্মা?

—ক্ষুধা, পিপাসা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত যিনি, যিনি পুত্র, বিত্ত ও লোককামনা থেকে মুক্ত হয়ে ভিক্ষাচার্যা গ্রহণ করেছেন তিনিই আত্মবিদ্যা লাভ করেন, সেই বলে বলীয়ান হয়ে মননশীল হন। মনন ও মননহীনতার পার্থক্য সম্যক ভাবে জেনে তিনি ব্রাহ্মণ হবেন।

—সে ব্রাহ্মণের আচরণ কেমন হবে?

—তাঁর আচার যেমনই হোক তিনি ব্রাহ্মণই, এর বাইরে সব কিছু বিনাশশীল। (ছা. উ. ৩:৫:১)। এখানে দু-তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, প্রথমত সব রকম কামনাকে জয় করা ব্রহ্মবিদ্যার একটি প্রাক্‌শর্ত, তার পরে মননকে আশ্রয় করে ভিক্ষাটন করাও চাই। স্বভাবতই মনে পড়ে, এ যুগে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক এবং আরও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রস্থান যারা অবলম্বন করেছিল তারা সকলে আগে থেকেই এক ধরনের বিশ্বাসে এই ধরনের জীবনই যাপন করছিল। কাজেই এখানে 'ব্রাহ্মণ' কথাটির ওপরে একটা বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। ওই প্রস্থানের লোকেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলত না, এখন শুনছি তার আচরণ যেমনই হোক না কেন সে-ই খাঁটি ব্রাহ্মণ। উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য নিয়ে যে-ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা ছিল তার ওপরে নতুন এক সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যের: সর্বকামনাত্যাগী মননশীল, ভিক্ষাজীবী। অর্থাৎ, যে-সমাজব্যবস্থায় থেকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে উৎপাদনকর্ম থেকে বিরত হয়, মননের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে যে-পরান্নজীবী প্রব্রজ্যাশীল। এ প্রব্রজ্যা চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্য নয়, গার্হস্থ্যও নয়, এ হল ওই বেদবিরোধী প্রস্থানগুলির তুল্য একটি জীবনযাত্রার আকল্প,

যার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সংস্থার মধ্যেও নতুন ব্রহ্মবাদী, আত্মবাদীরও স্থান হয়। এই ভাবে নির্মিত হচ্ছে, বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রম। এবং একে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে বলা হচ্ছে সেই বিখ্যাত কথাটি 'অতোঽন্যদার্তম্'— এর বাইরে সব কিছুই দুঃখের, কারণ তা ধ্বংসশীল।

এর পরে গার্গী প্রশ্ন করলেন। এর মানে এই ব্রহ্মোদ্যে জনকের দেওয়া স্বর্ণশৃঙ্গ গাভিগুলির প্রার্থিনী হয়ে তর্কে জয় করবার আশায় এই একটি ব্রহ্মবাদিনী নারীই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন:

—এ সমস্তই যখন জলে ওতপ্রোত, তখন জলের আধার কী?

—বায়ু

—তার?

—অন্তরিক্ষলোকসমূহ।

—তাদের?

—গন্ধর্বলোক, সেটি আদিত্যলোকে, সেটি চন্দ্রলোকে, সেটি নক্ষত্রলোকে, সেটি দেবলোকে, সেটি ইন্দ্রলোকে, সেটি প্রজাপতিলোকে, সেটি ব্রহ্মলোকে।

—সেটি?

যাজ্ঞবল্ক্যের অসহিষ্ণু উত্তর 'যে দেবতা প্রশ্নের অতীত আপনি তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন।

আরও অনেকে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু একমাত্র গার্গীকেই যাজ্ঞবল্ক্য ধমকে বলেছিলেন, 'তোমার মাথা খসে পড়বে যদি আর বেশি প্রশ্ন কর'।[৪] সে কি গার্গী নারী বলে? যাজ্ঞবল্ক্যকে কোণঠাসা করেছিলেন বলে? না যে-দেবতা প্রশ্নের অতীত তাঁর বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বলে? কিন্তু গার্গীর শেষ প্রশ্নের উত্তর তো ব্রহ্মে গিয়ে ঠেকে এবং এটা তো ব্রহ্মিষ্ঠ নির্ণয়ের আয়োজন। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের এই তিরস্কারের অর্থ কি এই যে, গার্গীকে তিনি ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের অধিকারিণী মনে করেননি? অথচ তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীও নারী, তাঁকে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছিলেন। যে-কারণেই হোক, অন্য কোনও জিজ্ঞাসুকেই যাজ্ঞবল্ক্য এ ভাবে ভর্ৎসনা করেননি, অথচ গার্গী ক্রমান্বয়ে আধারের আধার জানতে চাইছিলেন, প্রশ্নগুলি অর্বাচীনের মতোও ছিল না, অসংগতও ছিল না। এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, সমাজের বহু তত্ত্বজিজ্ঞাসুর প্রশ্নই গার্গী করেছিলেন।

পরের প্রশ্নকর্তা উদ্দালক আরুণি। বললেন, 'মদ্রে পতঞ্চল কাপ্যের বাড়িতে ভূতগ্রস্ত[৫] তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন: কোন্ সূত্রে ইহজীবন, পরজীবন ও সর্বভূত সংগ্রথিত আছে?' তিনি জানেন না বললেন। 'যে অন্তর্যামী অভ্যন্তরে থেকে ইহজীবন, পরজীবন ও সর্বভূতকে নিয়মিত করেন?' 'না' আরুণি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যদের বললেন, 'যে এসব জানে সে

---

৪. গার্গি মাঽতিপ্রাক্ষীর্মা তে ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি, গার্গি, মাঽতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম॥ (ছা. উ. ৩.৮:১)

৫. গন্ধর্বগৃহীত এই উপনিষদের ৩:৩ অংশে ইনি পতঞ্চলের দুহিতা, কাহিনি সেখানেও একই।

ব্রহ্ম, ভূত, আত্মা এবং সবকিছুকেই জানে। যাজ্ঞবল্ক্য, সেই অন্তর্যামীকে না জেনে এই ব্রহ্মগবীগুলি যদি নিয়ে যান তো আপনার মাথা খসে পড়বে।' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তিনি সবই জানেন। আরুণি বললেন, 'জানি, জানি, সকলেই বলতে পারে, আপনি যেমন জানেন প্রকাশ করে বলুন।' যাজ্ঞবল্ক্য একে একে বললেন:

> যে দেবতা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক, চন্দ্রতারকা, আকাশ, তমঃ, তেজ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বিজ্ঞান, রেতঃ-তে থাকেন অথচ এরা যাঁকে জানে না তিনিই অন্তর্যামী। অমৃত ও আপনার আত্মা। তিনি অদৃষ্ট হয়েও দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, মননের অবিষয় হয়েও মন্তা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা, তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা ইত্যাদি নেই। অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই আপনার আত্মা; এর বাইরে সবকিছুই বিধ্বংসী।'

এতে উদ্দালক আরুণি নীরব হলেন।

এর পরে গার্গী আবার প্রশ্ন করলেন। তার আগে সমবেত ব্রাহ্মণদের বললেন, আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব, সে-দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি ইনি দিতে পারেন তা হলে ইনি আপনাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য হবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবেন। প্রথম প্রশ্ন হল: 'যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর নীচে, যা এ দুয়ের মধ্যবর্তী, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই যে সব কথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন তা কার মধ্যে ওতপ্রোত?'

উত্তর: 'আকাশ'।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: 'আকাশ কীসে ওতপ্রোত?'

উত্তর: 'ব্রাহ্মজ্ঞরা এঁকে অক্ষর' (= যার ক্ষরণ অর্থাৎ বিনাশ নেই) বলেন। তিনি স্থূল, অণু, হ্রস্ব, দীর্ঘ, লোহিত, স্নেহ, ছায়া, তমঃ, বায়ু, আকাশ, সঙ্গ, রস, গন্ধ নন, তাঁর চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, পরিমাণ, অবকাশ, বাহ্য কিছুই নেই। তিনি কাউকে ভক্ষণ করেন না, তাঁকে কেউ ভক্ষণ করে না। এই অক্ষরের শাসনে দ্যুলোক ভূলোক বিধৃত, তাঁরই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর সকলই বিধৃত; শ্বেত পর্বতগুলি থেকে নির্গত পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত নদীগুলি নিজের নিজের পথে যাচ্ছে। এঁর শাসনে পণ্ডিতেরা দাতাদের প্রশংসা করেন, দেবতারা যজমানের অধীনে থাকেন ও পিতৃগণ তাঁদের উদ্দেশে প্রদত্ত দাবীর্হোমের ওপরে ভরসা করেন। এই অক্ষরকে না জেনে কেউ যদি বহু হাজার যজ্ঞ করে তবুও সে বিনষ্ট হয়। যে এই অক্ষরকে না জেনে ইহলোক ছেড়ে যায় সে বড়ো দুর্ভাগা। যিনি এঁকে জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি ব্রাহ্মণ।'

গার্গী অন্যান্য ব্রাহ্মণদের যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করে চলে যেতে বললেন। (ছা. উ. ৩:৮:১-১২)

তার পর শাকল্যের প্রশ্ন:

—দেবতাদের সংখ্যা কত?

—তিনশো তিন হাজার তিন।

—দেবতারা ঠিক ক-জন?

—তেত্রিশ

—যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক ক-জন?

—ছয়।

—ভালো, দেবতারা আসলে ক-জন?

—'তিন' 'দুই' 'দেড়' 'এক'।

—সেই তিন হাজার তিনশো তিন জন কারা?

—যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'দেবতারা তেত্রিশ-অষ্টাবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র আর প্রজাপতি।' (ছা. উ. ৩:৯:১-২)

লক্ষণীয়, এটা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নয়। শাকল্যের আরও কিছু প্রশ্নের পর যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'শাকল্য, এই ব্রাহ্মণরা কি আপনাকে অঙ্গারদহনের যন্ত্রে পরিণত করেছেন?' (অর্থাৎ দহনের তাপ ভোগ করার জন্যই কি আপনি এঁদের মুখপাত্র?) এতে ক্রুদ্ধ শাকল্য বললেন, 'কেমন আপনার ব্রহ্মজ্ঞান যে কুরু পঞ্চাল দেশের এই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আপনি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আমি দেবতা ও দিক্‌গুলিকে জানি।' আরও কিছু আলোচনার পর যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে প্রশ্ন করে বললেন, 'আপনি যদি এ প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন তো আপনার মাথা খসে পড়বে।' শাকল্য উত্তরটা জানতেন না, সত্যিই তাঁর মাথা খসে পড়ল, ফলে অন্যরা আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলে কেউ আর উত্তরও দিলেন না। তখন তিনি নিজেই কিছু তত্ত্বকথা বলে আলোচনা শেষ করলেন। (ছা. উ. ৩:৯:১৯-২৭)

এখানে একটি সুদীর্ঘ ব্রহ্মোদ্যের বিবরণ পেলাম, যার শুরুতে এমন বেশ-কিছু প্রশ্ন আছে যা তৎকালীন সমাজের চিন্তাশীল মানুষের মনে উদিত হত। বহিঃপ্রকৃতি, মানুষের বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, বিশ্বজাগতিক সত্তা, কাল ও কল্পিত কিছু কিছু লোক বা পৃথিবী, যা এতাবৎকাল শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়ে মানুষের পরিচিত ছিল, সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ আধার ও আধেয়ত্ব নিয়ে মানুষের কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন এতে স্থান পেয়েছে। সহজেই লক্ষ করা যায় যে, সব উত্তরই উত্তর নয়, অনেক উত্তরকে বক্তা স্বেচ্ছায় আপাতদুর্বোধ্য করে রেখে পরে তার অন্য সমাধান দিচ্ছেন (যেমন দেবতাদের সংখ্যা)। অন্যত্র আধার-আধেয়ত্ব নিয়েও কল্পিত, অপ্রমাণ্য উত্তরও দেওয়া হচ্ছে, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে কল্পিত ভুবন নির্মাণ করে, যার প্রত্যক্ষ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনও প্রমাণ নেই। এ ছাড়াও যা চোখে পড়ে তা হল, প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তির উক্তি বিশ্বাস করে বা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে তা নিয়েও আলোচনা। অর্থাৎ যুক্তির জগতে অনায়াসে অতিপ্রাকৃতের অনুপ্রবেশ ঘটছে, এতে ওই বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞরা কেউ বিচলিতও হচ্ছেন না। অর্থাৎ সমস্ত আলোচনাটা যুক্তির স্তরেও ঘটছে না, ব্যঙ্গবিদ্রুপও আছে, অপমানবোধ এবং শাপও আছে। একজন মাত্র নারী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে যাজ্ঞবল্ক্য অপমান করলেও কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি। এবং সমবেত ব্রহ্মবিদরা শেষ পর্যন্ত যাতে প্রশ্ন

করা থেকে ক্ষান্ত হলেন তা কোনও জ্ঞানের উক্তি বা সদ্‌যুক্তি নয়, একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা: শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি বলে তাঁর মাথা খসে পড়ল। ওই প্রসঙ্গে লেখা আছে, 'চোরেরা অন্য বস্তু মনে করে তাঁর অস্থিগুলি অপহরণ করল।'[৬] এখানে অন্তর্নিহিত একটি অপমানও রয়েছে; মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি হল না, অস্থিচয়ন হল না, চোরেরা অস্থি চুরি করে নিয়ে গেল। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বাস অনুসারে শাকল্যের পারলৌকিক সদ্‌গতিও হল না। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মকে অক্ষর (= অবিনাশী)— দেহ-মন, মহাবিশ্ব, কাল ও সকল দেবতার ঊর্ধ্বে একটি সর্বোত্তম সত্তা— বলে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

ঘোষণা বা আয়োজন করে অনুষ্ঠিত না হলেও ব্রহ্মোদ্য হতে পারত। সেখানে ব্রহ্ম-বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্ক হত, কখনও-বা দুজনের মধ্যে। এবং, অন্যান্য ব্রহ্মবিদের মতও তার মধ্যে উপস্থাপিত হত। এই রকম একটি আলোচনার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। বিদেহরাজ জনক রাজসভায় বসে আছেন, সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য আসতে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে করে— পশুর জন্যে না সূক্ষ্ম (আত্মা)-বিষয়ে?'

—দুটোরই জন্যে।

—আপনার কোনও আচার্য আপনাকে যা বলেছেন, তা আমাকে বলুন।

—জিত্বা শৈলিনি আমাকে বলেছেন, 'বাক্‌ই ব্রহ্ম'।

—মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান মানুষের যেমন বলা উচিত শৈলিনি আপনাকে তেমনই বলেছেন, কিন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় কী তা কি বলেছেন?

—না।

—এ হল ব্রহ্মের একপাদ (= এক চতুর্থাংশ)।

—আপনি আমাকে বলুন।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বাক্‌, প্রজ্ঞা, চতুর্বেদ, ইতিহাসপুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্য, যাগ, হোম, অন্নজল দানের ফল ইহপরজন্ম ও সমস্ত প্রাণীকেই যে বাক্‌ দ্বারা জানা যায়, সে-কথা বললেন। তখন রাজা জনক হাতির মতো বড়ো ষাঁড়-বলদসমেত এক হাজার গাভি যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা বলতেন, 'শিষ্য কৃতার্থ না হলে দান গ্রহণ কোরো না।'

তখন যাজ্ঞবল্ক্য আবার জানতে চাইলেন কোনও আচার্য জনককে কী বলেছেন। জনক বললেন, উদঙ্ক শৌল্বায়ন তাঁকে বলেছেন, 'প্রাণই ব্রহ্ম'।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আগের মতোই বললেন, ভাল, 'আচার্যের যা বলা উচিত ইনি তা-ই বলেছেন, কিন্তু প্রাণব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কি?'

—না, আপনি বলুন।

—প্রাণই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা, এঁকে প্রিয় বলে উপাসনা করা উচিত।

৬. পরিমোষিণ্যোঽস্থীন্যপজহ্রুরন্যন্মন্যমানাঃ। (ছা. উ. ৩:৯:২৬)

—যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়তা কাকে বলে?

—সম্রাট, প্রাণরক্ষার জন্যে যজ্ঞে অনধিকারীও যজ্ঞ করে। যার দান গ্রহণ করা উচিত নয়, তার দানও লোকে প্রাণরক্ষার জন্যে গ্রহণ করে। লোকে এমন দিকেও যায় যেখানে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এমন জেনে যে এই ব্রহ্মকে উপাসনা করে প্রাণ তাঁকে ত্যাগ করে না, সকল প্রাণী তাঁর বশীভূত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবলোকে যান।

রাজা আবার ওই রকম পুরস্কার দিলেন।

পরের বার প্রশ্নের উত্তরে জনক বললেন, বর্কু বার্ষ্ণ তাঁকে বলেছেন, 'চক্ষুই ব্রহ্ম'।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'চক্ষু ইন্দ্রিয়টিই সত্য, কারণ যে স্বচক্ষে দেখেছে তার অভিজ্ঞতা মানুষ স্বীকার করে... তিনি দেবলোক লাভ করেন।'

জনকও পূর্বের মতো পুরস্কার দিলেন।

পরের আচার্যের নাম গর্দভীবিপীত ভরদ্বাজ, তিনি বলেছিলেন, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'শ্রবণেন্দ্রিয় শরীর, তার প্রতিষ্ঠা আকাশে, একে অনন্ত বলে উপাসনা করা উচিত।'

'অনন্ত কী'— এ প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'দিকসমূহই অনন্ত। যে এমন জানে সে দেবলোক পায়।'

আবার সেই পুরস্কার।

পরবর্তী আচার্য সত্যকাম জাবাল, তাঁর শিক্ষা: মনই ব্রহ্ম। একে আনন্দ বলে উপাসনা করা উচিত। যিনি করেন তিনি দেবলোক লাভ করেন। শেষ আচার্য বিদগ্ধ শাকল্য। তিনি বলেছিলেন, 'হৃদয়ই ব্রহ্ম। হৃদয়ই স্থিতি, এখানেই সমস্ত প্রাণী আশ্রিত।' প্রতিবারই আলাপের পরে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বের মতো পুরস্কার পেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, তাঁর পিতার শিক্ষা হল, শিষ্য চরিতার্থ না হলে তার দান গ্রহণ করা উচিত নয়; কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি ওই দান গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করি, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনায় পরোক্ষ থেকে অনুপ্রবেশ করছেন ছ-জন ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত, কাজেই এঁদের দুজনের সংলাপে বস্তুত আট জনের উপস্থিতি আছে, যদিও সিদ্ধান্ত ছ-টিই: বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং হৃদয়— এগুলি ব্রহ্মস্বরূপ। এর মধ্যে বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র হল ইন্দ্রিয় (বা ইন্দ্রিয়কর্ম, যেমন বাক্); প্রাণ, মন ও হৃদয় শরীরের অভ্যন্তরে অদৃশ্য ক্রিয়াশীল তত্ত্ব। এগুলিকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে প্রতিপন্ন করলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ-কিছু এগোয় না।

প্রাণের প্রসঙ্গে বাস্তববুদ্ধির একটা সুন্দর নির্দেশ দেখি প্রাণরক্ষার জন্য সমাজে মানুষের গর্হিত আচরণও করার মধ্যে, এতে প্রাণের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পড়বার সময়ে অবশ্য প্রত্যেকটি তত্ত্বই তখনকার মতো সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। শুরুতে শুনি, যাজ্ঞবল্ক্য জনকের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, তিনি ব্রহ্মের আলোচনা ও পশু দুটোই কামনা করে রাজার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কার্যত তিনি প্রচুর মহার্ঘ দক্ষিণা নিয়ে গেলেন ব্রহ্মসংক্রান্ত

আলোচনার বিনিময়ে। যে তত্ত্বগুলি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তা উপনিষদে অন্যত্রও বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে; ব্যাখ্যার ভঙ্গি পৃথক হলেও বিষয়বস্তু অপরিচিত নয়। এ ব্রহ্মোদ্য কতকটা পরোক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হল: অনুপস্থিত আচার্যদের মত পাওয়া গেল জনকের মুখে, তার সমালোচনা ও সম্পূরণ ঘটল যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা। এখানে পাওয়া যাচ্ছে সমাজের মানুষের নানা প্রশ্ন ও সংশয়: শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নয়— বহির্বিশ্ব, মানবদেহ ও মন, কাল ও মরণোত্তর অবস্থা, স্বর্গ ছাড়াও নানা 'লোক' সম্বন্ধে, এবং এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে। প্রশ্ন, সংশয় ও আলোচনা যজ্ঞকে পুরোপুরি বর্জন করেনি, বরং ব্রহ্মবিদরা সেগুলির প্রতীকী অর্থ করছেন অধ্যাত্মতত্ত্ব দিয়ে।

আর এক বার রাজা জনক স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে গিয়ে নমস্কার করে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আপনি বেদ ও উপনিষদ জানেন, কিন্তু এই দেহ থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় যাবেন তা জানেন কি?'

'না, আপনি বলুন।'

'দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষের "ইন্ধ", পরোক্ষে "ইন্দ্র" কারণ দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় প্রত্যক্ষবিরোধী।'[৭] 'বাম চক্ষে এঁর স্ত্রী বিরাজ থাকেন, দু-নেত্রের মধ্যবর্তী স্থলে এঁদের মিলনক্ষেত্র...।' এটা মনে করা কঠিন যে, মানুষের মনে এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল যে দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে কাঁরা অবস্থান করেন। এ আলোচনার শেষ হয় দিকসকল ও প্রাণ দিয়ে, এবং যাঁকে 'নেতি নেতি' বলা হয়েছে, তিনিই এই আত্মা। এঁকে কেউ গ্রহণ করতে পারে না, ইনি অক্ষয়, অসঙ্গ, অবদ্ধ; ইনি কখনও বিনষ্ট হন না। 'জনক, আপনি অভয় লাভ করুন'। জনকও যাজ্ঞবল্ক্যকে অভয় দান করলেন এবং সঙ্গে বিদেহ রাজ্য এবং নিজেকেও জনকের কাছে সমর্পণ করলেন। এখানে লক্ষ্য করি যে, বাম ও দক্ষিণ নেত্রের অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও তাঁর পত্নী দিয়ে আলোচনা শুরু। জনক এই প্রসঙ্গই তোলেননি। মানবদেহ ও বিশ্বজগতের কিছু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার পর আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 'নেতি নেতি' বলে, অর্থাৎ আত্মা কী কী নয় তা জেনে পারিশেষ্যাৎ অর্থাৎ নেতি নেতি সংজ্ঞার পরে যা বাকি থাকে তাকেই আত্মা বলে অভিহিত করা হল। তার লক্ষণ কিছু কিছু উল্লেখ করে বলা হল, এবং এতেই জনক অভয় লাভ করলেন; অভয়ের বিনিময়ে যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ রাজ্য লাভ করলেন, কিন্তু 'মরণের পর মানুষ কোথায় যায়' যে-প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল তার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না; অথচ এটি তখনকার এবং সর্বকালের মানুষের মনে একটি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা। এমন কথাও বলা হয়নি যে, মৃত্যুর পরে মানুষ ব্রহ্মে বিলীন হয় বা ব্রহ্ম লাভ করে। বলা হল, ব্রহ্মকে জানলে মানুষ অভয় লাভ করে; কোন ভয় থেকে অভয়? মৃত্যুভয়? তা-ও বলা হয়নি। এ সব অনুত্তরিত রয়েই গেল।

৭. ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ।। (বৃ. উ. ৪:২:২)

আরও এক বার যাজ্ঞবল্ক্য জনকের কাছে মনে মনে এই সংকল্প করে গেলেন যে কোনও কথাই জনককে বলবেন না। কিন্তু মনে পড়ল একবার অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে আলোচনার পরে যখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বর দিতে চান তখন তিনি তাঁকে যথেচ্ছ ভাবে প্রশ্ন করার (কামপ্রশ্নতা) বর দিয়েছিলেন।

এবার জনক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ জ্যোতিতে মানুষ আলোক পায়?'

—সূর্যের জ্যোতিতেই মানুষ বাইরে যায়, কাজ করে এবং ফিরে আসে।

—তাই বটে। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায়?

—চন্দ্র।

—চন্দ্র অস্ত গেলে?

—অগ্নি।

—অগ্নি নির্বাপিত হলে?

—বাক্।

—আর সূর্য চন্দ্র যখন অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত, বাক্ সংরুদ্ধ, তখন কোন জ্যোতি থাকে মানুষের?

—আত্মাই তার জ্যোতি হয়, আত্মার জ্যোতির দ্বারাই সে বসে, কাজ করে ফিরে আসে।[৮]

এখানে যে-প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি তখনকার মানুষের মনে স্বভাবতই উদিত হতে পারে, এবং সর্বশেষ যে-উত্তরটি, সেটির আধ্যাত্মিক যথার্থতা যতটুকু আছে, নৈতিক বা চারিত্রিক তাৎপর্যও ততটাই। বাইরের সব রকম আলো এবং নিজের বাক্শক্তি যখন মানুষকে ছেড়ে যায়, তখন মানুষ আপন অন্তরের শক্তিতেই শক্তিমান। যে যুগে মানুষ স্তিমিত প্রদীপের আলোতে কাজ করত সে যুগে প্রকৃতির আলোর অন্তর্ধান তো নানা প্রশ্নের উদ্রেক করতেই পারে। এখানে পরম্পরাক্রমে উত্তরগুলি দেওয়া হয়েছে এবং মানুষ আত্মদীপ হওয়ার প্রেরণা পাচ্ছে শেষ উত্তরটিতে।

মৃত্যুর পরে মানুষের কী গতি হয়— এ নিয়ে মানুষ তো একান্ত ভাবে বিচলিত ছিল, তাই ওই বিষয়ে আরও একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে বৃহদারণ্যকে। রাজা প্রবাহণ জৈবলির সভায় উপস্থিত আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু। জৈবলি ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মচর্যের অন্তে শ্বেতকেতু এসেছেন ও বলছেন, তিনি পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। তখন জৈবলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মৃত্যুর পরে মানুষ বিভিন্ন পথে যায়, তা জান?'

—না।

—কেমন করে তারা আবার ফিরে আসে, জান?

—না।

৮. অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি। (বৃ. উ. ৪:৩:৬)

—পরলোকে এত আত্মার সমাগম তবু তা কেন পূর্ণ হয় না?

—না।

—পিতৃযান ও দেবযানের পার্থক্য এবং কোন কর্মে সেগুলি পাওয়া যায় জান?

—না।

রাজা তাকে সেখানে বাস করতে আমন্ত্রণ জানালেও ক্রুদ্ধ কুমার বাড়ি গেল ও পিতাকে অনুযোগ জানাল অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, কারণ সে জৈবলির পাঁচটি প্রশ্নের কোনওটিরই উত্তর দিতে পারেনি। এ কাহিনিটি ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৫:৩-১০) বিবৃত আছে, মোটের ওপরে একই ভাষায়। সমাধানও প্রায় একই ভাষায়: শ্বেতকেতুর পিতা গৌতমকে জৈবলি বলেন, 'পূর্বে এ বিদ্যা কখনও ব্রাহ্মণে বাস করেনি, তবু আমি আপনাকে বলব, কারণ আপনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব এমন অঙ্গীকার করেছি।' এবারে তিনি পিতৃযান ও দেবযান ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে বিস্তৃততর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন। এর কোনও অংশই প্রমাণসহ নয়, এতে বহু সমীকরণ আছে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান ও উপাদানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের তত্ত্বের, যা সবটাই হয় আপ্তবাক্য বলে গ্রহণ করতে হবে অথবা অপ্রমাণিত, অপ্রামাণ্য বলে বর্জন করতে হবে।

এমন বহু আখ্যানে দেখতে পাচ্ছি, প্রশ্নগুলি স্বভাবতই মানুষের মনে উঠতে পারে এবং সে দিক থেকে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে— এবং অনেকগুলি এখনকার পরিপ্রেক্ষিতেও— প্রাসঙ্গিক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরগুলি প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে অন্য অন্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। এ যুগে জ্ঞানকাণ্ডের পক্ষে আনুষঙ্গিক তত্ত্ব হিসাবে সে-উত্তরগুলির হয়তো প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্য আছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একেবারেই অচল। এর একটা কারণ হল, প্রশ্নগুলির উত্তর ব্রহ্মবিদদের জানা ছিল না। জানা থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ তেমন বহু প্রশ্নের উত্তর মানুষ এখনও খুঁজে পায়নি। তা হলে তখন যে সব প্রশ্ন আছে, সে সব প্রশ্নের যা যথার্থ উত্তর নয় তেমন উত্তর এগুলির সঙ্গে উত্তররূপে জুড়ে দেওয়া হল কেন? সম্ভবত, জিজ্ঞাসু যখন প্রশ্ন করেছে তখন কোনও না কোনও উত্তর তার প্রাপ্য, এমন কথাই মনে করতেন ব্রহ্মবিদরা। এবং, যথার্থ উত্তর যখন জানা নেই, তখন সে চেষ্টা না করে এই নতুন চিন্তাধারার আবহে যে সব তত্ত্ব নতুন করে তাৎপর্য পাচ্ছে, যেমন আত্মা, ব্রহ্ম, পরলোক, পুনর্জন্ম, পিতৃযান, দেবযান, যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ হিসেবে ধরে নিচ্ছেন প্রশ্নগুলিকে। কেননা, কোনও জিজ্ঞাসু সরাসরি ওই সব বিষয়ে প্রশ্ন করছেন না, অথচ ওই বিষয়গুলি নতুন জ্ঞানকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, বিশেষত যজ্ঞের উপাদান ও প্রণালীর রূপক ব্যাখ্যা। বহু নিষ্ফল যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে বহু মানুষ যখন যজ্ঞের উপযোগিতা নিয়ে ভেতরে ভেতরে ভীষণ সন্দিহান, যজ্ঞবিমুখ বহু সম্প্রদায় যখন সমাজে রয়েছে ও সংখ্যায় এবং সম্মানে বাড়ছে তখন যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া তাকে সমর্থন করা তো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

নচিকেতার প্রশ্ন

যজ্ঞের নিষ্ফলতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন যে স্পষ্ট হচ্ছিল তার বড় একটি প্রমাণ আছে মুণ্ডক উপনিষদে। এখানে বলা হয়েছে, যজ্ঞ হল অদৃঢ় নৌকো, অর্থাৎ গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে না ওই 'অদৃঢ় (তলাফুটো?) যজ্ঞরূপ নৌকোগুলো— প্লবা হোতা অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।' (১:২:৭) সোজা কথায়, যজ্ঞে আর অভীষ্ট ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা দেখেছি, এর ফলে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বেশ-কিছু প্রস্থানের উদ্ভব হল, অন্য দিকে তেমনই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় কিছু পরিবর্তন এল। এর পটভূমিকা ক্রমবর্ধমান সংশয়, সমাজের এক বড় অংশে যজ্ঞ সম্বন্ধে দোলাচলতা। এই পটভূমিকায় যজ্ঞ সম্বন্ধে পূর্বের মতো বিশ্বাসও যেমন আর নেই, পূর্বের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করাও তেমনই কমে আসছে।

এমনই এক অবস্থার রচনা কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত কঠোপনিষদ; যজুর্বেদ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় অধ্বর্যুকে, যিনি হাতেকলমে যজ্ঞ করেন। অর্থাৎ এর সঙ্গে মন্ত্র আবৃত্তি বা গানের তত যোগ নেই যতটা আছে যজ্ঞকর্ম বা যজ্ঞ সম্পাদনের। কঠোপনিষদ একটি বৃহৎ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ— বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের পরে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর শুরু হচ্ছে বাজশ্রবার পুত্র-যজ্ঞফল কামনা করে সমস্ত সম্পত্তি দক্ষিণায় দান করার মধ্য দিয়ে (সম্ভবত এটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, যার দক্ষিণা হল যজমানের সমস্ত ধন)। তাঁর নচিকেতা নামের এক ছেলে ছিল।[1] যখন দক্ষিণাগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কুমার নচিকেতার মনে 'শ্রদ্ধা' উদিত হল। তাঁর মনে হল, 'যেসব গাভি জীবনে শেষবার জলপান করেছে, তৃণভক্ষণ করেছে, দুধ দিয়েছে, যাদের আর বাছুর জন্মাবে না, এমন সব গাভিদের যে-যজমান দান করেন তিনি তো তেমন লোকে যান যেটি দুঃখময়।'[2]

এখানে কয়েকটি কথা লক্ষ্য করবার মতো। যজমান যে-যজ্ঞে গাভিগুলি দান করছেন সে-যজ্ঞের শাস্ত্রীয় দক্ষিণা হল, যজমানের তাবৎ সম্পত্তি। কুমার নচিকেতা দেখলেন, এই গাভিগুলি বৃদ্ধা এবং আসন্নমরণা, এরা আর কোনও দিন ঘাস খাবে না, জল খাবে না। এদের

১. উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥ (মুণ্ডক. ১:১)
২. তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা বিবেশ, সোঽমন্যত॥ পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥ (কঠ. ১:১:২-৩)

কাছ থেকে আর কোনও দিন দুধ বা গোবৎস পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এগুলি, আজকের ভাষায়, ভাগাড়ে যাওয়ার মতো গাভি। বাজশ্রবার যজমানের সংসারে এগুলি খরচের খাতায়, যা দেওয়ার এরা শেষ পর্যন্ত দিয়েছে, এখন গোহত্যা না করে সম্পূর্ণ নিরর্থক এই জীবগুলিকে আমরণ খোরাক জোগাতে হবে। অতএব তৃতীয় যে-রাস্তাটি যজ্ঞ করে দিয়েছে তা হল, এদের দক্ষিণা হিসেবে কোনও ঋত্বিক পুরোহিতকে দান করা। এতে গ্রহীতা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্বন্ধে বাজশ্রবসের প্রগাঢ় অবজ্ঞা সূচিত হচ্ছে। এমন দক্ষিণা যার বাবা সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সেই কুমার নচিকেতার এ সব দেখে একটা বিশ্বাস জন্মাল। মনে রাখতে হবে, শ্রদ্ধার মূল অর্থ বিশ্বাস (ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতু c + ∂δ থেকে সংস্কৃতে শ্রদ্ধা এসেছে। কেন্তুম গোষ্ঠীর ভাষায় আমরা ল্যাটিনে ও ইংরেজিতে পাই credo, credit, credible অর্থাৎ এর মূল অর্থ বিশ্বাস)। নচিকেতার মনে একটা বিশ্বাসের উদয় হল। কী সেই বিশ্বাস? এমন হাড়-জিরজিরে মুমূর্ষু গাভিগুলি দক্ষিণায় দিলে তো শাস্ত্র-অনুসারে বাজশ্রবসের অক্ষয় নরকপ্রাপ্তি হবে, এ কী করছেন তিনি? তাই পিতাকে প্রশ্ন করলেন, 'বাবা আমাকে কাকে দান করবেন?' (এক বার) দু'বার, তিন বার। তখন তাকে (বাজশ্রবস) বললেন, 'মৃত্যুকে দেব তোকে।'[৩]

এখানে লক্ষ্যণীয় নচিকেতার বর্ণনা 'কুমারং সন্তং' মানে কুমার থাকতেই, অর্থাৎ নচিকেতা অপ্রাপ্তযৌবন কিশোর। তার সম্ভবত মনে হয়েছে এতগুলি বৃদ্ধা গাভি দান করলে পিতার অক্ষয় নরকবাস হবে। একটি তরুণ কিশোরকে সঙ্গে দিলে হয়তো সে-শাস্তি খানিকটা কমতে পারে। স্বভাবতই এ প্রশ্নে পিতা বিব্রত, বিরক্ত, কারণ ছেলের কাছে যজ্ঞের দক্ষিণার ফাঁকিটা ধরা পড় গেছে; আরও বিরক্তির কারণ হল, যে-যজ্ঞের দক্ষিণা হল যথাসর্বস্ব, তারই দক্ষিণায় সাজানো ওই মুমূর্ষু গাভিগুলি। রাগের কারণ হল, কিশোর বালক যদি এটা ধরে ফেলে থাকে, তা হলে তো সকলেই ধরতে পারবে। ছেলে প্রশ্ন করছে, 'আমাকে কাকে দান করবে'— বলা বাহুল্য, বাজশ্রবসের কোনও অভিপ্রায়ই ছিল না নচিকেতাকে কাউকে দান করার। কিন্তু নাছোড়বান্দা ছেলে এক বার, দু'বার, তিন বার প্রশ্ন করতে বাপের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেন, 'তোকে দান করব মৃত্যুকে।' আজকের ভাষায়: 'তুই যমের বাড়ি যা।' এবং ছেলে সেই মানেই বুঝল, তবে যাওয়ার আগে সে বাপকে প্রশ্ন করল, 'আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, আবার অনেকের মধ্যে মধ্যম (অর্থাৎ একেবারে অধম আমি নই)। যমের এমন কী কাজ আছে যা আমাকে দিয়ে সিদ্ধ হবে?'[৪] পরে যা বললেন তার অর্থ, 'পূর্বপুরুষ এবং বর্তমানের মানুষদের দেখে (জানা যায়) যে-মানুষ শস্যের মতো, পক্ব হয়ে বিনষ্ট হয় আবার শস্যেরই মতো পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে।'[৫] এ কথার অন্তরালে নচিকেতা পিতাকে বলতে

৩. স হোবাচ পিতরং তত, কস্মৈ মাং দাস্যতীতি। দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥ (কঠ. ১:১:৪)

৪. বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥ (কঠ. ১:১:৫)

৫. অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ (কঠ. ১:১:৬)

চায়, মৃত্যুতে যেহেতু শেষ পরিসমাপ্তি নয়, পুনর্জন্ম আছে, তাই যম আমাকে গ্রহণ করলেও, অর্থাৎ আমি মরলেও আবার জন্মাব। সুতরাং আপনি যখন বলে ফেলেছেন আমাকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করবেন, তখন সে-কথাটা রাখুন, আমাকে মৃত্যুর কাছে যেতে দিন।

নচিকেতা যমের বাড়ি গেল। যম বাড়ি ছিল না, তাই নচিকেতা তিন দিন যমের বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করল না। যম ফিরলে বাড়ির লোকেরা বলল, 'ব্রাহ্মণ অতিথি স্বয়ং অগ্নির মতো গৃহে প্রবেশ করেন, লোকে তাঁর শান্তিবিধান করে, (অতএব) হে বৈবস্বত যম, (গৃহস্বামী হিসাবে) তাঁকে পাদোদক দাও।'[৬] 'ব্রাহ্মণ যার বাড়িতে অনাহারী হয়ে থাকে, আকাঙ্ক্ষিত ও প্রাপ্ত বস্তু, সৎসঙ্গের সুফল, ইষ্টাপূর্ত, পুত্রপশু সেই অল্পবুদ্ধি মানুষের সবই ধ্বংস হয়ে যায়।'[৭] তখন যম নচিকেতাকে (পাদোদক অর্ঘ্য আসন দিয়ে) বললেন, 'যেহেতু তুমি তিনরাত্রি আমার বাড়িতে অনাহারী হয়ে থেকেছ, আমার নমস্য অতিথি হয়েও, তাই তোমাকে আমি নমস্কার করছি, হে ব্রাহ্মণ, আমার কুশল হোক, তুমি তিনটি বর চাও।'[৮] প্রথম বরে নচিকেতা চাইল, তার পিতা যেন ক্রুদ্ধ না থাকেন তার প্রতি, সদয় ও প্রসন্ন হন, যমের কাছ থেকে ফিরে গেলে যেন ভাল ভাবে সম্ভাষণ করেন। যম বর দিলেন, উদ্দালকের পুত্র বাজশ্রবা তোমাকে দেখে আগেকার মতোই স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবেন, ক্রোধ ভুলে যাবেন, দীর্ঘকাল সুখে থাকবেন। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা চাইলেন, 'স্বর্গে কোনও ভয় নেই, আপনি (অর্থাৎ মৃত্যু) সেখানে নেই, জরার আশঙ্কাও নেই। মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুটিকেই অতিক্রম করে শোক পার হয়ে সেখানে বাস করে। যম, স্বর্গকামী মানুষ যে-অগ্নিবিদ্যার সাহায্যে অমরতা পায় তা আপনিই জানেন, শ্রদ্ধান্বিত হয়ে আমি এসেছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে বলুন, এটিই আমার দ্বিতীয় বর।'[৯] যম দ্বিতীয় এ বর দিতে রাজি হলেন, বললেন, 'তোমাকে ভালো করে বলছি, শোনো, নচিকেতা, অগ্নিকে জেনে স্বর্গলাভ করা যায়। স্বর্গলাভ প্রাপ্তির ও (সেখানে) প্রতিষ্ঠার উপায় এই অগ্নির তত্ত্ব গুহাতে নিহিত বলে জেনো।'[১০]

দ্বিতীয় বরে নচিকেতা জানতে চাইল কোন সেই আপাতগূঢ় অগ্নিবিদ্যা (= যজ্ঞাগ্নির স্বরূপ), যা জানলে তার সাহায্যে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে এবং সেখানে থাকতে পারে, অর্থাৎ

৬. বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথি র্ব্রাহ্মণো গৃহান্। তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ (কঠ. ১.১.৭)

৭. আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্। এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ (কঠ. ১:১:৮)

৮. তিস্রো রাত্রীর্যদবাসীর্গৃহে মেনশ্নন্ ব্রহ্মান্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেহস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তিমেহস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥ (কঠ. ১:১:৯)

৯. স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রুহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ (কঠ. ১:১:১২-১৩)

১০. প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্ অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥ (কঠ. ১:১:১৪)

কোন অগ্নিবিদ্যার জ্ঞানে অক্ষয় স্বর্গবাস অর্জন করা যায়। স্বর্গে হয়তো জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করে যাওয়া যায়, কিন্তু তখনকার সমাজে সকলে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, কাজেই অল্পকাল স্বর্গে বাস করে আবার তো মর্তে ফিরে আসতে হতে পারে। নচিকেতার প্রশ্ন স্বর্গ দিয়ে জন্মান্তার এড়ানো, কী সেই অগ্নিবিদ্যা যা আয়ত্ত করলে স্বর্গ থেকে আবার মর্তে এসে জন্মাতে হয় না।

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্ন শুধু নচিকেতার নয়, সে-যুগের বহু মানুষের তীব্র বাসনার উচ্চারণ এটি। মর্তলোকে জীবনে নানা দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ-অত্যাচার-নির্যাতন। জন্মান্তরের ফলে মর্তে এলে এই তো ভাগ্য। পুনর্জন্ম মানে এই সবই, অন্তিমে পুনর্মৃত্যু এবং আবার এ সবের পুনরাবর্তন। একমাত্র প্রতিকার হল অক্ষয় স্বর্গবাস; তাতে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, অতএব, এর মধ্যে দিয়েই বারংবার দুঃখময় জীবনের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি এবং অন্তহীন সুখের সম্ভাবনা। যমের অপরাধবোধ ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়িতে ত্রিরাত্রি উপবাস করেছে, কাজেই নচিকেতার প্রার্থিত বর দিতে রাজি হলেন। সেই সৃষ্টির আদিম অগ্নির কথা তাঁকে বললেন, বেদিনির্মাণ করতে যতগুলি যে রকম ইষ্টক লাগে তা সবই বললেন। কী ভাবে (সে-যজ্ঞে) অগ্নিচয়ন করতে হয়, প্রীত হয়ে দু'বার করে নচিকেতাকে সব বললেন। নচিকেতা তা গ্রহণ করলে যম আরও বললেন, তোমার প্রতি প্রীত হয়ে তোমাকে এবার চতুর্থ একটি বর দিচ্ছি: 'এই অগ্নিটি তোমারই নামে (অর্থাৎ "নচিকেত অগ্নি" বলে) খ্যাত হবে। তুমি এই ঝংকারিণী বহুরত্নখচিত মালাটিও নাও।'[১১] এখানে লক্ষ্য করি, নচিকেতা বহু মানুষের মুখপাত্র হিসাবে জরামৃত্যু দুঃখযন্ত্রণা থেকে চিরকালীন মুক্তির পথটি জানতে চাইছে দ্বিতীয় বরে— জন্মান্তরে বিশ্বাসের যুগে এটি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে স্থায়ী আনন্দের জন্য প্রার্থনা। এটি কিন্তু নচিকেতার প্রাপ্য দ্বিতীয় বর, এখানে নচিকেতা খুব যুক্তিযুক্ত একটি প্রার্থনা করে এবং যম তা দিতে স্বীকার করেন: এর জন্যে যমের বিশেষ ভাবে প্রীত হওয়ার কিছু ছিল না। তবু যম খুশি হয়ে আরও দুটি পুরস্কার বা উপহার দিলেন: ওই স্বর্গের অগ্নিবিদ্যা 'নাচিকেত অগ্নি' নামে অভিহিত হবে এবং তারই সঙ্গে একটি বহুমূল্য মালাও দিলেন, নচিকেতা সেগুলি গ্রহণ করল। পরবর্তী দুটি শ্লোকে যম বললেন, 'মাতা, পিতা ও আচার্যের উপদেশ পেয়ে যে তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে এবং বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান করে সে, জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে; যে নাচিকেত অগ্নিকে আত্মার বলে জেনে ধ্যান করে, সে যমের বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে শোকরহিত হয়ে স্বর্গে আনন্দ থাকে।' (১:১:১৮,১৯) এ কথার শেষে যম নচিকেতাকে বললেন, এইবারে তুমি তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করো। যেহেতু যম তাকে আগেই অনেক কিছু দিয়েছেন, স্বভাবতই তিনি আশা করতে পারেন, নচিকেতার আর তেমন কিছু প্রার্থনীয় নেই, তাই বললেন, 'তোমার তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করো, নচিকেতা।'

---

১১. লোকদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা। স চাপি তং প্রত্যবদদ্ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ তমব্রবীৎ প্রীয়মাণে। মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চৈমামনেকরূপাহং গৃহাণ ॥ (কঠ. ১:১:১৫,১৬)

তৃতীয় বর সম্বন্ধে নচিকেতা বললেন, 'মানুষের মৃত্যুর পরে এই যে সংশয়— কেউ কেউ বলে (মৃত্যুর পরে) কিছু থাকে আবার অনেকে বলে কিছুই থাকে না— আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে আমি এ বিষয় জানতে চাই, বরগুলির মধ্যে এইটিই তৃতীয় বর।'[১২] এ প্রশ্ন সুদীর্ঘকাল থেকেই মানুষকে উদ্‌বেজিত রেখেছে— শুধু প্রাচীন ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষ শেষ হয়ে যায়, না মৃত্যুর পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে? ঋগ্বেদের শেষতম অংশ দশম মণ্ডলে অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে জড়িত যে-মন্ত্রগুলি পাওয়া যায় সেগুলির ভিত্তি হল, মৃত্যুর পরে মানুষ যমের তত্ত্বাবধানে সুখেই থাকে; এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ওই শ্লোকগুলি রচিত: সম্ভবত তখন পৃথিবীর সর্বত্রই অধিকাংশ মানুষই মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল।

পুরাকালে প্রত্ন-উৎস উৎখননে যে সব বস্তু শবের সঙ্গে সমাহিত হত, তা থেকেই বোঝা যায় যে সারা পৃথিবীতেই এটি একটি ব্যাপক বিশ্বাস ছিল। অস্তিত্ব অনস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না, ফলে মরণোত্তর সত্তা অধিকাংশ দেশে এবং কালে স্বীকৃত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পর্যায় থেকে মানুষের স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং তার একটি বড় প্রকাশ হল সন্দেহ। কাজেই নচিকেতা যমকে বলছে, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে এ কথা কেউ কেউ বলে, তেমনই কিছুই থাকে না এ কথাও কেউ কেউ বলে। মনে রাখতে হবে যে এ উপনিষদ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে রচিত, তখনই নচিকেতা বলছেন, 'কেউ কেউ বলেন মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না'। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতকেই এই সংশয় সমাজে প্রসার লাভ করেছে। ওই সময়েরই শেষাংশে বেদবিরোধী প্রস্থানগুলির উদ্ভব এবং খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে এগুলি সমাজে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিদৃষ্ট। কঠোপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদ, অর্থাৎ এর উদ্ভব যজ্ঞের পটভূমিকায়, এই যজ্ঞে যারা হাতেকলমে কাজ করত তাদেরই মধ্যে। তাদেরই এক উত্তরপুরুষ কিশোর নচিকেতা দেখছে তার পিতা যজ্ঞে কতটা অবিশ্বাসী, যে-গাভি দান করার সম্পূর্ণ অযোগ্য সেগুলি অনায়াসে দক্ষিণায় দান করছেন তিনি। অর্থাৎ নচিকেতা এই মৌলিক অবিশ্বাস নিজের বাড়িতেই যজমান পিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

যাই হোক, যম তিনটি বর দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই তৃতীয় বর যখন নচিকেতা চাইল তখন তাঁর না দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তবু চেষ্টা করলেন, নচিকেতাকে নিবৃত্ত করতে, বললেন, 'এই ব্যাপারে স্বয়ং দেবতাদেরও আগে সংশয় ছিল। এই ধর্মের তত্ত্ব এত সূক্ষ্ম যে সহজে বোঝা যায় না। তাই, নচিকেতা, তুমি অন্য কোনও বর প্রার্থনা করো, আমাকে এ নিয়ে উপরোধ কোরো না, এ অনুরোধ ছেড়ে দাও।'[১৩] এখানে লক্ষ্য করি যে, যম নিজের

১২. যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ (কঠ. ১:১:২০)

১৩. দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণী স্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ (কঠ. ১:১:২১)

অঙ্গীকার থেকে সরে আসতে চাইছেন; ব্রাহ্মণ প্রার্থী তার গৃহে ত্রিরাত্রি উপবাসী ছিল বলে তাঁর যে অপরাধবোধ, তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে নিজের প্রস্তাব ছিল তিনটি বর। এমন কোনও শর্ত ছিল না যে যমের ইচ্ছামতো বরই চাইতে হবে, বরং চিরন্তন রীতি অনুসারে প্রার্থীর অভিলষিত বস্তুই সে চাইবে। সে-বর দিতে যমের আপত্তি কোথায়? প্রথমত এ ধর্ম বড়ই সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম যে সহজে বোঝা যায় না; কিন্তু যম কেমন করে জানলেন যে নচিকেতার বুদ্ধি যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়, সে বুঝবে না এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব? নিজের কুযুক্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে যম বলছেন, এই ব্যাপারে পূর্বকালে দেবতারাও সংশয়িত ছিলেন। এর সোজা মানে হল মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না সে-বিষয়ে দেবতাদেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কেমন দেবতা তাঁরা যাঁরা ত্রিকালজ্ঞ নন? যাঁরা মর্তলোকের ওপারে বাস করেন, তাঁদেরও সংশয় ছিল মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না তা নিয়ে। লক্ষ করলে দেখি, যম বলছেন, 'পুরা' অর্থাৎ পূর্বকালে দেবতাদের এ বিষয়ে সংশয় ছিল। সহজ ব্যঞ্জনা হল, এখন আর সে-সন্দেহ দেবতাদের নেই, তাঁরা জানেন মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না। কিন্তু তাঁরা সন্দেহ করেন কি না, জানেন কি না সে-কথা এ পটভূমিকায় তো সম্পূর্ণ অবান্তর, কারণ যমের অঙ্গীকার তো কোনও শর্তাধীন ছিল না; যে-কোনও তিনটি বর নচিকেতা চাইবে, যম তা পূরণ করবেন, এমনই তো কথা ছিল। এখন এ পশ্চাদপসরণের চেষ্টা কেন? নচিকেতা বললেন, 'দেবতাদেরও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, হে মৃত্যু, আপনি স্বয়ং এ তত্ত্বকে দুর্বিজ্ঞেয় বলছেন, আপনার মতো বক্তা আমি অন্য আর কাউকে পাব না, এই বরের তুল্য কোনও বরই হতে পারে না।'[১৪]

নচিকেতার যুক্তিগুলির কোনও খণ্ডন হয় না। প্রথমত, এ এমন একটা বিষয় যা নিয়ে স্বয়ং দেবতারাও সন্দিহান ছিলেন, দেবতাদের মানুষ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বলেই জানে, তাঁদেরও জ্ঞান তা হলে এখানে এসে ঠেকে যেত? তা হলে মর্ত্যমানুষ নচিকেতার এ বিষয়ে কৌতূহল তো আরও স্বাভাবিক, আরও যথার্থ। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটা হল মরণোত্তর সত্তা, আর প্রশ্নটা করা হচ্ছে স্বয়ং মৃত্যুকে, কাজেই তাঁর চেয়ে কে আর বেশি যোগ্য এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে? তৃতীয়ত, যম স্বয়ং বলছেন বিষয়টা দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু এক বারও বলছেন না যে এর সমাধান নেই। বরং ইঙ্গিতটা যেন এমন যে, মানুষ নচিকেতা সেই সমাধান জানবার যোগ্য নয়, যা দেবতারাও জানতেন না। নচিকেতার যুক্তি হল মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং মৃত্যুদেবতার চেয়ে যোগ্যতর ব্যাখ্যাতা বা শিক্ষক তো আর কেউ হতে পারে না, অতএব যমের বরে যখন এমন দুর্লভ সুযোগ জুটেছে তখন তা হাতছাড়া করা অবিবেচনার কাজ হবে, তাই যম তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিন। এটিই তাঁর শেষতম বর এবং যমের বরে এ জ্ঞানে তার অধিকার আছে। উত্তরে যম বললেন:

১৪. দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্যো এতস্য কশ্চিৎ॥ (কঠ. ১:১:২২)

> শতায়ু পুত্র পৌত্র প্রার্থনা করো, বহু গাভী, সুবর্ণ, হস্তী ও অশ্ব চাও, বৃহৎ আয়তনের ভূমি চাও, যত বর্ষ ইচ্ছা বাঁচবার বর চেয়ে নাও। আর এ সবের সমতুল্য অন্য কোনও বস্তু পেতে চাও, তাও চেয়ে নাও। সুদীর্ঘ জীবন, সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে তোমার সব কামনা পূরণ করে ভোগ করবার ব্যবস্থা করে দেব। এ পৃথিবীতে যে সমস্ত কামনা দুষ্প্রাপ্য, ইচ্ছামতো সে সব কাম্যবস্তু তুমি প্রার্থনা করো। এই সব সুন্দরী রমণী, এদের সঙ্গে রথ ও বাদ্যযন্ত্র আছে, এমন-সব বস্তু মানুষের অপ্রাপ্য, আমার দান এই সব কিছু দিয়ে তুমি নিজের পরিচর্যা করাও, নচিকেতা, শুধু মৃত্যুর পরের ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন কোরো না।[১৫]

মৃত্যু নচিকেতাকে যা যা প্রার্থনা করতে বলছেন, তার সবই কর্মকাণ্ডে যজ্ঞ থেকে পাওয়ার কথা। পিতার আচরণে নচিকেতা এমন যজ্ঞ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ, তা-ও সে জানে যে এ সবের বাইরে অন্য কোনও কাম্যবস্তু সে-যুগে বা সমাজে অকল্পনীয় ছিল। পৃথিবীতে রাজৈশ্বর্য এবং কল্পনীয় সর্বপ্রকার সুখভোগের তাবৎ উপকরণ। যম নচিকেতাকে দিতে সম্মত, শর্ত একটাই: মরণের পরের অবস্থা নিয়ে নচিকেতা যেন কোনও প্রশ্ন না করে। প্রকারান্তরে যম তাঁর প্রতিশ্রুত তৃতীয় বরটি প্রত্যাহার করে নিতে চান, বিনিময়ে মর্তে সুচিরকাল স্বর্গের সর্বসুখ দান করতে চান। এর আগে অবশ্য দীর্ঘকাল স্বর্গবাসের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। নচিকেতার প্রার্থিত বস্তুটি দিতে অস্বীকার করার মধ্যে যে-প্রচ্ছন্ন মিথ্যাচারিতা আছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এত ঐশ্বর্য ও সুখ দিতে চান যাতে ওইটি ঢাকা পড়ে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়, নচিকেতা হঠাৎ-পাওয়া এ সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। সে বলে:

> হে যম, যে সব উপহার আপনি দিতে চান সে সবই তো ক্ষণস্থায়ী (আজ আছে কাল নেই), এগুলি (ভোগের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ের তেজ ক্ষীণ করে দেয়, তা ছাড়া (এত ভোগ করার পক্ষে) জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, (কাজেই) এই রথ, ইত্যাদি, এই নৃত্যগীত এ সব আপনারই থাকুক। সম্পত্তিতে মানুষের আত্যন্তিক তৃপ্তি নেই, আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন বিত্তলাভ ঘটবেই, আপনি যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিনই বাঁচব, কিন্তু যে-বর আমি কামনা করি তা এই-ই।[১৬]

১৫. শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্, বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ং চ জীব শরদঃ যাবদিচ্ছসি॥ এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তঃ চিরজীবিকাং চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামনাং ত্বা কামভাজং করোমি॥ যে যে কামাঃ দুর্লভ মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামা সরথা সতূর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ (কঠ. ১:১:২৩-২৫)

১৬. শ্বোবাবা মর্ত্যস্যঃ যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহা তব নৃত্যগীতে॥ ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা। জীবিষ্যামি যবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥ (কঠ. ১:১:২৬,২৭)

এখানে নচিকেতা যমের কথার উত্তরে কতকগুলি মোক্ষম যুক্তি দিয়েছে। যমের প্রস্তাবিত সুখভোগে কেন নচিকেতা প্রলুব্ধ নয়, সে-কথা সে স্পষ্ট করেই জানায়, 'যাঁদের জরামৃত্যু নেই সেই দেবতাদের কাছে পৌঁছেও পৃথিবীর মানুষ জানে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ— সঙ্গীত, সম্ভোগ ও আনন্দ— সব কিছুই অনিত্য, অতএব অতিদীর্ঘ জীবনে কে আনন্দ পাবে? হে মৃত্যু, এই যে বিষয়টিতে (আমাদের) পরলোক সম্বন্ধে এই যে মহৎ সংশয় সে-কথাই আপনি আমাকে বলুন। (আত্মার গহনে) অনুপ্রবিষ্ট রহস্যগূঢ় এই যে বিষয় সেইটিই আমার (অভীষ্ট) বর, নচিকেতা আপনার কাছে অন্য বর কামনা করে না।'[১৭] এই সব কথায় নচিকেতা যমের প্রতিশ্রুত সমস্ত আনন্দের উপকরণ প্রত্যাখ্যান করে জানতে চাইল, মৃত্যুর পরে কী থাকে। যম বললেন: শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে যে শ্রেয়কে বরণ করে সে সাধু হয়, যে প্রেয়কে বরণ করে পরমার্থ থেকে সে চ্যুত হয়। (একই কথা কঠ. ১:২:১,২-তে)। নচিকেতা, তুমি আপাত সুখের পথ ছেড়েছ বুদ্ধিমানের মতো, (কঠ. ১:২:৩); কাম্যবস্তুর দ্বারা তুমি প্রলুব্ধ হওনি, (কঠ. ১:২:৪); অবিদ্যার মধ্যে যারা বিচরণ করে ও নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ মনে করে, তারা মূর্খ। (কঠ. ১:২:৫) পরের শ্লোকে যম বললেন, 'যারা মনে করে শুধু ইহলোকই আছে, পরলোক নেই তারা বারেবারে আমার বশীভূত হয়।'[১৮] এর অর্থ হল, যারা নাস্তিক অথবা পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাদের পুনর্জন্ম হয় ও বারংবার মৃত্যুভোগের দ্বারা তারা যমের (= মৃত্যুর) বশে আছে। পরের শ্লোকে যম বললেন, আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার যোগ্য লোক বিরল, ফলে অধিকাংশ মানুষই এ সম্বন্ধে কিছু জানতেই পারে না, এবং উপদেশ পেয়েও অনেকে ঠিকমতো জানতে পারে না। (কঠ. ১:২:৮) পরে বললেন, 'এ বুদ্ধি তর্ক দিয়ে লাভ করা যায় না। তার্কিক নয় এমন কোনও জ্ঞানী আচার্য উপদেশ দিলে ভাল ভাবে জানা যায়, নচিকেতা তোমার সত্যজ্ঞান হয়েছে, তোমার মতো প্রশ্নকারী আমার কাছে যেন আসে। (কঠ. ১:২:৯) এখানে যম স্পষ্ট করেই বলছেন, আত্মজ্ঞান যুক্তি দিয়ে পাওয়া যায় না, যমের মতো জ্ঞানী বিচক্ষণ আচার্যের উপদেশেই শুধু পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিদ্যাটি গুরুমুখী, যুক্তির জগতের বাইরে এর অবস্থান। এবং যেহেতু সাধারণ মানুষ তেমন আচার্যের সন্ধান পায় না, পাবে না, তাই ওই জ্ঞান সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই ভাগ্যেই জুটবে।

এর পরে যম নচিকেতাকে বললেন, সে কাম্য বিষয় পরিত্যাগ করে এই জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে; মানুষ এ জ্ঞান লাভ করে সূক্ষ্ম আত্মাকে লাভ করে। (কঠ. ১:২:১৩) 'সমস্ত বেদ যে-লক্ষ্যকে নির্দেশ করে, সমস্ত তপস্যা যার কথা বলে, যাকে কামনা করে মানুষ ব্রহ্মচর্য

১৭. অজীর্যতানমৃতানামুপেত্য জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্ অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥ (কঠ. ১:১:২৮,২৯)

১৮. অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি 'মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥ (কঠ. ১:২:৭)

পালন করে, তোমাকে সেই লক্ষ্য সংক্ষেপে বলছি: ওম্‌ই হল তাই— সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি— ওমিত্যেতৎ॥' (কঠ. ১:২:১৫) এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব: সমস্ত বেদবিদ্যা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য সব কিছুই একটি অক্ষরে সংগৃহীত: ওম্। এবং এর পরের দুটি শ্লোকে ওম্-এর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে— এই একটি অক্ষরই ব্রহ্ম। এটি জানলেই যে যা চায় তা পায়, এর দ্বারা মানুষ ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। (কঠ. ১:২:১৬,১৭) এর পরের পাঁচটি শ্লোকে আত্মার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে: জ্ঞানে, বিদ্যায়, স্বাধ্যায়ে, মেধায় এঁকে পাওয়া যায় না, ইনি যার প্রতি দয়া করে আত্মপ্রকাশ করেন, সে-ই শুধু একে পায়। কর্মকাণ্ডে ছিল বেদশিক্ষার মহিমা, জ্ঞানকাণ্ডে এল জ্ঞানের মাহাত্ম্য, আত্মব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা— কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে, এ সবের দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না। একটু আগে যে-বিচক্ষণ আচার্যের সাহায্যে আত্মজ্ঞান লাভ করার কথা শোনা গেল, সেটারও আর প্রযোজ্যতা রইল না। কারণ, সেটা ছিল প্রবচন, মেধা ও শ্রুতের অন্তর্গত এবং এখন শোনা গেল এ সবের কোনও উপযোগিতা নেই, আত্মা যার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে কেবল সে-ই জানতে পারে। খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে একে বলে grace এবং এর সংজ্ঞা হল grace is unmerited favour (ভগবৎকরুণা হল অনর্জিত কৃপা)। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যুক্তি ও জ্ঞানের স্তর থেকে সরে চলে গেল রহস্যের স্তরে, কারণ আত্মা কাকে কৃপা করে তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবে তার নির্ণায়ক আর কিছুই রইল না, সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত লোকে চলে গেল সমস্ত ব্যাপারটা।

প্রায় ভাগ্যের আয়ত্ত হয়ে উঠল আত্মজ্ঞান। ব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে এই বল্লীটি শেষ হয়েছে যে-শ্লোকে তা হল 'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই-ই যাঁর অন্ন, মৃত্যু যাঁর ব্যঞ্জন তিনি কোথায় আছেন সে-কথা কেই-বা জানে?'[১৯] অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে কেউই জানে না। মনে পড়ে, নচিকেতা ব্রহ্মকে জানতে আসেনি, মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না তা-ই জানতে এসেছিল; প্রসঙ্গত উঠল ওম্-এর মাহাত্ম্য, আত্মব্রহ্মের কথা এবং শেষ হল এই বলে যে ব্রহ্মকে কেউই জানতে পারে না। এর পরে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী অর্থাৎ কঠোপনিষদের শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যার কথা। ইন্দ্রিয়, মন, বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং পুরুষের কথা, এটির শেষে শুনি: 'পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই তিনিই চূড়ান্ত, তিনিই পরম গতি— পরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥' (কঠ. ১:৩:১১) 'সমস্ত প্রাণীতে গোপন আত্মা এই পুরুষ প্রকাশিত হন না, একাগ্রতাযুক্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মদর্শীরা এঁকে দেখতে পান— এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা না প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥' (কঠ. কঠ. ১:৩:১২) তা হলে একাগ্র সূক্ষ্মদর্শী মানুষের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে এঁকে দেখা যায়। এখন আর ভগবৎকৃপার প্রসঙ্গ উঠছে না। বিচক্ষণ আচার্য নেপথ্যে থাকতেও পারেন। এর একটা শ্লোক

১৯. যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতি ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

পরে সেই বিখ্যাত শ্লোক: 'ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠদের কাছে গিয়ে (কিংবা বর লাভ করে) জানো, ক্ষুরের সূক্ষ্ম ধারালো অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণ সেই দুর্গম পথ— উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।' (কঠ. ১:৩:১৪) কোন্ পথ? ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ, জেগে উঠে তা লাভ করবার জন্যে কী প্রয়োজন— শ্রেষ্ঠ আচার্য, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও একাগ্রতা, না ভগবৎকৃপা, তার উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে বেদান্তে ব্রহ্মের যে-সংজ্ঞা তাতে তিনি নির্গুণ, কৃপা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যা বলতে চেষ্টা করছি তা হল, নচিকেতার প্রশ্নটি দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট, ঋজু। কিন্তু উত্তর— যদি কিছু থেকে থাকে— তা গভীর অন্ধকার অরণ্য। শংকরাচার্যের ভাষ্য এ রচনার দেড় হাজার বছরের পরের— অন্তর্বর্তীকালের সমস্ত চিন্তাচর্চার উত্তরাধিকার তার অন্তরালে নিহিত আছে, এখানে সেটা প্রযোজ্য নয়, কারণ এই যুগের চিন্তার ওপরে দুর্ভেদ্য বহু প্রলেপ পড়েছে। এর পরের শ্লোকে সর্বলক্ষণবিনির্মুক্ত ব্রহ্মকে জানলেই 'মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়— নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।' (কঠ. ১:৩:১৫) নচিকেতার প্রশ্নটা কিন্তু মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী, তা ছিল না, মৃত্যুর পরে কিছু আছে কি না, তাই ছিল। প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি 'মাহাত্ম্য' শ্লোক, 'মৃত্যু কর্তৃক কথিত নচিকেতার এই সনাতন উপাখ্যান বললে বা শুনলে মেধাবী ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন।'[২০] এটাও কিন্তু নচিকেতার প্রার্থিত বর ছিল না, এই ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হওয়া; তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর এখনও যম দেননি।

এর পরের বল্লীতে যম বলছেন, পণ্ডিতেরা অধ্রুব অর্থাৎ অস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখের জগতে ধ্রুব বা স্থায়ী সুখের খোঁজ করেন না। (কঠ. ২:১:২) যার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা জন্মায় তা সব এঁরই দ্বারা হয়; 'ইনিই সেই— এতদ্বৈ তৎ।' (কঠ. ২:১:৩) এর পরেরটি বাদে পাঁচটি শ্লোকে আত্মা যে দৃশ্য-ভোগ্য জগতের বহির্ভূত, গোপন একটি সত্তা তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এই পাঁচটি শ্লোকের প্রত্যেকটিরই শেষে যোগ করা হয়েছে, 'এতদ্বৈ তৎ'; অর্থাৎ কী নয়, কী হতে পারে না, সেই নেতি-নেতি প্রক্রিয়ায় আত্মার স্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। 'এখানে যা ওখানেও তা-ই, ওখানে যা এখানেও তাই, যে একে বিভিন্ন (নানা)-ভাবে দেখে সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়— যদেবেহ তদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।' (কঠ. ২:১:১০) অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করে বলা হল, যে এই একত্ব দেখতে পায় না সে বারংবার মৃত্যুর অধীন হয় অর্থাৎ জন্মান্তরে পুনর্মৃত্যু ভোগ করে। এর পরের দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে অন্তরাত্মার আকৃতি বা আয়তন বুড়ো আঙুলের মতো (অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ) এবং পরের দুটি শ্লোকের শেষেও আছে 'এতদ্বৈ তৎ'। অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা, ব্রহ্ম বললে আকৃতিগত কোনও বৃহত্ত্ব বোঝায় না। আদিম যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুকালে প্রাণ মস্তিষ্কের ওপরের রন্ধ্র থেকে নির্গত হয়। অতএব তাকে ক্ষুদ্রায়তন কল্পনা করাই সংগত, তাই সে বুড়ো আঙুলের মতো। লোককথায় আমরা

২০. নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।। (কঠ. ১:৩:১৬)

নানা দেশে যে-বুড়ো আঙুলের মতো জাদু-শিশুর কথা পড়ি, যে বড়দের মতো বা বড়দের চেয়েও বেশি শক্তির কাজ সম্পন্ন করে, এ সবই এর পেছনে ক্রিয়াশীল। আত্মা-ব্রহ্ম, যার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছুই কল্পনা করা যায় না, তাঁর গুরুত্ব আকৃতি বা আয়তনে নয়, ঐশী বা অতিলৌকিক শক্তিতে।

দ্বিতীয় বল্লীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম, চতুর্থ ও অষ্টম শ্লোকের শেষে, এবং তৃতীয় বল্লীর প্রথম শ্লোকেও 'এতদ্বৈ তৎ' ধ্রুবপদটি পাই। অর্থাৎ নানা ভাবে সদর্থক ও নঞর্থক বর্ণনার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে: ব্রহ্ম কী নয়, কী ভাবে তার সন্ধান করলে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে স্বতন্ত্র সেই দুর্জ্ঞেয় সত্তার অবস্থান প্রতি মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান। বায়ু, অগ্নি ও সূর্য যেমন দৃষ্ট, অনুভূত হয়, কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ের বাইরে বিষয় হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান, আত্মারও তেমনই। মনে রাখতে হবে, দেহবহির্ভূত আত্মা এই সময়েই দেখা দিল একটি ভাবপদার্থ হিসেবে, মানুষের অবধারণার বাইরে এর অস্তিত্ব; তাই এর স্বরূপ বোঝানো যাবে কী করে? প্রথমত, এ কী নয়, ভুল করে একে কী কী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করতে পারে লোকে, সেইগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে একে বোঝাবার জন্যে ওই নেতি-নেতি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বতঃস্বরূপে আত্মা কী, তা বোঝাবার জন্যে আশপাশ থেকে এর বর্ণনা করা হয়েছে যেন আভাসে লোকে আত্মাকে বুঝতে পারে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনার মধ্যে স্বভাবতই অনেক অস্পষ্টতা, অনির্দেশ্যতা আছে; কিন্তু এ ছাড়া ওই কাল্পনিক সত্তাটিকে জনসমক্ষে গ্রহণযোগ্যতারূপে উপস্থাপিত করা যেত না। এ ভাবেও যায়নি। তার অনেক প্রমাণ আছে।

প্রথমত, যে সময়ে আত্মব্রহ্ম তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা চলছে সে সময়ে মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে বাদ দিলে দেশসুদ্ধ লোক অশিক্ষিত, বৃহৎসংখ্যক শূদ্র। নারী আদিবাসী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের অনেকেই অশিক্ষিত। এদের মধ্যে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পেটভাতায়, এদের দৈনন্দিন জীবনে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়— এরা অবসর-সময়ে নেশা করে, উৎসব করে, আলস্য যাপন করে, এবং আর যা-ই করুক দর্শনচিন্তা করে না। ফলে ওই আত্মব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা উৎসাহ এদের ছিল না। কোথাও যজ্ঞ হলে দূর থেকে এরা দেখত, প্রয়োজন মতো মজুর খাটত, গার্হস্থ্য জীবনে প্রাগার্য পূজাপদ্ধতি যা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তাতেই এদের চলে যেত। এরা ধরেই নিয়েছিল, এদের অপার দুঃখদুর্দশা ঘোচাবার সাধ্য দেব-মানব কারুরই নেই। তবু অসহ্য হয়ে উঠলে দেবতার কাছে কেঁদে পড়ত। সে-দেবতা আর যে-ই হোন আত্মা বা ব্রহ্ম নয়। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব যে জনসমাজে বিস্তার লাভ করেনি তার একটা প্রমাণ, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েই চলছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রাগার্য প্রভাবে নানা চেহারায় পূজাও ঢুকে পড়েছিল। তৃতীয়ত, আত্মব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে সমাজে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে। এর মধ্যে খুব কম গ্রন্থকারের পরস্পরের সঙ্গে ঐকমত্য আছে। অর্থাৎ তত্ত্বটি দুরূহ, দুর্বোধ্য এবং পণ্ডিতরা

একে প্রথম থেকেই বিজ্ঞজনগ্রাহ্য বলেছেন, এবং সেটি প্রমাণ করবার জন্যে নানা ভাবে— ভাষায়, শব্দবিন্যাসে, অলংকারে অর্থাৎ উপমা ও রূপকে নানা ধরনের বিমূর্ত বর্ণনায়— এটিকে তাঁরা দুর্গম করে রেখেছিলেন। নচিকেতাকে তো যম স্পষ্টই বললেন, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছাড়া এ তত্ত্ব বোঝে এমন সাধ্য কার আছে? চতুর্থত, ধরে নেওয়া যায় যে, সে সময়েও সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি বেশ-কিছু লোকের ছিল, তারাও কিন্তু ওই সূক্ষ্মবুদ্ধির জোরে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী নয়, কারণ এ বিদ্যা তর্ক অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে পাওয়ার নয়— নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। তা হলে পাবে কে?

ব্রহ্ম কৃপা করে যার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে শুধু সে-ই পাবে। আগে দেখেছি, গুণাতীত ব্রহ্মে কৃপারূপ উপাধি (লক্ষণ, বা ধর্ম) আরোপ করা অযৌক্তিক। ব্রহ্ম ব্যক্তি নয়, পদার্থ এবং নির্গুণ, কৃপা তিনি করবেন কেমন করে? যাই হোক, উপনিষদ যখন বলছে তখন না হয় ধরে নেওয়া গেল যে তিনি মধ্যে-মধ্যে কৃপা করে থাকেন, তখন তার প্রসাদধন্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ জানতে পারে। শেষ প্রশ্ন থেকে যায়, সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও যখন জানবার নিশ্চয়তা নেই, তখন তো আরও বেশি অনিশ্চিত ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্-এর পাত্র কে হবে সে-ব্যাপারটা। তা হলে পারিশেষ্যাৎ দাঁড়াল এই যে, ব্রহ্ম যার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে ব্রহ্মজ্ঞান তারই হবে; সে যে কে আর কে নয়, এ সম্বন্ধে শাস্ত্র নীরব। কারণ বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা এ সব যখন যথার্থ যোগ্যতা নয়, তখন কৃপা নেহাতই আকস্মিক হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী ভাষ্যকাররা অবশ্য বলেছেন, ভোগ্য বিষয় থেকে যে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, যে অধ্রুব জগতে ধ্রুব ব্রহ্মের সন্ধান করে না অর্থাৎ মনকে যে নির্লিপ্ত বিষয়বিমুখ করে নিয়েছে সে অনুকূল পাত্র। শাস্ত্র এ-ও বলেছে, বুদ্ধি যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সে-ও অনুকূল পাত্র। কিন্তু শাস্ত্র এ-ও বলেছে যে এ সব সত্ত্বেও সে ব্রহ্মকৃপা না-ও লাভ করতে পারে।

তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যাবৃত হয়ে রইল, এবং তা-ই থাকে। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সমস্ত ধর্মতত্ত্বে। ইংল্যান্ডে ক্যাল্‌ভিন প্রবর্তন করলেন প্রাক্-নিরূপণ তত্ত্ব (predestination theory) যার অর্থ, ঈশ্বর কাকে মুক্তি দেবেন কাকে দেবেন না সে-কথা মানুষের জন্মের আগেই ঠিক করা থাকে; তা হলে যে মুক্তি পাবে যেহেতু সে মুক্তি অর্জন করার মতো কোনও সৎকর্ম করেনি তা হলে তার মুক্তির হেতুও 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্'। এমন তত্ত্ব ইসলামেও আছে, অন্য ধর্মেও আছে, এবং ঠিক এইরূপে না হলেও অন্যরূপে সর্বত্রই আছে। সাধে আর আজীবিকরা বলত, ভাল কাজই কর মন্দ কাজই কর, তাতে তোমার ভাগ্যের কোনও ইতরবিশেষ হবে না। চুরাশি লক্ষ জন্মের পরে আপনা-আপনিই আত্মা মোক্ষ লাভ করবে। এই অনির্দেশ্যতা সমস্ত ধর্মাচার্যের হাতের বেত্রদণ্ড। ভাল কাজ করে ভাল ফল না হলে ওই যুক্তি— নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। কী হবে তা তোমার কর্মের ওপরে নির্ভর করে না, একটা অনির্দেশ্য কিছু খুব দরকার, নইলে দুই আর দুয়ে চার হয়ে যাবে। যমের সংজ্ঞা অনুসার ঐহিক সুখে নির্লোভ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান নচিকেতা তো ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শ পাত্র ছিল, যদিও সে-বেচারি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে আসেনি, এসেছিল পরলোকতত্ত্ব

জানবার জন্যে। তবু তাকে আত্মব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান দেওয়া হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাকে যোগ্যতা-লভ্য করে রাখা হল না, অনর্জিত ব্রহ্মকরুণার অন্তর্গত করে রাখা হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় (শেষ) বল্লীর শুরু 'এই সনাতন অশ্বত্থের মূল ঊর্ধ্বে, শাখা নীচে, সে-ই শুক্র, সে-ই ব্রহ্ম, সে-ই অমৃত বলে অভিহিত। এই পৃথিবী তাতেই আশ্রিত, তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। এ-ই সেই।'[২১] এখানে ব্রহ্মের নতুন এক ধরনের বর্ণনা করা হল। চিত্রকল্পটি প্রকৃতির বিরুদ্ধ, ঊর্ধ্বমূল নিম্নশাখ গাছ হয় না, কাজেই এ শ্লোকটিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া চলবে না।

গাছের শেকড় যেখানে থাকে সেখান থেকে সে প্রাণরস আহরণ করে; এই ব্রহ্ম-অশ্বত্থ তা হলে আকাশ থেকে রস আহরণ করে? অবাক্‌শাখ মানে নীচের দিকে শাখা, আকাশের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীতে, অতএব পরিদৃশ্যমান। অর্থাৎ ব্রহ্মের যে-অংশ দৃশ্যমান তা হল এই জগৎসংসার, এখানে গাছের শাখা, ফল, পাখির কোটর, ছায়া, আশ্রয়, সৌন্দর্য। এর মূল সুন্দরও নয়, স্পষ্ট দৃশ্যমানও নয়, কিন্তু এর সত্তার উৎস আকাশে। সেখানকার সৌন্দর্য চোখে পড়ে না, তবু আছে। মনে পড়ে উপনিষদেরই কথা, 'কে শ্বাস নিত, কে বেঁচে থাকত যদি এই আকাশ আনন্দ না হত?— কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যোৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা।' ব্রহ্মকে সনাতন বনস্পতি অশ্বত্থের সঙ্গে তুলনা করে রচয়িতা বলতে চান এর নীচেরটুকুই দেখা যায়, মূল দেখা যায় না। অর্থাৎ অন্যত্র নানা অংশে যেমন একে রহস্যাবৃত জ্ঞানের অগোচর করে রাখার প্রয়াস, এখানেও সেটা লক্ষ করা যায়। মনে পড়ে প্রাচীন নরওয়ের মহাকাব্য প্রোজ এড্ডা-তে অমনই একটি গাছের বর্ণনা আছে। Snorri Sturlusson-এর সংকলিত এই প্রাচীন গদ্য-মহাকাব্যে এবং ছন্দে রচিত এল্ডার এড্ডা-তেও Yggdrasil নামের একটি অ্যাশ্‌ গাছের কথা আছে।

এ দেশে অশ্বত্থ যেমন সনাতনত্বের প্রতীক ওখানে অ্যাশ্‌ও ঠিক তাই। প্রোজ এড্ডা-তে পড়ি:

> 'পরমেশ্বরকে গাংলেরি (গিল্‌ফ্‌, অসুরজাতীয় জীব) প্রশ্ন করলেন, 'দেবতাদের প্রধান নিবাস বা পবিত্র স্থলটি কোথায়? পরমেশ্বর বললেন, 'সেটি অ্যাশ্‌ ইগড্রাসিলের পাশে... ওই বনস্পতিটি বিধৃত আছে তিনটি মূলের দ্বারা যেগুলি দূরবিসারী। একটি ঈসীর (দেবতা)দের মধ্যে, দ্বিতীয়টি কুয়াশা-দৈত্যদের মধ্যে এবং তৃতীয়টি নিফ্‌ল্‌হাইম্‌ (পাতাল)-এর ওপরে।... ওই অ্যাশ্‌ গাছটির তৃতীয় মূলটি আকাশে এবং এর মূলটি হল উর্দ্‌দের পবিত্র ঝরনা।'[২২]

২১. ঊর্ধ্বমূল্যোঽবাকশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে। অস্মিল্লোকা:' শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যোতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ (কঠ. ২:৩:১)

২২. 'Gylf Gangleri asked the High One where is the chief place or sanctuary of the gods? The High One replied 'It is by the ash Yggdrasil... The tree is held in position by three roots that spread far out: one is among the Aesir the second among the frost ogres. .the third extends ovor Niflheim... The third root of the ash tree is in the sky, and under the root is the sacred spring of Urd.'— *The Prose Edda*, pp. 44-45

পরে বলা আছে, 'বনস্পতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল অ্যাশ্ ইগ্‌ড্রাসিল্'। (পৃ. ৬৬) *এল্ডার এড্ডা*-য় আছে, 'যে সব ঘোড়ায় চড়ে দেবতারা প্রত্যহ (মানুষের) ভাগ্য নির্ণয় করতে যান অ্যাশ্ ইগ্‌ড্রাসিল থেকে'। (পৃ. ৬৪) শেষোক্ত বইটির শেষে সমগ্র এড্ডা সাহিত্য থেকে সংকলন করে ইগ্‌ড্রাসিলের যে-ছবিটি দিয়েছেন তাতে এই গাছটি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদেও এই ব্রহ্মবৃক্ষটি চরাচর ব্যাপ্ত করে আছে; এর ঊর্ধ্বে দেবলোক, মধ্যে নরলোক, নীচে পাতাল। এর থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের কিছু মনীষীর মনে হয়েছিল, এমনই একটি বৃক্ষের আকারে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ শক্তি রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ দেশে অশ্বত্থ যেমন সনাতনত্বের প্রতীক, উত্তর ইউরোপে অ্যাশ্‌ও তাই, তার থেকেই প্রথম নরনারীর সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নচিকেতার পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে এই ব্রহ্মবনস্পতির অবতারণার হেতু কী। এর পরের শ্লোকেই একে চরাচরের সৃজনীশক্তি বলা হয়েছে এবং তার পরে সেই শ্লোকটি তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আছে: 'এর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য তাপ দেয়, এর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।'[২৩] কোনও শক্তির মহিমা-কীর্তন করতে হলে তাকে ভয়াবহ করে তোলা একটি পরিচিত প্রক্রিয়া; কিন্তু এখানে ভয় পায় কারা? পৃথিবীর নিয়ামক শক্তিগুলি: অগ্নি, সূর্য ও বায়ু; এ ছাড়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং মৃত্যু। অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির চালনা করেন ব্রহ্ম; দেবতারাও যে এর অধীন তা দেখাবার জন্যে ইন্দ্রের নাম করা হয়েছে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। (লক্ষণীয় ইগ্‌ড্রাসিল্ সম্বন্ধেও বলা হয়েছে, এটি দেবতাদের পীঠস্থান (পৃ. ৪২)। এর পরের অংশটিই নচিকেতার প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত: মৃত্যু ধাবিত হয় ব্রহ্মের ভয়ে। ভয় কীসের? বিশ্বচরাচরে যে ঋত ক্রিয়াশীল বলে তার সমস্ত প্রকাশ নিয়মানুবর্তী, তার ব্যত্যয় হওয়ার ভয়। অতএব মৃত্যু স্বেচ্ছাচারী নয়, ব্রহ্মের নির্দেশেই সক্রিয়। অতএব কোথাও যেন এতে একটা আশ্বাস আছে, বেহিসেবি, বেনিয়মে কিছুই হওয়ার নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নচিকেতা এ আশ্বাসের সন্ধান করেনি, সে ধরেই নিয়েছিল যমের ইচ্ছা হলে পরমায়ু শেষ হয়— জীবিষ্যামি যাবদীশিষ্যসি ত্বম্। (কঠ. ১:১:২৭)। তার পরের শ্লোকেই বলা হয়েছে, 'এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্বে যার মৃত্যু হয় সে আবার সৃষ্টির ভূমিতে শরীর নিয়ে আসে— ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।।' (কঠ. ২:৩:৫)

একটা হদিস পাওয়া গেল মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে: ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পূর্বে মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম হয়। এ বার প্রশ্ন ব্রহ্মজ্ঞানের 'আয়নায় যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, বুদ্ধিতে তেমনই আত্মার দর্শন লাভ করা যায়। স্বপ্নে যেমন দর্শন তেমনই পিতৃলোকে, জলে যেমন

---

২৩. ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।। (২:৩:৩) তৈত্তিরীয় উপনিষদ (কঠ. ২:৮:১)

তেমন গন্ধর্বলোকে; ব্রহ্মলোকে আলো ও ছায়ার মতো স্পষ্ট করে (দেখা যায়)'।[২৪] স্পষ্টতই এটি কোনও অসংশয়িত উত্তর নয়। সূর্য ও ছায়ার মতো স্পষ্ট আত্মদর্শন বললে সত্যিই কিছু বোঝায় না, ব্রহ্মলোকে তত্ত্বগত ভাবে আত্মদর্শন হওয়ারই কথা নয়, আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাধিত হয় মাত্র। গন্ধর্বলোক বলতে পরবর্তী টীকাকাররা দেবলোক অর্থ করছেন; স্পষ্টই বোঝা যায় এক সারি অনেকান্ত উপমা ব্যবহার করা হয়েছে ব্রহ্মলোকের উৎকর্ষ বোঝাতে। আগের শ্লোকে বলা হল, এ জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান না হলে জন্মান্তর হয়, অর্থাৎ আভাসে বলা হল এখানে, আলো ও ছায়ার মতো পৃথক করে দেখা যায়। দেখবার পরে কী হয় বলা হয়নি।

পরের তিনটি শ্লোকে শুনি ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি জেনে পণ্ডিত শোক ত্যাগ করেন, ইন্দ্রিয়ের ওপারে মন, মনের পরে সত্ত্ব, তার পরে মহান আত্মা ও মহতের পরে অব্যক্ত, অব্যক্তের পরে পুরুষ, ব্যাপক এবং লিঙ্গহীন 'যাঁকে জেনে জীব মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব পায়— যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বম্ চ গচ্ছতি।।' (কঠ. ২:৩:৮) এই অমৃতত্ব কী তা কখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অমর আত্মার রূপ চোখে দেখা যায় না; মনে মনীষার দ্বারা প্রকাশিত হন আত্মা; 'যারা এটা জানে তারা অমৃত হয়— য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।' (কঠ. ২:৩:৯) মন যখন ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, বুদ্ধি ক্রিয়াহীন হয় তাকেই পরম গতি বলা হয়। (কঠ. ২:৩:১০) এই অবস্থাকেই যোগ বলে, ইন্দ্রিয়ধারণা তখন স্থির, (মানুষ) তখন অপ্রমত্ত, যোগের উৎপত্তি বিনাশ আছে— যখন হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্যমানুষ অমৃত হয়, এই হল অনুশাসন (কঠ. ২:৩:১৪)। হৃদয় থেকে নিঃসৃত একশোটি নাড়ির মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, সেই উর্ধ্বে নিষ্ক্রান্ত নাড়ি অবলম্বনে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। বাকিগুলির দ্বারা অন্য দিকে গতি হয় (কঠ. ২:৩:১৬)। বুড়ো আঙুলের আয়তন পুরুষ হল অন্তরাত্মা, সর্বদা মানুষের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকেন। মুঞ্জঘাস থেকে যেমন তার শিসটা ছিঁড়ে নেওয়া হয় সেই ভাবে ধৈর্য ধরে ওই অন্তরাত্মাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাকে শুক্র ও অমৃত বলে জানবে (কঠ. ২:৩:১৭)। দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'পরমাত্মাকে বাক্য দিয়ে জানা যায় না, মন বা চক্ষু দিয়েও নয়, যারা আত্মা সম্বন্ধে 'আছে' এই কথা বলে, (তারা জানে) তা ছাড়া অন্য কোনও ভাবে একে জানা যায়?'[২৫] পরে (আত্মাকে) 'আছে' বলে উপলব্ধি করতে হবে সগুণ ও নির্গুণ বা সোপাধিক ও নিরুপাধিক দু ভাবেই 'আছে' বলে উপলব্ধি করলে পরে তবেই তা যথার্থত প্রসন্ন হবে (অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করবে)।[২৬] এ দুটি শ্লোকে কিন্তু কঠোপনিষদের একেবারে প্রথমে যমের প্রতি নচিকেতার যে-প্রশ্ন তারই যেন প্রচ্ছন্ন উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

২৪. যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরী দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।। (কঠ. ২:৩:৫)

২৫. নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।। (কঠ. ২:৩:১২)

২৬. অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্ব-ভাবঃ প্রসীদতি।। (কঠ. ২:৩.১৩)

নচিকেতা বলেছিল, 'মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে এই যে সংশয়, কেউ কেউ বলে (মৃত্যুর পরে) কিছু থাকে আবার অনেকে বলে কিছুই থাকে না, এ সম্বন্ধে আপনি আমাকে বলুন।' (কঠ. ১:১:২০) এতক্ষণে যেন যম প্রকারান্তরে, সে-প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যারা আত্মাকে 'আছে' বলে জানে তারাই জানে, অন্য কোনও ভাবে জানা যায় না। কিন্তু এ কি উত্তর? এ তো নচিকেতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া। যারা 'আছে' বলে জানে, নচিকেতার প্রশ্নের অর্ধাংশ তারা, যারা 'নেই' বলে জানে? তাদের সম্বন্ধে যম বললেন তাদের কোনও মতেই আত্মজ্ঞান হবে না কারণ একমাত্র 'আছে' বলে উপলব্ধি করলেই জানা যায় আত্মাকে। ইংরেজিতে যাকে বলে auto-suggestion (নিজেকে বলে বলে বিশ্বাস করানো) এ তো তাই। মুশকিল হল, যমের দাবি এর চেয়েও বেশি— যারা 'আছে' বলে উপলব্ধি করে; উপলব্ধি করাটা তো মানুষের হাতে নেই। মন, চক্ষু, বাক্য দিয়ে জানা যায় না, 'আছে' বলে উপলব্ধি করলেই তার জ্ঞান পাওয়া যায়, ইংরেজিতে একে বলি begging the question। উপলব্ধি ছেলের হাতের মোয়া নয়, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না; সূচ্যগ্রবুদ্ধি, প্রভূত বিদ্যা উপযুক্ত আচার্য, জ্ঞান বা মনস্বিতার দ্বারাও পাওয়া যায় না। বুদ্ধির জগতের বাইরে অনুভবের জগতে উপলব্ধি, চেষ্টা করেও পাওয়ার নয়। তা হলে শেষ পর্যন্ত ওই দৈবকৃপাতে এসে ঠেকছে, যদিও এ দুটো শ্লোকে সে-কথা বলেনি। কিন্তু এমন ভাবে বলা হয়েছে যেন উপলব্ধি করা মানুষের সাধ্যের বা আয়ত্তের মধ্যে। সংশয়ীকে যম তার আলোচনার পরিধি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেন, অথচ সংসারে সৎ, বিবেকী, যথার্থ সংশয়ী মানুষ আছে। সংশয় যাদের আত্মপ্রতারণা নয়, সংশয় যাদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, তাঁদের কোনও গতি যমের বিধানে নেই। যে সংশয়ী তাকে পুরো হিসেবের বাইরে রাখা হল যেন সে ইচ্ছে করেই বিশ্বাস করছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না বলে নয়।

শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'মৃত্যুর দ্বারা কথিত এই বিদ্যা ও সমগ্র যোগবিধি লাভ করে নচিকেতা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হল, রজোগুণ থেকে এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হল, অন্য যে-কোনও অধ্যাত্মবিদও এই অবস্থা লাভ করে।'[২৭] এক অর্থে নচিকেতার প্রশ্নের চেয়ে বেশি উত্তর দেওয়া হল: আত্মার বিভিন্ন পরিণতি এবং সেগুলির নির্ণায়ক কর্মের কথা বলা হল। এ সব সম্বন্ধে তখনকার জনমানসে উদগ্র জিজ্ঞাসা ছিল; মৃত্যুর পরে সত্যিই কিছু থাকে কি না, থাকলে তার লক্ষণ কী, পরিণতি কী, এ পরিণতি কি মানুষ কোনও ভাবে নিরূপণ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তর যম দিয়েছেন, বাড়তি অনেক তথ্যও জানিয়েছেন। সে-যুগে যেটি নতুন তথ্য তা হল ইন্দ্রিয়যুক্ত মানুষের প্রকৃত সত্তা তার দেহ নয়, দেহাতীত যে আত্মা সেই আত্মাই অমর। মৃত্যুর পরে এ জন্মের কর্ম অনুসারে তার দু' রকম গতি হতে পারে: পিতৃযান যাতে নানা পথ ঘুরে বারবার জন্মাতে হয়, অন্তিমে জন্মান্তর-ধারা থেকে

২৭. মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগাবধিং চ কৃৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব॥

মুক্তি ঘটে। দ্বিতীয় পন্থাটি হল দেবযান, সে-ও এ জন্মের কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়, সে-পথে মৃত্যুর পরে আত্মা কিছু পথ ঘুরে সূর্যের পথ ধরে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় বা তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ব্রহ্মে লীন হয়। এর মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাসও স্থান পেয়েছে, যেমন মৃত্যুকালে বুড়ো আঙুলের মাপের আত্মা মাথার খুলি ভেদ করে নির্গত হয়। আধ্যাত্মিক স্তরে আত্মার বিস্তার অনন্ত, কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানবদেহে সেই বিপুল আত্মা কেমন করে বাস করে? স্বভাবতই, আত্মার সঙ্গে নতুন এই পরিচয়ের যুগে এ সব প্রশ্ন মানুষের মনে উঠবেই, তাই নচিকেতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যম এ-জাতীয় নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

সংশয় ও নাস্তিক্যের ধারা

এ সব সত্ত্বেও মৃত্যুর পরে কিছু থাকে অথবা থাকে না— এই দু'রকম লোকপ্রতীতিকে অবলম্বন করে প্রশ্ন এসেছিল; এ ছাড়াও জিজ্ঞাসা ছিল বুদ্ধির স্তর থেকে। উত্তর যখন এল তা ব্রহ্ম এবং আত্মা সম্বন্ধে নানা আচার্যের নানা মতের সমাহার হিসেবেই, এবং সেগুলি যেহেতু বিভিন্ন মানুষের সমাধান বা প্রত্যয়, তাই পরস্পরের মধ্যে কোনও সংহতি ছিল না। যুক্তির স্তরে সংগতিও ছিল না। এটা উপনিষদের সমস্ত স্তরের সমস্ত আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এক তো বিভিন্ন উপনিষদ বিভিন্ন লোকের রচনা, এবং তাঁরা যে যার প্রত্যয় বা উপলব্ধি অনুসারে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুত সংগতিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার বা পরস্পরের মতের সমর্থন করার তাঁদের কোনও দায় ছিল না। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব:

> তিনি একাকী ছিলেন তাই আনন্দ পাননি, দ্বিতীয়কে সৃষ্টি করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন সৃষ্টি করলেন।... প্রথমে শুধু জলই ছিল, তার মধ্যে বীজ নিক্ষেপ করলেন, তাই থেকে সৃষ্টি হল।... তিনি নিজেকে দ্বিদল বীজের মতো দু' ভাগ করলেন এবং দুই অংশ মিলে সৃষ্টি করলেন।

এমনই বহু ধরনের কথা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের দীর্ঘকালের প্রশ্ন ও কৌতূহল নিয়ে আচার্যরা নিজের নিজের উপলব্ধি দিয়ে উত্তর দিচ্ছেন। স্বভাবতই সেগুলির মধ্যে কোনও সংহতি নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালে যে সব সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভাবিত হচ্ছে সেগুলিই বিধৃত আছে উপনিষদের বিভিন্ন অংশে। যেহেতু এই আচার্যরা দাবি করেননি যে তাঁর উপলব্ধিটাই একমাত্র সত্য অথবা অন্যদের উপলব্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তত্ত্বই তিনি উপস্থাপিত করবেন— তাই স্বাভাবিক ভাবেই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য রয়ে গেছে। অনেকটা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো; খণ্ড-খণ্ড ভাবে হাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যারা দ্যাখে তারা কেউই ভুল দ্যাখে না, আবার কেউই সম্পূর্ণ দ্যাখে না। প্রশ্নকারীরা বিভিন্ন সমাধানের মধ্যে যেটি তাদের রুচিসম্মত বা অভিপ্রেত সেটিই মেনে নেয়, বিসংবাদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। উপনিষদে কেউ সার্বিক সংগতি বা মতৈক্য প্রত্যাশাও করেনি, তার অভাব নিয়ে বিচলিতও হয়নি।

আবার পরে বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থানগুলি যখন নির্মিত হচ্ছিল তখন খোঁজ পড়ল সংহতির: বহির্বিশ্ব, জড়জগৎ, জীবজগৎ, শরীর, আত্মা, পরলোক এসব নিয়ে দ্বিধাহীন ঐকমত্যের দাবি উঠল। উপনিষদে তা ছিল না বলে শুরু হল টীকাভাষ্যের, এবং তা চলল প্রায় পৌনে দু-হাজার বছর ধরে। দেড় হাজার বছর পরে শংকরাচার্য তাঁর প্রস্থানত্রয়ে ওই ঐকমত্য দেখাবার জন্যে বিস্তর কসরত করলেন। অসম্ভব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী শংকর নানা রকম ভাবে ভাষ্য নির্মাণ করে একটি সংহতিপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন; এটিই অদ্বৈত বেদান্ত। উপনিষদ থেকে সমস্ত শাস্ত্রসম্ভারকে ব্যবহার করলেন— তাঁর মতের পরিপোষক শাস্ত্র হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপারটা ওইখানেই থামল না; শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ইত্যাদি নানা শাখায় ও মতভেদে এর পরিবর্তিত ও বিবর্তিত সংস্করণ নির্মিত হয়ে চলল। কিন্তু যে-কথা আমাদের প্রতিপাদ্য তা হল, উপনিষদে অধিকাংশ স্থলেই প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের যুক্তিগত সংগতি নেই, এবং মনে হয়, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথাও ছিল না; তখনকার সমাজে চিন্তাশীল মানসজগতে সঞ্চরমাণ অন্যান্য বহু প্রশ্নের আংশিক উত্তর বা উত্তরকল্প আলোচনাতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকত। নচিকেতার প্রশ্ন, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না, এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে যম বলতে লাগলেন পিতৃযান-দেবযান— যার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন আছে উত্তর: থাকে, আত্মা মৃত্যুর পরেও থাকে। এ জীবনে ঠিক মতো আচরণ করলে তার মরণোত্তর গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ আত্মা সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র ইতিবাচক লক্ষণ জানা যায়: এ ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত, এর মাপ বুড়ো আঙুলের পরিমাণ, মৃত্যুকালে এটি মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বিনির্গত হয় এবং কর্ম অনুসারে বিভিন্ন পথে হয় জন্মান্তর নয় মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। একে না বিশ্বাস করলে মানুষের অধোগতি হয় এবং দেবতাদের ঊর্ধ্বে পরমলোকে এর শেষ পরিণতি। স্পষ্টতই, এ সব তত্ত্ব সাধারণ লোক কেবলমাত্র আবছা ভাবেই অবধারণ করতে পারত, এবং যেহেতু তাদের কাছে জীবনসংগ্রামটা কঠিনতর বাস্তব ছিল, তাই তারা এ সব প্রণিধান করে বোঝবার চেষ্টা করার অবকাশ পেত না। এই সময়ের কিছু পরে কর্মবাদ বিবৃত হলে সাধারণ মানুষ জন্মান্তর থেকে ছুটি পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তাদের বোঝানো হল উচ্চত্রিবর্ণের নিঃশর্ত পদসেবা করাই তাদের পরকালের উন্নতির একমাত্র পন্থা।

নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম শুধু মৃত্যুর পর আত্মা থাকে তাই বলছেন না, সাধারণ মানুষের আর-একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিচ্ছেন: আত্মার জন্মান্তর হয়। ঠিক পথে জীবনযাপন না করলে বারে বারেই জন্মাতে হয়— পিতৃযানের পথে। আর যথার্থ জ্ঞানের উদয় হলে আত্মব্রহ্মের একত্বের বোধ জন্মালে পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় ও ব্রহ্মে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করা যায়। 'যাঁকে জেনে মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়— যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি।' (কঠ. ২:৩:৮) তা হলে অমরত্বের পথ হল কোনও সৎকর্ম, সদভিপ্রায়, সদাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান বা লোকহিতকর কোনও ক্রিয়া নয়— জ্ঞান। এ পথটিও নতুন। আরও একটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে চলিত প্রশ্ন, নচিকেতা আলাপের

শুরুতেই যা উচ্চারণ করেছিল, তার অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন উত্তর দেন যম; বলেন, ‘পরমাত্মাকে বাক্য দিয়ে জানা যায় না, মন বা চোখ দিয়েও নয়; যারা আত্মা সম্বন্ধে “আছে” এই কথা বলে, (তাদের এই উপায় ছাড়া) আর কোন্ ভাবে আত্মাকে জানা যায়?’[১] নচিকেতার বাকি প্রশ্নের উত্তর বাকি রইল: যারা বলে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে না তাদের কোনও গতি হয় না, এ-ও এক ধরনের উত্তর যাতে সংশয়ীদের পক্ষে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ বিস্তর সংশয়ী মানুষ সংসারে আছে; সেদিনও অনেকে ছিল; তাদের কী গতি হবে তার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। অর্থাৎ যম যা বলছেন, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, দ্বিবিধ অবস্থান, পুনর্জন্মকে জয় করা, মোক্ষ লাভ করা এ সম্বন্ধে শেষ কথা হল, আত্মা আছে এটি মেনে নেওয়া। যে-সমাজে বহু মানুষ বলে আত্মা নেই, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে না, সেখানে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম একটি ফতোয়া দিলেন। মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে, এ কথা স্বীকার করলে তার পরের ধাপগুলোও কিন্তু এল ফতোয়ার চেহারায়। তা হলে সংশয় নিরসনের যে-উপায় উপনিষদ দিয়েছে তা যুক্তিবহ নয়, প্রমাণসহ নয়, যমের অনুজ্ঞামাত্র: ‘আছে’ বলে বিশ্বাস করতে হবে, না হলে মহতী বিনষ্টি। সংশয়ী একটুও টলল না, বিশ্বাসীর তো প্রথম থেকেই কোনও সমস্যাই ছিল না। অর্থাৎ নচিকেতা যে অত তোয়াজ করেছিলেন যমকে, ‘আপনার মতো প্রবক্তা এ বিষয়ে কোথায় পাব আর’ সেটা তত্ত্বত অমূলক। যম যা ‘জানেন’ তা-ই বললেন; যে বিশ্বাস করে তাকে বোঝালেন; যে করে না তাকে কিছুই দিলেন না।

ভাষার দিক থেকে, আলোচনার আঙ্গিকের দিক থেকে ব্রহ্মোদ্যে বা ওই জাতীয় আলোচনায় পাই প্রশ্নোত্তরের পরম্পরা, যা এক জায়গায় এসে থেমে যায়। তখন প্রশ্নকারীকে ধমক খেতে হয়, ‘মাতিপ্রাক্ষীঃ’— অতিপ্রশ্ন কোরো না, যা জানবার নয় তা জানতে চেয়ো না। মনে পড়ে, নচিকেতাকে প্রশ্ন থেকে নিরস্ত করতে গিয়ে যম বলেছিলেন ‘দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরাঃ’, পুরাকালে এ ব্যাপার (মরণোত্তর সত্তা) সম্বন্ধে দেবতাদেরও সংশয় ছিল। তাঁদের সে-সংশয় কী ভাবে কখন গেল, অথবা আদৌ গেল কি না তার কোনও ইঙ্গিত যম দেননি। বিষয়টির গাম্ভীর্য বোঝাতে এ ভাবে নচিকেতাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। দেবতাদের মৃত্যু নেই এমন কথাই শাস্ত্রে বলে (অমরকোষে ‘অমর’, ‘নির্জর’ এ সব দেবতার প্রতিশব্দ) তা হলে মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না, এমন প্রশ্ন তাঁরা করবেন কেন? অবশ্য স্বয়ং যম এক সময়ে মানুষ ছিলেন, শাস্ত্র তাঁর বিষয়ে বলে, ‘মর্ত্যদের মধ্যে প্রথম যিনি মারা যান— যো মমার প্রথমো মর্তানাম্।’ (অথর্ব: ১৮:৩:১৩)। তা হলে মৃত্যুর পর যমের অস্তিত্বই তো নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর, অবশ্য তিনি পিতৃযান ও দেবযান দুটি বিকল্পেই বাইরে, কারণ তাঁর পুনর্জন্মও হয় না, মোক্ষও হয়নি। দুটি মাত্র বিকল্প যিনি উপস্থাপিত করেছেন, তিনি নিজে এ দুয়ের বাইরেই রয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে নচিকেতা কোনও প্রশ্নও করলেন না।

১. নৈব বাচনে মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ (কঠ. ১:১:১০)

সংশয়ের একটা প্রকাশ প্রশ্নে। প্রশ্ন সংহিতা-সাহিত্য থেকেই আছে— যজ্ঞ ও দেবদেবীর বিষয়ে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রশ্ন যজ্ঞের অনুপুঙ্খ নিয়ে— সংখ্যা, দিক, উপকরণ, প্রণালী নিয়ে— এ সব প্রশ্নের উত্তর প্রায়ই যুক্তিনিরপেক্ষ, অনুষ্ঠানটিকে রহস্যাবৃত রাখবার চেষ্টা। আরণ্যকে ও উপনিষদে সত্যকার প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়ার ধারা দেখা দিল। এখানেও বহু ক্ষেত্রে প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের কোনও সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু যেটা প্রণিধান করবার বিষয়, সেটা হল তখনকার দেশের বাতাসে সংশয়ের অকুণ্ঠ প্রকাশ, তার নিরসনের চেষ্টা, তর্ক, আলোচনা, ব্রহ্মোদ্য এবং গুরুশিষ্য আলোচনার ও বিতর্কের একটি ধারা প্রবর্তিত হয়। প্রশ্নোপনিষদ তো ওই নামেই অভিহিত, কিন্তু অন্যান্য উপনিষদেও দেখি জিজ্ঞাসুরা ইতস্তত যাচ্ছে— গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রবীণ মনীষীদের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হচ্ছে। পুত্র পিতার কাছে, শিষ্য গুরুর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে, এক মনীষী অন্য এক মনীষীর কাছে সংশয়ের সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এই সময়ে বস্তুগত জীবনের ভিত্তিতে নানা পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে সমাজমানসের অধিসংগঠনে বহু সংশয় জাগতে থাকে এবং উত্তর যথাযথ না পেলেও সংশয় প্রকাশ করতে কুণ্ঠা নেই। আলোচনা ও বিতর্ক সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞে যে সব ঐহিক সুখের প্রতিশ্রুতি ছিল সেগুলি সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসুই বিমুখ। অসংকোচে সংশয় প্রকাশ করা, তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া এ যুগের (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের) একটি লক্ষণ। আর প্রশ্নই-বা কত। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মানসক্রিয়া, বহির্বিশ্ব, জীবনমৃত্যুপরলোক, দেবতার ভূমিকা, উৎপত্তি, সংখ্যা, জীবনের পরিণাম, লক্ষ্য, নানা বিষয়ে প্রশ্ন এদের মনে জাগরূক। তা-ও তো আমরা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের— দীন-দুঃখী চাষিমজুর, অন্ত্যজ, প্রাগার্য, নারী ও শূদ্রের বিশিষ্ট সংশয় ও প্রশ্নের কোনও চিহ্নই উপনিষদে পাই না। কিন্তু যা পাই তাতে একটি সজীব মানসিকতার প্রকাশ দেখি। প্রশ্ন-পরম্পরা চলে, পরিণামে কখনও ধিক্কার কখনও-বা পুরস্কার, কিন্তু যে-মনে প্রশ্ন জাগরূক তাকে সহজে নিরস্ত করা যাচ্ছে না বেশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্নোত্তর শিক্ষার একটা স্বীকৃত পদ্ধতিই ছিল। উপনিষদে দেখি ছাত্র ঐহিক থেকে পারমার্থিক নানা বিষয়ে শিখছে গুরুকে প্রশ্ন করে কিংবা আচার্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াসে। অর্থাৎ ততদিনে সংশয় এবং সংশয় থেকে উত্থিত প্রশ্ন ব্যক্ত করা ও তার সমাধানের জন্য যোগ্য মনীষীর কাছে গিয়ে উত্তর খোঁজা— এ ব্যাপারটা একটা সমাজসম্মত শিক্ষাপ্রণালী হয়ে গেছে। বহু বারই জিজ্ঞাসুকে তার প্রার্থিত উত্তর দেওয়া হচ্ছে না। বিকল্প কিছু দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি বার আছে সংশয়ে সম্মুখীন হওয়ার সাহস। এটি সমাজমানসের সুস্থতার একটি লক্ষণ।

সংহিতাব্রাহ্মণে অর্থাৎ যজ্ঞযুগের কর্মকাণ্ডে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল সেগুলি মুখ্যত হল: দেবতারা আছেন কি না, তাঁদের জন্মাতে কে দেখেছে, তাঁরা থাকলেও ভক্তদের প্রার্থনা শোনেন কি না, যে-প্রণালীতে, যে-স্তব ও যে-হব্য দিয়ে তাঁদের আহ্বান করা হয় তা তাঁদের

মনঃপূত হয় কি না, হলেও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা তাঁদের আছে কি না, ক্ষমতা থাকলেও ইচ্ছে আছে কি না। এ ছাড়াও পরলোক আছে কি না এমন প্রশ্নও করা হয়েছে। দেবতা (ইন্দ্র) নেই এমন কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্যই এগুলি অনুত্তরিত প্রশ্নই থেকে গেছে, 'স জনাস ইন্দ্র' বলে নেম ভার্গবের ইন্দ্রের অনস্তিত্ব ঘোষণার যে-উত্তর দেওয়ার চেষ্ট করা হয়েছে, সে-উত্তর বস্তুত উত্তরই নয়। কতকগুলি ঘোষণামাত্র, ফলে প্রশ্নগুলি রয়েই গেছে।

জ্ঞানকাণ্ডে আরণ্যক উপনিষদে প্রশ্নের ধরন পালটে গেছে। প্রথম যুগের কিছু কিছু প্রশ্ন আছে কিন্তু এখন প্রশ্নগুলির পরিসর অনেক বেড়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভব, আচরণ, দেবতাদের আচরণ, মানুষের দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের উদ্ভব, কর্মভূমিকা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য, শরীরের সঙ্গে মনের আপেক্ষিক সম্পর্ক, বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষের শরীরমনের সংযোগ এ সব নিয়ে নানা প্রশ্ন নানা মানুষ করেছে। এ ছাড়াও যে-প্রশ্নটি এই পর্বে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে তা ঠিক জ্ঞানকাণ্ডের যুগের নতুন বিষয় নয়, প্রশ্নটি পুরাতন, উত্তরটিই নতুন। প্রশ্ন হল, মরণোত্তর অবস্থা, এ নিয়ে পূর্বেও মানুষ ভেবেছে, সন্দেহ করেছে, প্রশ্ন করেছে, কোনও উত্তর পায়নি। এখন বারে বারে নানা ভাবে এ প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে; এর তীক্ষ্ণতম প্রকাশ যমের কাছে নচিকেতার প্রশ্নে। প্রশ্নগুলি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বা মৌলিক নয়, সারা পৃথিবীতেই মোটের ওপর মরণোত্তর অবস্থান নিয়ে এই ধরনের প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে, উত্তরগুলি প্রত্যেক দেশে পৃথক। এ দেশে উপনিষদ থেকে শুরু করে পরবর্তী দর্শনপ্রস্থানগুলিতে প্রায় সর্বত্রই বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে উত্তর পায়নি, পেয়েছে কিছু শাস্ত্রীয় অনুশাসন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রথম দিকে ধর্মতত্ত্বই দর্শন ছিল, পরে দর্শনচর্চা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়।

উপনিষদে আমরা যে-স্তরে আলোচনা পাই তা সম্পূর্ণতই বেদনির্ভর। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে, বিশেষত উপনিষদে বেদের আদিপর্ব অর্থাৎ সংহিতাব্রাহ্মণে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দুটি নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হল ওই মৌলিক— মরণোত্তর অস্তিত্ব— প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্যে; সে-দুটি তত্ত্ব হল, দেহাতিরিক্ত আত্মা ও জন্মান্তরবাদ। উত্তর যথার্থ না হলেও এর মধ্যে একটি যুক্তির ছক দেওয়ার চেষ্টা বেশ বোঝা যায়। দেহ যদি সম্পূর্ণত নশ্বর হয় তা হলে মৃত্যুতেই জীবনের চরম পরিসমাপ্তি হয়। তাতে সুখী মানুষের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কোনও আধার থাকে না, পাপীর শাস্তিরও নয়। তাই আত্মা বলে দেহব্যতিরিক্ত একটি সত্তাকে কল্পনা করা হল। বহু সংশয়ের নিরসনের জন্যে এই আত্মাকে বারে বারে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। মানবিক সকল অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে বা বাইরে এর স্থিতি, তাই দেহ সম্বন্ধে আমাদের যা জ্ঞান তা দিয়ে আত্মাকে ধারণা করা যাবে না। অতএব শাস্ত্রকাররা প্রভূত প্রয়াসে এবং নিরলস উদ্যম এই আত্মাকে নেতিবাচক নানা ভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন। ইতিবাচক কিছু বলা বিপজ্জনক এবং অবাঞ্ছিতও, তাই সে-পথ পরিহার করাই নিরাপদ। শুধু অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলে এর পরিমাণ নির্ধারণ করলেন। সুখী ধনী সার্থক মানুষ তৃপ্ত হলেন এই জেনে যে মৃত্যুতেই সব শেষ হয়

না, পরজন্মে আবার সবই ভোগ করা যাবে; কিছু দুঃখী মানুষও সান্ত্বনা পেল এই ভেবে যে, যথাযথ শাস্ত্রসম্মত আচরণ করলে তারা আবার জন্মে এ জন্মে যা পেল না তা পাবে; এ সবের জন্যে জন্মান্তরবাদের আমদানি করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিছু জীবনবিমুখ বৈরাগ্যবান আর জন্মাতে চাইলেন না। আর অগণ্য সাধারণ মানুষ যারা অভাবে, অস্বাস্থ্যে, অনাহারে, বিপর্যয়ে, অত্যাচারে জর্জরিত ছিল তাদের মনে হল: জীবন তো এই, একটানা যাতনা ভোগের ইতিহাস, এর পুনরাবৃত্তি তো যন্ত্রণারই অভিজ্ঞতা। কাজেই তারা এর পুনরাবর্তন থেকে মুক্তি চাইল। অতএব উপস্থাপিত করা হল আত্ম-ব্রহ্ম-ঐক্য তত্ত্ব অর্থাৎ মোক্ষ। ঋগ্বেদের আমল থেকে বহু অনুত্তরিত প্রশ্ন এ ভাবে যেন একটি উত্তরের আভাস পেল। আত্মার সত্তা নচিকেতার মূল প্রশ্নের এবং ঋগ্বেদ থেকে বহুসংশয়িত উক্তির উত্তর। এ আত্মা স্বর্গে বা নরকে চিরদিন থাকে না, এ পৃথিবীতেই ফিরে ফিরে আসে। এতে ঋগ্বেদের সেই বারংবার উচ্চারিত প্রার্থনা: পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম— একশো শরৎ দেখব একশো শরৎ বাঁচব'; 'জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম— উদীয়মান সূর্যকে দীর্ঘকাল ধরে দেখব'— তারই উত্তর। এইখানে আমরা জটিল একটি অবস্থার সম্মুখীন হই: যার পুনর্বার জন্মাবার আগ্রহ নেই তার বিকল্প করণীয় কী? যম বলছেন, ব্রহ্ম যাকে দয়া ক'রে ওই অভেদবুদ্ধি দেন সে-ই মোক্ষকর উপলব্ধি পায়, অন্যেরা পায় না। অর্থাৎ মানুষের হাতে তার মুক্তির কোনও যথার্থ উপায় নেই। অর্থাৎ শেষ প্রশ্নটা অনুত্তরিতই রইল।

সমাজে সংশয় নানা চেহারায় ছিল সংহিতা-যুগ থেকেই, এবং নচিকেতার কথায় আছে নাস্তিক্যও ছিল। নাস্তিক্য সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুম বলে, ঈশ্বরাপ্রামাণ্যবাদী আর বেদাপ্রামাণ্যবাদী অর্থাৎ ঈশ্বর বা বেদকে প্রমাণ বলে যারা মানে না। প্রতিশব্দ বা পর্যায়শব্দ হল বার্হস্পত্য, নাস্তিক্য, লৌকায়তিক (হেমচন্দ্রর অভিধানের মতে)। এদের মধ্যে চার্বাকমত হল, ভূমি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারটি ভূতবস্তুকে স্বীকার করে (আকাশকে ভূত বলে স্বীকার করে না— আকাশভিন্নভূতচতুষ্টয়বাদী)। এ ছাড়া এবং প্রত্যক্ষ ছাড়া এরা অনুমান, উপমান, আপ্তবাক্য স্বীকার করে না— প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ। চার্বাক ছাড়া বৃহস্পতিও এই ধরনের মত পোষণ করতেন। মনে পড়ে দেবতাদের গুরু বা আচার্যের নাম বৃহস্পতি, আর মনে পড়ে যমের উক্তি 'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা'— পুরাকালে দেবতাদেরও সংশয় ছিল; মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না। বৃহস্পতি তার কী উত্তর দিয়েছিলেন জানবার উপায় নেই। কিন্তু পুরাকাল থেকে দেবতা মানুষ সকলে মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না সে নিয়ে সংশয় পোষণ করতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রামাণ্য, অর্থাৎ ঈশ্বরবচন বলে সব কিছু মেনে নেওয়াতে প্রথম থেকেই মানুষের আপত্তি ছিল। পরে আপত্তি বা সংশয়ের সীমা প্রসারিত হল, বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করায়। দুটি অতিলৌকিক প্রমাণই অস্বীকৃত হচ্ছে; ঈশ্বর তো অতিলৌকিক বটেই। আর বেদকে অপৌরুষেয় বলা মাত্রই বেদও অতিলৌকিক হয়ে গেল। মানুষ যখন এ দুটি প্রমাণ মানতে অস্বীকার করল তখন সে যা মানল তা প্রত্যক্ষলোকে এবং মানুষের জগতে সীমাবদ্ধ রইল, তা হল লোকায়ত; দেবায়ত বা লোকাতিগ নয়। এ কথা সত্য যে

প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করলে জ্ঞানের জগৎ খর্ব হয়ে থাকে; তেমন হলে, কলকাতায় বসে আফ্রিকা দেখা যায় না বলে আফ্রিকা অপ্রমাণ হয়, অথবা অশোক আকবর প্রত্যক্ষ নন বলে অপ্রমাণ হয়ে যান। তাই অনেক আটঘাট বেঁধে যথার্থ কাঠামোর মধ্যে অনুমিতি (অনুমান) অর্থাৎ তর্ককে স্বীকার করতেই হয়েছে। বেদের সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে: 'প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যা বোঝা যায় না সেটাকে যা বোঝায় তাই-ই বেদ— প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বুধ্যতে।' এবং, 'বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা।' দুটির বাইরে যে-প্রমাণ তর্কশাস্ত্র স্বীকার করে তা হল, 'শব্দ' অর্থাৎ বেদবাক্য। বাক্য দু'রকমের— আনুষ্ঠানিক বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত— এবং তাত্ত্বিক অর্থাৎ দেবতাদের বিষয়ে বা ধর্ম, নীতি ইত্যাদি অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ বিষয়ের কথা।

বেদবিরোধী প্রস্থানগুলি, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কাছাকাছি যে সব সংশয়বাদী মূল বৈদিক ধর্মধারার বাইরে চলে যাচ্ছিল তাদের তত্ত্বে সংহত হয়ে রয়ে গিয়েছিল দু' রকমেরই সংশয়। এ সব সংশয়ের অনেকগুলিরই অন্তরালে প্রবাহিত ছিল নাস্তিক্য, সম্ভবত সকল সংশয়ী এ বিষয়ে অবহিতও ছিলেন না, তবু মূল সংশয় অনেকক্ষেত্রেই নাস্তিক্যকে স্পর্শ করে, যদিও সর্বদা নয়। সংশয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রইল অনুত্তরিত, অসমাধিত। মানুষ পাঁচ-ছশো বছর ধরে নানা রকম প্রশ্ন করে গেছে, যথার্থ উত্তর মেলেনি। অতএব সংশয়ের তথা নাস্তিক্যের ভিত্তিও রয়ে গেল। আর রয়ে গেল প্রশ্ন করার, তর্ক করার এক সজীব ধারা,— বিশ্ব জ্ঞান চর্চায় যা এক অসামান্য অবদান।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Agarwal, V S 1963 *Hymn of Creation the Nāsadī ya Sūkta,* Varanasi
Armstrong, D M 1973 *Belief, Truth and Knowledge,* Cambridge, U K
Atler Robert 1981 *Sacred History of Prose fiction,* Near Eastern Studies, Vol 22 *The Creation of the Sacred Literature,* University of California Press
Bandyopadhyaya, N C 1945 *Economic Life and Progress in Ancient India,* Calcutta
Banerji, N B 1974. *The Spirit of Indian Philosophy,* New Delhi
Bhattacharji, S 2000. *The Indian Theogony,* Penguin
Bhyattacharji, S 1987 *Doubt Belief of Knowledge,* New Delhi
Blacker, C & Lowe, M (ed) 1977 *Weltformeln der fruhzeit, Die kosmologien der alten kulturen* Köln
Brandon, S G F 1963 *Man and his Destiny in the Great Religions,* Manchester
Burnyat, M (ed) 1983 *The Skeptical Tradition,* Berkeley
Berger Peter: 1969 *The Social Polity of Religion,* Faber and Faber
Berger Peter: 1970 *A Rumour of Angels,* Penguin.
Chakrabarti, A K , Motilal B K 1994. *Knowing from Words,* Dordrecht
Chattopadhyaya, D.P. 1964 *Indian Philosophy,* New Delhi (4th edn 1979)
Chattopadhyaya, D.P. 1977 *What is living and what is dead in Indian Philosophy.* People's Publishing House
Dasgupta, S N 1922 *A History of Indian Philosophy,* Cambridge, U.K (1955).
Frauwallner, E. 1953. *Geschichte der indischen philosophie.* Vol 1, Salzburg
Gupta, U. 1987. *Materialism in the Vedas,* New Delhi.
Geertz, Clifford. 1968. *Islam observed,* Yale University
Geertz, Clifford 1973. *The Interpretation of Culture,* N.Y.
Hallic, P (ed). 1964. *Scepticism· Man and God,* Connecticut
Herman, A.L 1976 *An Introduction to Indian Thought,* New Jersey.
Heesterman, J.C. 1968-69 *On the Origin of the Nāstika* in Wissenschaft Zeitschript für die süd and Ostasiens Band XII-XIII.
Halbfass, W. 1988 *India and Europe,* An Essay in understanding, Suny Press
Halbfass, W. 1991. *Tradition an Reflection,* New York.
Herbert, H & Mauss, Marcel: 1964 *Sacrifice: its nature and function,* London.
Hulin, M. 1979. *L'Hinduisme,* Paris.
Jha, G (ed) 1924. *Tantravārtika,* Vols , I & II, Calcutta, (2nd edn 1983)
Jha, G. (ed) 1900-1904 *Slokavārtika,* Delhi (2nd edn 1995)
Kuiper, F.B.J. 1983. *Ancient Indian Cosmogony,* Delhi
Kulke, H & Rothermund Dietmar. 1995 *A History of India,* London
Kirkegaard: 1952. *Six Existentialist Thinkers,* Routledge and Kegan Paul

Long, A A. 1986 *Hellenistic Philosophy*, Duckworth
Mann, U 1974 *Schöpfungsmythen vom Ursprung und Sinn* Stuttgart
Macnicol, N 1915 *Indian Theism*, London.
Marrett, R R 1914 *The Threshold of Religion*, Oxford
Mittal, K K 1974. *Materialism in Indian Thought*, Delhi
Maser, P 1985 *Knowledge and Evidence*, Cambridge, U K
Mukhopadhyaya, P.K 1985, *Indian Realism: A Rigorous Descriptive Metaphysics*, Calcutta
McClosky, H J.M 1964 'God and Evil' *in God and Evil*, ed Helson Pike, Prentice Hall.
Nakamura, Hajime: 1985 *A Comparative History of Ideas*, Tokyo
Protagoras, Frag 4 *The Sophist*
Patrick, M M 1983. *The Greek Skeptics*, London
Swanson, G E 1964 *The Birth of the gods*, Michigan
Sontheimer, G D. & Kulke H (ed) 1989 *Hinduism Revised*, Delhi
Toporov, V N. 1977 *Les sources cosmologiques des premieres descriptions historioques*, Brukelles
Thomson, G 1955 *Studies in Ancient Greek Society*, Vols. I & II, Lawrence and Wishart, London
Taylor, P B & Auden W H · 1969 *The Elder Edda Selections*, Random House.
Warder, A K 1970. *Indian Buddhism*, Motilal Banarasidas.
Wolf, A 1974 *Religion and Ritual in Chinese Society*, Standord University Press.

ARTICLES

Agassi, J 'Privileged Access'. *Inquiry*, 12, (196), pp. 420-26
Almeder, R 'Truth and Evidence', *Philosophical Quarterly*, 24, (1974), pp. 365-68
Annis, D B 'Knowledge, Belief and Rationality', *Journal of Philosophy*, 74 (1977), pp 219-25.
Barkes, J 'Knowledge, Ignorance and Presupposition', *Analysis*, pp 33-45.
Bronsted Mogens 1967 'The Transformations of the concept of gate in Literature', in Ringgern Helmer (ed). *Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore and Literature*, Stockholm
Corronda Pensa 1972 'The Field of Indian Religions' in U Branchi, C J. Bleeker, A Bausani (ed.) *Some Internal and Comparative Problems in Methods of History of Religions*, Brill
Collins, A 'Reflections on Rg veda X, 129, *Journal of Indo-European Studies*, 3, (1975), pp. 27-81
Kapstein, M 'India's search for self and the beginnings of philosophical perplexities in India', *Religion Studies*, Cambridge, 1988.
Maüer, W H 'A re-examination of Rg veda X, 129, the Nāsadiya Hymn' *Journal of Indo-European Studies*, 3 3, pp 219-37.
Polome, E C 'Vedic Cosmogonies and their Indo-European Back-ground', *The Mankind Quarterly*, 24, (1983), pp 61-69
Sellars, W 'Skepticism and Inquiry', *Philosophical Forum*. 7, (1975-76), pp. 203-07.

DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS

Dictionary of the History of Ideas, 1975
Macmillan Encyclopaedia of Philosophy, 1967.
Macmillan Encyclopaedia of Religion, 1987
Macmillan Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1958.
The New Schaff-Herzog Encyclopaedia of Religious Knowledge, 1958.
Oxford Dictionary of the Christian Church.

আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত

দু'টি কথা

রামায়ণ আকৃতিতে অনেক ছোট। মহাভারতের এক-চতুর্থাংশেরও কম। কাজেই এটা পড়ে শেষ করা এবং রসগ্রহণ করাও কম সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সাধারণ পারিবারিক সমস্যা বাদ দিলে থাকে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সত্যকার জটিলতা খুব কম, ফলে এর রসগ্রহণ করা আপেক্ষাকৃত সহজ। চিরদিনই মানুষ সহজ পেলে কঠিনকে বর্জন করে; এখানেও কতকটা সেই ব্যাপারই ঘটেছে। যাকে সহজ বুঝি তা যেমন সহজে জীবনের অঙ্গাঙ্গী অংশ হয়ে ওঠে, কঠিন তা হয় না। সে দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা। মহাভারতের এই দাবিই তাকে দুরূহতর করেছে। কিন্তু, যে যথাযথ আগ্রহ ও নিষ্ঠায় অন্তর দিয়ে, মহাভারতের মূল সন্ধান করে সে পায় বেশি। জীবননিষ্ঠ জীবনবোধ। মহাভারত এই কারণে মহত্তর। বর্তমান প্রবন্ধটিতে ভারতের দুই মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারতের, যথাক্রমে জনপ্রিয়তা ও জীবননিষ্ঠা নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেছি। 'গাঙচিল' থেকে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সংকলনের জন্য লেখাটি যথাসম্ভব পরিমার্জিত করার চেষ্টা করেছি। এর পাদটীকাগুলি পুণের সংশোধিত সংস্করণের মহাভারত এবং গোরখপুর গীতা প্রেস-এর রামায়ণ থেকে নেওয়া।

রামায়ণের সহজ আবেদন

বেদ ভারতবর্ষের ব্যাপক জনসাধারণের ধর্মগ্রন্থ নয়, তা হল রামায়ণ ও মহাভারত। এ দেশে গত দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ তার সংকটের মুহূর্তে যে গ্রন্থ থেকে দিকনির্দেশ খুঁজছে তা হল এই দুটি মহাকাব্য। অতএব এর পর্যালোচনার দাবিটি উপেক্ষা করা যায় না।

দুটি মহাকাব্যেরই পরিণতি এসেছে একটি বড় মাপের যুদ্ধের পরে। অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ বানরসেনার সাহায্য নিলেন। বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বানররাজ সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠিয়ে সীতার সন্ধান করলেন, এবং পরে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সসৈন্যে গিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধ নির্মাণ করে অন্যপারে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হলেন। বানরসেনা কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, যা অস্ত্রশস্ত্র তা ওই রাম লক্ষ্মণ দু-ভাইয়ের। তারই বা পরিমাণ কত হতে পারে? হনুমান যখন লঙ্কায় গিয়ে ঘুরে সব দেখছিলেন তখন কিন্তু একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানীর সমস্ত সম্ভার এমনকী প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন।[১] যুদ্ধে রাক্ষসসেনা সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র মানুষ সেনার মতোই লড়াই করেছিল। অযোধ্যায় সামরিক প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা যে রকম, লঙ্কাতেও ঠিক সেই রকমেরই ছিল। ব্যতিক্রম বানর সেনা; যারা নিরস্ত্র, শুধু হাতে পাথর ছুঁড়ে, গাছ উপড়ে ফেলে যুদ্ধ করেছিল। রামের সেনা বলতে এরাই। শিক্ষিত রাক্ষসসেনা হেরেছিল এই নিরস্ত্র বানরসেনা এবং দুটিমাত্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা— রাম, লক্ষ্মণের কাছে। এই সাংঘাতিক অসম যুদ্ধে একটা অতিলৌকিক উপাদান থাকবেই এবং ছিলও। গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে আসা এবং সেখানকার ভেষজ বিশল্যকরণীর সাহায্যে যুদ্ধে প্রায়-পরাস্ত হতচেতন লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে আসে। যুদ্ধে মায়া-সীতা দেখানো, রামের মুণ্ড দেখানো এবং নানা মুনিঋষি এবং দেবতাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, এ সবই অলৌকিক ঘটনা।

বিস্তর অলৌকিক ঘটনা সারা রামায়ণ জুড়েই আছে। গল্পের শুরু ঠিক রূপকথার মতোই: এক রাজা, তাঁর তিন রানি, রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার ছেলে হয় না। ছেলে যে হল সে-ও রূপকথারই মতো অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। তার পর কিশোর রাম-লক্ষ্মণকে নিতে এলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর আশ্রমে রাক্ষসরা বেজায় দৌরাত্ম্য

১. সুন্দরকাণ্ড; (৪:৫)

করছে, তাদের ঠেকাতে হবে। প্রথমত, রাক্ষসরা ভয়ানক শক্তিশালী জীব, তাদের হারাতে নিয়ে যাওয়া হল দুটি কিশোরকে। পথে অহল্যার কাহিনিতে দেখানো হল রাম সাধারণ মানুষ নন। যাই হোক, বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাক্ষসদের হারানো, এও প্রায় অলৌকিক ঘটনারই পর্যায়ে পড়ে। তার পরে বিয়ে। ওই কিশোরই হরধনু ভাঙল, যা বড় বড় বীর পারেনি। বিয়ের কিছুকাল পরেই যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময়ে সব কিছু ভেস্তে গেল কৈকেয়ীর আবদারে: কবে তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ দুটি বর দিয়েছিলেন, সেই সুবাদে রামকে বনবাস দিয়ে ভরতকে রাজা করার দাবি তুললেন কৈকেয়ী, এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতির দায়ে রাজাকে তা-ই করতে হল। এখানে রূপকথার অন্য একটি আনুষঙ্গিক অংশ জুড়ল; রাজার ছেলে বনবাসী হল। এটা বহু রূপকথায় ঘটেছে।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গেলেন। এখানে তাঁদের জীবনের দুটি অংশ: এক, দৈনন্দিন জীবনে ক্লেশ, কুঁড়ে ঘরে বাস, ফল পাকুড় এবং শিকারের মাংসে দিনযাত্রা নির্বাহ। এর অবশ্য একটি কাব্যিক দিকও আছে। কিন্তু বনে কখনও বাঘ সিংহ তাঁদের আক্রমণ করেনি, সাপ-বিছে কামড়ায়নি। এত অহিংস জঙ্গল বাস্তবে মেলে না। দ্বিতীয়ত, এখানে ওই সদ্য তরুণ দুটি রাজপুত্র, ধনুর্বাণ, বর্শা, তরবারি দিয়ে হাজার হাজার ভয়ংকর রাক্ষসকে প্রায়ই মেরে ফেলতে লাগলেন। এ অংশটা স্পষ্টতই অলৌকিক। যদি মনে রাখি যে, আদিকাণ্ডের প্রথমার্ধ ও উত্তরকাণ্ড বাদে বাকি অংশটাই আদি রামায়ণ এবং এ অংশে রাম বিষ্ণুর অবতার নন, 'নরচন্দ্রমা',[২] তা হলে সামান্য অস্ত্রে দুটি তরুণের হাতে প্রচণ্ড শক্তিশালী অগণ্য রাক্ষসের মৃত্যু— এ-ও অলৌকিক উপাদান। বনবাস পর্বে কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার ঘটেছে, খরদূষণ-তাড়কা-শূর্পণখা উপাখ্যানে; এরা সবাই রাম লক্ষ্মণের হাতে পরাস্ত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে।

এই নির্যাতনের খবর পৌঁছেছে লঙ্কায়, সেখানে রাজা রাবণ রাম লক্ষ্মণকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছায় সীতা হরণের জন্য মারীচের শরণ নিলেন। মারীচ এল সোনার হরিণের রূপ ধরে; আরও একটা অলৌকিক মাত্রা যুক্ত হল কাহিনিতে। সোনার হরিণ দেখে সীতা জেদ ধরলেন, ওই সোনার হরিণ তাঁর চাই। রাম হরিণের পিছু পিছু গেলেন। কুটীরে লক্ষ্মণ ও সীতা শুনতে পেলেন রামের গলা, 'বাঁচাও'। সীতা জোর করে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামের নিরাপত্তার জন্যে। এ বার কুটীরে একলা সীতার কাছে ছদ্মবেশী রাবণ ভিক্ষা নিতে এসে জোর করে তাঁকে রথে তুলে রওনা হলেন। ছদ্মবেশও একটা অলৌকিক ব্যাপার, পুষ্পক-রথও তাই। লঙ্কায় সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করে রাখা হল, কারণ তিনি রাবণকে ভজনা করতে সম্মত হননি। রাবণ ধমকে বলে গেলেন, দু-মাসের মধ্যে সীতা রাজি না হলে তাঁকে মেরে কেটে খাওয়া হবে।

২. শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ, (১:১১)

এদিকে রাম কুটীরে ফিরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ঘটনাচক্রে সুগ্রীবের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হল, এটাও লৌকিকের সীমা ছাড়িয়ে; মানুষে-বানরে বন্ধুত্ব। বলা বাহুল্য, এ-বানর পরিচিত সলাঙ্গুল বানরের মতো নয়, এরা মানুষের মতো কথা বলে, এবং এদের আচরণও মানুষেরই মতো। চর পাঠিয়ে সুগ্রীব সীতার সন্ধান পেলেন। হনুমান গেল লাফ দিয়ে সাগর পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে— এ-ও অতিলৌকিক ঘটনা। তেমনই অতিলৌকিক পথে রাক্ষসী সিংহিকাকে মেরে ফেলার ঘটনা। রাম লক্ষ্মণ বানরসেনার সাহায্যে যে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করলেন সেও সাধারণ সম্ভাব্যতাকে লঙ্ঘন করে। যুদ্ধে অতিলৌকিক ঘটনা বেশ কয়েকটাই ঘটে, কিন্তু নিরস্ত্র বানরসেনার হাতে ও ধনুর্বাণধারী রামলক্ষ্মণের হাতে সুশিক্ষিত সশস্ত্র রাক্ষসসেনার পরাভব, এইটেই সবচেয়ে বড় অলৌকিক। যুদ্ধের পরে রাম সীতাকে সর্বজনসমক্ষে পরিত্যাগ করলে সীতা চিতারোহণ করেন। দেবতারা ও দশরথ এসে তাঁর 'সতীত্ব' প্রতিপাদন করেন, এটাও অলৌকিক। যেমন অবান্তর পুষ্পক রথে দেশে ফেরা।

কাজেই দেখছি, পদে পদে অলৌকিকতার অবতারণা এবং রূপকথার মতো দুর্বল পক্ষের সবল পক্ষকে পরাস্ত করা এ সবই ব্যবহার করা হয়েছে, কাহিনিটিকে বাস্তব অর্থাৎ মানুষের পরিচিত জগৎ থেকে সরিয়ে অন্য এক স্তরে উন্নীত করবার জন্যে। সেখানে বাস্তব অবাস্তবের ভেদ নেই, গল্পের মধ্যে কাহিনিগত, চরিত্রগত বিশেষ কোনও জটিলতা নেই। যখনই কাহিনির প্রয়োজনে কোনও ব্যাপার ঘটা দরকার, যেটা বাস্তবে ঘটা অসম্ভব, তখনই অতিবাস্তবের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে কাহিনিটির জনপ্রিয় হওয়া আরও সহজ হয়েছে। লোকে বারে বারে সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা পেয়েছে, কাহিনির মধ্যে পেয়েছে রোমহর্ষক উপাদান এবং অলৌকিকের বহুল প্রয়োগ, যা রূপকথার উপাদানের মতো এটিকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে।

জীবনের যে ধরনের মূল্যবোধ রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূলত পরিবারনিষ্ঠ। পিতা-পুত্র (রাম-লক্ষ্মণ ও দশরথ, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ), মাতা-বিমাতা (কৌশল্যা-কৈকেয়ী), পারিবারিক ক্ষমতালোভে ষড়যন্ত্র (কৈকেয়ী-মন্থরার রামের বিরুদ্ধে ভরতের দাবি উপস্থাপন করা), সৌভ্রাত্র্য (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত), ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, (বালী-সুগ্রীব, রাবণ-বিভীষণ), পরস্ত্রীহরণ ও ভোগ বা ভোগের চেষ্টা (রুমা-তারা, সীতা), বন্ধুকৃত্য (জটায়ু-সম্পাতি রামলক্ষ্মণের সহায়তা করেন দশরথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে), দাম্পত্যের ত্রুটি ও বিকৃতি (বালী-সুগ্রীব-রাবণ), অনুচরের আনুগত্য (হনুমান), দাসীর দৌরাত্ম্য (মন্থরা), ভ্রাতৃবধূ-দেবর (সীতা-লক্ষ্মণ), আরও ছোটখাটো শাখায় পল্লবে নানা উপকাহিনিতে এই ধরনের পারিবারিক মূল্যবোধের কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে। সমাজের মানুষ প্রতিনিয়ত অব্যবহিত ভাবে যে সব সম্পর্কের জটিলতার সম্মুখীন হয় এবং প্রায় প্রত্যহ পদে পদে যে সব সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, রামায়ণ সেই নীতি-দুর্নীতি-সুনীতির সম্বন্ধে পারিবারিক ও কতকটা সামাজিক অক্ষাংশে তার সম্বন্ধে দিকনির্দেশ দিয়েছে। পরিবারবদ্ধ সমাজজীবনে মানুষ স্বভাবতই চেয়েছে

পারিবারিক সম্পর্কে সংঘাত ও সংশয়ে মহাকাব্যের কাছ থেকে আচরণের বিধি ও মূল্যবোধের দিশা। পারিবারিক সম্পর্কের সংঘর্ষে কী করণীয়, কেমন ভাবে তা করণীয়, তা দেখাক মহাকাব্য।

খ্রিস্টিয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণ সাম্রাজ্যের কালে ভারতবর্ষে একটি ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ঘটে। এর ফলে প্রচলিত সমাজবিধির বিশ্লেষণ করে নতুন, সার্বিক ভাবে গ্রহণীয় যে আচরণবিধি প্রবর্তিত হল, সেই পরিবর্তিত বিধানই হল এই মূল্যবোধের উৎস। রামায়ণের সমকালীন ভগবদগীতা, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, মনুসংহিতা, সংস্কৃত জাতকের কিছু অংশেও এই মূল্যবোধই প্রতিফলিত। এর বিশদ আলোচনা না করেও সাধারণ ভাবে বলা যায়— জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার বিকল্প, অতএব সর্বতো ভাবে তাঁর বাধ্য হওয়া উচিত। পিতা দেবকল্প, তাঁর আদেশ নির্দেশ একান্ত ভাবেই অলঙ্ঘনীয়।[৩] বন্ধুর দাবি রক্ষণীয়। অনুগতের আশ্রয়স্থল হওয়ার দায়িত্ব আছে। দাম্পত্যে স্বামীই প্রভু, স্ত্রীর স্থান তার অনেক নিচে; কাজেই স্বামীর সেবা ও অভিলাষপূরণ স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। যত দিন দাম্পত্যপ্রেম উভয়ত প্রবাহিত, তত দিন স্ত্রীর একটা স্থান আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ স্ত্রীকেও সন্দেহ বশে বারবার প্রত্যাখ্যান করা সংগত; কারণ সমাজে 'সতীত্ব' একটি সর্বজনস্বীকৃত মূল্য। কিন্তু 'সতী'র কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ না থাকায় স্বামীকে স্ত্রী-র সন্দেহ করার হেতু থাকলেও কোনও অবকাশ থাকে না। বংশমর্যাদা একটি সমাজস্বীকৃত মূল্য। তাই যুদ্ধ শেষে রাম সীতাকে বলতে পারলেন, 'যুদ্ধ করেছি ইক্ষ্বাকু কুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য', অর্থাৎ তোমার জন্যে নয়। তাই যুদ্ধের শেষে অযোধ্যার সিংহাসন পেলেন ভরত, রামের বৈধ উত্তরাধিকারী লব কুশ নয়। শূদ্র ও চণ্ডাল উনমানব, তাই গুহক চণ্ডালের কাছে ফলমূলও গ্রহণ করা যায়নি (যদিও বনবাসী অবস্থায় মুনিঋষিদের আতিথ্য গ্রহণ করতে রামের বাধেনি)।[৪] আর ব্রাহ্মণ সন্তানের বাজারদর চণ্ডালের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি, তাই অকালমৃত ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রাণের মূল্য শোধ করতে হল চণ্ডাল শম্বুককে নিজের প্রাণ দিয়ে। দু-একটা ব্যতিক্রমী চরিত্র বা ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এই হল ওই সময়কার সমাজের মূল্যবোধের ছক। নারীর বা শূদ্রের সামাজিক অবস্থান উচ্চত্রিবর্ণের ও পুরুষের পায়ের নিচে।

ধর্মশাস্ত্র ও সমাজপতিরা যে ছকটি ধরে দিয়েছিল তা নিয়ে রামায়ণে কোনও সংঘাত নেই। মূলত পরিবারনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ এ মূল্যবোধ সরলরৈখিক ভাবে রামায়ণে উপস্থাপিত হয়েছে। এ মহাকাব্যে সাড়া দিতে পাঠক শ্রোতাকে তাই তেমন কোনও মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না। কাহিনিটিকে প্রচুর রূপকথার উপাদানে মণ্ডিত করে, অলৌকিকতায় ভরে দিয়ে সমৃদ্ধ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারীর অবদমন, শূদ্রের সেবকত্ব, চণ্ডালের উপান্তবর্তিত্ব, রাজার গৌরব, স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্ব, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার দেবতুল্য মহিমা প্রচার অতি সহজ ভাবে করা হয়েছে। আরও সহজ হয়েছে এর প্রক্ষিপ্ত অংশে মানুষ রামের বিষ্ণুর

৩. বালকাণ্ড; (১:১১)
৪. অযোধ্যাকাণ্ড; (১১৭:৫, ১১৮-১১৯)

অবতার হয়ে ওঠায়, সীতার লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলে উল্লেখিত হওয়ায়। কেউ কখনও প্রশ্ন করেনি যে, লক্ষ্মীর ত পূর্বজন্মে কোনও পাপ থাকার কথা নয়, তা হলে সীতা শেষ দুটি কাণ্ডে এত নির্যাতন, প্রকাশ্য অপমান, ও বারবার নির্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করলেন কেন। এ কেন'র উত্তর অতিকথায় মিলবে না, মিলবে তৎকালীন আর একটি মূল্যবোধে: স্ত্রী যথার্থ সতী না হলে সন্তানের পিতৃত্ব সংশয়িত হয় এবং সন্তানই তো পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই স্ত্রীর প্রতি অহেতুক সন্দেহের উদ্রেক হলেও তাকে ত্যাগ করা চলে। নইলে ঋষি বাল্মীকি যার সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে উক্তি করেন তাকেও গ্রহণ করতে বাধে স্বামীর? অযোধ্যার লোকে বলেছিল,[৫] পরহস্তাগতা নারীকে যদি রাম গ্রহণ করেন তবে তো আমাদেরও ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হবে। সমাজে এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় মূল্যবোধেরই আধিপত্য এবং এই মূল্যবোধকে ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে রামায়ণ। এক দিকে তার রূপকথাধর্মিতা, অলৌকিকত্ব-সিঞ্চিত কাহিনির অতি সহজ আবেদন, অন্য দিকে মানুষ যে মানদণ্ড ধরে নির্দ্বন্দ্বে জীবন অতিবাহিত করতে চায় তার এমন সরল উপস্থাপনা—কাজেই রামায়ণের জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবীই ছিল। এ মহাকাব্যে সাড়া দিতে হলে কোনও বিশেষ নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না, যা কিছু নৈতিক সংঘাতের উপাদান ছিল কাহিনিতে তার নিঃসংশয় সমাধান ঘটেছে; পাঠকশ্রোতা আদর্শ হিসেবে এ মূল্যবোধ মেনে নিলে তাকে বড় কোনও মানসিক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয় না। সাধারণ পাঠক এ-ই চায় এবং রামায়ণ কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করে তাকে এটাই দিয়েছে, কাজেই সমগ্র আর্যাবর্তে রামায়ণের অপ্রতিদ্বন্দ্ব জনপ্রিয়তা ঘটেছে। রামায়ণে কিছু কিছু নৈতিক সংঘাত অবশ্যই আছে, সেগুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য, তবু সেগুলি সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশ সংঘাতই পাঠককে উদ্ভ্রান্ত বা যন্ত্রণাতুর করে তোলে না। পরিমাণগত ভাবে তাই এই কাব্যের সংকট এর সহজ আবেদনকে জটিল করে তোলেনি।

৫. উত্তরকাণ্ড; (৪৩:১৯)

মহাভারতের দ্বন্দ্ব

মহাভারতে কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কগুলি রামায়ণের মতো আদর্শ ভাবে চিত্রিত নয়। অযোধ্যায় প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে বিমাতার বিদ্বেষ রামচন্দ্রের বনবাসের হেতু, কিষ্কিন্ধ্যায় বালী-সুগ্রীবের বিরোধ ও লঙ্কায় বিভীষণের পক্ষে জ্যেষ্ঠের আনুগত্য ত্যাগ, ব্যতিক্রমী ঘটনা বলতে এই ক'টিই। না হলে দশরথের চারটি পুত্রের মধ্যে আদর্শ সৌভ্রাত্র্য, মৃত্যুকালে বালী ও সুগ্রীবের পুনর্মিলন ও সুগ্রীবের হাতে বালীর নিজপুত্র অঙ্গদকে সমর্পণ, লঙ্কায় রাবণ, শূর্পণখা, কুম্ভকর্ণের সৌভ্রাত্র্য (যেমন জটায়ু সম্পাতিরও), এবং সর্বত্রই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য, পিতার প্রতি পুত্রের বাধ্যতা— বন্ধুদের মধ্যে সখ্য, গুরুজনদের প্রতি বশ্যতা, এ সব নৈতিক আদর্শ অনুসারেই চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতে প্রাথমিক বিরোধই হল এক বংশের দুই ধারার মধ্যে তৎকালীন সম্পর্কে যারা ভাই। বিরোধ সম্পত্তি অর্থাৎ সিংহাসনে অধিকার নিয়ে এবং বিষয়টি সত্যিই জটিল, সহজে সমাধেয় নয়। যুধিষ্ঠিরের জন্ম আগে, সে দিক থেকে সিংহাসনে তাঁর অগ্রাধিকার; কিন্তু তাঁর জন্ম পাণ্ডুর ঔরসে নয়, এবং পাণ্ডুর প্রজনন ক্ষমতা না থাকা তাঁর অধিকারকে বিসংবাদিত করে। তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বও তৎকালীন আইনে সিংহাসনে তাঁর অধিকারকে সংশয়িত করে। কাজেই বিষয়টি জটিল ও সমস্যাসংকুল।

রামায়ণে সীতাকে হরণ করে কামুক এক রাক্ষস; মহাভারতে দ্রৌপদীর ওপরে কামনা ছিল দুর্যোধন ও কর্ণের। হরণ না করলেও প্রকাশ্য সভায় তাঁর অকথ্য অসম্মান ঘটায় যারা, তারা সম্পর্কে তাঁর ভাসুর; এবং জড়বৎ আচরণ করে সে অসম্মানকে সহ্য করেন যাঁরা তাঁরা তাঁর শ্বশুর। রামায়ণে সম্পর্কে শ্বশুর-স্থানীয় (দশরথের সখা) জটায়ু বন্ধুপুত্রের বধূকে অবমাননা থেকে রক্ষা করতে চেয়ে প্রাণই দিলেন। দ্রৌপদীকে একবার জয়দ্রথ হরণ করে, কিন্তু স্বল্প কালের মধ্যেই সে দণ্ডিত হয় এবং ওই হরণের অভিযোগে— পরপুরুষের স্পর্শের দোষে— সীতাকে রাম যেমন প্রত্যাখ্যান করেন, পঞ্চপাণ্ডবের মনে কিন্তু দ্রৌপদীহরণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বৈকল্য দেখা দেয়নি।

রামায়ণের যুদ্ধ দূরদেশবাসী অনাত্মীয়, অপরিচিত, শত্রুপক্ষ রাক্ষস রাবণের সঙ্গে; মহাভারতে তা নয়। ওখানে কারণটা খুব সঙ্গত ছিল; রাবণ রামের স্ত্রীকে হরণ করেছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠির পৈত্রিক অধিকারে সিংহাসন দাবি করলে শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করা হয়। যুধিষ্ঠির খেলায় দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু রাজি না হলে সম্মানহানি

হবে এ আশঙ্কায় রাজি হন এবং একে একে সব কিছু পণ রেখে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিলে তিনি একে একে স্বামীদের মুক্তি চেয়ে নিলেন। তখন আবার শকুনিকে দিয়ে কর্ণ ও দুর্যোধনের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানান এবং দ্বিতীয় বারেও একে একে সমস্ত সম্পত্তি, চার ভাইকে, নিজেকে ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে হারিয়ে শর্ত অনুসারে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে বনে চলে যান।[১]

এই উপাখ্যানের মধ্যেই নিহিত আছে মহাভারত সম্পর্কে জনসাধারণের সংবেদনে একটা গুরুতর প্রত্যবায়। দ্রৌপদী যে প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিত হলেন এ ব্যাপারটার কোনও সরব প্রতিবাদ তেমন হল না। প্রথম দ্যূতসভায় বিদুর প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর তো কোনও সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা এমনকী পারিবারিক প্রতিপত্তিও ছিল না, যার বলে লোকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে; ফলে সে কথা উচ্চারিত হল বটে, কিন্তু উপেক্ষিত হল সম্পূর্ণ ভাবে। দ্বিতীয় দ্যূতসভায় বিকর্ণ সকলের বিবেকের কাছে আবেদন করলেন এই বলে যে, কাজটা ক্ষত্রিয় নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ন্যায়নীতিরও বিরুদ্ধ। কিন্তু বিকর্ণ এমন কেউ নন যে, লোকে তার কথায় সাড়া দেবে। বলা বাহুল্য, বিদুর ও বিকর্ণ পাঠক শ্রোতার প্রতিবাদই উচ্চারণ করছেন এবং জীবনে যেমন প্রায়শই ঘটে তেমনই, এখানেও সুবিচারের জন্য আবেদন উপেক্ষিত হল। এক অর্থে এই-উপেক্ষার মধ্যেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার অভিঘাত পাঠকের বিবেক ও বোধের কাছে তীব্রতর হল এবং সমস্ত ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলল। এখানে মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা কী দেখছে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র এঁরা চুপ করে রইলেন, ন্যায়নীতির কোনও প্রশ্ন তুললেন না। বনবাস ও অজ্ঞাতবাস পাণ্ডবদের, কিন্তু অপমান ও লাঞ্ছনা প্রধানত দ্রৌপদীর।

দ্রৌপদী কে? একজন বিবাহিতা নারী, যাঁর স্বামী তাঁকে পণ রেখে জুয়া খেলে হেরেছেন। অর্থাৎ যে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা বিপদ অসম্মান থেকে, সেই স্বামীই স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ঠেলে দিলেন তাঁকে মর্মন্তুদ অপমানের মধ্যে। নারীকে অপমান করা এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপায় নয়। শ্রোতা-পাঠকদের খানিকটা বিস্ময় উদ্রেক করলেও ব্যাপারটা বিবমিষা উৎপাদন করেনি। কিন্তু অবচেতনে সকলেরই একটা অস্বস্তি ছিল: দ্রুপদরাজকন্যা অপূর্ব রূপবতী, বহুগুণবতী, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নারী যে প্রকাশ্য রাজসভায় অবমানিত এবং কেশাকর্ষণ, বেশাকর্ষণের মতো জঘন্য নির্যাতন ভোগ করলেন, এতে পুরুষশাসিত ও পুরুষপ্রধান সমাজের মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে এর কোনও প্রতিবাদ না দেখেও অন্তরের অন্তঃস্থলে অবশ্যই কতকটা বিচলিত বোধ করেছিলেন। কারণ সমস্তটাই ছিল প্রথম থেকে অনিবার্য: যুধিষ্ঠির জানতেন জুয়াখেলা পাপ, একবার হেরেও তাঁর চৈতন্য হয়নি, দ্বিতীয় বার সে পাপে যোগ দিলেন শকুনির মতো দুরাত্মার আহ্বানে। তার পর পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা

১. সভাপর্ব; (৫৩:২৮-৩৩)

যুধিষ্ঠির পণ রাখেন কোন অধিকারে? বড় ভাই পিতার মতো মাননীয়, কিন্তু বড় ভাই যেখানে বাকি চার ভাইয়েরও স্ত্রীর স্বামী, সেখানে তাঁর অন্য এক দায়িত্ব; জ্যেষ্ঠাধিকারের একটা সীমা আপনিই সংকুচিত হয়, তাই সেখানে যুধিষ্ঠির অন্যায় করেছেন। দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ছিল প্রতিকার্য, এবং সেটা নিবারণ করার দায় ছিল স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর, গুরু-আচার্যদের, সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজের এবং সমগ্র পুরুষ সমাজের। বিদুর, বিকর্ণ, আর ভীম ছাড়া ক্ষত্রিয়োচিত, পুরুষোচিত এবং মানবোচিত প্রতিক্রিয়া কারও কাছেই পাওয়া যায়নি। পাঠক এতে কী ভাবে সাড়া দেবেন? সাহিত্যের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা চিত্তবিনোদন, রামায়ণ তা স্পষ্টতই স্বীকার করেছে; এ কাব্যে মনোরঞ্জনের উপকরণ প্রচুর। কিন্তু যেহেতু মহাকাব্য একটা যুগের, একটা জাতির অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে, তাই তার মধ্যে মহত্ত্বের উপাদান সঞ্চার করে ধর্মসংকট। দশরথ, রাম, রাবণ, ভরত, মারীচ, বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও সীতার জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এ সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমগ্র কাব্যের কলেবরের অনুপাতে তার পরিমাণ কম। তীব্রতাও স্বল্পস্থায়ী, তাই চিত্তবিনোদনই অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মহাভারতে এই অনুপাত ঠিক বিপরীত; মনোরঞ্জনের তুলনায় আপাত বিভ্রান্তি ও সংকটই প্রাধান্য পেয়েছে।

এই ঘটনাটি মহাভারতকে দুটি স্পষ্ট ভাগে খণ্ডিত করে দেয়; এর আগে কৌরবরা বহু অন্যায় করেছে ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডবরা কৌশলে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়নীতি সম্বন্ধে দোলাচলচিত্ত ছিলেন, কখনও গান্ধারী, বিদুর বা কৃষ্ণের কথায় আত্মগ্লানি বোধ করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই কর্ণ শকুনি দুর্যোধনের মতে সায় দিয়েছেন।[২] কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, পুত্রবধূর এই নির্যাতন, দুঃশাসনের প্রকাশ্য অন্যায্য আচরণ, দুর্যোধনের অসহ্য অপমানকর কটূক্তি, কর্ণের নীচ, অশালীন ইঙ্গিত, এই সব জেনেশুনেও সিংহাসনে স্থির ভাবে বসে থাকা, ন্যায়নীতিবোধের সমস্ত প্রেরণা উপেক্ষা করা, এর দ্বারাই ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরবরা পরম পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। অত্যাচারিত পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরের প্রথম অন্যায় (পাশা খেলায় রাজি হওয়া) সত্ত্বেও, ছলনার দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে অসহায় ভাবে স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখতে বাধ্য হওয়ায়, এবং প্রতিজ্ঞা অনুসারে সুদীর্ঘকালের জন্য বনে যেতে বাধ্য হওয়ায় সাধারণ শ্রোতাপাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করে। একা ধৃতরাষ্ট্র নন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এঁরাও এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেন। গান্ধারী, বিকর্ণ ও বিদুর বাদে কেউই মনুষ্যত্বের ন্যূনতম সাক্ষ্য রাখতে পারলেন না। অথচ ব্যাপারটা সত্যিই তো জটিল। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, তিনি জানতেন অক্ষক্রীড়া পাপ, তবু খেলেছেন। জানতেন, খেলায় তাঁর দক্ষতা নেই, জানতেন শকুনি শঠ ও চতুর প্রতিপক্ষ, কাজেই জয়ের সম্ভাবনা নেই, তবুও খেলেছেন। কাজেই এখানে শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষে কৌরব-পাণ্ডব সম্বন্ধে পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় কোনও পক্ষ সুনিশ্চিত ভাবে স্থির করা যতটা কঠিন,

২. সভাপর্ব; (৬৮:১,২)

কোনও পক্ষে রায় দেওয়াও সেই কারণে ততটাই কঠিন। ঘটনা এখানে জটিল, জটিলতর নৈতিক মূল্যবোধের আপাত-বিপর্যাস। জনসাধারণ চায় ভালমন্দ সাদা-কালোর মতো সহজে বিভাজ্য হোক, তা হলে শ্রোতা বা পাঠকের সাড়া দেওয়াতে কোনও সমস্যা থাকে না। যেখানে তেমনটি হয় না, সেখানে পাঠকের দ্বিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য তার প্রতিক্রিয়াকে সংশয়িত করে তোলে। এমন সাহিত্য আর যাই হোক, সাধারণ ভাবে জনপ্রিয় হয় না।

এ ছাড়াও মহাভারতে পদে পদে নৈতিক মূল্যবোধে নানা সংঘাত ও সংঘর্ষ চোখে পড়ে। দুর্যোধন যখন পুরোচনের সাহায্যে গূঢ় ভাবে জতুগৃহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের সেখানে বাস করতে পাঠালেন তখন বিদুর কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে এ খবরটি পাঠান। যে রাত্রে তাঁরা পালাবেন সে রাত্রে কুন্তী এক নিষাদী ও তাঁর পাঁচটি পুত্রকে নিমন্ত্রণ করে সুখাদ্যে ও সুরায় মত্ত অবস্থায় নিদ্রিত রেখে অগ্নিসংযোগের পূর্বেই পাঁচ পাণ্ডব পুত্রসহ পূর্বনির্মিত ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যান।[৩] মহাকাব্যের পক্ষে পাণ্ডবদের বেঁচে থাকা দরকার, কারণ তারা দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ কৌরবদের ধ্বংস করবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কিন্তু পাঠক কি কোনও মতে ভুলতে পারে কুন্তীর নিজের সন্তানদের বাঁচানোর এই অপকৌশলের ফলে নিরীহ ছ'টি নিষাদ প্রাণ দিতে বাধ্য হল?[৪] আবার দেখুন, সমাজে নিষাদের অবস্থিতি আর্যদের নিচে। কাজেই এখানে প্রাণের যে আপেক্ষিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত একান্ত মানবিক নীতির নিরিখে তাকে মেনে নেওয়া কঠিন। নিষাদ নিচুস্তরের মানুষ, পাণ্ডবদের বাঁচাবার জন্যে ছলনার সাহায্যে যদি তাদের মরতে হয় তো ক্ষতি কী? ক্ষতি জাতিবর্ণবিভক্ত সমাজ হয়তো সহসা নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু অবচেতনের মনুষ্যত্ব নিশ্চয়ই বোঝে, সম্পূর্ণ নিরীহ মানুষ শুধু নিম্নবর্ণে জন্মানোর দাম দেবে উচ্চবর্গীয় মানুষকে প্রাণ দিয়ে বাঁচানোর জন্য— এটা ন্যায়নীতির সীমা লঙ্ঘন করে। আবারও দেখি, পরিস্থিতি এমন যে পাণ্ডবদের অগ্নিদাহে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গেলে এ ছাড়া পথও ছিল না। অথচ এ পথটি পঙ্কিল, অতএব নীতির দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পথ নয়। সাধারণ পাঠক এখানে এই মুহূর্তে কী ভাবে সাড়া দেবে? মূল মহাকাব্যের তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলতে বাধ্য হবে কুন্তীর কৌশলটির বিকল্প ছিল না, অথচ সাধারণ মানুষের বিবেকেও একটি কাঁটা ফুটে থাকে: কাজটা সত্যিই ঠিক হল কি? এই কাঁটা রামায়ণের তিনটি ব্যাপারে— বালী-বধ, সীতাপরিত্যাগ ও শম্বুকবধেও বড় করেই ফোটে, অন্তত ফোটা উচিত। কিন্তু রামায়ণ তিনটি ক্ষেত্রেই নানা বাগ্‌জাল বিস্তার করে তখনকার সামাজিক মূল্যবোধকে সমর্থন করেছে: উনমানব বালীর বধ রামচন্দ্রের নিজের স্বার্থসিদ্ধির (সীতা উদ্ধারের) জন্যে, পরপুরুষস্পর্শে দুষ্ট নারী স্বামীর পক্ষে 'অভোগ্যা' বলে সীতাপরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণদানের জন্যে চণ্ডাল শম্বুকের অনিবার্য প্রাণহরণ। এতে রামায়ণ সরল হয়েছে; কিন্তু মহাভারতে পদে পদে দ্বন্দ্ব; জটিল তার পথ।

৩. আদিপর্ব: (১৩৬:৭-১৩)
৪. আদিপর্ব; (১৩৭:৭-৯)

মহাভারতের মহত্তম দ্বিধা

পূর্বের মতো একই ধরনেরই একটি প্রশ্ন মহাভারতে আছে, একলব্য উপাখ্যানে। আপাত দৃষ্টিতে এক চণ্ডাল লোকচক্ষুর অগোচরে মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর সামনে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করছিল। কাজটা ধর্ম-বিরুদ্ধ নয়, চণ্ডাল শিকার করে, ধনুর্বিদ্যায় জ্ঞান তার পক্ষে প্রয়োজনীয়। সে চণ্ডাল বলে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য-রূপে স্বীকার করবেন না, কাজেই বেচারার গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা (উচ্চমানের ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করা) সফল করতে গেলে এ ছাড়া পথও ছিল না। বেশ চলছিল, যতক্ষণ না সে তার বিদ্যায় এমন উঁচুমানের শিক্ষার পরিচয় দিয়ে ফেলল যা অর্জুনেরও সাধ্যাতীত। অর্জুন দ্রোণাচার্যের কাছে নালিশ করতে দ্রোণাচার্য দেখলেন অর্জুনের মনস্কামনা পূর্ণ না হলে তাঁর নিজের প্রতিপক্ষ দ্রুপদের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া দুঃসাধ্য হবে, অতৃপ্ত অর্জুন তাঁর তৃপ্তিবিধান নাও করতে পারেন। তা ছাড়া একলব্য চণ্ডাল বৈ ত নয়, অতএব দ্রোণাচার্য ফতোয়া দিলেন, 'গুরুদক্ষিণা দাও ওই আঙুল ক'টি— যা দিয়ে ধনুকে জ্যা রোপণ করে, শরনিক্ষেপ করা যায়।' হাসিমুখেই দিলেন একলব্য এবং মহাকাব্য এর পর তাঁকে ভুলে গেল। এই উপাখ্যানও সহজ নয়, বহুমুখী এর সমস্যা: চণ্ডাল নিম্নবর্গের মানুষ, তার প্রাণের আপেক্ষিক মূল্য সামান্য; অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় উন্নতমান লাভ করবেন, তাঁর কাছে দ্রোণের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ছিল। কার্যকালে তাঁকে দিয়ে ইষ্টসিদ্ধি করতে হবে, অতএব তাঁকে বিমুখ করা চলবে না, এ পর্যন্ত বেশ সহজ। কিন্তু ঘটনা তো এইটুকুই নয়। একটি অন্ত্যজ বালক নিভৃতে অন্যথা-দুষ্প্রাপ্য দ্রোণাচার্যকে গুরুর আসনে বসিয়ে সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠা সহকারে এমন একাগ্র সাধনা করেছে যে তার কৃতির সামনে অর্জুন পরাঙ্মুখ, তাকে আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে শঙ্কিত হন। এই দীর্ঘ দুরূহ গোপন সাধনার এমন অসামান্য সিদ্ধি, যেখানে দ্রোণাচার্যের কল্পিত পদতলে বসে সে অর্জন করেছে, সেখানে এই নৈপুণ্য, সাধনা, নিষ্ঠা, একান্ত আত্মবিলোপের কী মর্যাদা দিলেন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগুরু, ক্ষত্রিয় শিষ্য? গুরু দেখলেন শিষ্যের ক্ষোভ, শিষ্য দেখলেন দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব, তার মর্মস্থানে আঘাত করে তার সাধনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার জন্যে ওই ধনুঃসাধক আঙুল কটিই দক্ষিণা দিতে হল। আপাতস্তরে এ ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু কী নিষ্ঠুর, কী অমানবিক এ গুরুদক্ষিণা! এমন দক্ষিণা গুরুই বা নেন কেমন করে এবং তাঁর প্রিয়শিষ্য তাঁকে নিবারণ না করে সমর্থনই বা করে কী করে? কেমন করে একটি চণ্ডাল

বালকের স্বপ্ন-সাধ-সাধনা-দীর্ঘ তপস্যা পদদলিত করে অনায়াসে বিজয়ীর মতো সেখান থেকে নিষ্ক্রমণ করেন গুরু-শিষ্য, যেখানে রক্তাপ্লুত অঙ্গুলিহীন করতল মৃণ্ময় গুরুমূর্তির দিকে উদ্যত রেখে হতোদ্যম ব্যর্থ তরুণটি সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে পাঠকও, এবং স্বস্তি পায় না, কারণ একটি মানুষের এমন সুন্দর এক স্বপ্নসাধনা, হোক না সে চণ্ডালের, সে তো দ্রোণকেই গুরু মেনেছিল! সেই দ্রোণের এক কৃতী শিষ্যের মনস্কামনা পূরণ করতে অজ্ঞাতপরিচয় একটি নিষাদের সুকঠোর সাধনার কঠিন সিদ্ধির মুহূর্তে তার ওপর নেমে এল আত্মবিলোপের নির্দেশ।

আবার দেখছি, কোনও ঘটনায় সাড়া দিতে গেলে প্রথমে তার বহুমুখী ব্যাপ্তি ও সম্ভাবনার মুখোমুখি আসতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে এর সম্ভাব্য বিকল্প কী। না পেলেও আত্যন্তিক অর্থে ঘটনাটি যে হীন, মর্মান্তিক এবং আচার্য শিষ্য উভয়েরই সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মিয়ে দেয়, এ প্রতিক্রিয়া পাঠক এড়াতে পারেন না। ফলে তার প্রতিক্রিয়া দ্বিধাবিভক্ত, কখনও বা বহুধা বিভক্ত হয়, তাই একটা অসন্তোষ একটা নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য থেকেই যায়।

মহাকাব্যের প্রথমাংশেই বেশ কিছু কাহিনি পাঠক শ্রোতাকে চিন্তায় ফেলে। শান্তনুর ছেলে দেবব্রত, গঙ্গার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহের সন্তান। জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে সিংহাসনে তাঁরই অগ্রাধিকার। শান্তনু প্রেমে পড়লেন সত্যবতীর সঙ্গে, কিন্তু সত্যবতীর শর্ত তাঁর আপন সন্তান সিংহাসনে অধিকার পাবে। শান্তনু এত বড় অন্যায্যতাটাতে রাজি হতে পারছিলেন না, কিন্তু অচরিতার্থ প্রেমের তাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। বুঝতে পেরে দেবব্রত সত্যবতীকে আশ্বাস দিলেন সিংহাসনের অধিকার তিনি ত্যাগ করবেন। সত্যবতীর সংশয় ঘোচে না, যদি দেবব্রতর পুত্রের এ ঔদার্য না থাকে? তখন দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি ব্রহ্মচর্য আচরণ করবেন। এ কঠোর ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যে তাঁর নাম হল ভীষ্ম। দেবব্রত চিরকুমার থাকার উদার অঙ্গীকার তাঁকে মর্যাদা দিয়েছে, মহনীয় করে তুলেছে তাঁর পিতৃভক্তিকে। কিন্তু সম্পর্কটি তো একতরফা নয়। এ অঙ্গীকার গ্রহণ করার অর্থ: শান্তনু যে সুখের জন্য এত বড় ত্যাগ গ্রহণ করলেন, সেই গ্রহণের দ্বারাই তিনি আপন আত্মজকে প্রেমের ও দাম্পত্যের সুখ থেকে বঞ্চিত করলেন; বঞ্চিত করলেন বংশধর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বংশের ধারা সৃষ্টি করার সমাজে চিরস্বীকৃত অধিকার থেকে। শান্তনু সত্যবতীর বিবাহ হল;[১] কুরু পাণ্ডব, মহাভারতের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ এঁদেরই সন্ততি। চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্রবীর্য দুই ছেলে। চিত্রাঙ্গদ দুরাচার, গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধ তিনি নিহত হন। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে ভীষ্ম নিয়ে এলেন কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে, কিন্তু সন্তান জন্মের পূর্বেই তাঁরও মৃত্যু হল।

পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর এক পুত্র ছিল ব্যাস। ঘটনাচক্রে শান্তনুর দুই পুত্রেরই মৃত্যু হলে সিংহাসনে পুত্রের দাবি কায়েম করার জন্যে পূর্বে সত্যবতী একটি নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করেছিলেন: দেবব্রতকে চিরকুমার ব্রত নিতে হয়েছিল। এত করেও কিন্তু তাঁর বা তাঁর

১. আদিপর্ব; (১২৩:৩৫)

স্বামীর কোনও পুত্র বা পুত্রদেরও কোনও সন্ততিরই সিংহাসনে অধিকার হল না। প্রথমে সত্যবতী যখন শান্তনু ও দেবব্রতর সঙ্গে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দরাদরি করেছিলেন, তখন সত্যবতীর প্রতি পাঠকের এক রকম সহানুভূতি উদ্যত হয়, ধীবর কন্যাকে রাজা ক্ষণভোগ্যার মতো গ্রহণ করে অল্প দিন পরেই ভুলে যেতে পারতেন, তাই এই শর্ত। কিন্তু পিতার প্রেমকে সার্থক করার জন্য ভাবী বিমাতার কাছে চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এটা এতই নিষ্ঠুর ও অমানবিক যে, এতে সাড়া দেওয়া পাঠকের পক্ষে কঠিন। নিরপরাধ দেবব্রতকে স্বাভাবিক জীবন থেকে চিরবঞ্চিত থাকতে হল। পিতার প্রেমোন্মাদকে চরিতার্থতা দিতে গিয়ে, প্রেমকে তিনি নিজের জীবনে জানতে পারলেন না। অর্থাৎ ঘটনাটির দুটি দিক আছে: সত্যবতীর স্বার্থের দিক, যার একাংশ শান্তনুরও স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন, আর অন্য একটা দিক হচ্ছে সত্যের প্রতি আনুগত্য; তাঁকে আমরণ কঠোর ব্রত মেনে নিতে হল এঁদের সুখবিধানের জন্য। পাঠক দ্বিধান্বিত বোধ করে প্রেমের সার্থকতা এবং নির্দোষ এক তরুণের আমরণ কৌমার্যের প্রতিজ্ঞার মধ্যে। যখন রাজমাতা হওয়ার জন্যে সত্যবতীর এই উদগ্র আকুতি পদে পদে ব্যর্থ হয়, এবং শান্তনুর সিংহাসনে বসে সত্যবতীর কানীন পুত্রের ঔরস জাত সন্তান, তখনও হয়তো পাঠক বিষণ্ণতার সঙ্গে একটা ন্যায়সঙ্গত বিধান দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। যা বলতে চাইছি তা হল: মহাভারতের ছোট বড় প্রায় কোনও উপাখ্যানেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া সরল, একমাত্রিক নয়। এই বহুমাত্রিক সংবেদনই মহাভারতের বৈশিষ্ট্য।

সিংহাসন নিয়ে এই ধরনের আরও একটি উপাখ্যান শকুন্তলা-দুষ্যন্তর কথা। গল্পটি বিখ্যাত, কিন্তু সেখানেও দুষ্যন্তকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, শকুন্তলার সন্তানই রাজা হবে। গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিয়ে করবার পরই দুষ্যন্ত শকুন্তলার কথা সব ভুলে গেলেন। শকুন্তলা বালকপুত্র সর্বদমনকে নিয়ে রাজসভায় যেতে দুষ্যন্ত বালকের পিতৃত্ব, গান্ধর্ব বিবাহ সবই অস্বীকার করলেন। তখন শকুন্তলা কঠিন ভাষায় তীব্র অনুযোগ করলেন, বললেন, 'আমার দায়িত্ব নিতে হবে না। কিন্তু তোমার সন্তানকে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষেক কর বা না কর ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার।' দুষ্যন্ত স্বীকার না করলেও দৈববাণী শকুন্তলার কথার সত্যতা প্রমাণ করল, দুষ্যন্ত পুত্র ও শকুন্তলাকে গ্রহণ করলেন।[২] এই পুত্রই বংশকর পুত্র, পরে এর নাম হয় ভরত, কুরু পাণ্ডব যার বংশের শাখাপ্রশাখা। এ উপাখ্যানেও এমন বস্তু আছে যাতে সাড়া দেওয়া কঠিন। গান্ধর্ব বিবাহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন নয়, কিন্তু যে সময়ে মহাকাব্য সম্পূর্ণতা লাভ করছে সে সময়ে গান্ধর্ব-বিবাহ ক্রমশ অচল হয়ে আসছিল। তার পরে প্রকাশ্যে রাজসভায় এক নারী এমন এক পুরুষকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছে, ভর্ৎসনা করছে, যে-পুরুষ বিবাহ সম্বন্ধই অস্বীকার করছে। দৈববাণী অলৌকিক; সমাধান এল সে পথে; কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এই স্বাধীনচেতা নারীর আচরণ শ্রোতা বা পাঠককে কতকটা বিভ্রান্ত করে। গোপন বিবাহে জাত এই সন্তান বংশকর পুত্র হয়ে উঠল, কিন্তু তার পূর্বে তাকে

২. আদিপর্ব: (৯৪:৮৮-৯০, ৯২)

উপলক্ষ্য করে তার জননী রাজাকে কটুকথা বলে যাচ্ছে অনর্গল, এটা বরদাস্ত করা হয়তো সহজ হয়নি সামাজের পক্ষে, কারণ ব্যাপারটায় কিছু জটিলতা আছে এবং জটিল ব্যাপারে সাড়া দেওয়া কঠিন। তাই তার জনপ্রিয়তা বড় একটা ঘটে না।

যে-বেদব্যাস মহাকাব্যের রচয়িতা তাঁর জন্মের ইতিবৃত্তেও একই রকম এক ঘটনা। নৌকা বাইত মেছুনির মেয়ে; পারানির সময়ে তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন ঋষি পরাশর। না, বিবাহ নয়, কোনও দায়িত্ব নয়, শুধু ক্ষণ-সম্ভোগের আহ্বান। কৌমার্য ফিরে পাবে সে-মেয়ে, গায়ের যে গন্ধের জন্যে তার দুর্নাম 'মৎস্যগন্ধা' বলে', তা ঘুচে যাবে, সন্তান কৃতী হবে, ইত্যাদি বরে তাকে প্রলুব্ধ করলেন। জন্ম নিল কালো ছেলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।[৩] লক্ষণীয়, ঋষি পরাশর সত্যবতীকে সম্ভোগ করার জন্য তাকে কিছু কিছু বর দিলেন বটে কিন্তু তার সম্বন্ধে বা তার গর্ভজাত সন্তানটির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব স্বীকার করলেন না। ঋষিত্বের একটা দিক উন্মোচিত হল। দ্বৈপায়ন, কেননা এক দ্বীপে তমিস্রার আবরণ সৃষ্টি করে মৎস্যগন্ধাকে গ্রহণ করেছিলেন ঋষি। কাজটা প্রচলিত অর্থে দুর্নীতির, অথচ সেই ছেলেই হল বেদব্যাস। মানতে মুশকিল থেকে যায়, মহাভারতের রচনার শেষ পর্বের পাঠকেরও, পরবর্তীদের তো বটেই। কিন্তু অকুণ্ঠ নিরাবরণ এই বর্ণনায় কোথাও দুর্নীতিকে সুনীতিতে পরিণত করার চেষ্টাও নেই। জনপ্রিয়তার পথে এতে এক ধরনের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়: সমাজে যা ভ্রষ্টাচার, তারই ঋষি-আচরিত সংস্করণকে মেনে নিতে হবে আর এক মহর্ষির জন্মকথা বলে।

কুন্তি এক ঋষিকে সেবায় তুষ্ট করলে তিনি একটি মন্ত্র শিখিয়ে বর দেন, সে মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করলে তিনি আসবেন। তরুণী কুন্তির কৌতূহলে এলেন সূর্য, তাঁর বরে কুন্তির পুত্র কর্ণের জন্ম। আক্ষরিক অর্থে এ কাহিনিকে বিশ্বাস করা যায় না। মূল কথাটা বোঝা যায়, কর্ণ প্রাসাদের বা প্রাসাদে অভ্যাগত কোনও ব্যক্তির জারজ সন্তান; কুন্তির কুমারী কন্যা অবস্থায় তাঁর জন্ম বলে কর্ণের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা কানীন। কিন্তু কুন্তি তো কুমারী, কেমন করে স্বীকার করবেন কানীন এই পুত্রকে? ধাত্রীর সাহায্যে এক পেটিকায় শুইয়ে তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।[৪] কোনওদিন কর্ণ ক্ষমা করেননি জন্মক্ষণেই জননীর এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা। অথচ কুমারী কুন্তি কোন ভরসায় সে পুত্রকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে লালন করবেন? তিনি তো তখন জানতেন না যে যাঁর সঙ্গে পরে তাঁর বিবাহ হবে তিনি স্বয়ং প্ররোচনা দিয়ে তিনটি ক্ষেত্রজ সন্তানকে জন্ম দিতে বাধ্য করবেন কুন্তিকে। অতএব, কর্ণের জন্মক্ষণে যেহেতু কুন্তির সে আশ্বাস ছিল না, তাই তাঁর বিকল্প আচরণের সুযোগও ছিল না। ব্যাপারটা উভয়পক্ষেই মর্মন্তুদ, তাই কুন্তির আচরণের এবং কর্ণের ক্ষোভের বিচার করতে পারে না পাঠক। পারে না বলে দুঃখ পেলেও নৈতিকতা নিয়ে বিচলিত বোধ করে,

৩. আদিপর্ব; ৬৯:৩৭

৪. আদিপর্ব; ৫৭:৭১

আরও বেশি এই জন্যে যে, একদিন কুন্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর্ণকে আত্মপরিচয় দিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করতে অনুনয় করেন। যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হন কুন্তি, সূর্যপুত্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দলত্যাগী হতে সম্মত হতে পারেন না।[৫] কিন্তু যে দ্বিধা অনুক্ষণ পাঠকের মনে অস্বস্তি আনে তা হল ঘটনাটির বহুমুখীনতা। জন্মক্ষণে পরিত্যাগও যেমন অনিবার্য ছিল, কর্ণকে পক্ষত্যাগ করতে অনুরোধ করাও তেমনই অনিবার্য। এ অনুরোধের পশ্চাতে শুধু কি অর্জুনের কল্যাণকামনা? চির-অতৃপ্ত যে মাতৃত্ব অপরিণত ভীরু কুমারীকে নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তার প্রায়শ্চিত্তের কোনও বাসনাই কি এর মধ্যে নিহিত ছিল না? শত্রুপক্ষীয় পাণ্ডবদের জননী বলেই, অথবা হয়তো জন্মক্ষণে সন্তানপরিত্যাগিনী বলে কর্ণের পক্ষে সহজ হয়নি জননীকে সত্যকার পরিচয়ে মাতৃত্বের স্থান দেওয়া। তিনি তো জানতেন অধিরথ ও রাধা তাঁর পালক পিতামাতা মাত্র, কুন্তিপুত্র হওয়ার গৌরব ত্যাগ করলেন বৃহত্তর সত্যরক্ষার জন্যে, কিন্তু কাজটা সহজ হয়নি। তাই পাঠকের পক্ষেও সহজ হয়নি এ-ঘটনায় সংবেদন নিরূপণ করা। নৈতিক বিচার যেখানে যথার্থ ভাবে প্রযোজ্য হয় না, বিষয়টির অন্তর্নিহিত জটিলতার জন্যে, সেখানে তা শ্রোতা বা পাঠককে বাধ্য করে চিন্তা ও মননের দ্বারা একটি সমাধানের সৃষ্টি করতে এবং হয়তো এ সমাধানও সকলের এক রকম হয় না। ললাটে কুঞ্চনরেখা নিয়েও অকুণ্ঠিত প্রশংসা করে চিন্তাশীল পাঠক। বাকিরা দ্বিধার মধ্যে পড়ে এবং ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গিয়ে সহজ সরল ঘটনা, বর্ণনার সন্ধান করে। জনতার প্রিয় নয় এমন বস্তু; জনতা অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করে এর সুগভীর আবেদন, কিন্তু সেটা আবেগ ও মননের মিশ্র সংযোগে নির্মিত হয়, তাই যথার্থ বোদ্ধা ছাড়া এর মর্মে প্রবেশ করা কঠিন। তাই এ বস্তু আপন উৎকর্ষের মহিমায় আসীন থাকে, ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না।

৫. আদিপর্ব; (১০৪:১৩)

মহাভারতে নৈতিক অভিঘাত

ছোটখাট উপাখ্যানের মতোই মহাভারতের কাহিনিতে বৃত্তের কেন্দ্রীয় উপজীব্যেও এবং কাহিনির তাৎপর্যে সাড়া দেওয়া, রামায়ণের সরলরৈখিক কাহিনিতে সাড়া দেওয়ার চেয়ে কঠিন। রামায়ণের কলেবর মহাভারতের এক-চতুর্থাংশ, এই কারণে রামায়ণে ঘটনার পারম্পর্য মনে রাখাও অনেক সহজ। মহাভারতের ঘটনার বিস্তৃতি ও জটিলতা, চরিত্রের সংখ্যা ও পরস্পরের সংঘাত— এ সবই এ-কাব্যের দুরূহতার কারণ। কিন্তু মূল দুরূহতা এর নৈতিক অভিঘাতে পাঠকের সাড়া দেওয়ার সমস্যায়। উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও স্ত্রী— এই ক'টি পর্বেই মূলত যুদ্ধকাণ্ড বিবৃত হয়েছে। উদ্যোগ পর্বে দু' পক্ষই কতকগুলি যুদ্ধের শর্ত স্বীকার করে নেন: শত্রুকে পিঠের দিকে আঘাত করা চলবে না; অধোনাভি আঘাত করা চলবে না; যে শত্রু ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম চাইছে বা কোনও কারণে সময় চাইছে তাকে সময় দিতে হবে— এমনকী প্রয়োজনে সাহায্যও করতে হবে। সূর্যাস্তের পরে যুদ্ধ করা যাবে না এবং নারী বা শিশুকে আঘাত করা অশাস্ত্রীয়।[১] এই সব শর্ত করার পরে দু'পক্ষের প্রস্তুতি— অস্ত্রশস্ত্র, সেনাপতি নিরূপণ, আগত রাজা ও সৈন্যদলের কর্তব্য নির্ধারণ, ব্যূহরচনা, যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে দু'পক্ষে গোপন মন্ত্রণা। তার পর যুদ্ধের নির্দিষ্ট দিনে উষাকালে কৌরবের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ। পাণ্ডবদের অনুগত রাজা, রাজন্য ও সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্যে ব্যূহবদ্ধ করা।

সব আয়োজন শেষ, এখন যুদ্ধ আরম্ভের সূচনা করবে যে-শঙ্খধ্বনিটি শুধু তারই প্রতীক্ষা। নাটকীয় প্রতীক্ষার মুহূর্তে। ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির পাণ্ডব-শ্রেণি ছেড়ে ছুটে গিয়ে একে একে কৌরবপক্ষে দণ্ডায়মান বয়োবৃদ্ধ, যশোবৃদ্ধ আচার্য ও সেনাপতিদের পায়ে পড়ছেন, বলছেন, 'যেমন করে হোক, এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করুন। এ ঘটতে দেওয়া অন্যায়, আপনারা থামান এ যুদ্ধ।' কী বললেন কুরুপক্ষীয় যশস্বী, বর্ষীয়ান, তেজস্বী আচার্য ও সেনাপতিরা? 'অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥— পুরুষ অর্থের দাস: অর্থ কারও দাস নয়। আমরা

১. উদ্যোগপর্ব; (১৪৪:১১-১৪)

কৌরবদের কাছে অর্থের দ্বারা বদ্ধ, অতএব, ক্লীবের মত বলছি, যুদ্ধবিরতি ছাড়া আর কোনও প্রার্থনীয় থাকে তো বল।'[২]

এই নাটকীয় ঘটনায় প্রশ্ন ও উত্তর দুটিই এমন জটিল যে সহজে কোনও সাড়া জাগে না। কেন? ছুটে যাচ্ছেন কে? পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, বিধিমতে কুরুরাজ্যের সিংহাসনে যাঁর জ্যেষ্ঠাধিকার। এর আগে পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে তাঁর হয়ে সে-অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে জানানো এবং দীন ভাবে আজ তাঁর এই শান্তিভিক্ষা, এ দুটোই তাঁর পক্ষে ধর্মত্যাগ। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মের দুটো সমাজস্বীকৃত সংজ্ঞা ছিল. বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম। বর্ণধর্মের নিরিখে ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য তাঁর ন্যায্য অধিকার আদায় করবার জন্যে এ যুদ্ধ করা। আশ্রমধর্মের নিরিখে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে ছিলেন। সে আশ্রমে ধর্ম, অর্থ এবং কাম তাঁর লক্ষ্য এবং সাধনের বিষয়। এ দুই দিক থেকেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যা করলেন তা অধার্মিক। পাঠক শ্রোতা তাঁর মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত ও পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাব দেখে, এ ব্যাপারে অসহিষ্ণু বোধ করে। অতএব পাঠকের এ প্রতিক্রিয়া যথার্থই বিধিসঙ্গত।

তবে যুধিষ্ঠির এমন কাজ করলেন কেন? তিনি কাপুরুষ, অশাস্ত্রজ্ঞ বা মূর্খ তো ছিলেন না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে আন্তর অশান্তি তাঁকে পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে কুরুসিংহাসনে অধিকার ত্যাগ করতে প্ররোচনা দিয়েছিল, সেই অশান্তি, অস্থৈর্য ও অনিশ্চিত-বোধই তাঁকে এ-কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। স্বজনঘাতী যুদ্ধের বিনিময়ে কুরুসিংহাসনও তাঁর কাম্য মনে হয়নি, কারণ ক্ষত্রিয় ধর্মের চেয়েও তাঁকে অনুপ্রাণিত করছিল মানবধর্ম। যে কোনও কারণেই হোক, হিংসা, নরহত্যা, ভ্রাতৃ-রক্তপাত তাঁর কাছে নিতান্ত ঘৃণ্য ও গর্হিত মনে হচ্ছিল। আরও বেশি এই কারণে যে, এই মূল্যে সিংহাসনের অধিকার লাভ করার চেষ্টা তাঁর কাছে অমানবিক মনে হয়েছিল। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কৃত্যের চেয়ে মানবধর্মকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই এত দীন ভাবে গুরুজনদের পায়ে পড়ে যুদ্ধ ও ভ্রাতৃহত্যা নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন।

এটাই কিন্তু সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার কাছে প্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি শঙ্খধ্বনি শুনে ক্ষত্রিয়দর্পে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করবেন, কেননা তাঁর পক্ষে এটি ধর্মযুদ্ধ। অতএব তাঁর আচরণ সমর্থন করা দূরে থাক, পাঠকের কাছে এটা ভীরু কাপুরুষতার মতোই ঠেকে; তাদের তিনি হতাশ করেন। আর মহারথী আচার্যরা কী বললেন? অমানবিক ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধ বন্ধ করবার কোনও সাধ্য তাঁদের নেই, কারণ তাঁরা কৌরবপক্ষের কাছে অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মহারথীরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে কৌরবপক্ষ সমর্থন ও আশ্রয় করেছেন, কৌরবরা অন্যায় যুদ্ধের প্রবর্তন করছেন জেনেও। এই সব আচার্য কৌরব, পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই শ্রদ্ধেয়, গুরু বা গুরুকল্প। যুধিষ্ঠিরের মতোই সাধারণ পাঠকও তাঁদের কাছে জীবনের উন্নততর মূল্যবোধ প্রত্যাশা করে। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা স্বীকার করলেন তাঁরা

২. ভীষ্মপর্ব: (১:২৯-৩২)

কৌরবদের অন্নদাস, অতএব, 'ক্লীবের মত কথা বলেছেন'। যুদ্ধ থামাবার নৈতিক অধিকার তাঁরা খুইয়ে বসে আছেন— অর্থের জন্যে কৌরবদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ তাঁরা ন্যায়-অন্যায় যথাযথ ভাবে বুঝেও অন্ন-ঋণ অস্বীকার করতে পারেন না। বিদ্যায় জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই আচার্যরা জীবনে মহৎ আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে অন্যায় পক্ষে থেকে অগৌরবের মৃত্যু বরণ করলেন। এর করুণ দিকটি শ্রোতাদের স্পর্শ করে; সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের বহুমুখীনতার সামনে এসে হতবাক বোধ করেন তাঁরা। এ কেমন আচার্য? মাথা উঁচু করে যাঁদের দিকে তাকানোর কথা, তাঁদের উক্তিতে কী অপরিসীম দৈন্য। ন্যায়নীতি, আত্মমর্যাদাবোধ আচার্য-পদের গরিমা সবই ধূলিলুণ্ঠিত হল, একদিন অর্থের জন্যে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলে। স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে কী মর্মান্তিক দুঃখেই না সে ভুলের মূল্য শোধ করতে হয়। শ্রদ্ধেয় আচার্যদের মুখে এই অশ্রদ্ধেয় স্বীকারোক্তি পাঠককে নৈতিক মূল্যবোধের সংঘর্ষের মুখোমুখি নিয়ে আসে: আচার্য বলে শ্রদ্ধা করবে, না, স্বার্থবুদ্ধিতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে তাঁরা আজ 'ক্লীবের মত কথা বলছেন' বলে ঘৃণা করবে? যুগপৎ দুটোই অর্থবহ এবং সে কারণে পাঠকের প্রতিক্রিয়া দ্বিধান্বিত ও সংশয়াকুল হয়ে ওঠে।

যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, এমন সময়ে অর্জুন বেঁকে বসলেন: স্বজনের রক্তের পথ বেয়ে তিনি সিংহাসনের অধিকার চান না। এখানেও ক্ষত্রিয় বর্ণধর্ম এবং তারও ওপরে যার স্থান নেই মানবধর্মের সংঘাত।[৩] এ দুটি ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল্যবোধকে প্রতিহত, পরাস্ত করছে মহাভারতের ও কিছু পূর্বকালের বৌদ্ধ মূল্যবোধের অহিংসা-নীতি। ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধেও অহিংসা পরম ধর্মরূপে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে সত্য, কিন্তু যেখানে বৈদিক ধর্মাচরণে পশুবধ আবশ্যিক, সেখানে হিংসা ত ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গরূপেই থেকে গেছে। এর উর্ধ্বে কোনও বিশুদ্ধ মানবিক মৈত্রী, সর্বজীবে দয়া ও অহিংসার নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই বর্ণধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কি যুধিষ্ঠির ও অর্জুন? খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ষষ্ঠ শতক থেকে জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিক ও অমনই বিস্তর বেদপ্রতিবাদী প্রস্থানের প্রভাবে আর্যাবর্তে যে নতুন বাতাস বইছিল, তার মধ্যে অহিংসা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। মহাভারত রচনা শুরু হয় সেই সময় যখন এই অহিংসাবাদ বৈদিক ধর্মাচরণকে অস্বীকার করছে যখন; মানবমৈত্রী ও করুণা বিকল্প ধর্মাচরণে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। কাজেই তখনকার মহাকাব্যের নায়ক হিংসাকে বর্জন করে উর্ধ্বতন এক আদর্শকে বরণ করবেন, এটা প্রত্যাশিতই ছিল। পাঠক ও শ্রোতা কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন, কারণ বর্ণধর্ম তো সমাজ-অনুমোদিত ধর্ম এবং সেই কারণে অবশ্য-পালনীয়। ক্ষত্রিয় যখন স্বধর্ম পালন করতে পরাঙ্মুখ হল, তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের কাছে প্রত্যাশিত আচরণ না পেয়ে পাঠকের চিরাভ্যস্ত হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়। এবং তখন এ কাব্যে সাড়া দেওয়ার জন্যে পাঠককে নতুন করে, স্বতন্ত্র ভাবে ভাবতে হয়। এই

৩. ভীষ্মপর্ব; (৪১:৩৬-৭, ৫১-২, ৬৬-৭, ৭৭-৮)

ভাবে ভাবতে বাধ্য করে যে কাব্য, তা নিয়ে পাঠকের স্বস্তি থাকে না। রামায়ণ দু-একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া তাকে ভাবায় না; বরং গল্প বলে, প্রচলিত মূল্যবোধগুলিই পুনর্বার পরিবেশন করে, মনোরম বর্ণনায় তাকে মুগ্ধ করে। যা সে জীবনের ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করে এসেছে পারিবারিক সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে, তাকেই সে পাচ্ছে বারে বারে নতুন নতুন উপাখ্যানের পরিবেশে। কোথাও ধাক্কা লাগছে না, বরং তার অভ্যস্ত বিশ্বাসভূমির ওপরে দাঁড়িয়েই নবতর ভূমিকায় সে-বিশ্বাসের সমর্থন পেয়ে সে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছে তার পুরনো অভ্যস্ত বিশ্বাসগুলিকে। এতে আছে স্বস্তি, যার থেকে আসে কাব্যের জনপ্রিয়তা।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল সারথি কৃষ্ণের কাছে: যাদের জন্যে লোকে বেঁচে থাকতে চায়, সেই অতিপ্রিয় আত্মীয়দেরই হত্যা করে, যে-বিজয়, যে-কীর্তি, যে-রাজ্য, তা আমি চাই না। মূলত এটা যুধিষ্ঠিরের বিবেকদংশনেরই নতুন এক উচ্চারণ। কোনও আচার্যের কাছে নয়, স্বয়ং কৃষ্ণের কাছে। যুধিষ্ঠিরকে কৃপ, দ্রোণ, ভীষ্মরা যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত আত্মগ্লানি, মূল্যবোধের প্রতারণা। কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বললেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর:

> তুমি যাদের মারবে তাদের কর্ম তাদের আগেই মেরে রেখেছে, তুমি নিমিত্তমাত্র হও, সব্যসাচী। এ তো সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে'। তা ছাড়া, কেউই ত আসলে মরে না, শস্যের মতো ক্ষণিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আবার উজ্জীবিত হয়। এদের তো তুমি কোনও ফল লাভের আশায় মারছ না; নিষ্কাম ভাবে ফলপ্রত্যাশা ত্যাগ করে তোমার ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম তুমি কর।

এ ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ ধরে কৃষ্ণ অর্জুনকে নানা দার্শনিক যুক্তি দিলেন— প্রক্ষিপ্ত অংশে এর দৈর্ঘ্য আঠারো অধ্যায়। সত্যকার যুদ্ধের প্রাক্কালে দু'পক্ষ একক কৃষ্ণের উপদেশ অতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছিল এটা অবাস্তব। যাই হোক, কিছু অংশও যদি বলে থাকেন ওই মর্মে, তা হলে তার প্রত্যেকটারই উত্তর ছিল: শত্রুর কর্মই যদি তাকে আগে থেকে মেরে রেখে থাকে, তা হলে অর্জুন তাকে পুনর্বার হত্যা কেন করবেন? বিশেষত, তার এবং শত্রুর কাছে যখন এটা বাস্তব মৃত্যুরই রূপ নেবে। স্বজনহত্যার মতো এমন নিষ্ঠুর কর্মে 'নিমিত্ত'ই বা হবেন কেন? শস্যের মতো শত্রু যদি পুনর্জাত হয়, সে তার নির্দিষ্ট পরমায়ুর শেষে শয্যায় প্রাণত্যাগ করুক না কেন? যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তাকে হনন করা কেন? সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধটা তো মোটেই নিষ্কাম নয়— সিংহাসনটা কৌরবরা পাবে না পাণ্ডবরা, লড়াই তাই নিয়েই; অতএব উভয়তই এটা সকাম। অর্জুন মনের মধ্যে নিষ্কাম হলে তো এ যুদ্ধ থেকে তাঁর সরে থাকাই উচিত, যেমন ছিলেন বলরাম। এ ছাড়া আরও অনেক যুক্তিগত, তত্ত্বগত ফাঁক আছে, তার আলোচনা অন্যত্র করেছি।[৪] এখানে লক্ষ্য করতে হবে, পাঠকের প্রতিক্রিয়া: অর্জুনের অত্যন্ত

৪. আমার 'গীতা নিয়ে প্রশ্ন' রচনা দ্রষ্টব্য

মর্মান্তিক যুক্তি ও মানবিক জুগুপ্সাতে সকলে সাড়া দিতে পারে; আবার জুগুপ্সা ক্ষত্রিয়োচিত নয় বলে পাঠকের মনে এতেও দ্বিধার উদয় হয়। গীতায় অর্জুন শ্রোতা, কিন্তু তাঁর দ্বিধার শেষ নিরসনটা কৃষ্ণ যুক্তি দিয়ে করতে পারেননি, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দর্শন প্রস্থান উপস্থাপিত করেও বুঝলেন, অর্জুনের প্রথম আত্যন্তিক ব্যাকুলতা ঘোচেনি। তখন কৃষ্ণ জাদুর অবতারণা করলেন। অর্জুন দেখতে পেলেন কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বজাগতিক রূপে প্রকাশিত।[৫] এ অংশটা অতিলৌকিক; বর্ণনা যতই চিত্তগ্রাহী হোক না কেন, এটার সাহিত্যিক চরিত্র কিন্তু রূপকথাধর্মী এবং সাধারণ পাঠকের সাধারণ দ্বিধাসংশয় এতে উড়িয়েই দেওয়া হল। ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম অনুসারে আচরণ করতে যিনি বলছেন তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ; যুক্তিতে যতই ফাঁক থাক, বক্তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। কাজেই অর্জুন যুক্তির উত্তরে পেলেন জাদু এবং স্তম্ভিত হয়ে কৃষ্ণের বশ্যতা স্বীকার করলেন। পাঠক ভেবে দেখে না যুক্তির স্তরে প্রতিযুক্তি কতটা নিশ্ছিদ্র। নির্বাক বিস্ময়ে জাদুতে বিমূঢ় হয়ে উদ্যত সংশয়কে নিরস্ত করে। এই কৌশল রামায়ণেও বারবার দেখেছি: লৌকিক সংকটের সমাধান অতিলৌকিকে। সেখানেই রূপকথাধর্মী রামায়ণের জনপ্রিয়তার একটি সূত্র; গীতার জনপ্রিয়তারও, অন্তত এর শেষাংশের।

৫. ভীষ্মপর্ব; (৩৩:৯)

ভীষ্ম: চিন্তার সংঘাত

আঠারো দিনের যুদ্ধের প্রথম দশ দিনের সেনাপতি ভীষ্ম। বয়সে প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, আশির ওপরে বয়স, কিন্তু সেনাপতির ভূমিকায় যুদ্ধ করছেন তরুণের মতো।[১] দিনের পর দিন পাণ্ডব কৌরব দু'পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হচ্ছে, নিপুণ সেনাপতির যুদ্ধকুশলতায় কৌরবদের পরাজয়ের লক্ষণ নেই, জয়েরও না। পাণ্ডবরা, বিশেষ করে যুধিষ্ঠির, কোনও কিনারা দেখতে পাচ্ছেন না; বিপর্যস্ত বোধ করা ছাড়া। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একদিন যুদ্ধ শেষে ভীষ্মেরই দ্বারস্থ হলেন। তাঁরা তো জানতেন যে পিতাকে সুখী করবার জন্য তিনি চিরকৌমার্য স্বীকার করবার পরে পিতা তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়েছিলেন; কাজেই ভীষ্ম নিজে মৃত্যুবরণ করতে না চাইলে, নেই তাঁকে বধ করার আর কোনও পথই। তা ছাড়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করলেও পাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্য তিনি পরামর্শ দেবেন। কাজেই পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি বললেন, এ রকম ক্রমাগত লোকক্ষয়ে তিনিও ক্লান্ত ও বিচলিত। এমনিতে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করবার সাধ্য কারওরই নেই। কিন্তু, তিনি যুদ্ধে বিমুখ, রুগ্ন, ভীষণ ভাবে আহত, নিরস্ত্র সৈন্য বা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না— এ তাঁর দীর্ঘকালের সংকল্প। পাণ্ডবদের চেষ্টা হবে যাতে তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেন, যাতে অর্জুন অনায়াসেই তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন।

দীর্ঘকাল পূর্বে যখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের জন্য বধূসংগ্রহ করতে গিয়ে কাশীর তিন রাজকন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করে আনেন, তখন অম্বা তাঁকে জানান যে তিনি মনে মনে শাল্বরাজের বাগদত্তা। শুনে ভীষ্ম নিজে তাঁকে শাল্বরাজের কাছে দিয়ে আসেন। কিন্তু অম্বা পরপুরুষের জন্যে নীত হয়েছিলেন বলে, শাল্বরাজ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। এই প্রত্যাখ্যান অপমানিত, ক্রুদ্ধ, নিষ্প্রতিকার এই অবস্থার জন্য ভীষ্মকেই দায়ী করে অম্বা তপস্যায় দেহত্যাগ করলেন; সংকল্প নিলেন, তিনি যেন জন্মান্তরে ভীষ্মের মৃত্যুর নিমিত্ত হন। বিদর্ভরাজ পুত্রের জন্য সাধনা করলে অম্বা কন্যা হয়ে তাঁর ঘরে জন্মালেন, যদিও শিব বলেছিলেন পরে এ কন্যা পুত্রত্ব লাভ করবেন। পরে তিনি স্থূণাকর্ণ যক্ষের পুরুষত্ব লাভ করেন, বিনিময়ে সেই যক্ষ নারীত্ব প্রাপ্ত হয়।[২] সেই অম্বাই বিদর্ভরাজকন্যা শিখণ্ডী, আপাতত ধার করা পুরুষত্বে

১. ভীষ্মপর্ব (১১১:১); দ্রোণপর্ব (১:৩৩)
২. 'অর্জুনস্য ইমে বাণাঃ শিখণ্ডিন'; ভীষ্মপর্ব (৬৮:৩০)

পুরুষ। কিন্তু ভীষ্ম তো জানেন বাস্তবিকপক্ষে শিখণ্ডী নারীই, কাজেই পূর্ব সংকল্প অনুসারে তার বিরুদ্ধে ভীষ্ম অস্ত্রধারণ করবেন না। এখন অর্জুন যদি তাঁর রথের সামনের দিকে শিখণ্ডীকে বসিয়ে যুদ্ধ করেন তা হলে তাঁর অস্ত্র ভীষ্মকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সামনে শিখণ্ডী থাকায় ভীষ্ম নারীবধের আশঙ্কায় অস্ত্রমোচন করতে পারবেন না। এই ভাবেই, একমাত্র এই ভাবেই, পাণ্ডবরা ভীষ্মকে পরাস্ত করতে পারবেন; অন্যথা ভীষ্ম নিজে এত শক্তিমান, সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ যোদ্ধা যে, সম্মুখ সমরে তাঁকে পরাজিত করবার সাধ্য আর কোনও বীরেরই নেই।

পরদিন তাই হল; অর্জুন শিখণ্ডীকে রথের সামনের দিকে বসিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শিখণ্ডী তখন পুরুষ, যোদ্ধাও, তিনি শরনিক্ষেপ করছেন ভীষ্মের বিরুদ্ধে। তাঁর সমস্ত ক্ষোভ, গ্লানি, অপমান মোচনের সুযোগ এসেছে— ভীষ্মকে বধ করে এ বার সে সবের প্রতিশোধ নিতে পারবেন। তাঁর থেকে অর্জুনের বাণ নিক্ষেপের পার্থক্য ভীষ্ম ভাল করেই বুঝতে পারছেন, বলছেন এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, অর্জুনের। কিন্তু যুদ্ধ করতে গেলেই শিখণ্ডী আহত হবে আর ভীষ্ম জানেন শিখণ্ডী প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ জন্মসূত্রে নারী, তাই তিনি অস্ত্রসংবরণ করলেন। তার পরের যুদ্ধটা একতরফা। শিখণ্ডী যথাসাধ্য অস্ত্রমোচন করছেন, কিন্তু অর্জুন যথার্থ সুশিক্ষিত নৈপুণ্যে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন। মহাভারত বলছে: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর যে দিন প্রথম বৃষ্টি নামে, মানুষ যেমন বাইরে বেরিয়ে শরীর পেতে দিয়ে সে বৃষ্টিধারা গ্রহণ করে তেমনই করে ভীষ্ম সারা শরীরে অর্জুনের বাণ-বর্ষণ গ্রহণ করতে লাগলেন। এক সময়ে জরা, ক্লান্তি ও অজস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়ার দরুণ রক্তপাতে ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে গেলেন। নিপুণ ধনুর্ধর অর্জুন সুকৌশলে বাণে বাণে তাঁর জন্য একটা শরশয্যা নির্মাণ করলেন। ভীষ্মের দেহ ভূমি স্পর্শ করল না, ওই শরশয্যায় শায়িত রইল দীর্ঘকাল, পরে তাঁর অভীষ্ট তিথিতে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর বরে মৃত্যুবরণ করলেন।

এ পর্যন্ত কাহিনি। এর জটিল গ্রন্থনার মধ্যে কয়েকটি দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যু-বরের সুযোগ না নিতে পারলে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল চলত, যে পর্যন্ত না অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ও পুরো পাণ্ডব সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন হত। যুদ্ধে সেনাপতির ভূমিকায় থেকে ভীষ্ম যত ক্লান্তই হোন না কেন, এমনিতে স্বেচ্ছামৃত্যু-বরের সুযোগ নিতে পারতেন না— ক্ষত্রিয়ধর্মে এবং সেনাপতিধর্মে বাধত। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করার কথাই ওঠে না। তাঁর প্রতিজ্ঞা, স্ত্রী-বধ করবেন না, তাই অর্জুন রথের পুরোভাগে এক নারীকে স্থাপন করলে তবেই ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করবেন। রথে শিখণ্ডীকে বসবার বুদ্ধিটা ভীষ্মই দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ যথার্থই কার্যকর হল।

মুশকিল থেকে যায় অনেক। শিখণ্ডী যখন স্থূণাকর্ণের পুরুষত্ব ধার করলেন তখন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পুরুষ হলেন; প্রমাণ, স্থূণাকর্ণ নারীতে পরিণত হল এবং সে বেচারি এ লজ্জায় মনিব কুবেরের সামনে বেরোতেই পারেনি। কাজেই রথারূঢ় শিখণ্ডী পুরুষই, এবং জন্মক্ষণে তার নারীত্ব যতটা সত্য ছিল, যুদ্ধক্ষণে অর্জুনের রথে তাঁর পুরুষধর্ম ঠিক ততটাই সত্য। কাজেই ভীষ্মের পক্ষে তাঁকে নারী ধরে নিয়ে স্ত্রীবধের ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করার মধ্যে

গোলমাল থেকেই গেল। শিখণ্ডী যে পরে পুরুষ হবে, দেবতার এ বর সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন বলেই শিখণ্ডীর পিতা এক নারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন, কারণ দেবতার বর মিথ্যা হওয়ার নয়। কাজেই যখন শিখণ্ডী পুরুষ হলেন তখন তাঁর সে পুরুষতা যথার্থই; তাকে সন্দেহ করলে দেবতার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়ে যায়। ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীর জন্মবৃত্তান্ত, তপস্যা, বরলাভ পুরুষ হওয়া এত সবই জানতেন তখন অর্জুনের রথে আসীন শিখণ্ডী যে দেবতার বরেই আজ প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ, এটাও তাঁর জানার কথা। কাজেই সেই সময়কার পুরুষ শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেও তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হত না। তা ছাড়া এ ব্যাপারটা অর্জুনের বীরখ্যাতিকেও স্পর্শ করল, প্রায় লুকোচুরি ও প্রতারণার দ্বারা তিনি প্রতিপক্ষকে অস্ত্রত্যাগ করিয়ে তবে তাঁকে পরাস্ত করতে পারলেন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর খ্যাতিতে এ কলঙ্ক লেগে রইল। যে-অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় ধনুর্ধর খ্যাতিতে অচল রাখবার জন্য একদা নিরপরাধ একলব্যকে মর্মান্তিক গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছিল, সেই অর্জুন আজ আত্মগোপন করে প্রতিপক্ষকে অস্ত্রত্যাগ করাতে সম্মত হলেন। এতে বীরের কর্ম— শত্রুজয়— সিদ্ধ হল বটে, কিন্তু বীরের ধর্ম?

শিখণ্ডী চেয়েছিলেন ভীষ্ম-বধ তিনিই করবেন। নিমিত্ত হয়ে তিনি সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারলেন বটে, কিন্তু এতে পুরুষ শিখণ্ডীর মর্যাদা হয়তো পুরো বাঁচল না। রথের সামনে বসাটা এমনই এক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, যাতে অত প্রবল বিক্ষোভ, অপমান, গ্লানির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়তো রইল না। শিখণ্ডীর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু সে-ও যেন এক চোরা পথে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হল, এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পারল শুধুমাত্র এই কারণেই যে, একদা শাল্বরাজের প্রতি আসক্ত অম্বাকে ভীষ্ম হরণ করেছিলেন সৎ-ভাই বিচিত্রবীর্যের বধূ হওয়ার জন্য। অম্বিকা অম্বালিকাকে নিয়ে কোনও গোলমাল ছিল না। ভীষ্ম কেমন করে জানবেন, অম্বা মনে মনে বাগদত্তা? এবং, যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পর কাপুরুষ শাল্বরাজ যে বাগদত্তা কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করবেন সেটাই বা তিনি জানবেন কী করে? এই ব্যাপারে ভীষ্ম সম্পূর্ণ নির্দোষ। রাজকন্যাদের হরণ করার পূর্বে তাঁর কী করে মনে আসবে এদের কেউ অন্যের প্রতি আসক্ত? যখনই জানতে পারলেন তখনই নিজে অম্বাকে সঙ্গে নিয়ে শাল্বরাজের কাছে পৌঁছে দিলেন। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বীরের ধর্মে যা করণীয় তাই করলেন। শাল্বরাজের কাপুরুষোচিত অমানবিক প্রত্যাখ্যানই অম্বার জীবনে ব্যর্থতার কারণ; এ অপমানের প্রতিবাদের ক্রোধটা বর্ষিত হওয়া উচিত ছিল তারই ওপরে। তা না হয়ে সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল ভীষ্মের ওপরে। এত তার তীব্রতা যে, এখান থেকে গৃহীত হল ভীষ্মের প্রাণহানির শপথ, তার জন্য সাধনা ও পরে তার সিদ্ধিতে জ্বালার উপশম।

মহাভারতের পাঠক শ্রোতার এই অংশে কী রকম প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব? অম্বা লাঞ্ছিত, কিন্তু তার দায়িত্ব তো তার পূর্বরাগের আধার শাল্বরাজের। অথচ ভীষ্মকে বধ করার কঠোর সংকল্প, নিজের পুরুষবেশী নারী-জীবনে অপর এক নারীর সঙ্গে বিবাহ প্রহসন, তারই পরিণতিতে পিতৃরাজ্য আক্রান্ত হওয়া, বনে গিয়ে স্থূণাকর্ণের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময়, পরে অর্জুনের

রথারূঢ় হয়ে শুধু মাত্র নিমিত্তরূপে ভীষ্মের ওপরে সেই তীব্র ক্রোধের উদ্‌গীরণ— পাঠক এর পৌর্বাপর্য ও অমোঘ ঘটনাগতি বুঝলেও তার বিবেক কি সায় দেয় এ সমস্ত ব্যাপারটায়? মনে কি হয় ভীষ্ম, অর্জুন, অম্বা-শিখণ্ডীর আচরণ অমোঘ এবং যথার্থ? ভীষ্ম অবধ্য, অজেয়, স্বেচ্ছামৃত্যু-বরপ্রাপ্ত, সেই ভীষ্মকে পরাজিত ও বধ করার জন্য দু-জন্মে অম্বার প্রচেষ্টা, অর্জুনের একটা স্পষ্ট প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে— হোক না তা ভীষ্মেরই পরামর্শে— ক্ষাত্রধর্ম ও বীরোচিত আচরণের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হওয়া, এটা তো রয়ে গেল। এবং যে ছলনাটুকু স্বয়ং ভীষ্মই বলে দিয়েছিলেন তার মধ্যে যে ফাঁকটা, অর্থাৎ অর্জুনের রথারূঢ় পুরুষটিতে তার পূর্বজন্মের নারীত্ব আরোপ করে স্ত্রীবধের আশঙ্কায় ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগ, এটা পাঠক কী ভাবে নেবে? তার প্রতিক্রিয়া সংশয়িত হতে বাধ্য। নির্দোষ অম্বার লাঞ্ছনা যেমন সত্য ও মর্মান্তিক, তেমনই নির্দোষ ভীষ্মের মিথ্যা নারীবধের আশঙ্কায় মৃত্যুবরণও সমান হৃদয়বিদারক। শাল্বরাজ মহাভারতে অপরিচিত-প্রায়; সে দোষী, কিন্তু কোনও শাস্তি পেল না; নিদারুণ শাস্তি দিল শুধু অম্বাকে— এটিও পাঠককে পীড়িত করে। অর্জুন আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে প্রথমে পরাস্ত ও পরে নিহত করার ব্যবস্থা করলেন— এটিও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত, সে অস্বস্তিও থেকে যায়, যেমন আড়াল থেকে রামের বালিবধের ব্যবস্থা। রামায়ণ ওই ঘটনাটায় স্বস্তিবোধ করেনি। মহাকাব্যের নায়কের এ আচরণকে উপলক্ষ্য করে বিস্তর বাদানুবাদের অবতারণা করেছে। এখানেও সেই দ্বিধা থাকে। পাঠকের সহানুভূতি, সমর্থন সরলরেখার কোনও পথ খুঁজে পায় না— বারে বারে সামনে প্রতিকূল নৈতিকতায় নানা ভাবে ব্যাহত হয়। রামায়ণের মতো জনপ্রিয়তা যে মহাভারতের সে ভাবে হল না, তার কারণ এই ধরনের বহুধা-প্রবাহিত সংবেদনের আঘাতে পাঠক বিমূঢ় বোধ করে। তার প্রতিক্রিয়া আবেগ বা নৈতিকতার কোনও সোজা পথ খুঁজে পায় না। এ ব্যাপারে আরও একটা গুরুত্বের দিক হল, ভীষ্ম প্রথম ও প্রধান সেনাপতি; দশ দিনের যুদ্ধে দু'পক্ষে বিস্তর সৈন্যক্ষয় হল বটে, কিন্তু ভীষ্মবধের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ের পথে এ এক নিদারুণ সমস্যা। এই গুরু সমস্যার সমাধান এল একরাশ ফাঁক ও ফাঁকির মধ্যে দিয়ে। নিষ্পাপ ভীষ্মের ওপরে (অপরাধী শাল্বরাজের ওপরে নয়) অম্বার দুর্জয় ক্রোধ, বিদর্ভরাজকন্যার নারীকে বিবাহ করে উপহসিতা হওয়া; দেবতার বরে— প্রত্যক্ষত নয়— কিন্তু যক্ষ স্থূণাকর্ণের বদান্যতায় পুরুষত্বলাভ; সর্বজ্ঞ ভীষ্মের এ কথা জেনেও তাকে নারী রূপে গ্রহণ করা এবং ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনের ছলনাকে আশ্রয় করে কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পরাস্ত করা— এ সবই পাঠককে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঠেলে দেয়।

অথচ জীবনে তো এমনই ঘটে। ঘটনাও সরল নয়, তার মূলও সহজ নয়। ফলে তার আবেদনও বহুমুখী এবং মানুষকে প্রায়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেদনের সম্মুখীন হতে হয়। জীবনকে মানুষ যে ভাবে মেনে নেয়, বোঝবার চেষ্টা করে, জর্জরিত বোধ করে, তেমনই মহাভারতের কাহিনিতে সাড়া দিতে গিয়েও মানুষ বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত বোধ করে। যে রচনায় এই বিভ্রান্তি আসে তার জনপ্রিয়তা ঘটে না; সাধারণ মানুষ চায় সংবেদনে বিশ্রান্তি।

দ্রোণ: চারিত্রিক দ্বন্দ্ব

ভীষ্মের পর কৌরব সেনাপতি হলেন দ্রোণ। পাঁচদিন সমস্ত শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি কৌরব পক্ষকে নেতৃত্ব দেন। দ্রোণের চরিত্র ও ভাগ্য বুঝবার জন্যে তাঁর অতীত জীবনে কিছু সূত্র কাজে লাগবে। দ্রোণের প্রথম জীবন কেটেছে চূড়ান্ত দারিদ্র্যে। বাল্য-সুহৃদ রাজপুত্র দ্রুপদ যৌবনে রাজা হন; তাঁর সভায় এসে দ্রোণ 'সখা' বলে কথা শুরু করতেই দ্রুপদ নিষ্করুণ রূঢ়বাক্যে জানিয়ে দেন, দরিদ্রের সঙ্গে ধনীর বন্ধুত্বের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।[১] লাঞ্ছিত দ্রোণ ফিরে আসেন কঠিন সংকল্প নিয়ে: দ্রুপদের অহমিকা চূর্ণ করতে হবে। তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রগুরুর পদ গ্রহণ করেন এই উদ্দেশ্যেই যে, তিনি অর্জুনের ধনুষ্মত্তাকে কাজে লাগাবেন, কৌরব সৈন্যদের পাবেন, দ্রুপদের কাছে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। এরই জন্যে একলব্যের সঙ্গে ব্যবহারে দ্রোণ মিথ্যাচরণ করেন; যে একলব্যকে একদিনও তিনি শিক্ষা দেননি, শুধু দ্রোণাচার্যের মৃণ্ময় মূর্তি সামনে রেখে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করেছে বলেই তার কাছ থেকে তিনি মর্মান্তিক নিষ্ঠুর গুরুদক্ষিণা আদায় করলেন। একলব্যের মনোভূমিতে দ্রোণ আচার্য, কিন্তু বাস্তবে দ্রোণ তো একদিনও তার শিক্ষার দায়িত্ব নেননি, সত্যকার দক্ষিণা তো তাঁর প্রাপ্যই ছিল না। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিলেন দ্রোণ, পাণ্ডব কৌরবের শ্রদ্ধেয় আচার্য। বহু পূর্বে একলব্য একবার দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি জাতে নিষাদ বলে দ্রোণ তাকে শিষ্য করেননি।[২] যে নিচু জাতের মানুষ শিষ্য হতে পারে না, গুরুদক্ষিণা নেওয়ার বেলায় তো প্রকারান্তরে তাকে শিষ্য বলে স্বীকার করাই হল।

এ সব ছলনার মধ্যে আছে অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করার প্রতিজ্ঞা, কারণ, একা অর্জুনই রাজি হয়েছিলেন দ্রোণ যা চাইবেন তাই গুরুদক্ষিণা দেবেন।[৩] তৎসত্ত্বেও নিজের ছেলে অশ্বত্থামার প্রতি স্নেহের বশে মাঝে মাঝেই পাণ্ডবদের কাজে পাঠিয়ে অশ্বত্থামাকে গোপনে

১. উদ্যোগপর্ব; (১৮৯:১৭)
২. আদিপর্ব, (১২২:৭)
৩. আদিপর্ব; (১২৩:১১)

কিছু বেশি বিদ্যা দান করতে চাইতেন। অর্জুন এ ছলনা বুঝে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এসে পড়তেন, যাতে অশ্বত্থামা ধনুর্বিদ্যায় তাঁকে ছাড়িয়ে না যান। এখানেও দেখি দ্রোণের স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে মিথ্যাচরণে প্ররোচনা দিচ্ছে। দ্রোণের মধ্যে ছলনার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।[৪]

ধনসম্পত্তিতে লোভ তাঁর ছিল না। দ্রুপদকে দণ্ড দিতে প্রথমে কর্ণ ও দুর্যোধন গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। পরে অর্জুন কৃতকার্য হয়ে দ্রুপদকে বন্দি করে আনলে দ্রোণ দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্যের রাজা হয়ে দ্রুপদকে বাল্যকালের সখ্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, এত দিনে সমানে-সমানে অর্থাৎ রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব পাকা হল। দ্রোণের মর্মস্থলে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশ্য রাজসভায় সেই অপমানের যে বাণ বিদ্ধ ছিল, এত দিনে তা উন্মূলিত হল। এ সব ঘটনায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া একেবারে সহজ হয় না। রাজসভায় অপমানে সহানুভূতি দ্রোণের দিকেই থাকে; কিন্তু জন্মসত্ত্বে যিনি রাজা সেই দ্রুপদ পরাজিত শত্রু রূপে কৌরব রাজসভায় এলে পাঠকের এক ধরনের অস্বস্তিও হয় সুদীর্ঘসঞ্চিত অপমানের এই তীব্র প্রতিশোধে।

ওই অর্ধেক রাজ্য দ্রোণ কোনও দিনই ভোগ করেননি, আমরণ কৌরব রাজসভাতেই ছিলেন। ছিলেন অস্ত্রগুরু রূপে আশ্রিত। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির যখন আচার্যদের পায়ে পড়লেন যুদ্ধ করার মিনতি নিয়ে, তখন অন্যদের মতো দ্রোণও বললেন, অর্থের জন্য তিনি কৌরবদের কাছে দায়বদ্ধ। এইখানে মনে পড়ে দ্রুপদের অর্ধেক রাজত্ব তাঁর অধিকারে ছিল। কাজেই অন্যায়কারী কৌরবদের অন্নদাস হওয়ারও তাঁর যথার্থ কোনও প্রয়োজন ছিল না, ওই অর্ধেক রাজ্যের রাজস্ব তো তাঁকে আর্থিক ভাবে স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর করতে পারত; তা হলে তিনি বিবেকের প্রণোদনায় অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারতেন। পাণ্ডবরা ন্যায় পক্ষে যুদ্ধ করছে এ কথা জেনে ও শুনে তো অন্তত তিনি যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য পক্ষত্যাগ করতে পারতেন। প্রথমত, তাঁর নিজের ওই অর্ধেক রাজ্য ছিল; দ্বিতীয়ত, তিনি তো সত্যিই কৌরবদের অন্নদাস নন; আচার্যের তো শিক্ষকতার বিনিময়ে কিছু প্রাপ্য থাকে, কাজেই এ ভাবে নিজেকে আত্মবিক্রীত জ্ঞান করার তো তাঁর সত্যি কোনও প্রয়োজন ছিল না। যে-দ্রোণ যথার্থ নিজের গুণে, শ্রমে ও সাধনায় ভরণপোষণের অনেক বেশিই দাবি করতে পারতেন, তিনি কেন অন্যায় জেনেও কৌরবপক্ষ ত্যাগ করতে পারলেন না? তাঁর ক্ষেত্রে কৌরবদের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগাযোগের মূল্যই কি ছিল এই আনুগত্য, যা তাঁকে ন্যায়-পথ থেকে সরিয়ে রাখল? এমন প্রশ্ন পাঠকের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে।

যে পাঁচ দিন দ্রোণ সেনাপতি ছিলেন তারই তৃতীয় দিনের যুদ্ধে একটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে। বালক অভিমন্যু অর্জুনের সন্তান, কিন্তু কৌরববীরেরা সকলেই তাঁর আত্মীয় ও গুরুজন; চক্রব্যূহে প্রবেশ করে বালক যখন নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তখন যাঁরা তার পথ

৪. আদিপর্ব; ১২২:৪৩-৪৪

রুদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্রোণও ছিলেন। চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ কিশোরকে তিনিও অস্ত্রাঘাত করেন।[৫] পুত্রকল্প অর্জুনের পুত্রকে এই রকম অসহায় ভাবে বধ করতে দ্রোণের দ্বিধা হয়নি। শিষ্যও শাস্ত্রমতে পুত্রকল্প; একলব্য তাঁকে গুরুজ্ঞান করে সাধনা করছিল, অর্জুনের প্রীত্যর্থে সেই একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল দক্ষিণা চাইতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। পাঠক এটা সহজে মেনে নিতে পারে না, যুদ্ধের অলঙ্ঘ্য নীতি হিসেবেও না। এই নিষ্ঠুরতার মূল্য তাঁকে শোধ করতে হয়েছিল।

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে পাণ্ডবরা অধীর, দ্রোণ দুর্ধর্ষ অস্ত্রবিৎ, দুর্জয়পরাক্রম প্রতিপক্ষ, তাঁর মৃত্যু না হলে যুদ্ধ নিষ্পত্তি হতে পারছে না. কৌরবপক্ষে কর্ণও অপেক্ষা করছেন; আসলে দ্রোণ বেঁচে থাকতে দুর্যোধন কর্ণকে সেনাপতি করতে রাজি হবেন না। কাজেই শৌর্যাভিমানী কর্ণের উন্নতি ও গরিমার জন্যেও দ্রোণের মৃত্যু প্রয়োজন।

এই মৃত্যু ঘটে কী ভাবে? কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধরত দ্রোণকে বলতে হল, 'অশ্বত্থামা হত'। কথাটা অন্য কেউ বললে পুত্রগর্বিত দ্রোণ উড়িয়ে দিতেন, কিন্তু বলছেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির; শুধু ধর্মপুত্র নন, ধর্মাচরণের জন্য যিনি যশস্বী। এই সর্বৈব মিথ্যাটাতে যুধিষ্ঠিরের অন্তরাত্মাও স্বস্তি পায়নি, তাই সেটাকে শোধন করবার জন্য নিচুস্বরে যোগ করলেন 'ইতি গজ' অর্থাৎ মরেছে অশ্বত্থামা নামে হাতিটি।[৬] কিন্তু তাতেও কথাটা যে পরিশোধিত হয়ে সত্য ভাষণে পরিণত হল না তার প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠির সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তাই তাঁর রথ মাটি থেকে চার আঙুল ওপরে থাকত। দ্রোণকে এই ডাহা মিথ্যে কথাটি বলার পরে 'ইতি গজ' যোগ করার পরেও তাঁর রথ ভূমিস্পর্শ করল, আর কখনওই সে রথ মাটি ছেড়ে ওঠেনি।[৭]

পুত্রকল্প দুটি বালক, একলব্য ও অভিমন্যুর ওপরে দ্রোণ নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। একলব্যের ক্ষেত্রে, এবং অশ্বত্থামাকে গোপনে অর্জুনের চেয়ে বেশি ধনুর্বিদ্যা দান করার চেষ্টার মধ্যে স্পষ্ট মিথ্যাচার ছিল, তাই যেন এক মিথ্যা উক্তিই তাঁর মৃত্যুর হেতু হল। অস্ত্রত্যাগ করে যোগাসীন হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন; প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাই যখন বেঁচে নেই, তখন কার জন্যে যুদ্ধ, কার জন্যে জয়, কার জন্যে জীবন?

রামায়ণের কোনও বীরের মৃত্যুরই এত বহুমুখী দ্যোতনা নেই, সেখানে ভাগ ভাল-মন্দ, সাদা-কালোতে। কিন্তু দ্রোণ? রাজ্য পেয়েও যিনি রাজ্য গ্রহণ বা ভোগ করেন না, সেই আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের জোরেও যিনি অন্যায় পক্ষে লড়ছেন জেনেও দলত্যাগ করেন না, তাঁর মৃত্যু ঘটানো হল কৃষ্ণের প্ররোচনায় সদাসত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলিয়ে। দ্রোণ একটা মিথ্যা উক্তির জন্যে প্রাণত্যাগ করছেন এতে পাঠকের সহানুভূতি যথার্থ কারণেই দ্রোণের অভিমুখে যাবে; কারণ তাঁর মৃত্যুর নিমিত্ত একটা মিথ্যাভাষণ। কিন্তু তিনিও তো জীবনে

৫. দ্রোণপর্ব; (৩৬:২৬)
৬. দ্রোণপর্ব; (১৬৪:১০৬)
৭. দ্রোণপর্ব; (১৬৪:১০৭)

মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন একাধিকবার, কাজেই মিথ্যার দ্বারা তাঁর নিধন যেন কোনও এক নৈতিক সুবিচারের ক্ষেত্রে পাঠক মেনেও নেয়। যুদ্ধারম্ভে যুধিষ্ঠিরের আবেদনে যিনি সাড়া দেননি, তিনি সব দায়বদ্ধতা অস্বীকার করলেন পুত্রস্নেহের বশে। এর মধ্যে একটা করুণ দিক থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে একটা অনৌচিত্যও আছে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন যুদ্ধত্যাগ করেননি। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে ভীমও যুদ্ধ ত্যাগ করেননি। পুত্রশোকে দ্রোণের যুদ্ধত্যাগ ও মৃত্যু এ-ঘটনায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া বহুমাত্রিক— আবেগের দিকে এক ধরনের, আবার নৈতিকতার দিকে আর এক রকম; এবং মিথ্যাচারণের পরিণতি মিথ্যাভিত্তিক মৃত্যুতে পাঠকের উদ্যত সহানুভূতিও কোথাও বাধা পায়। জীবনের বহু অধ্যায়ে এমন প্রতিক্রিয়াই যথার্থ এবং ব্যঞ্জনায় অস্থির এবং সেই কারণেই অধিক দ্যুতিময়। কিন্তু এ-কাহিনি পাঠকের গতিকে ব্যাহত করে, থামায়, ভাবতে বাধ্য করে এবং সংশয়ের মধ্যে ফেলে, প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার পক্ষে যা একটুও অনুকূল নয়। অথচ এই ভাবনা, যা জীবনের অর্থ বোঝাবারই এক প্রয়াস তার দ্বারাই মহাকাব্যটি নিছক কাব্যত্ব পেরিয়ে মহাকাব্যে উত্তীর্ণ হয়। এই উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে অন্তঃস্থ করতে হয়, এবং সেটি যথার্থই আত্মিক উত্তরণের যন্ত্রণাময় একটি প্রক্রিয়া। এখানেই মহাভারতে সাড়া দেওয়ার আর্তি ও ক্লেশ।

কর্ণ: সংবেদনার জটিলতা

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা মতো সেনাপতি পদে বরণ করলেন কর্ণকে। যুদ্ধের ষোড়শ ও সপ্তদশ দিনের সেনাপতি কর্ণ। কৌরব পক্ষে যখন মহাভারত রচনা হচ্ছিল, অর্থাৎ কৌরব রাজত্বে ভাটচারণরা যখন যুদ্ধের সময় গান বাঁধছিলেন ও গাইছিলেন, তখন স্বভাবতই সে সব গানের বিষয়বস্তু ছিল কৌরবদেরই যশোগাথা। এই কৌরবপক্ষীয় মহাকাব্যের নায়ক ছিলেন কর্ণ। পৃথিবীর সব প্রাথমিক মহাকাব্যেরই নায়ক সূর্যের পুত্র, কর্ণও তাই; এবং তাঁদের মতোই শৈশবে পরিত্যক্ত, তাঁদের মতো বীর ও উদার। কর্ণের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল চেয়ে নিয়েছিলেন, বিনিময়ে কর্ণ একঘ্নী অস্ত্র চেয়ে নেন।[১]

জন্মক্ষণে কর্ণকে কুন্তী পেটিকায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সারথিকুলের অধিরথ ও রাধা তুলে নিয়ে লালন করেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত কর্ণ তাঁদেরই পিতামাতা বলে জ্ঞান করতেন।[২] ধৃতরাষ্ট্রের সভায় এসে অস্ত্রশিক্ষা করেন দ্রোণাচার্যের কাছে, বন্ধুত্ব হয় দুর্যোধনের সঙ্গে। কৈশোরের প্রান্তে পরশুরামের কাছে নিজেকে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে যান. তখনই সম্পূর্ণ ভুল করে গোহত্যা করে ফেলেন এবং অভিশপ্ত হন: যুদ্ধের শেষে তাঁর রথের চাকা বসে যাবে এবং সেই অবসরে প্রতিপক্ষ তাঁকে হত্যা করবে।[৩] পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে একদিন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন অলর্ককীট কর্ণের উরুতে দর্শন করে, রক্তপাত করে এবং দংশন করতেই থাকে। রক্তাক্ত উরু নিয়ে কর্ণ অবিচলিত নিশ্চল ভাবে বসে থাকেন। ঘুম ভেঙে সব দেখে পরশুরাম নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, যে কর্ণ পরিচয় গোপন করে অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করতে এসেছেন, আসলে তিনি ক্ষত্রিয়; কারণ কোনও ব্রাহ্মণের এত শারীরিক সহনশীলতা থাকতে পারে না। তখন কর্ণ সব স্বীকার করলেন। পাঠকের সংশয় থেকে যায়, কারণ সে-সময়ে কর্ণ নিজেকে সূতপুত্র বলেই জানতেন, ক্ষত্রিয়

১. আদি; (১০৪:১৮-২০)
২. আরণ্যক; (২৯৩:১০, ১৩-১৪)
৩. কর্ণ; (২৯:৩১)

পরিচয় তখনও প্রকাশিত হয়নি। পরশুরাম অভিশাপ দিলেন: অধীত অস্ত্রবিদ্যা কার্যকালে কর্ণ স্মরণ করতে পারেন না।[৪] যৌবনের শুরুতেই এ-দুটি অভিশাপ নেমে এল কর্ণের জীবনে।

কর্ণের জীবনের এই ছোট উপাখ্যানটি এক দিকে অত্যন্ত মর্মবিদারক, কারণ ক্ষত্রিয় হিসেবে জন্মেও কোনও দিনই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কোনও সুযোগ সুবিধা পাননি। ক্ষত্রিয়সুলভ আগ্রহে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষার আশায় যান, কারণ ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষী পরশুরাম ক্ষত্রিয় জানলে অস্ত্রবিদ্যা দেবেন না; তাই ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়েছিলেন। কৌরব গুরুরা সূতপুত্রকে অস্ত্রবিদ্যা দিতেন না তাই এই ছলনা; কিন্তু পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা যা পেয়েছিলেন তাকে ছাপিয়ে উঠল এই নির্মম অভিশাপ— কার্যকালে প্রয়োগ করতে পারবেন না, এবং যুদ্ধ শেষে তাঁর রথের চাকা বসে যাবে। এই সাংঘাতিক অভিশাপে কর্ণ পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করেন।

হস্তিনাপুরে অস্ত্রশিক্ষা শেষে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে উদ্যত হলে, অর্জুন রাজা বা রাজপুত্র ছাড়া কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলাতে দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। বিনিময়ে শুধু কর্ণের বন্ধুত্ব চাইলেন। এর পর প্রতিযোগিতায় কর্ণের অধিকার জন্মাল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই অধিরথ রাজসভায় উপস্থিত হলেন, এবং কর্ণ তাঁকে পিতৃসম্ভাষণ করে প্রণাম করলে ভীম ব্যঙ্গপরিহাস করলেন।[৫] প্রতিযোগিতা হল না। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেও কর্ণ লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত হলে দ্রৌপদী স্পষ্টই বললেন তিনি সূতপুত্রকে বরণ করবেন না। নীরবে সরে আসতে হল কর্ণকে, কিন্তু অপমান ভোলেননি। ভেতরে ভেতরে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন।

দ্যূতসভায় প্রতিশোধ নিলেন এবং তখনই কর্ণচরিত্র কলঙ্কিত হল, ক্ষোভ অপমানের অতিকৃত এবং বিকৃত প্রকাশে। যুধিষ্ঠির জুয়াতে দ্রৌপদীকে হারাবার পর কর্ণ দুর্যোধন দু'জনেই হিংস্র বিদ্রূপে সভায় জোর করে টেনে আনা এক কুণ্ঠিত রাজকুলবধূকে অপমান করলেন।[৬] মহাকাব্যের এইখানেই প্রথম কৌরব-পাণ্ডব যেন সুনীতি-দুর্নীতির প্রতিরূপ হয়ে উঠল, যদিও এর মধ্যেও কিছু কিছু অতিব্যাপ্তি অব্যাপ্তি থেকে গেল। দ্রৌপদীকে দাসী ও বহুভোগ্যা বলে উল্লেখ ও সম্বোধন করে কর্ণ যখন আপন উরুতে হাত রেখে অশালীন ইঙ্গিত করলেন, তখন ক্ষত্রিয় বীরের মর্যাদা থেকে আপনিই বিচ্যুত হয়ে নেমে এলেন এক অমার্জিত কামুকের পর্যায়ে। যদিও এর মধ্যে স্বয়ংবরসভায় প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিহিত ছিল, তবু পাঠকের তো মনে হতেই পারে যে রাজকন্যা দ্রৌপদী সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সূতপুত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে থাকেন, তবে তিনি তাঁর অধিকারের মধ্যে থেকেই তা করতে পারেন।

৪. কর্ণপর্ব; (২৯:৬)
৫. আদি; (১:১৮৬:২২)
৬. সভাপর্ব; (৬০:৩৮)

তার জন্যে তাঁকে জঘন্য সম্বোধনে বিশেষিত করে, প্রকাশ্য সভায় নারীকে, কুলবধূকে অপমান করতে পেরে শ্লাঘা বোধ করা ক্ষত্রিয়োচিত কাজ নয়, পুরুষোচিতও নয়।

না জেনে গোহত্যা করে মর্মান্তিক অভিশাপ পেতে হয়েছিল বলে অবশ্যই কর্ণের পক্ষে পাঠকের সহানুভূতি আসে কিন্তু দ্রৌপদীকে এ ভাবে লাঞ্ছনা করায় পাঠকের মনে জুগুপ্সা জন্মায়। তেমনই অভিমন্যুবধের সময়েও কর্ণ সক্রিয় ভাবেই উদ্যোগী ছিলেন, এটাও গর্হিত কাজ; তাই অভিমন্যুর পিতা অর্জুন পরে যখন কর্ণপুত্র বৃষসেনকে হত্যা করে তখন পাঠকের উদ্যত সহানুভূতি প্রতিহত হয়।[৭]

কর্ণের বীরত্ব, শৌর্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই, সেখানে তিনি কারও চেয়ে কম নন। আজন্ম অবিচার দুর্বিচার ও অন্যায় লাঞ্ছনা পেয়েছেন। পরশুরামকে প্রতারণা করে যে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন, নির্মম কীট-দংশনে ওই রক্তপাতে অবিচলিত থেকে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ঘটতে দেননি, তবু ওই সাধনাও তাঁর সম্পূর্ণই ব্যর্থ হল। সহজাত কবচ-কুণ্ডল একজন দেবতা প্রতারণা করে কেড়ে নিলেন। বিনিময়ে যে একঘ্নী অস্ত্র দিলেন, ঘটনাচক্রে ঘটোৎকচকে বধ করতেই সেটা খরচ হয়ে গেল, তা দিয়ে কোনও পাণ্ডব বীরকে বধ করা হল না। সে দিক থেকেও সহজাত কবচকুণ্ডল দানের বিনিময়ে কর্ণ তেমন কিছুই পাননি; পেয়েছেন অনর্জিত অভিশাপ, দেবতার প্রতারণা, মানুষের কাছে সূতপুত্র পরিচয়ের লাঞ্ছনা, জন্মক্ষণে নিষ্পরিচয়ের অন্ধকারে নির্বাসন— শুধুমাত্র নিজের শৌর্য ও দুর্যোধনের সখ্য ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনও মূলধন ছিল না।

কিন্তু এই সব অবিচার ও অপমানের আঘাতে তাঁর জীবনের গভীরে কোথাও একটা কঠিন হীরে দানা বাঁধছিল। সেটা প্রকাশ হল প্রথমে কৃষ্ণ ও পরে কুন্তি যখন তাঁকে তাঁর যথার্থ পরিচয় জানিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে বলেন। কৃষ্ণকে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই আপন মৃত্যুর যথাযথ অগ্রিম বিবরণ দেন, এ-ও বলেন যে, কৌরব পক্ষে থাকলেও তিনি পাণ্ডবদের কল্যাণকামনা করেন; বলেন, যুধিষ্ঠিরকে যেন কোনও মতেই তাঁর সত্য পরিচয় না জানানো হয়, তা হলে যুদ্ধই হবে না। কুন্তিকে বলেন, অধিরথ ও রাধা তাঁকে তাঁর সম্পূর্ণ অসহায় শৈশব থেকে লালন করেছেন, আজ সহসা তাঁদের পিতৃমাতৃ-পরিচয় অস্বীকার করা অন্যায় হবে। যেমন অন্যায় হবে দুর্যোধনের সখ্যকে পদদলিত করে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করা। কুন্তিকে কথা দিলেন, একা অর্জুন ছাড়া অন্য কোনও পাণ্ডবের তিনি ক্ষতি করবেন না, কাজেই তাঁকে ধরে, বা অর্জুনকে ধরে, কুন্তির পাঁচটি পুত্রই থাকবে।[৮] যে দিন কুন্তির মাতৃত্ব, সূর্যের পিতৃত্ব প্রকাশিত হল সে দিন তিনি সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে পারতেন। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের যে-দিনগুলো কেটেছে অবহেলিত সূতপুত্র পরিচয়ে সেগুলো আড়ালে চলে যেতে পারত। কিন্তু, আজ যখন মৃত্যু আসন্ন, তখন পক্ষ পরিবর্তন করার

---

৭ সভাপর্ব, (৬১:৩৫; ৬৩:১০,১১)

৮. কর্ণপর্ব: (৬২:৬০)

প্রস্তাব তিনি কোনও ক্রমেই গ্রহণ করতে পারেন না। গ্রহণ করতে পারলে সুস্থতর চিত্তে ন্যায়পক্ষে যুদ্ধ করার শান্তি পেতেন, পেতেন কুন্তিসুত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের গৌরব। কিন্তু কি অনায়াসে সে প্রলোভন জয় করলেন। হয়তো অনায়াসে নয়, মুহূর্তের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে থাকতেও পারেন, কিন্তু কোথাও তার এতটুকু প্রকাশ রইল না। দৃঢ় ভাবে প্রলোভন জয় করলেন, পরিচয়ের গ্লানিমুক্তির সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। যুদ্ধশেষে কুন্তি যখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন কর্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে, কারণ তিনিই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, তখন যুধিষ্ঠির ভর্ৎসনা করলেন কুন্তিকে, সক্ষোভে বললেন এই না-জানানোটা কুন্তির পক্ষে খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে। কিন্তু কর্ণের এ প্রলোভন-জয় তাঁর চরিত্রকে অম্লান ও ভাস্বর করে তোলে।

শেষ কালে না জেনে তাঁর গাভী হত্যার জন্য, সেই ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অন্যায় অভিশাপ ফলল; রথের চাকা কাদায় বসে গেল, মহাশক্তিশালী বীর কোনও মতেই টেনে তুলতে পারলেন না। উদ্যোগপর্বে কৌরব পাণ্ডব উভয়েই যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নীতি স্বীকার করেছিলেন; তার মধ্যে একটা ছিল, প্রতিপক্ষ সময় চাইলে সময় দিতে হবে, এমনকী এ ভাবে বিপদে পড়লে তাকে সাহায্যও করতে হবে। সাহায্য পাওয়া দূরে থাক, সময় চেয়েও পেলেন না। তাঁর মৃত্যুর পুরো ব্যাপারটা আগাগোড়াই অন্যায়। ব্রাহ্মণের শাপ সম্পূর্ণ অন্যায়, সেটা ফলে যাওয়াও অন্যায়; সময় চেয়ে না পাওয়াটা পাণ্ডবদের দিক থেকে গর্হিত কাজ, অসহায় বিপন্ন বীরের সংকটের সময়ে তাকে বধ করাও অন্যায়। কাজেই অন্যান্য প্রধান কৌরব বীরের মতো কর্ণও অন্যায়-সমরেই প্রাণ দিলেন। এ মুহূর্তে পাঠকের পুরো সহানুভূতিই তাঁর প্রতি ধাবিত হয়, কোনও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভাবলে মনে আসে, দুর্যোধনের সঙ্গে পরামর্শ করে আকৈশোর পাণ্ডবদের ক্ষতির সব ষড়যন্ত্রে কর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন, জতুগৃহদাহের ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় সহায়তা ছিল। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা অমানবিক, অপুরুষোচিত, তাতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল, এ দিক থেকে তাঁর বধ ও বিনাশ পাণ্ডবদের করণীয়ই ছিল। আবার তারও পিছনে যখন ভাবি যে, স্বয়ংম্বর সভায় দ্রৌপদী যে-কারণে তাঁকে অপমান করেন সে কারণটাই তো মিথ্যে, কর্ণ তো সত্যিই সূতপুত্র নন, পাণ্ডবদের মতো 'দেবপুত্র'ই অস্ত্রপরীক্ষার দিন যদি অধিরথ সভায় প্রবেশ করা মাত্রই কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে পিতৃসম্ভাষণ ও প্রণাম না করতেন তা হলে একটা প্রকাশ্য গৌরবের অংশভাক হতে পারতেন। কিন্তু পরিণাম জেনেও তিনি অকৃতজ্ঞ বা অমানবিক আচরণ করেননি। সে দিন ভীমের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ভিত্তিটাই ছিল মিথ্যে, তিনি অধিরথের পুত্র সত্যিই তো ছিলেন না। মানবিক অহংকারের বশে তিনি বৃদ্ধ অধিরথকে পিতার প্রাপ্য সম্মান দিলেন, কারণ এই কর্ণই বলেছিলেন:

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।

সারা জীবন আপন শৌর্যের আসন ছাড়া পায়ের নীচে আর কোনও খাঁটি জমি পাননি।

একটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কারণের অভিশাপ ফলল প্রতিপক্ষের অন্যায় আচরণের সাহায্যে। জীবনে যা কিছু অন্যায় করেছিলেন— এবং তার পরিমাণ এবং সংখ্যা কম হলেও গুরুত্ব কম নয়— তার পুরো মূল্য শোধ করে দিলেন অন্যায় সমরে ওই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাপরাধ অবস্থায় প্রাণ দিয়ে। এবং যেহেতু কৌরবপক্ষে রচিত মহাভারতের তিনিই ছিলেন নায়ক, তাই নায়কের মৃত্যুতে যে প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে হওয়ার কথা সেই অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করুণা সহানুভূতি তিনি এ মুহূর্তে পুরোপুরি আকর্ষণ করেন। পাঠক সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত থাকেন যে, বহু বিরুদ্ধ শক্তির এককালীন সমাপতনের ফলেই কর্ণের মৃত্যু ঘটতে পারল, কারণ মহাকাব্যের প্রথম পর্যায়ের সূর্য-পুত্র এই নায়কের মৃত্যুও তাকে এক অগ্রণী বীরের মর্যাদায় মণ্ডিত করল। তাঁর সারা জীবনের বহু সন্ধিক্ষণে পাঠকের নানা মিশ্র ও বিরূপ সংবেদনা যেন মৃত্যুর মোহানায় এসে বৃহৎ একটি গৌরবে লীন হয়ে গেল।

জীবনদর্শনের পার্থক্য

যুদ্ধের সতেরো দিনের দিন কর্ণের মৃত্যু হয়। আঠারো দিনের আধবেলার সেনাপতি ছিলেন শল্য। কিন্তু তার আগেই তাঁর বেশি পরিচয়, কর্ণের সেনাপতিত্বকালে শল্য ছিলেন কর্ণের সারথি। মদ্র বা বাহ্লীক দেশের রাজপুত্র শল্য, মাদ্রীর ভাই। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে শল্য ধনুতে জ্যা আরোপ করতে পারেননি। শল্যকে প্রথম থেকেই দেখি আনুগত্যের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। ইচ্ছে ছিল পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার; কিন্তু দুর্যোধন তাকে এমন খাতির করেন যে, তিনি কৌরবপক্ষেই যোগ দেন। তবু যুদ্ধের ঠিক আগে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বিজয়কামনা ও আশীর্বাদ জানান। তাঁর পাণ্ডবকৌরবপক্ষ সম্বন্ধে দোলাচলচিত্ততা বুঝতে পেরে যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে অনুরোধ করেন যেন শল্য যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের সারথি হন এবং কর্ণকে তেজভ্রষ্ট করেন।[১] এখানে একটা কথা আছে: সারথির দুটি কাজ, একটা রথ সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাবধানে বিপদ এড়িয়ে কৌশলে রথ চালানো; আর দ্বিতীয় কাজ হল, রথারূঢ় যোদ্ধাকে অস্ত্র, বাণ, ইত্যাদি এগিয়ে দেওয়া এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, রথীকে প্রশংসা করে, অভয় দিয়ে, তাকে অজেয় বলে উল্লেখ করে, তার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা।

যুদ্ধক্ষেত্রে শল্য কর্ণকে প্রশংসা করা দূরে থাক, বারবার বলেছেন, অর্জুনকে কেউ জয় করতে পারবে না। তিনি দুর্ধর্ষ ধনুর্বিদ, তাঁর জ্ঞান, কৌশল ও অস্ত্রসিদ্ধির সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না, অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা সারথির ধর্মবিরুদ্ধ, মিত্রপক্ষের লোকের ভূমিকায় থেকে শত্রুপক্ষের কাজ করেছেন শল্য। তাঁর কর্ণের সারথি হতে অস্বীকার করা উচিত ছিল; যেহেতু তাঁর মনের আনুগত্য পাণ্ডবপক্ষে। অথবা এ সত্ত্বেও যখন সারথি হয়েছিলেন তখন যুধিষ্ঠিরের কাছে পাণ্ডবপক্ষে আনুগত্য সম্বন্ধে কথা দেওয়া[২] অন্যায়, অধর্মীয় প্রতিশ্রুতি— অর্জুনের প্রশংসা করে, কর্ণের আপেক্ষিক অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে কর্ণের মতো অস্ত্রজ্ঞ বীরের মনোবল নষ্ট করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার উচিত ছিল না। এখানে শল্য সম্বন্ধে পাঠকের মনোভাব দ্বিধা-বিভক্ত হতে বাধ্য। প্রাথমিক

১. উদ্যোগপর্ব; (১৪৪.২২)
২. উদ্যোগপর্ব; (৮:২৭)

আনুগত্য তাঁর কৌরবপক্ষে, অথচ ষড়যন্ত্রীর মতো গোপনে তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যথার্থ সারথির ভূমিকা তিনি পালন করবেন না বরং কৌরবদের শত্রুতা করবেন। যুদ্ধের নীতি অনুসারে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গর্হিত, কাজেই শল্য সম্বন্ধে পাঠক অবজ্ঞা ও ঘৃণা বোধ করেন। কর্ণ নানা দোষে দোষী, এমনকী রথের চাকা বসে যাওয়ার পিছনেও তাঁর পূর্ব অপরাধের অভিশাপই ছিল সক্রিয়। কিন্তু কুচক্রী শল্যের কোনও মার্জনা নেই। এবং এ-ই হল কৌরবদের শেষ সেনাপতি। দায়িত্ব পালন করা দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কর্ণের মতো বীরের সঙ্গে— এমন একটা সময়ে যখন তার প্রতিকার করা কর্ণের সাধ্যের বাইরে। শল্যের আনুগত্য দ্বিধাবিভক্ত— কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে, পাঠকেরও প্রতিক্রিয়া তাই নীতি ও দুর্নীতির মধ্যে বিভ্রান্ত।

যুদ্ধের একেবারে শেষ প্রহরের ঘটনা স্বল্পকালীন শেষ সেনাপতি দুর্যোধনের মৃত্যু। আঠারো দিনের প্রত্যেক দিনই দুর্যোধন যুদ্ধ করেছেন, আহত হয়েছেন। একে একে ভাই-জ্ঞাতিবান্ধবদের মৃত্যু দেখতে হয়েছে তাঁকে, এবং প্রখ্যাত কৌরববীরদের অন্যায় সমরে মিথ্যাচরণের মধ্যে নিহত হতে দেখতে হয়েছে। কাজেই দুর্যোধন তখন শরীরে মনে বিধ্বস্ত। স্বল্পকাল বিশ্রামের জন্য দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে গিয়ে শুয়েছিলেন; তখন ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডব বীররা গিয়ে বিদ্রুপ ও বক্রোক্তি করে তাঁকে উঠে এসে যুদ্ধ করতে বলেন। শ্রান্ত বিষণ্ণ দুর্যোধন উঠে আসেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা গদাযুদ্ধে, তাই পাণ্ডবপক্ষের সুশিক্ষিত গদাযোদ্ধা ভীমের সঙ্গেই তাঁর যুদ্ধ। ভীম প্রবল যোদ্ধা, কিন্তু গদাতে দুর্যোধনের দক্ষতা বেশি, এই জন্য কিছুক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে কৃষ্ণের ইশারায় অর্জুন ভীমকে দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করবার ইঙ্গিত দেন। ভীমও গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন; এর পরে ভীম বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথা চূর্ণ করতে উদ্যত হলে দুর্যোধন কৃষ্ণকে ধিক্কার দেন ও ভীম নিরস্ত হন।[৩]

ধিক্কার কেন? দুটি কারণে। উদ্যোগপর্বে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পাণ্ডব ও কৌরবরা উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য কতকগুলি নীতি স্থির করেন। তার একটা হল, রণক্লান্ত সৈনিকের বিশ্রামের অধিকার আছে এবং বিশ্রামের সময়ে তাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানো যাবে না। পাণ্ডবরা এ শর্তটি মানলেন না। দ্বিতীয়ত, একটি বড় শর্ত স্বীকৃত হয়েছিল, অধোনাভি প্রহার করা রণনীতি-বিরোধী; উরু অধোনাভি, সেখানে আঘাত করা তাই বেআইনি। এটা করতে হল, কারণ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরা জানতেন যে, কৃত্যারা (মূর্তিমতী জাদুশক্তি) দুর্যোধনকে নির্মাণ করার সময়ে কটির ঊর্ধ্বদেশের দেহকে দুর্ভেদ্য কঠিন লৌহের দ্বারা গঠন করে, কটির নিম্নদেশ ফুল দিয়ে নির্মাণ করেন; অর্থাৎ ওই অংশটিই সহজভেদ্য।[৪] যুদ্ধের আইন মেনে চললে ভীমের যতই দক্ষতা থাকুক না কেন, দুর্যোধনের দেহকে ক্ষত বা বিদ্ধ করতে পারতেন না। তাই এই বেআইনি অধোনাভি আঘাত।

৩ উদ্যোগপর্ব; (৮.৩০-৩২, কর্ণ, ২৭:৪২-৪৬)

৪. শল্যপর্ব; (৫৮.৫, ৬০ ২৭-৩৮)

দুর্যোধন অনেক দুষ্কর্ম করেছেন, যার প্রধান হল প্রকাশ্যে রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে সমর্থন, এবং নিজের বাম উরুতে আঘাত করে পতিব্রতা দ্রৌপদীকে তাঁকে পতিরূপে ভজনা করার অশালীন ইঙ্গিত। পাঠকের মনে হয় সেই যে সে দিন উরুতে চপেটাঘাতের ইঙ্গিতের দ্বারা কুলস্ত্রীর চূড়ান্ত অবমাননা ঘটেছিল, তারই প্রতিশোধে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন নিজের উরুদেশ দেখিয়ে ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দেহের ঊর্ধ্বভাগে সম্পূর্ণ দুষ্প্রধর্ষ দুর্যোধন, অতএব উরুভঙ্গ করা ছাড়া তাঁকে পরাজিত বা নিহত করার কোনও উপায় নেই।[৫] এ সবের মধ্যে যেন কোনও এক ভাবে একটা গর্হিত কর্ম শোধ হল অনুরূপ একটা গর্হিত কর্মের দ্বারা। পাণ্ডবদের উদ্ভাবিত উপায়টি যতই অত্যাবশ্যক হোক, যে সব শর্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়পক্ষই মেনেছেন, তার একটা শর্তকে এ ভাবে লঙ্ঘন করলে স্বভাবতই দুর্নীতির কলঙ্ক স্পর্শ করে পাণ্ডবদের। অতএব মহাবীর দুর্যোধনের এই নীতিহীন ভাবে মৃত্যু ঘটানোর জন্য সে মুহূর্তে অপরাধী দুর্যোধনকে ছাপিয়ে ওঠে অপরাধিত দুর্যোধন। পাঠকের দুর্যোধনের অতীত অপরাধ সম্বন্ধে যত ক্রোধ বিরাগই থাকুক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তে দুর্নীতির কাছে বলিপ্রদত্ত ভগ্নোরু ধূলিশায়ী দুর্যোধন করুণার সঞ্চার করেই।

রামায়ণের যুদ্ধে রাবণ রামকে মায়াসীতা ও সীতাকে রামের মুণ্ড দেখালেও মৃত্যুটা তাঁর যুদ্ধনীতিকে লঙ্ঘন করে হয়নি; সীতাহরণের পর থেকে পাঠকের সহানুভূতি রামের প্রতিই, রাবণের প্রতি নয়। তাই সে ভেবে দেখে না যে, সুশিক্ষিত সশস্ত্র বহুসংখ্যক রাক্ষসসৈন্য শুধু দু-ভাইয়ের ধনুর্বাণ ও বানরদের ভেঙে আনা গাছপাথরে পরাজিত হওয়াটা অবাস্তব ঘটনা। পাঠক চায় রাবণ পরাজিত হোক, রাম জিতুন। এবং যে কোনও উপায়ে সেটা সংঘটিত হলেই পাঠকের অন্তরাত্মা স্বস্তি পায়, কারণ জয় পরাজয়ের দুটো দিকই খুব পরিষ্কার। তাই পক্ষত্যাগী বিভীষণকেও বিশ্বাসঘাতক বলার আগে পাঠক মনে করে যেহেতু রামপক্ষ ন্যায়পক্ষ, রাবণপক্ষ অন্যায়ের, তাই বিভীষণের কাজটা শেষ বিচারে অন্যায় নয়, বরং তিনি অন্যায়কে বর্জন করে ন্যায়পক্ষ অবলম্বন করেছেন। গুহকের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান, বালিবধ, সীতাপ্রত্যাখ্যান এবং শম্বুকবধ ছাড়া তার কোথাও নৈতিক সমস্যার বালাই নেই। ওগুলি খুবই মারাত্মক, গ্লানিকর অপরাধ, তাই অনেক কুতর্কের অবতারণা করতে হয়েছে সব কটি ক্ষেত্রেই। অন্য দিকে মহাভারত যদিও বিস্তর কুতর্কের প্রসঙ্গ টেনে এনেছে তার ভার্গব-প্রক্ষেপের অংশে, কিন্তু অপ্রক্ষিপ্ত মূল অংশে মহাভারত ঘটনা ও চরিত্রকে যে ভাবে বিন্যস্ত করেছে তাতে এর অন্তর্নিহিত বহু মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিধাস্থান স্বতই উদ্ঘাটিত হয়েছে, পাঠক ন্যায়নীতি সম্বন্ধে তার অভ্যস্ত চিন্তা ও বোধের ক্ষেত্রে পরিপন্থী মূল্যবোধের সম্মুখীন হয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও অস্থির। যে গ্রন্থ পাঠককে চিন্তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে আজন্মলালিত বোধ ও বিচারকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে, তার জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা কম।

৫ আরণ্যকপর্ব; (২৪০:৬-৭)

মূল মহাভারত এক সময়ে শেষ হয়েছিল স্ত্রী পর্বে। এটি ছোট একটি পর্ব, এর মধ্যে থেকে দু-তিনটি বিষয় উপস্থাপিত করব। প্রথম, যুদ্ধ-শেষে রণক্ষেত্রে এলেন সধবা গান্ধারী— একশত তরুণী বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে। শতপুত্রের মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। চারিদিক থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুড়িয়ে জোড়া দিয়ে বধূরা নিজেদের স্বামীর দেহে অবয়ব বিন্যাস করছেন, সঙ্গে চলছে শত তরুণীর যুগপৎ বিলাপ। ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে গান্ধারীর। ইতিমধ্যে ভীম এসে জানালেন যে, তিনি সত্যিই দুঃশাসনের রক্ত পান করেননি, ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়েছিলেন মাত্র। যুধিষ্ঠির এসে ক্ষমা চাইলেন যুদ্ধের জন্য পুরো দায়িত্ব মেনে নিয়ে, গান্ধারীর অভিশাপ প্রার্থনা করলেন। মুখাবরণের ফাঁক দিয়ে গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙুল শুধু দেখতে পেলেন, তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে সেগুলি কালো হয়ে গেল। দ্যূতক্রীড়া থেকে এবং অন্যত্রও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে খানিকটা দায়িত্ব ছিল এই শ্মশান-রচনায়, তা প্রমাণিত হল। কিন্তু গান্ধারী জানতেন মূল অপরাধী কে। তাই কৃষ্ণকে বললেন, পাণ্ডব-কৌরবদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, এ যুদ্ধে সিংহাসন-লাভের স্বার্থ, তাই তাদের যুদ্ধ বোঝা যায়। কিন্তু কৃষ্ণই ছিলেন একমাত্র যাঁর সে রকম কোনও স্বার্থ ছিল না এবং যাঁর কথা শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষই শুনত; চাইলে একা তিনিই এ যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতেন— কিন্তু চাননি। সেটা এত বড় এক বিধ্বংসী অপরাধ যে, গান্ধারী তাঁকে অভিশাপ দিলেন: কুৎসিত উপায়ে কৃষ্ণের মৃত্যু হবে, যদুকুলের অনাথ বিধবারা কুরুবিধবাদের মতোই অসহায় আর্তনাদ করবেন।[৬] প্রথমত ধর্মপরায়ণা গান্ধারীর এ অভিশাপ দেওয়ার অধিকার ছিল, তাঁর সামনে ছিল তাঁর একশত বিধবা পুত্রবধূ এবং একশত পুত্রের শবদেহের ছিন্নভিন্ন অবয়ব। নৈতিক অধিকার তাঁর এসেছিল মর্মন্তুদ শোক থেকে; এই নিবার্য প্রলয় ও অসংখ্য স্বজনহত্যা নিবারণ না করবার পুরো দায় তিনি কৃষ্ণের উপর আরোপ করলেন। এর পরেও একটু কথা থাকে· গান্ধারীর অভিশাপবাণী যে ধর্মসম্মত, তার কী প্রমাণ? প্রমাণ এই যে, স্বল্পকালের মধ্যে এ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল এবং প্রমাণ করে দিল কৃষ্ণেরই পুরো দায়িত্ব ছিল এই বিভীষিকাময় সর্বনাশের জন্য। পাণ্ডবের কাছে তাঁর একটি অভিযোগ ও পরে একটিমাত্র প্রার্থনা ছিল। অভিযোগ হল· 'দুটো অন্ধ বুড়োবুড়ির অবলম্বন একটা লাঠিও রাখলে না? একশোটা ছেলেকেই মেরে ফেলতে হল?'

অনেক পরে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের কাছে গান্ধারী ও তাঁর নিজের নামে বনে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বলেছিলেন, রাজা ও রানি এই পুত্রহীন, অন্ধ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা দু'জনেই তাঁদের পুত্রদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছেন, আর ভিক্ষা চাইছেন বাকি জীবনের জন্য বনবাসী হওয়ার সম্মতি।[৭] এ দৃশ্যের তুলনা কমই আছে। কী প্রতিক্রিয়া হবে পাঠকের এখানে? এই দম্পতির মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র দেহে মনে অন্ধ, অন্ধ পুত্রস্নেহে বারবার বিসর্জন দিয়েছেন

৬. শল্যপর্ব; (৫৭.৪)

৭ স্ত্রীপর্ব; (২৫ ৩৯-৪২)

ন্যায়নীতিবোধ, কিন্তু বসনাবৃতনেত্রা গান্ধারী বাস্তবে তো চক্ষুষ্মতী ছিলেন এবং নৈতিক স্তরে আরও বেশি করেই, তাই বারবার গোপনে এবং প্রকাশ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, দুর্যোধনকে ত্যাগ কর। দুর্যোধন যুদ্ধযাত্রার আগে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এলে তিনি শুধুই বলতেন, 'ধর্ম যেখানে, জয় সেখানে'। 'পুত্র জয়ী হও'— এ কথা কখনও বলতে পারেনি। এই দম্পতির মধ্যে নীতিগত গভীর পার্থক্য ছিল, কিন্তু এই দীন আর্তি মুহূর্তের জন্য পাঠককে ভুলিয়ে দেয় ধৃতরাষ্ট্রের বহু অন্যায় কর্ম এবং বহুতর অন্যায়কে সমর্থন ও প্রশ্রয়দান। যেন তিনি পুত্রশোক, বার্ধক্য, অন্ধত্ব, রাজপটে আসীন পাণ্ডব ভ্রাতাদের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যে বিদ্রূপ-ভর্ৎসনা ও বক্রোক্তি সহ্য করার এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার দুঃখে, সিংহাসনের রাজমর্যাদা ও সম্মানের পরিবর্তে বর্তমানে প্রজার ভূমিকায় অবনমিত হয়ে বহু পূর্ব পাপ ক্ষালন করেছেন; নীরবে অনাদরে দূর অরণ্যে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বাকিটুকু শোধ করে দেওয়ার অনুমতি ভিক্ষা চাইছেন। সমস্ত মহাকাব্য জুড়ে যিনি স্বয়ং দুষ্কৃতি এবং দুষ্কৃতকারীর প্রশ্রয়দাতা, তিনি সর্বগৌরব-রিক্ত অবস্থায় সর্বজনের কৃপাপ্রার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।[৮] কাজেই পাঠকের স্বভাবতই কিছু ধন্ধ থাকে। পূর্বের ধৃতরাষ্ট্রকে সে মার্জনা করে না ঠিকই, কিন্তু এখন? এ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের কারাবাস তো কেউ লাঘব করতে পারবে না, কাজেই পাঠকের করুণা তাঁর প্রতি উদ্যত হবেই। তাই ভর্ৎসনার সঙ্গে মিশল করুণা, প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র, দ্বিধাসংকুল।

আর গান্ধারী? পাঠকের মনে পড়ে, কুন্তির সন্তান যুধিষ্ঠির আগে জন্মগ্রহণ করলে শোকে ক্রোধে ক্ষোভে নিদারুণ পীড়িত গান্ধারী তাঁর গর্ভজাত শিলাস্বরূপ বর্তুলাকৃতি বস্তুটিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিলেন, হিতৈষীদের মধ্যস্থতায় নিবৃত্ত হন।[৯] দু-বছর পরে একশত কৌরব পুত্র জন্মায়। গান্ধারীর এই ক্রোধ ও ক্ষোভ সূচিত করে তাঁর রাজমাতা পদের জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। স্বামী যাঁর অন্ধ, নীতিবর্জিত, দুর্বলচরিত্র, কুমন্ত্রকদের পরামর্শে চালিত, তাঁর জীবনের শেষ বাসনা ছিল শতপুত্রপ্রসবিনী হয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে রাজমাতার পদে আসীন থাকা। এ পদ তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ন্যায়ের দৃষ্টিতে কুন্তির পুত্রই জ্যেষ্ঠ, ধৃতরাষ্ট্রের নয়; পাণ্ডুরই প্রাপ্য ছিল সিংহাসন এবং পরে পাণ্ডবদের। এই সমস্ত ব্যাপারটা নষ্ট হতে চলেছিল একটি কঠিন পিণ্ড প্রসব করে দু-বছর অণ্ডবৎ ভ্রূণগুলিকে লালন করার সম্ভাবনায়। তাই ওই সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ মর্মান্তিক আক্রোশ। এ আক্রোশ নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধেই, কাজেই এ তাঁর পাপ নয়, ব্যর্থতাবোধ; বহুধাবঞ্চিতা নারীর নীরব আর্তনাদ। এ ছাড়া সারা জীবনে যিনি সত্যিই কোনও অন্যায় করেননি, আত্মজের অন্যায়কেও যিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা সত্ত্বেও, রাজবধূ ও রাজমাতার পদ যাঁর কাছে গুরুদায়িত্বের আসন ছিল বলে যিনি মাতৃসুলভ কোমলতাকে শাসন করেছেন নীতির মর্যাদা রাখতে, তিনি তো আগাগোড়াই সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

৮. স্ত্রীপর্ব; (১৪·২০-২১)

৯. আশ্রমবাসিক; (৯:৭-৯) (বঙ্গবাসী)

যুদ্ধের শেষে প্রাসাদের জীবনযাত্রা আবর্তিত হতে লাগল পাণ্ডবদের ঘিরে, কৌরব রাজমাতা প্রান্তবাসিনী হয়ে রইলেন তাঁরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যে স্বামীর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের গভীর বিচ্ছেদ ন্যায়বোধের স্তরে। তাঁর অন্তরের বনবাস শুরু হয়েছিল প্রাসাদের অভ্যন্তরেই, পরে সেটা বাস্তবায়িত হল।

বিদুর, সঞ্জয় ও গান্ধারী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের বিকল্প বিবেক; এঁদের এবং তৎকালীন রাজমাতা কুন্তিকে নিয়ে শুরু হল বনবাস, শেষ হল অগ্নিদাহে, মৃত্যুতে। বনগমনের প্রাক্কালে গান্ধারী সম্বন্ধে পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? সেও এক মিশ্র অনুভূতি। চিরশ্রদ্ধার পাত্রী গান্ধারী দীন ভাবে বনবাসের অনুমতি চাইছেন। এতে পাঠকের মনে যে সহানুভূতি জাগে তার মধ্যে কোথাও একটা দীনতা ও করুণার সংশ্লেষ ঘটে।

এই স্ত্রীপর্বেই পঞ্চম অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে:

> এক ব্রাহ্মণ রাক্ষসবহুল এক বনে প্রবেশ করেন। সেখানে অনেক সিংহ, বাঘ, হাতি, চারিদিকে ঘুরছে। দেখে ব্রাহ্মণটির ভয়ে রোমাঞ্চ হল। দেখলেন চারিদিকে জালে ঢাকা এক বনভূমি তাকে এক নারী দু-হাতে বেষ্টন করে আছে। পাঁচমাথাওয়ালা পাহাড়প্রমাণ হাতিরা ঘুরছে। সেই বনে লতায় ঢাকা এক জলাশয়, তার মধ্যে এক কূপ। ব্রাহ্মণ আচমকা সেই কুয়োয় পড়ে গেলেন, ঝুলন্ত লতা ধরে ঝুলতে লাগলেন— মাথা নিচে, পা ওপরে এই অবস্থায়। কুয়োর পাড়ে এক প্রকাণ্ড হাতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওই ঝুলন্ত শাখায় ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। মৌচাক থেকে মধুর ধারা নিঃসৃত হচ্ছে। ওই ব্রাহ্মণটির মুখেও মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা মধু পড়ছে, পান করে তার অতৃপ্তিই বাড়ছে। মহাভারত বলছে, ওইখানেই মানুষের বেঁচে থাকার বাসনা প্রতিষ্ঠিত। এ দিকে যে-গাছের লতা ধরে মানুষটি ঝুলছে সেই গাছের শিকড়গুলো কেটেই চলেছে কিছু ইঁদুর, অর্থাৎ যে কোনও সময়ে গাছটা পড়ে যাবে, লতাগুলো ছিঁড়ে যাবে এবং মানুষটি কুয়োর নীচে পড়ে যাবে আছে বিষাক্ত সাপ। মানুষ সংসারে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই ভাবেই বেঁচে থাকে।[১০]

এই প্রলম্বিত উপমাটি আছে স্ত্রীপর্বে, যেখানে রচনার এক স্তরে মূল মহাভারত সমাপ্ত হয়েছিল, অর্থাৎ মহাভারত জীবন সম্বন্ধে যা বলতে চায় তা এখানে বিধৃত। একবারও অস্বীকার করা হচ্ছে না যে জীবনে বিপদ, আশঙ্কা ও ভয়ের নানা কারণ আছে। অন্যত্র মহাভারত বলছে, 'শোকস্থান-সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।' ওপরে বিপুলকায় হাতি, মৌমাছির ঝাঁক, জালে ঢাকা জলাশয়ের মধ্যে এই কূপ; যে লতা ধরে ঝুলছে মানুষটি তার আশ্রয়স্থলে যে গাছ তার শিকড় কেটেই চলেছে ইঁদুররা; গাছ-লতা পড়ে গেলে অবলম্বনচ্যুত হয়ে মানুষটি পড়বে কুয়োর নীচে, যেখানে আছে বিষধর সাপ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণের কোনও

১০ আদিপর্ব; (১০৭:১১)

উপায় নেই। অনিবার্য মৃত্যুর বহুবিধ সম্ভাবনা, যন্ত্রণার নানাবিধ উপাদান এই পরিবেশেই মানুষ জীবনে বেঁচে থাকে। কেন থাকে? কী তাকে বাঁচায়? ওই মৌচাক থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা মধু, যা পান করে তার কখনওই তৃপ্তি হয় না, কিন্তু যার জন্য লোলুপতা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, জাগিয়ে রাখে পরবর্তী মধুবিন্দুটির প্রত্যাশায়।

এই মধু-র স্বরূপ প্রত্যেক জীবনে ভিন্ন, কোথাও তা কর্ম, কোথাও কোনও ক্ষেত্রে সাধনা, কোথাও কোনও মানবিক আদর্শ, কোথাও প্রেম, কোথাও বা অন্য কিছু। কিন্তু স্বরূপ যাই হোক, ওই মধু-বিন্দু তাকে তৃপ্তি দেয় না, অতৃপ্তিই বাড়িয়ে দেয়; তার ফলে সে চারিদিকের বিপৎসংকুল পরিস্থিতির মধ্যেও হাল ছেড়ে দেয় না। বেঁচে থাকতে প্রয়াসী ও বদ্ধপরিকর হয়। সংস্কৃত সাহিত্য এই বাঁচবার উদগ্র অনিঃশেষ বাসনাকে বলেছে 'জীবাতুকাম্যা'। ঋগ্বেদ থেকেই জীবাতু শব্দটির দেখা পাই, অর্থাৎ এই বোধটি বহু প্রাচীন। প্রাচীনতর মহাকাব্য *গিলগামেশ্*-এও অমৃতের সন্ধানে নায়কের সুদীর্ঘ বিপৎসঙ্কুল অভিযান এরই প্রতীক; এই 'জীবাতুকাম্যা'র।

স্ত্রীপর্বের এই সুদীর্ঘ উপমা-আখ্যানে মহাভারত মানুষের জীবনের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। পাঠক এতে কী ভাবে সাড়া দেবে? মনে রাখতে হবে, এই রচনা উপনিষদের 'মোক্ষ' ও বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণে'র কল্পনার পরবর্তী। অর্থাৎ ওই সব চিন্তাকে পেরিয়ে এখানে মহাভারত তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত জীবন ও জীবনের তাৎপর্য ও 'জীবাতু' সম্বন্ধে উচ্চারণ করছে। 'জীবন মায়া' বলবার পেছনে যে নিস্পৃহতা তার নানা দিক এখানে সন্নিবিষ্ট— ওই বাঘ সিংহ হাতির দল, মৌমাছির ঝাঁক, অত্যন্ত ক্ষীণ অবলম্বন, ইঁদুরে যাকে এক সময়ে ছিন্নমূল করে দেবেই, অনিবার্য মৃত্যু কুয়োর নীচের সাপের মূর্তিতে এবং ওপরের শ্বাপদকুলের আক্রমণের সম্ভাবনায় প্রতিবিম্বিত। অতএব জীবনকে মায়া বলার প্রলোভনের বিস্তর হেতু এখানে উপস্থিত; অন্তিম মৃত্যুটি কোনও মতেই মায়া নয়, আর বিপদের সম্ভাবনাগুলির মধ্যে জীবনের নানা সংকট ও যন্ত্রণা প্রতিফলিত। এ সবই বাস্তব, কাজেই জীবন সম্বন্ধে যে অনীহা নানা দর্শন-প্রস্থানে উচ্চারিত হচ্ছিল এবং বহু মানুষকে আকৃষ্টও করছিল তার প্রতিস্পর্ধারূপে মহাভারতে জীবনের পুনর্মূল্যায়ন স্পষ্ট ভাবে অন্য এক মূল্যবোধ উপস্থাপিত করছে। জীবন বহুমূল্য; ওই মধুবিন্দুটি তার সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে না, কিন্তু নিত্যজাগ্রৎ রাখে। জীবনের ইহমুখীন এই স্বীকৃতি নেতিবাচক প্রস্থানগুলিকে প্রত্যাখ্যান করছে, যেগুলি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অত্যাচারিত সংখ্যাগুরু মানুষের জীবনে তখনই বেশ দৃঢ়মূল। কাজেই পাঠক জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ বিপদ, ভয়, শোক, আতঙ্ক যন্ত্রণাকে একান্ত মনে করে জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে পরমার্থের, নির্বাণ বা মোক্ষের চেষ্টা করবে, নাকি এই মধুবিন্দুটি যেহেতু অলীক নয়, তাই 'জীবাতু'র মূল্যমানে প্রত্যয় রেখে সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে বিপৎসংঘাতের সম্মুখীন হবে— এ দুটো সম্ভাবনা পাঠককে দ্বিধান্বিত করে। এ কাহিনিতে মহাভারত জীবনের সদর্থক দিককে অভ্যর্থিত করেছে। ঋগ্বেদের পরে এই প্রথম। হয়তো বেশ কিছু শতাব্দী পর্যন্ত; এর শেষ দৃঢ় পুনরুচ্চারণ পাই রবীন্দ্রনাথে— 'মরিতে

চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। দুটি আত্যন্তিক বিকল্পের এমন প্রত্যয়যোগ্য রূপায়ণ রামায়ণে কোথাও নেই; রামায়ণ জীবনের এত গভীর স্তরে মানুষকে নিয়ে যেতে পারেনি। সহজ জীবনে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ী মানুষ তাই যত সহজে রামায়ণে সাড়া দিতে পেরেছে, সংশয়সমাকুল মহাভারতে তেমন ভাবে কখনওই পারেনি।

অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়

স্ত্রীপর্বের পরে শান্তিপর্ব, মহাভারতের দীর্ঘতম অংশ। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশের যদি তিনটি স্তম্ভ থাকে তবে সেগুলি হল বনপর্ব, অনুশাসনপর্ব ও শান্তিপর্ব। এখানে ভীষ্মকে সুদীর্ঘকাল শরশয্যায় শুয়ে থাকতে হল: আসল কারণটা সূর্যের উত্তরায়ণে যাওয়া নয়, ততটা সময় না পেলে এতগুলি উপদেশবাণী ভীষ্ম দেবেন কখন? লক্ষণীয়, পাণ্ডব ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে বলা হলেও শান্তিপর্বের বাণীর মুখ্য শ্রোতা যুধিষ্ঠির; ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন ভীষ্ম। কেন? যুধিষ্ঠির রাজা হবেন, তাই। তা হলে শান্তিপর্বের 'রাজধর্ম' অংশটা বোঝা যায়। ধার্মিক রাজা হতে হবে, তাই মোক্ষধর্মও জানা দরকার। এমনি ভাবে নানা আনুষঙ্গিক বিষয় এতে জুড়েছে। কিছু বা তার অতিকথা, যেমন রাজার উৎপত্তি। কিছু বা কাহিনিনিষ্ঠ উপদেশ, যেমন আতিথ্য, দয়া, ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা। কিছু বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যেমন রাজার কর্তব্য নিরূপণ। এর মধ্যে প্রসঙ্গ ছাড়াও নানা বিষয় জুড়েছে যেমন নারীনিন্দা, শূদ্রের সামাজিক স্থান, জ্যেষ্ঠভক্তি, ইত্যাদি।

এ বিষয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়? তুলনীয় অংশ রামায়ণে নেহাৎ-ই কম। প্রাসঙ্গিকতা সর্বত্রই আছে, দৈর্ঘ্যও স্বল্পতর। এখানে পাঠকের চিন্তাগত একটা বিভ্রান্তি আসে, কারণ বক্তা ভীষ্ম, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। দুজনেই যখন ধর্মজ্ঞ, তখন এত বাগ্‌বিস্তার কেন? মৌর্যযুগের কাছাকাছি থেকে গুপ্তযুগের আরম্ভ পর্যন্ত আর্যাবর্তব্যাপী যে রাজ্য-সাম্রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে তার নির্দেশক শাস্ত্র তো চাই। এই সেই শাস্ত্র। কাজেই যুধিষ্ঠির পরোক্ষ শ্রোতা, প্রত্যক্ষ শ্রোতা ওই দীর্ঘ আটশ বছরের বিবর্তনের মধ্যবর্তী কালের ও পরবর্তী কালের মানুষ। ফলে বহু পুরাতন ভাব পুনরাবৃত্ত হচ্ছে; বহু বিষয়ে, নির্দেশ কঠোরতর হচ্ছে; শ্রোতা ভেবে পাচ্ছে না এত শাস্ত্রকথা শাস্ত্র ছেড়ে মহাকাব্যে স্থান পায় কেন, মহাকাব্যের ধর্ম যে এতে ক্ষুণ্ন হয়। বোঝাই যায়, এই সুদীর্ঘ শান্তিপর্ব একজনের রচনা নয়; বহু বিভিন্ন কবি-মনীষী ও অকবি শাস্ত্রকারের সমবেত প্রয়াসে এর সৃষ্টি। এবং এমন ক্ষেত্রে যা হয় তা মাঝে মাঝেই ঘটেছে: সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কথাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন দু-চারজন ব্যতিক্রমী রচয়িতা। তার একটি দুটি বলব।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলছেন, তীক্ষ্ণ বিষ কালসাপ, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার, বিষ ও নারী একই রকম প্রাণনাশক; আর যা-ই করো, যুধিষ্ঠির, নারীকে কদাপি বিশ্বাস কোরো না।[১] বক্তা চিরকুমার, ব্যক্তিগত ভাবে নারীর বিষাক্ততা বা মাধুর্য কোনওটাই তাঁর জানবার কথা নয় এবং বিপরীতে, শ্রোতা স্ত্রী-অভিজ্ঞ (এক পঞ্চমাংশের হলেও স্বামী এবং তাঁর অন্য স্ত্রী ছিল); এই চিরকুমারের উপদেশ না শুনে নারী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে আসার, দৃঢ়তর ভিত্তি তাঁর থাকার কথা। এ অবস্থায় সমস্ত অংশটা হাস্যকর ও যথার্থই অপ্রযোজ্য, অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হবে? ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধা টলে যাবে। যুধিষ্ঠিরের নিষ্প্রতিবাদে এ কথা শোনা তো দ্রৌপদীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অপমানে পর্যবসিত হয়। সমকালীন ও উত্তরকালীন পুরুষের মনকে নারী সম্বন্ধে বিষিয়ে দেওয়াই এর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে প্রতীত হবে। এর কারণ, গুপ্তযুগ থেকে যে সমাজের ভিত্তিস্থাপন হচ্ছে, তার একটি মূলস্তম্ভ নারীর সামাজিক অবনমন এবং পুরুষের দ্বারা অবদমন। কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, শরশয্যায় শুয়ে পিতামহ পরিণত বয়স্ক নাতিকে এই সব শিক্ষা দিচ্ছেন মৃত্যুর অনতিদূর থেকে— এতে একটা উদ্দেশ্য-উপায়ের বিরোধ পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এমনই বহু শ্লোকে শূদ্রের হীনতা, রাজার প্রতি প্রজার বশ্যতা, গুরুজনের প্রতি কনিষ্ঠের, পুরুষের প্রতি নারীর, দেবতার প্রতি মানুষের, নিয়তির সঙ্গে পুরুষকারের সম্বন্ধ— মৃত্যুপথযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধের এই সব কী পৌত্রের হাতে শেষ উত্তরাধিকার তুলে দেওয়ার যথার্থ নমুনা? উপায় ও উপেয়ের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, পাঠককে অনেকটা ব্যাকুল করে তোলে।

আগেই বলেছি, ভিন্ন ভিন্ন লেখনীর সৃষ্টি ভিন্ন অংশ। তাই এক জায়গায় প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই সহসা ভীষ্ম বলেন, 'গোপন একটি রহস্য তোমাকে বলি। যুধিষ্ঠির, মানুষের চেয়ে বড় কোনও কিছুই নেই।'[২] অর্থাৎ? দেবতাদের চেয়ে মানুষই বড়। এবং শুদ্ধ মানুষ হিসাবেই সে বড়। গুণী, জ্ঞানী, বীর, পণ্ডিত, যশস্বী মানুষ নয়, মানুষ বলেই মানুষ বড়। কত বড়? আবিশ্বচরাচরে সবচেয়ে বড়; সবচেয়ে উঁচুতে তার জায়গা। তা হলে এতক্ষণ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গার মহিমা কীর্তন করা হল, তাঁদের জায়গা কোথায়? কোথায় আবার? ভীষ্ম তো সরাসরিই বললেন, মানুষের নিচে। কারণ মানুষ সৃষ্টির উন্নততম স্থানে আসীন। স্বভাবত, বলাই বাহুল্য, এই উক্তিতে পাঠক শ্রোতার মনে একটা ধন্ধ লাগে, তার চিরাভ্যস্ত ধারণাগুলি কেমন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সমস্ত রামায়ণে এমন বৈপ্লবিক উক্তি একটিও নেই। সেখানে আদি নায়ক রাম 'নরচন্দ্রমা' ছিলেন, যেমন সব মহাকাব্যের নায়করাই হন। কিন্তু মহাকাব্যটির জনপ্রিয়তার পরেই রাম বিষ্ণুর অবতারে পরিণত হন, অর্থাৎ মানুষের মর্যাদার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় দেবতার মহিমা। মহাভারতের শেষ সংযোজনে কৃষ্ণকেন্দ্রিকতা দেখা যায়; কিন্তু 'স্ত্রীপর্বে'-তে বিষ্ণুর অবতার সেই কৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান, এবং

১. স্ত্রী পর্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়

২. শান্তিপর্ব; (৪০:১); অনুশাসনপর্ব; (৪৩:২৫)

'যতঃকৃষ্ণস্ততোজয়ঃযতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এই সব বাণীতে যিনি ধর্মের সঙ্গে সমীকৃত, সেই কৃষ্ণকে যখন তাঁর অধার্মিক আচরণের জন্য অভিশাপ দেন মানবী গান্ধারী, তখন স্পষ্টতই কৃষ্ণ মানুষে পরিণত। মথুরার রাজা পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ মহাভারতের মূল অংশে মানুষরূপেই ছিলেন; মহাকাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করবার পরে বিষ্ণু-কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের পুরোহিত ভক্তরা এটিকে আত্মসাৎ করে এবং সাম্প্রদায়িক ইষ্ট সিদ্ধির জন্যে কৃষ্ণকে এর কেন্দ্রস্থলে বসায় এবং তখনকার কৃষ্ণ ভগবদগীতার বক্তা, দেবতা, বিষ্ণুর অবতার। একথা মনে রাখলে কৃষ্ণের দুটি চিত্রের ব্যাখ্যা মেলে। যখন মহাকাব্য পাণ্ডবসখা পার্শ্বচরিত্র, তখন তিনি সম্পূর্ণতই মানুষ; পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশে পুরো দেবতা।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আদিপর্বের একটি উপকাহিনি অণীমাণ্ডব্যের কাহিনি। এটি মূল কাহিনির সঙ্গে অসম্পৃক্ত:

> ঋষি অণীমাণ্ডব্য মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করছিলেন নিজের কুটীরে। কয়েকজন চোরকে নগররক্ষীরা তাড়া করতে তারা নিরুপায় হয়ে চুপি চুপি চোরাই মাল ঋষির কুটীরে রেখে পালিয়ে যায়। রক্ষীরা কুটীরে ঢুকে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করে, লোকগুলো কোনদিকে গেল। কিন্তু ঋষি তখন মৌন অবলম্বন করে আছেন তখন, কাজেই উত্তর দিলেন না। রক্ষীরা চোরাই মাল কুটীরে পেয়ে ঋষিকেই চোর সাব্যস্ত করে রাজদ্বারে বিচার চায়। রাজা বলেন তাঁকে শূলে দিতে। শূলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, নির্দোষ হলেও কেন তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু। ধর্ম বলেন, শৈশবে তিনি একটি কীটের শরীরে একটি কাঁটা প্রবেশ করান, এ তারই প্রায়শ্চিত্ত। তখন অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ করে অভিশাপ দিয়ে বলেন, অজ্ঞান বালকের লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড বিধান করার অপরাধে ধর্মকে মর্তে জন্মাতে হবে শূদ্রযোনিতে। ধর্ম শূদ্ররূপে অবতীর্ণ হলেন, বিদুর রূপে।[৩]

এটি একটি বৈপ্লবিক উপাখ্যান: শ্রোতা পাঠকের আজন্মলালিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে অভিশাপ। প্রথমত ধর্ম স্বয়ং দেবতা, তাঁর পক্ষে কোনও অন্যায় করাটাই অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত, দেবতা যা-ই করুন না কেন, একজন মানুষ তাঁকে কী ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ড দেবে, অভিশাপ দেবে? এবং আরও বিস্ময়কর কথা, সেই অভিশাপ ফলে যাবে? এখানেও একজন নির্দোষ সৎ মানুষ দেবতার বিচারক ও দণ্ডদাতা হয়ে দেবতার ওপরে উন্নীত হলেন।

এমনই আর একটি উপকাহিনি আছে:

> যমরাজের দূতেরা এক ব্যক্তিকে পরলোকে নিয়ে গেল; তাকে দেখে যম বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে। এরা অর্থাৎ যমদূতেরা নামসাদৃশ্যে ভুল লোককে ধরে এনেছে।' পরে লোকটির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তাকে মর্তে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[৪]

৩. শান্তিপর্ব; (২৮৮:২০)
৪. আদিপর্ব; (১০১:২৫, ২৭)

তা হলে দেবদূতরা ভুল করে মৃত্যু ঘটায়? এ সব কাহিনিতে পাঠকের চিরাচরিত বিশ্বাসগুলি চূর্ণ হয়, তাকে নতুন করে ভাবতে হয়: কেন এ কাহিনি, এর তাৎপর্য কী?

তাৎপর্য আছে বই কী। যে মহাভারতে ভীষ্ম অসংখ্য প্রচলিত কুসংস্কারের প্রশংসা করতে করতে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরকে বলে ওঠেন, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই, সেই মহাভারতকারেরই তো বুকের পাটা থাকবে এত বড় একটা প্রকাণ্ড লোকক্ষয়কারী যে পাপ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তার সমস্ত দায়িত্ব ধর্মরূপী কৃষ্ণের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার, এবং সেটা ফলিয়ে দিয়ে এটা প্রতিপন্ন করা যে ওই ধর্ম-কৃষ্ণের স্থান অভিশাপদাত্রী এক মানবীর নিচে। এই মহাভারত যখন দেবতা অণীমাণ্ডব্যকে দিয়ে ধর্মকে অভিশাপ দেওয়ায় মানুষ, তখন সে কি বলে না যে সংসারটা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এখানে বহু অনর্জিত তাপ ভোগ করতে হয় মানুষকে, যদি বিধাতা কেউ থাকে তবে সে বিধাতা একান্তই খামখেয়ালি? তাই এমন মৃত্যু প্রায়শই ঘটে, যার ব্যাখ্যা মেলে না; যমদূতের ভ্রান্তি সেই ব্যাখ্যা। এখানে সব সময় ভালর জয় হয় না। দেবতা থেকে থাকলেও নয়, বরং সেই দেবতাই দায়ী শাস্তি-পুরস্কারের বৈষম্যের জন্য। এ বৈষম্য তো মানুষকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এমন মর্মন্তুদ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে জানতে হচ্ছে যার কোনও ব্যাখ্যা সে কখনও খুঁজে পায়নি; পায় না, পাবেও না। মহাভারত এই সব উপাখ্যানের মধ্যেই বিভ্রান্ত সেই মানুষকে তো বলছে, 'এভাবে অভিজ্ঞতার অর্থ খুঁজোনা, কোথাও মিলবেনা হিসেব।' এবং প্রচলিত বিশ্বাসভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও মানুষ তো এই সব কাহিনির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মধ্যে দিয়েই পৌঁছেছে অর্থ খোঁজা থেকে মুক্তিতে, দেখতে পাচ্ছে সংসারের কোনও ন্যায়নিষ্ঠ অধিকর্তা নেই। কাজেই মানুষেরই ওপরে সেই দায়িত্ব বর্তায়: রূপনারাণের কূলে নিরুত্তর এই জীবনজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে, অন্যায়ের প্রতিকারের দায়িত্ব আপন হাতে তুলে নেওয়ার।

সমগ্র রামায়ণে এমন কোনও উপাখ্যান নেই যা মানুষের গভীরতম বিশ্বাসের মূলে এমন ধাক্কা দেয়। কাজেই রামায়ণের পাঠক যত তার.পূর্ব প্রত্যয়গুলির সমর্থন খুঁজে পায় মহাকাব্যে, ততই কাব্যটি তার সন্তোষ ও প্রশংসা অর্জন করে। সেখানে মহাভারতের পাঠককে প্রত্যয়ের প্রান্তে এসে সম্মুখীন হতে হয় বারংবার। সংশয়ের এক অতল কালো গহ্বরের আতঙ্কের প্রথম পর্যায়ে তার অস্বস্তি ও বিরক্তি জন্মায়, মহাকাব্যটি এ ভাবে তার বিশ্বাসের অবলম্বন কেড়ে নেয় বলে। যদিও যথেষ্ট ধৈর্য ও বিবেচনা নিয়ে যাচাই করলে সে আপাতত প্রত্যয়-ধ্বংসের ওপারে অন্য একটি গভীরতর প্রত্যয়ের ভূমি ধীরে ধীরে খুঁজে পায় ও উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারে, যেখানে জীবনের বহু জটিলতার অন্যতর ব্যাখ্যা মেলে।

কৌরবরা নিঃশেষ হলে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের অবিসংবাদিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন যুধিষ্ঠির সিংহাসনে অনীহা প্রকাশ করে কনিষ্ঠদের একে একে রাজা হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভ্রাতৃহত্যা-স্বজনহত্যার দরুন যে অপরাধ-বোধ যুধিষ্ঠিরকে পীড়া দিচ্ছিল তা অন্যেরাও অনুভব করছিলেন। এবং জ্যেষ্ঠ যেখানে বিমুখ, সেখানে অন্যরা তা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যাস পরামর্শ দিলেন, পাপবোধ থেকে

নিষ্কৃতি পেতে গেলে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করা উচিত। তার পরে শুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির অভিষিক্ত হয়ে রাজত্ব করতে পারবেন।[৫] পাঠকের অবাক লাগে এই ভেবে, যে, সমস্ত যুদ্ধটা তো সিংহাসনেরই জন্যে। বহু স্বজন-বন্ধু হত্যার পরে সেই সিংহাসনে বসতে পাণ্ডবদের এত দ্বিধা কীসের? তাঁরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করে নিজস্ব অধিকার আদায় করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম, তবু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যুধিষ্ঠিরের কী আকুতি যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে, অর্জুনের কী ঘোর আপত্তি আত্মীয়বন্ধু হত্যায়! ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে এত দ্বিধা করে কেন? এই দ্বিধারই শেষতম প্রকাশ আশ্বমেধিক পর্বে। ব্যাস উপায় নির্দেশ না করলে কী করতেন পাণ্ডবরা? এত কষ্টে অর্জিত সিংহাসন ছেড়ে বানপ্রস্থে যেতেন? কতকটা যেন অসহিষ্ণু বোধ করে পাঠক। কিন্তু এই দ্বিধার পশ্চাতে আছে ক্ষাত্র-ধর্মেরও ওপরে যার স্থান, সেই মানবধর্ম। গ্রন্থকার দেখাতে চাইছেন, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে শেষ পর্যন্ত যাঁরা এলেন তাঁরা শুধু ক্ষত্রিয় নন, পুরোপুরি মানুষও। বর্ণধর্মকে পেরিয়ে তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছেছে এমন এক স্তরে যেখানে তাঁদের এই অনুতপ্ত বৈরাগ্যই তাঁদের যথার্থ অধিকার দিচ্ছে রাজত্ব করবার। উপনিষদের সেই, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' তাঁরা অনুভব করেছেন বলেই এই মহতী দ্বিধা, যা তাঁদের মহনীয়তায় মণ্ডিত করেছে।

মহা ধূমধাম করে অশ্বমেধযজ্ঞ হয়ে গেল; যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল; বহু দূরদূরান্তের রাজাদের আনুগত্য নিশ্চিত হল; কৌরবদের অনুগতরা বিদ্রোহ করার সাহস হারাল; শুরু হল পাণ্ডব রাজত্ব। রামায়ণে রামের রাজত্ব উত্তরকাণ্ডে খুব ঘটা করে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে রামরাজ্যকে ধর্মরাজ্য বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে রাজ্যে একটি ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যুর মূল্য শোধ করেছে শূদ্র শম্বুক, এবং নিরপরাধা এক নারী সীতাকে বারংবার অকারণে অপমান ও প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য, উত্তরকাণ্ডে সুর নেমে এসেছে, গতানুগতিক বর্ণনা এবং শূদ্র ও নারীর ওপর অত্যাচার ছাড়া কোনও কিছুই এখানে পাঠকের চিত্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। মহাভারতের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরেও সুর নেমে এসেছে। আশ্রমবাসিক পর্বে কুন্তি ও বিদুরকে নিয়ে বৃদ্ধ রাজদম্পতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বনে গেলেন এবং একটি দাবানলে প্রাণ ত্যাগ করলেন।[৬] মৌষল পর্বে আকস্মিক, অর্থাৎ মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে অসম্পৃক্ত একটি ঘটনা ঘটে, তার আকস্মিকতাই তাকে খানিকটা কাহিনিগত বৈচিত্র্য দেয়।

এখানে শুনি একদিন বিশ্বামিত্র, নারদ ও কণ্বমুনি যদুরাজ্যে বেড়াতে এলেন কৃষ্ণের ভাই সারণ ও আরও দু-চারজনের কী দুর্মতি হল, তারা সাম্বর পেটের ওপরে এক মুষল রেখে কাপড় বেঁধে সেটা অদৃশ্য করে তাকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে মুনিদের সামনে এনে বললে 'এ কৃষ্ণের এক ভাইয়ের স্ত্রী, সন্তানসম্ভবা। এ কী প্রসব করবে পুত্র না কন্যা, তা আপনারা

৫. আশ্বমেধিকপর্ব; ৭১ অধ্যয়

৬. আশ্বমেধিকপর্ব; (৩:৪, ৯, ১০)

ধ্যানযোগে জেনে বলে দিন।' তখন মুনিরা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, তাঁদের ঠকাবার উদ্দেশ্যে এরা এই ছলনার অবতারণা করেছে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, তিন মুনিই অভিসম্পাত দিয়ে বললেন, 'এ একটি মুষল প্রসব করবে, এবং তার দ্বারা সমগ্র যদুকুল ও বৃষ্ণিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে।' বলে তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

সত্যিই সাম্ব একটি মুষল প্রসব করল। কংসের পিতা রাজা উগ্রসেন সমস্ত ঘটনা শুনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে মুষলটিকে বালির মতো চূর্ণ করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে বললেন এবং রাজ্যের সকলকে সুরাপান করতে নিষেধ করলেন। তখন আকাশে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে নানা দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল, তাঁর রথের ঘোড়ারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে গেল। তাঁর ও বলরামের ধ্বজা দুটি আকাশে উঠে নিশ্চিহ্ন হল। কৃষ্ণ বললেন কুরুবংশ ধ্বংস হওয়ার আগেও চারদিকে এ ধরনের নানা দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কয়েকজন যদু ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা অভব্য আচরণ করতে লাগল ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়ে ও সৌপ্তিক পর্বে বর্ণিত যে যা অন্যায় করেছেন তাই নিয়ে সাত্যকি ও কৃতবর্মা পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলেন। উচ্ছিষ্ট বাসন নিয়ে ভোজবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়রা পরস্পরকে আক্রমণ করতে লাগলেন। এ ভাবে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি মারা গেলেন। এদের অশালীন ও হিংস্র আচরণে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ একমুঠো এরকা-তৃণ (নলখাগড়ার মতো) ছিঁড়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লোহার মুষলে পরিণত হল এবং তিনি তা দিয়ে সামনে যাকে পেলেন তাকেই মারতে লাগলেন। তখন অন্যরাও, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশের লোকেরাও লৌহমুষলে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কৃষ্ণের ছেলে, নাতি সকলে তাঁর সামনেই পরস্পরের এই উন্মত্ত আঘাত প্রত্যাঘাতে মারা গেলেন— সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, গদ, চারুদোষ্ণ, অনিরুদ্ধ সকলেই। বহু লোক মারা গেলে পর, কৃষ্ণের সারথির পরামর্শে তাঁরা বলরামের কাছে এলেন; দেখলেন অনন্তনাগ তাঁর শরীর থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রে চলে গেল এবং বলরাম দেহত্যাগ করলেন। দেখে কৃষ্ণ কিছু দূরে গিয়ে যোগাসীন হলেন। দূর থেকে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে একটি শর নিক্ষেপ করলে তা কৃষ্ণর পায়ে বিদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণ প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পূর্ব নির্দেশ অনুসারে হস্তিনাপুরে খবর গেল। অর্জুন এলেন যাদব ও বৃষ্ণিবংশের নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে। পথে আভীররা তাঁদের আক্রমণ করলে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবে শরারোপ করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্রের কথাই মনে আনতে পারলেন না। ফলে আভীররা নারীদের হরণ করল, বহু নারী নিজের ইচ্ছেতেই অপহারকদের সঙ্গে গেলেন। অল্প ক'জন নারীকে নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।[৭]

এই কাহিনি যদি পাঠক অভিনিবেশ নিয়ে পড়েন তবে অনেকগুলো ঘটনায় তাঁর খোঁকা লাগে। প্রথম ঋষিদের প্রতারণা করার উপাখ্যানটি কাহিনির দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ঋষিশাপই যদি এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তাও বাহুল্য, কারণ যদু-বৃষ্ণি (কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশের

৭. আশ্রমবাসিকপর্ব; (৪৫:৩৪)

ছিলেন) ধ্বংসের অভিশাপও একাদশ ('স্ত্রী') পর্বে গান্ধারীই দিয়েছিলেন, তবে দ্বিতীয়বার এই নেহাৎ শিশুসুলভ কাহিনির দ্বারা কী প্রতিপাদিত হল? নারীর শাপ ফলতে পারে না, তাই কি ঋষির শাপ প্রয়োজন হল? গান্ধারী সমস্ত জীবনই যে কোনও ঋষির মতোই সংযত ও ধর্মপরায়ণ, কিন্তু নারী উনমানব, তাই কি পুরুষ অভিশপ্তার প্রয়োজন? পাঠকের কাছে ওই স্ত্রীপর্বের প্রবল গাঢ় সংবেদনাময় পরিস্থিতিতে গান্ধারীর শাপের যে আবেগ-ঘন আবেদন আছে, এ ছেলেখেলায় তা কোথায়? পাঠক কীভাবে গ্রহণ করতে পারেন এ নিষ্কারণ দ্বিরুক্তিকে? তার পর, যে সব অতিলৌকিক ঘটনা এখানে অতি দ্রুত পর পর ঘটে চলেছে সেগুলি মহাকাব্যে গম্ভীর পরিণতির পরে তুঙ্গবিন্দু থেকে একটি করুণ ও হাস্যকর অবপতন। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ও গরুড়ধ্বজ আকাশে মিলিয়ে যাওয়া এবং বলরাম দেহত্যাগ করলে কৃষ্ণের যোগাসনে বসে দেহত্যাগ এক ধরনের কর্তব্যচ্যুতি, কারণ অর্জুন না আসা পর্যন্ত তাঁর নিজের যোলো হাজার স্ত্রী এবং রাজ্যের বহু নারী, শিশু, বৃদ্ধ এদের কোনও ব্যবস্থাই তিনি করলেন না।

আগেই বলেছি শান্তিপর্ব থেকে মহাকাব্যের সুর নেমে এসেছে। প্রক্ষিপ্ত মৌষল পর্বে এই অবক্ষয়ের প্রকৃতি হল যাকে পূর্বেই অনিবার্য ভবিতব্য বলা হয়েছে তাকে এখানে কতকগুলি অতিলৌকিকের মধ্যে দিয়ে ঘটানো হচ্ছে। ধ্বজা, চক্র বাদ দিলেও যে কৃষ্ণ থাকেন তাঁর কি কোনও শক্তিই ছিল না আসন্ন যদুবৃষ্ণি-কুলক্ষয় নিবারণ করবার? তখনও কিন্তু তিনি অলৌকিক বিষ্ণু-অবতার, কারণ জরা'র শরে দেহত্যাগ করবার পর তাঁর চতুর্ভুজ মধুসূদন মূর্তি দেখানো হয়েছে।[৮] এ সবে পাঠকের খটকা লাগে এবং এই খটকাকে অতিক্রম করবার কোনও সূত্র মহাকাব্যে নেই। কাজেই ঋষিশাপ থেকে আরম্ভ করে অর্জুনের দিব্যাস্ত্র বিস্মরণ পর্যন্ত একাদিক্রমে যে সব অলৌকিক অনুপুঙ্খ বিবৃত হয়েছে তার যোগফল হল কৃষ্ণ, বলরাম ও অর্জুন ধাপে ধাপে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছেন। শুধু পাঠকের স্বস্তি থাকে কোথাও এক ধরনের ঋণশোধের বোধে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমেত সমগ্র কুরুকুল ও বিস্তর পাণ্ডব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বিস্তর বীরের প্রাণহানির এ যেন এক ধরনের প্রতিশোধ। কুরুকুল ও পাণ্ডবকুলের প্রতিশোধে যদু বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কুলের ধ্বংস। এবং এ উপসংহারে সুর এত নেমেছে যে কোথাও শৌর্য, উত্তেজনা, ধর্মযুদ্ধ, ন্যায়-প্রতিষ্ঠা, কোনও বৃহৎ ভাবের আভাসমাত্র নেই, শুধু অত্যন্ত রূপকথা-সুলভ অতিলৌকিকের ব্যবহার একটা অনিবার্য অবক্ষয় ঘটিয়ে তোলার জন্য।

কেমন এমন হল? পাঠক ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে মহাকাব্যের সঙ্গে এ অংশের কোনও আত্যন্তিক যোগ নেই। বলরাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, সবাই ফুরিয়ে গেছেন; তাই বীরের আর অস্ত্র লাগে না, তৃণই মুষল হয়ে ওঠে এবং নিষ্কারণ পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড চলে। বাপ ছেলেকে মারে, ভাই ভাইকে। এ কেমন হননলীলা? বীরের উন্মাদনা এতে নেই। আছে অভিশপ্তের

৮. মৌষলপর্ব; (৮:৬৫, ৬৬, ৬৮)

উন্মত্ততা। এ যেন প্রকারান্তরে বলছে, অস্ত্র থাক আর নাই থাক, জিঘাংসা আছে। হঠাৎ যেন মনে হয়, অতবড় আঠারো দিনের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধটাও এক অর্থে অমনই বিরাট এক ভ্রাতৃহনন পর্ব। মৌষলপর্বে একটা তীব্র জিঘাংসার ফলে ঘটল একটা ব্যাপক অপচয়। ছোট এই পর্বটি সহসা প্রতীকী হয়ে ওঠে: মহাকাব্যের যুদ্ধও তো তাই-ই। এখানে ঋষিদের প্রতারণা দিয়ে শুরু। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি মিলে বারবার অক্ষক্রীড়ায় প্ররোচিত করেন যুধিষ্ঠিরকে এবং দ্যূতক্রীড়ায় স্পষ্ট প্রতারণা দিয়ে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে। সেই প্রতারণাকে অবলম্বন করে নেমে এল ন্যায়ধর্মের অভিশাপ, সমগ্র কুরুকুল প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। মৌষলপর্ব ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিফলিত করেছে বৃহত্তর পরিসরের প্রতারণা ও মহাবিনাশ। যুদ্ধের পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মানবিকতা ছিল, যুধিষ্ঠির আচার্যদের পায়ে পড়েছেন যুদ্ধ থামাবার জন্য, অর্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করে যুদ্ধে প্রবল অনীহার যুক্তি দিয়েছেন। কৃষ্ণ 'যুক্তি' জালে অর্জুনকে পরাজিত করেছেন। ওর মধ্যে কোথাও একটা গভীরতর অযৌক্তিকতা পাঠক উপলব্ধি করেন। মৌষল পর্ব দুর্বল রচনা হলেও এই বোধটা যুদ্ধ, বর্ণধর্ম ও জীবনধর্ম সম্বন্ধে পাঠককে ক্রমে ক্রমে সচেতন করে একটা অস্থিরতায় পৌঁছে দেয় এবং সেই পরিমাণেই তার সার্থকতা।

দেবতা না মানুষ?

মহাভারতের মতো গ্রন্থিল মহাকাব্যটির সুর অনেকটাই খাদে নেমে এসেছে শেষের দুটি অংশ— 'মহাপ্রস্থান' ও 'স্বর্গারোহণ' পর্বে, কিন্তু পুরোপুরি নামেনি, মাঝে মাঝে উঁচু পর্দাতেও উঠেছে। মৌষলপর্বে অর্জুনের কাছে যদুকুল ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে একটা বৈরাগ্য এল, অর্জুনেরও কৃষ্ণের বিরহে কষ্ট এবং কৃষ্ণের শেষ ইচ্ছা— তাঁর রাজ্যের নারীদের রক্ষা করা— রাখতে না পারার জন্যে মর্মান্তিক যাতনা হল। যুধিষ্ঠির বললেন 'কাল' আমাকে আকর্ষণ করছে। আমি আর সংসারে থাকব না।[১] অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীরও মনে একই রকম বৈকল্য ও ঔদাসীন্যের উদয় হল; সকলেই সংসার ছেড়ে যেতে চাইলেন। যজ্ঞ করে অগ্নিকৃত্য শেষ করে, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, সব সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে, বল্কল ধারণ করে তাঁরা পরিব্রজ্যা নিলেন। পরীক্ষিৎ নাবালক, তার শিক্ষার ভার কৃপাচার্যকে দিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, এর পুত্র রাজা হবেন। ততদিন ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান যুযুৎসুকে রাজত্ব করতে বললেন। সকলে বল্কলধারণ করে সমবেত প্রজাদের নিষেধ ও রোদন উপেক্ষা করে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘুরে উত্তরের দিকে এগোলেন— পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী; একটি কুকুরও পথ থেকে তাঁদের সঙ্গ নিল। অগ্নিদেব এসে অর্জুনকে বললেন, তিনি যেন তাঁর গাণ্ডীব ধনু, যা বরুণের কাছ থেকে অর্জুনের জন্যে অগ্নি সংগ্রহ করেছিলেন, সেটি যেন অর্জুন বরুণকে প্রত্যর্পণ করে মহাপ্রস্থানে যান। শুনে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুটি জলে ফেলে দিলেন।[২]

পথ চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে গেলেন দ্রৌপদী; ভীম যুধিষ্ঠিরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন দ্রৌপদীর অর্জুনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সেই পাপে এই মৃত্যু। এর পরে নকুল— তাঁর প্রাজ্ঞতার অহংকারের জন্যে; সহদেব— তাঁর রূপাভিমানের জন্যে; অর্জুন— এক দিনে সব শত্রু বিনাশ করবেন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করতে পারার জন্যে; এবং অবশেষে ভীম— তাঁর ভোজনপ্রিয়তার জন্য প্রাণ হারালেন। একা যুধিষ্ঠির ও তাঁর

১. মৌষলপর্ব; (৫:২২-২৫)

২. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (১:৩,৪)

সঙ্গী কুকুরটি স্বর্গের দ্বারে পৌঁছতে দেবদূত কুকুরটি ফেলে রেখে যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে যেতে আহ্বান করলেন। যুধিষ্ঠির রাজি হলেন না, বললেন নিষ্কারণে বিশ্বস্ত সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তখন দেখা গেল কুকুর স্বয়ং ধর্ম। স্বর্গে পৌঁছে যুধিষ্ঠির ভাইদের ও দ্রৌপদীকে দেখতে চাইলেন।[৩]

শেষতম পর্ব স্বর্গারোহণ। যুধিষ্ঠির প্রথমে দেখতে পেলেন কৌরব বীরদের। বিস্ময় প্রকাশ করলে নারদ বললেন যাদের পাপ বেশি পুণ্য কম, তারা আগে স্বর্গ ভোগ করে নরকে যায়। পুণ্যবান আগে নরকে যায়, তাই যুধিষ্ঠির নরকে যাতনাক্লিষ্ট ভাইদের ও দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। যুধিষ্ঠির আসতেই নরকবাসীরা সকলে একবাক্যে তাঁকে অনুরোধ করলে যেন তিনি সেখানে অপেক্ষা করেন; কারণ নরকের দুঃসহ যন্ত্রণা, উৎকট পূতিগন্ধ, নানা রকম উৎপীড়নের কাতরোক্তি এ সবই যুধিষ্ঠির আসা-মাত্রই থেমে গেল। আলোকময় পরিবেশ, সুগন্ধ বায়ু ও শ্রুতিসুখকর ধ্বনিতে নরকবাসীরা তাদের যন্ত্রণা ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেল। তখন নরকবাসীরা সকলে বিশেষ ভাবে যুধিষ্ঠিরকে অনুনয় করতে লাগলেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন, কারণ তিনি আসাতে তাঁদের যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে। যুধিষ্ঠির দেবদূতকে দেবতাদের জানাতে বললেন যে, তিনি ওইখানেই থাকবেন, যন্ত্রণাকাতর নরকবাসীদের আরাম দিতে। এর পর দেবতারা এসে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। পথে স্বর্গের গঙ্গায় অবগাহন করে মানবদেহ ত্যাগ করে দিব্য শরীর ধারণ করে স্বর্গে এলেন। দেখলেন, তাঁর ভাইরা, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ সেখানে আছেন। শুনলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পরের অংশ অপ্রাসঙ্গিক— ফলশ্রুতি অংশ।[৪]

মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ অংশে বেশ কিছু ব্যাপারে পাঠকের সাড়া দ্বৈধতাকে স্পর্শ করে। মৌষল পর্বের শেষাংশে ও মহাপ্রস্থানের প্রথমাংশে দেখি, কৃষ্ণের মৃত্যু, যদুকুলধ্বংস, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু প্রত্যর্পণ, ইত্যাদির মধ্যে বীরদের ক্ষত্রিয়কৃত্য যেন ফুরিয়ে গেল। নিরস্ত্র ক্ষত্রিয়ের কী পরিচয়? এখন তাঁরা বানপ্রস্থী, কাজেই যজ্ঞকর্ম বা ক্ষাত্রকর্ম থেকে মুক্ত। কিন্তু বানপ্রস্থেও তাঁরা রইলেন না, ধীরে ধীরে হিমালয়ে আরোহণ করতে লাগলেন। প্রথমে পতন ও মৃত্যু ঘটল দ্রৌপদীর। ভীমের প্রশ্নে ধর্মপুত্রের উত্তর দ্রৌপদীর অপরাধ অর্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব। মনে পড়ে, দ্রুপদের রাজসভায় বীর্যশুল্কা দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে, হাতে সাদা ফুলের একগাছি মালা। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দেখলেন তরুণ বীর অর্জুন অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করছেন, ওষ্ঠাধরে আনন্দিত হাসি ও হাতে পুষ্পমাল্য নিয়ে শুচিস্মিতা দ্রৌপদী এগিয়ে এসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে অর্জুনকে মালা পরিয়ে দিলেন। কুমারী হৃদয়ের সে মুহূর্তের আত্মনিবেদনের চরিতার্থতা, সে কি ভুলবার। দৈবদুর্বিপাকে আরও চার ভাইকে পরে বরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেম যার প্রতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সে তো

৩. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (১:১২, ১৩)

৪. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (১:৪০)

অর্জুনই। তাঁর দুর্ভাগ্য অর্জুন পর পর অন্য তরুণীদের পাণিগ্রহণ করেন, দ্রৌপদীর সেই শুচিশুভ্র প্রেম তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। অর্জুনের ওপর নিষ্ফল অভিমান করেছেন, কর্তব্যে ত্রুটি ছিল না অন্য স্বামীদের প্রতি, কিন্তু প্রথম প্রেম কি শাসন মানে? অর্জুনের প্রতি নিষ্প্রতিদান অনুরাগ তো দ্রৌপদীর জীবনে মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে গোপনে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে— এ.কি পাপ হতে পারে? অথচ ধর্মপুত্র বললেন, এই তার পাপ। এই পাপে তাঁর মৃত্যু। লক্ষণীয়, প্রথম পতন ও মৃত্যু একমাত্র নারী অভিযাত্রিকটিরই, সে কি নারী বলেই?

যুদ্ধের মধ্যে প্রবল ক্ষোভে ও আক্রোশের মুহূর্তে অর্জুন হঠকারীর মতো দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা করে বসেন— একদিনে সব শত্রু নিপাত করবেন। এ উচ্চারণে অর্জুনের তখনকার ক্রুদ্ধ আস্ফালনই ছিল। বক্তা শ্রোতা সকলেই জানত এটা সম্ভাব্যতার সীমার বাইরে। এমন তো কত কথাই মানুষ তীব্র আবেগের মুখে বলে; অথচ সেই পাপে নাকি অর্জুনের মৃত্যু। নকুল-সহদেবের বিজ্ঞতা ও রূপের অভিমান কখনও উদগ্ররূপে প্রকাশ পায়নি, কারও ক্ষতিও করেনি। তবু সেই মনোভাব এমন অমার্জনীয় যে সেই পাপে তাঁদের মৃত্যু ঘটল। ভীম অসামান্য বলশালী, দীর্ঘদেহী, আহারে তাঁর প্রয়োজনও বেশি ছিল, রুচিও বেশি ছিল। স্বয়ং কুন্তি জানতেন শক্তিমান পুত্রের প্রয়োজন বেশি, তাই ভোজ্যের অর্ধাংশ ভীমের জন্যে রাখতেন, বাকিটা বাকি চার ভাইয়ের। প্রয়োজনে দৈহিক বলের জন্য সব পাণ্ডবদেরই ভীমের শরণার্থী হতে হয়েছিল। সেই মানুষটা ভোজনপ্রিয় ছিল বলে তাঁর মৃত্যু ঘটল! অর্থাৎ তাঁর সংযম যথেষ্ট ছিল না, তিনি নিষ্কাম ভাবে আহার করতেন না। শুনলে সকলেরই মনে হয়, পাপ ও দণ্ডের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্যই এখানে নেই। শেষ পর্যন্ত একা চলেন যুধিষ্ঠির, পিছনে কুকুরটি। এটি স্বেচ্ছায় তাঁদের অনুগামী হয়েছিল বলে একে ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে রাজি হননি যুধিষ্ঠির। এতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যদিও কুকুরটি সত্য অর্থে আশ্রিত ছিল না, শুধু অনুগামীই ছিল। তাই তাকে ত্যাগ করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মৃতের সঙ্গে (অর্থাৎ মৃত ভাইদের ও দ্রৌপদীর) জীবিতের কি সম্পর্ক? কুকুরটি জীবিত শরণার্থী, একে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'[৫] তা না হয় না ত্যাগ করুন, কিন্তু সারা জীবনের সহচর ও সঙ্গিনীর সঙ্গে ক'প্রহরের ব্যবধানে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল? এই মহানুভব উচ্চারণে যুধিষ্ঠিরের শরণাগতরক্ষণের নিদর্শন থাকতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের বিস্মৃত হওয়ার অকৃতজ্ঞতাও রয়েছে।

এর পরে প্রশ্ন ওঠে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে পৌঁছনোর ব্যাপারে। সামান্য ভোজনবিলাসিতা, প্রজ্ঞাভিমান বা রূপাভিমান, ক্রুদ্ধ মুহূর্তের অবিমৃষ্যকারী প্রতিজ্ঞা, অতি স্বাভাবিক প্রেমজ পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি যদি মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তা হলে স্বয়ং ধর্মপুত্রের যে স্পষ্ট মিথ্যাভাষণে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচার্যের প্রাণহানি ঘটেছিল সেই মিথ্যাভাষী কোন সুবাদে

৫. মহাপ্রস্থানিক (৩:৩৫, ৩৬)

সশরীরে স্বর্গে পৌঁছন? বলা প্রয়োজন, এই ব্যবস্থাপনা— দ্রৌপদী ও তাঁর চার স্বামীর মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমন— এ সবই দেবতাদের, যাঁদের মধ্যে ধর্মও আছেন। রূপকে পাওয়া যাচ্ছে, যে কুকুরটি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করেছিল, বাৎসল্যের জন্যে যাকে ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে যেতেও রাজি হননি, সে সত্যিই কুকুর নয়, স্বয়ং ধর্ম, যুধিষ্ঠিরের পিতা। এটা তাঁর ধর্মপরায়ণতা বলে গণ্য হল এবং যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের অনুগামী না দেখিয়ে মহাকাব্যকার দেখালেন ধর্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের অনুগামী। পরে আমরা দেখব, যুধিষ্ঠির নিষ্পাপ নন, কিন্তু কোনও এক স্তরে তিনি ধর্মের উন্নত শিখর স্পর্শ করেছিলেন যার দ্বারা ধর্ম তাঁর অনুগমন করছে— এই রূপকটি যথাযথ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ধর্ম যুধিষ্ঠিরের চিরানুগামী, কারণ যুধিষ্ঠির নিজেই সতত ধর্মচারী।

এ তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পরে ব্যাপারটা একটা নতুন আলো দেখা দেয়: ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক। তা হলে, সেই প্রাণঘাতী মিথ্যাটা কি পাপ নয়? অর্জুনের উত্তেজিত দম্ভোক্তি, যা শুনলেই বোঝা যায় যে এটাকে কার্যে পরিণত করা অর্জুনের বা অন্য কোনও বীরেরই সাধ্য ছিল না, যা ছিল শুধু অসহিষ্ণু রোষের প্রকাশ, সেটাকেই তাঁর প্রাণনাশী মিথ্যা বলে প্রতিপাদন করছেন যিনি, তিনি স্বয়ং মারাত্মক মিথ্যা-উচ্চারণে আচার্য হন্তারক। এখানে বিচারে ন্যায় কোথায়? সমতা বা ভারসাম্য কোথায়? নেই। ওই মারাত্মক মিথ্যাভাষণ সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতেও পারতেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের ক্ষমতার সীমাও এতে নিশ্চিত হয়ে গেল: সম্মুখসমরে দ্রোণকে পরাজিত বা নিহত করতে পারতেন না পাণ্ডববীররা— এ কথাও স্বীকৃত হয়ে রইল। অবশ্য কৃষ্ণের পরামর্শে অন্য কৌরব বীরদেরও মৃত্যু ঘটেছে অ-ক্ষত্রিয়োচিত আচরণের দ্বারা। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা বলা তো সজ্ঞানে করা পাপ। তা ছাড়া, শাস্ত্রে বলে 'মৃগয়াক্ষঃ পরীবাদঃ', ইত্যাদি আটটি অন্যায় আসক্তি হল ব্যসন, এবং পরিত্যাজ্য। দ্যূতক্রীড়া (অক্ষ)-ও তার মধ্যে পড়ে। অধিকন্তু, পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা পণ রাখতে কে তাঁকে অধিকার দিয়েছিল? কিংবা ভাইদের পণ রাখতে? অথবা সকলের যৌথ সম্পত্তি? এই সবই অন্যায়। যখন মনে পড়ে যে, কলি-আক্রান্ত নলও দময়ন্তীকে বাজি রাখতে রাজি হননি, সেখানে দেখি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যুধিষ্ঠির পর পর এ সব অন্যায় করলেন। এখানে পাঠক কী ভাববেন? ধর্ম আর যুধিষ্ঠির অভিন্ন হলে এই কি ধর্ম? যুদ্ধান্তে গান্ধারীর কাছে যিনি যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ওপরে নিয়েছিলেন তিনি কি তখন শুধুই ভদ্রতা করে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন? যে পাপ-বোধে সিংহাসনের জন্যে যুদ্ধ করেও করতলগত সিংহাসন গ্রহণ করতে পারছিলেন না সে-আত্মগ্লানি কি অভিনয় মাত্র? তা তো নয়, তিনি তো অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে রাজি হলেন সত্যকার একটা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতেই। কাজেই যুধিষ্ঠির একাধিক অন্যায় করেছিলেন এবং সে নিয়ে তাঁর কোনও মোহ ছিল না। তা হলে এই সশরীরে স্বর্গে পৌঁছনোর ব্যাপারটা কী? দেবতাদের ভুল? পাঠক এইখানে এসে যুধিষ্ঠিরের নিষ্পাপ ধর্মাত্মতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাঁকে নিষ্পাপ ধর্মাত্মা বলেই প্রতিপন্ন করছে মহাকাব্য।

এ জায়গায় পৌঁছে পাঠকের প্রতিক্রিয়াতে ধাক্কা লাগে এবং ধীরে ধীরে যে সমাধানটি পাঠকের প্রত্যয়ে উদিত হয় তা হল, যুধিষ্ঠিরের বিচার এবং বস্তুত কোনও মানুষের বিচারই একমাত্রিক হতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের একাধিক বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু কোনও একটি পরিমাপে পড়ে যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের মর্মন্তুদ অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। সে দিন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হতে দ্বিধা ছিল না। ভিক্ষুকের মতো আচার্যদের পায়ে ধরে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রার্থনা করতে তাঁর বাধেনি। অর্জুনের দ্বিধাও অর্জুনের চরিত্রে নতুন এক আত্মিক মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু অর্জুনের দ্বিধা স্বজনহত্যার আশঙ্কায়। সে তাঁর পারিবারিক সত্তার আত্মীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে দ্বিধা; তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অসম্মত। কিন্তু যুধিষ্ঠির পুরো যুদ্ধ ব্যাপারটাতেই অসম্মত। মনে পড়ে, সিংহাসনে ন্যায়সংগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে একদা সিংহাসনের দাবি প্রত্যাহার করতেও তিনি সম্মত ছিলেন। এর মধ্যে রাজকীয় গৌরব তো নেই-ই, সামাজিক এবং ধর্মগত মানদণ্ডে একটা দৈন্য ও অসম্মানও যেন নিহিত ছিল। এইখানে যুধিষ্ঠির এমন এক বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠেন যিনি ক্রান্তদর্শী। আপাত লাভ, যশ, খ্যাতি, বিজয়-সমারোহ ও রাজত্বের লোভকে ছাপিয়ে যিনি দেখতে পেয়েছেন নরহত্যা পাপ,— তা সে যে কারণেই হোক না কেন। কোনও কারণেই কোনও মানুষকে বধ করায় তাঁর অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ সায় দেয় না; তাতে আপাত ভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম বা বীরধর্মের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতেও তাঁর বাধে না। এই মনোভাবের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি আছে যুদ্ধশেষে তাঁর আন্তরিক আত্মগ্লানি ও সিংহাসনে অনীহার। এক যুধিষ্ঠিরই সে দিনের সমাজের প্রত্যাশিত বর্ণধর্মের ওপারে মানবধর্মের শেষ বিচারে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত এইখানেই, এই বিচারদৃষ্টির মহিমাতেই, তিনি ধর্মপুত্র, যিনি সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করার অধিকারী। মহাভারত নানা ভাবে জীবনের তুঙ্গতম শিখরে এই মানবত্বের জয়গান করেছে। করেছে বহু জটিল ঘটনা সংস্থাপনার দ্বারা, ফলে এই মহাকাব্যে সাড়া দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

রামায়ণে পত্নী-অপহারক রাক্ষসকে বধ করার প্রয়াসে দ্বিধার অবকাশ সেই, পারিবারিক মূল্যবোধ ও ক্ষাত্রধর্মের কর্তব্য পালনে দ্বিধার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যেখানে একটা কর্তব্য— বর্ণধর্মের আদর্শ— পালন করতে গেলে অন্য একটা বৃহত্তর কর্তব্য— মানবধর্মের নির্দেশ— পালন করা যায় না, সত্তার মহত্তর সংজ্ঞার নিরিখে একটা ধর্মপালনে পাপের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা, সংবেদনা এবং এক চূড়ান্ত অর্থে আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার জবাবদিহির সংকট উপস্থাপিত করে। মনে পড়ে, শান্তিপর্বে ভীষ্মের উক্তি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। যুদ্ধে এই মানুষকেই রাখতে হয়, যার ওপরে কেউ নেই। কাজেই মানবজিঘাংসা যার কাছে সব থেকে বড় পাপ তার ধর্ম-বোধ ক্ষত্রিয়তার ওপারে শ্রেষ্ঠ নীতির নিরিখই শুধু মানে। মহাকাব্যকারের দৃষ্টি যে শিখরে উত্তীর্ণ, পাঠককে অস্পষ্ট ভাবে হলেও সে উচ্চতা দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে বুঝতে হয় এ মহাকাব্যের গভীরে কোন মহত্তর ন্যায়নীতিবোধ ক্রিয়াশীল। অতএব সাড়া দিতে গিয়েও পাঠক সংকটে পড়েন এবং নিজের বোধের অন্তঃস্থলে সে সংকট অতিক্রম করে তবে মহাকাব্যের মর্মবস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

স্বর্গারোহণ পর্বে দেখি যুধিষ্ঠির স্বর্গগঙ্গায় অবগাহন করে মর্ত্যদেহটি সেখানেই রেখে দিব্যদেহ নিয়ে উঠেছেন।[৬] তা হলে তাঁর বৈশিষ্ট্য শুধু মর্ত্যদেহ নিয়ে স্বর্গে পৌঁছনোতে? এই আপাতবিরোধী দুটি ঘটনার মধ্যে কবি সম্ভবত বলতে চাইছেন যুধিষ্ঠিরকেও পাপ স্পর্শ করেছিল তাই স্ব-শরীরে তিনি স্বর্গে পৌঁছতে পারলেন, বাস করতে পারেন না। কিন্তু আর সকলের চেয়ে তিনি যে মাথায় বড়, সে কথাটি এর মধ্যে বিধৃত রইল। পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যের অন্ত্য দৃশ্যেই নায়ক একাকী, তাই মহাপ্রস্থানপর্বের শেষ থেকে মঞ্চে যুধিষ্ঠির একাই, পাঠকের দৃষ্টি পুরোপুরি তাঁর ওপরেই নিবদ্ধ।

স্বর্গে দেবদূত দ্রৌপদীকে দেখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ইনি আসলে পদ্মা, স্বয়ং লক্ষ্মী আপনাদের পাঁচ ভাইয়ের বধূরূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'[৭] এখানে বেশ কিছু ব্যাপার গোলমেলে ঠেকে। দ্রৌপদীর স্বামীরা ভিন্নভিন্ন দেবতার অংশে জন্মেছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই মানুষ এবং কেউই বিষ্ণুর অংশে জন্মাননি। তা হলে দাঁড়াল এই, যে লক্ষ্মীকে ভোগ করলেন পাঁচটি মানুষ, তাঁরা কেউই বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অংশও নন। দ্রৌপদী দ্রুপদরাজার যজ্ঞবেদী থেকে উঠেছিলেন আর লক্ষ্মীর উৎপত্তি সমুদ্র থেকে। আসলে মহাকাব্যের নায়কনায়িকাদের দেবতার অংশে জন্মানোর কথা মাঝে মাঝেই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সম্পর্কে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা, তা ঘটল ওই দ্রৌপদীর ওপরে লক্ষ্মীত্ব পরে আরোপিত হওয়ার জন্যে। ফলে পাঠকের মধ্যে খটকা থেকে যায়, বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অংশে জন্মানো পাঁচ ভাইয়ের বধূ হন কি করে? কেউ এ প্রশ্ন করেননি, কোনও উত্তরও দেওয়া হয়নি। শূন্যে প্রলম্বিত হয়ে থাকে সংশয়। মহাকাব্যের মানবিক মূল্যবোধ এতে খণ্ডিত হয় না, সামাজিক সতীত্বের প্রশ্নই শুধু অনুত্তরিত থেকে যায়। এর দ্বারা মহাকাব্যে অন্য এক মহিমা লগ্ন হয়।

স্বর্গে পৌঁছবার পর যুধিষ্ঠিরকে জানানো হল, যেহেতু তিনি ছলনার দ্বারা দ্রোণের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, সে জন্যে তাঁকেও ছলনার দ্বারা অল্পক্ষণের জন্য নরকদর্শন করানো হল।[৮] আগেই বলেছি, দ্রোণের মৃত্যু ঘটানো ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের অন্য পাপ ছিল, কিন্তু শুধু এইটিরই উল্লেখ করা হল, এই পাপেই নাকি তাঁকে স্বল্পকাল নরকে থাকতে হয়েছিল। নরকদর্শনের মধ্যে তাঁর নৈতিক স্খলনের স্বীকৃতি আছে নাকি এটা মিথ্যাবচনের দ্বারা দ্রোণবধের প্রায়শ্চিত্ত? এখানে কার্যকারণের অসামঞ্জস্য পাঠককে উদ্বেলিত করে: যুধিষ্ঠির ভাইদের দেখতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে নরকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি পৌঁছনোমাত্রই নরকবাসীদের সব যন্ত্রণার অবসান ঘটল, নারকীয় পরিবেশ লুপ্ত হয়ে মনোরম, উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হল। তা হলে যুধিষ্ঠির

৬. স্বর্গারোহণপর্ব; ৫:৫ অধ্যায়

৭. মহাপ্রস্থানিকপর্ব; (৩:১৪)

৮. স্বর্গারোহণপর্ব; (৩:৩৯, ৪০)

এক মুহূর্তের জন্যেও কিন্তু নরকভোগ করলেন না, যদিও মিথ্যাভাষণের দ্বারা আচার্যের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, 'ব্যসন' বলে বর্ণিত জুয়া খেলেছিলেন— নিজের অপটুতা ও পরাজয়ের সম্ভাবনা জেনেও। এবং বাজি রেখে খেলে হারলেন যে সম্পত্তি তা তাঁর একার নয়, ভাইদের বাজি রাখার অধিকার যুধিষ্ঠিরের ছিল না। কারণ তাঁরাও দ্রৌপদীর স্বামী, দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হারবার অধিকার ছিল না, কারণ দ্রৌপদী অন্য ভাইদেরও স্ত্রী— এত সব পাপের জন্য কী প্রায়শ্চিত্ত? নরকদর্শন, যে নরক তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নরকত্ব থেকে মুক্ত হল। মুহূর্তকাল, দূর থেকে শুধু নরক দেখাতেই এত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল? এ কেমন নৈতিক বিচার? পাঠক বিমূঢ় বোধ করেন। একটিমাত্র সমাধানে ঠেকে সব জিজ্ঞাসা: যুধিষ্ঠির মানবিক নীতির মানদণ্ডে বড় মাপের মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের অনিবার্য মনোভাব যে জিঘাংসা এবং তার অনিবার্য পরিণতি যে লোকক্ষয়, বিশেষত যারা মরবে তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যই সিংহাসনকামী নয়— এই সব নিয়ে নিরন্তর মর্মপীড়ায় দগ্ধ হয়েছেন যুধিষ্ঠির। সেই যন্ত্রাণাতেই জীবৎকালেই তাঁর বহু পাপ ক্ষালন হয়েছিল। তাই যন্ত্রণার নরকেই তিনি আন্তর শুচিতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই নরক তাঁর স্থান নয়।

স্বর্গ-নরক পাপ-পুণ্য নিয়ে এই অতি দুরূহ জটিল বোধ রামায়ণে কুত্রাপি নেই। সেখানে কর্তব্য অকর্তব্য অধিকাংশ স্থলেই সরলরৈখিক। যেখানে নয়, যেমন বালীকে ও শম্বুককে বধ করা এবং বারবার সীতা পরিত্যাগ, সেখানে রামচন্দ্রের যন্ত্রণা নেই— একেবারে শেষে বিচ্ছেদবোধ ছাড়া, এবং সেটাও দাম্পত্য আবেগপ্রসূত, কোনও গভীর নীতির সংকট তাঁর নেই। লঙ্কায় সীতা পরিত্যাগের সময়ে রামচন্দ্র যে সব মর্মান্তিক কটুকথা সীতাকে বলেন তার ভূমিকায় ওই অধ্যায়ের শুরুতেই বলা আছে 'হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং প্রবক্তুমুপচক্রমে' অর্থাৎ ওই কটুকথা রামের মনোগত ভাব; দেবতারা সীতার সতীত্ব প্রতিপাদন করবেন জেনে লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে পরীক্ষা করবার ছলে ওই সব বলেননি। সীতা চিতায় দেহত্যাগ করবেন এইটে জেনেও বাধা দেননি— সীতা যে রাবণের অঙ্কশায়িনী হননি এ কথা বিশ্বাসই করতে পারেননি বলে। মনে পড়ে, উত্তরকাণ্ডে রাম অযোধ্যার সিংহাসন ভরতকে দেন, লব-কুশকে নয়; তখনও তা হলে সীতার সতীত্বে পুরো বিশ্বাস আসেনি? আর যুদ্ধ ক্ষেত্র লঙ্কায় তো অযোধ্যার প্রজা কেউ ছিল না, কাজেই প্রজার জ্ঞানের জন্য ওই সব বলেছিলেন এ কথা একেবারেই প্রণিধানযোগ্য নয়। অতএব রামের কাছে নৈতিক সংকট যতবার এসেছে— একমাত্র পিতৃসত্য রক্ষা ছাড়া এবং ভরতের অনুরোধে তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া ছাড়া— সর্বত্রই রাম নৈতিক সংকটে অন্যায়কে অবলম্বন করেছেন। এবং কোথাও পাঠকের চিত্ত নৈতিক দ্বিধায় দোলাচল হয় না। রামায়ণের নৈতিক জগৎ সাদাকালোয় বিভাজিত— ধূসর বা দো-রঙা কিছু নেই।

স্বর্গারোহণের শেষ দিকে সব কৌরববীর সেনাপতি ও আচার্যরা স্বর্গে এসে গেছেন। কোনও কারণ দেখানো হয়নি; অল্পকাল স্বর্গবাস ও দীর্ঘকাল নরকবাস তাঁদের প্রাপ্য বলে শোনা গিয়েছিল আগে, কিন্তু কার্যত দীর্ঘকাল নরকবাস তাঁদের করতে হয় না। কেন, তা

বলা হয়নি। মনে হয়, বীর হিসেবে তাঁদের অম্লান কল্পমূর্তি পাণ্ডবদেরও ওপরে; কারণ কৌরব সেনাপতিরা পাণ্ডবদের কুচক্রে অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এইখানে কৌরবদের একটা নৈতিক জিৎ রয়ে গেল, যা পাণ্ডবরা অর্জন করতে পারেননি। কৃষ্ণের পরামর্শে উদ্যোগপর্বে উভয়পক্ষে স্বীকৃত শর্তগুলি পাণ্ডবরা নির্বিচারে পদদলিত করেছেন। কৌরবরা যুদ্ধকালে সে রকম অন্যায় করেননি। অভিমন্যুবধের উল্টোদিকে ঘটোৎকচ বধ আছে। কোনও একটা জায়গায় কৌরবরা বীরধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হননি বলে বীরের স্বর্গ থেকে তাঁদের বিচ্যুত হতে হয়নি। হিসেবটি খুবই সূক্ষ্ম, বহুমুখীন এবং বহুধাব্যাপ্ত। ভাবতে হয়, মননে, সংবেদনে স্থির হয়ে গ্রহণ করতে হয়; না হলে আপাত বৈষম্য দুর্লঙ্ঘ্য থেকে যায়। এত আয়াস কোনও রামায়ণ-পাঠককে করতে হয় না।

শেষ অংশে দু'বার বলা হয়েছে: 'রাজাদের নরক দর্শন করতেই হয়';[৯] কোনও কারণ দেখানো হয়নি। প্রশ্নটার বোধহয় দুটো সমাধান আছে। প্রথমত, রাজা বিজিগীষু বা বিজয়কামী হলে যুদ্ধ করতেই হবে, এবং রাজ্য-বিস্তারের জন্যে যে যুদ্ধ, তাতে নিরপরাধের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা এবং নিরপরাধের প্রাণহানি অনিবার্য; সে পাপ রাজাকে স্পর্শ করেই। আর রাজা যদি বিজিগীষু নাও হন, তবু শাসন করতে গেলেই দণ্ড বিধান করতেই হয় এবং তার মধ্যে নিরাপরাধের দণ্ডিত হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। যদি অপরাধীরই দণ্ডবিধান হয়, তবু তার মধ্যে কিছু নিষ্ঠুরতা থাকেই, সে পাপও রাজাকে স্পর্শ করে। এ ছাড়া চরবৃত্তির ছলনা, প্রয়োজনে নিরপরাধকে প্রতারণা করে ইষ্টসিদ্ধি করা এ সবের পাপও আছে। এ সব বোঝা গেলেও প্রশ্ন থাকে যে, এ ধরনের আচরণ তো অর্থনীতি ও রাজনীতি-সম্মত, এতে পাপ কোথায় যে রাজাকে নীতিসঙ্গত আচরণ করেও নরকদর্শন করতে হবে? আবার তাই মহাভারতের ভিত্তিভূমি যে নীতিসংকট, ধর্মসংকট সেইখানেই পৌঁছে যেতে হল। এ সংকট রাজধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের। ব্যবহারিক জগতে এর কোনও সমাধান নেই; তাই একটা কল্পিত চূড়ান্ত রায় দেওয়া হল: একটা ধর্মের নীতির সঙ্গে অন্য ধর্ম বা নীতির সংঘাতে শেষ পর্যন্ত মহত্তর নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার। তাই অপেক্ষিত ক্ষত্রিয়ধর্মে রাজধর্ম পালন করেও মানুষ শেষ মানবিক বিচারে দণ্ডিত হতে পারে। এ সবের উপস্থাপনা ওই মানবধর্মের চূড়ান্ত জয় ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে। মহাভারতে এ উদ্দেশ্য যতটা ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত, তার জয়ের স্থাপনাও ততটাই ঊর্ধ্বে। এবং এ-তত্ত্বকে প্রণিধান করতে গেলে বহু অভ্যস্ত নীতির স্তর পেরিয়ে যেতে হয়। এই কারণেই পাঠকের কাছে মহাভারতের দাবি এত বেশি জটিল, এত মর্মযন্ত্রণায় তার উপলব্ধি; শুধু মাত্র বোধে নয়, বোধিতে। সহজেই অনুমান করা যায়, এই আয়াস-সাধ্য জীবনবোধের অন্বেষা সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করবে, নিরুৎসুক করবে; ফলে মহাভারতে সাড়া দেওয়া তার পক্ষে দুঃখসাধ্য হয়ে উঠবে কাজেই, জনপ্রিয়তার ভিত্তি

৯. স্বর্গারোহণপর্ব; (৪:৯)

এখানে নেই। অনেক সহজে সাড়া দেওয়া যায় রামায়ণে— পাঠককে তা ব্যাকুল, মর্মপীড়াগ্রস্ত বা বিমূঢ় করে না। তাই বলা হয়েছে 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্', রামের মতো আচরণ করতে হবে। সেখানে মহাভারত বলছে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, এবং এই সুদীর্ঘ মহাকাব্যটি জুড়ে সেই মানুষের সংজ্ঞানিরূপণ করা হয়েছে, নৈতিক মূল্যবোধের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে।

মহাভারত স্রষ্টার অন্তর্দ্বন্দ্ব

মহাভারতে আপাত-নিষ্ক্রিয় এক সন্ন্যাসীর মতো চরিত্র হলেন ভীষ্ম। মনুষ্যজন্মের পূর্বে ইনি স্বর্গের অষ্ট বসুর অন্যতম দ্যু-নামের বসু ছিলেন। ভাইদের একদিন ইনি বশিষ্ঠের কামধেনু চুরি করার প্ররোচনা দেন। বশিষ্ঠ প্রথমে সকলকেই শাপ দেন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাবার; পরে সেটা প্রত্যাহার করে শুধু দ্যু-কেই শাপ দেন। এই শাপে বসুরা গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মান। গঙ্গা জন্মমাত্রেই প্রথম সাতটি পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করেন। পূর্ব-শর্ত মতো শান্তনু প্রতিবাদ করেননি; কিন্তু অষ্টম সন্তানের বেলা প্রতিবাদ করতেই গঙ্গা সন্তানটিকে নিয়ে শান্তনুকে ত্যাগ করে যান। গঙ্গা এই পুত্রের নাম দেন দেবব্রত এবং বশিষ্ঠ ও গঙ্গা একে শিক্ষিত করে তোলেন। বত্রিশ বছর পরে একদিন শান্তনু দেখেন এক কুমার বাণবর্ষণে নদীর স্রোতকে রুদ্ধ করছেন; রাজার সন্দেহ হতে গঙ্গাকে স্মরণ করতেই তিনি এসে পুত্রকে প্রত্যর্পণ করেন ও জানান যে পুত্রটির কোনও সন্তান হবে না এবং তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবেন।[১] রাজা দেবব্রতকে নিয়ে এসে যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন। চার বছর পর দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীকে দেখে শান্তনু আসক্ত হলেন কিন্তু দাশরাজ শর্ত করেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্য দিতে হবে। পিতার বিমর্ষতার কারণ জানতে পেরে, দেবব্রত দাশরাজের কাছে ও শান্তনুর কাছে অঙ্গীকার করেন যে তিনি চিরকুমার থাকবেন, রাজ্য নেবেন না। এর পরিবর্তে তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভের বর প্রার্থনা করেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও দেন।[২] এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যে তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। কিছু দিন পরে তিনি ঋষি পুলস্ত্যের কাছে তীর্থমাহাত্ম্য শুনে তীর্থে যান।

শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের অনুজ সত্যবতীর পুত্র চিত্রাঙ্গদ তিন বছর ধরে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্ম তাঁকে তখন কোনও রকমে সাহায্য করেননি; চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন।[৩] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভীষ্ম অনুজের বিপদে

১. স্বর্গারোহণপর্ব; (৩:১৪)
২. স্বর্গারোহণপর্ব; (৩:১১, ৩৫)
৩. আদিপর্ব; (১১.২১, ৯৩:৩৮, ৯৪:৬২)

উদাসীন রইলেন কেন? এর একটা উত্তর হল ঔদাসীন্য ভীষ্ম চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। যিনি পিতার দাম্পত্যসুখের ব্যবস্থা করতে নিজের দাম্পত্য সম্ভাবনা রহিত করে দিলেন তাঁর চরিত্রে শৌর্য ছিল না— এ কথা বলা চলে না। অথচ গন্ধর্বদের হাতে ভ্রাতার মৃত্যু ঘটলেও তিনি ক্ষত্রিয় নীতি অনুসারে তার কোনও প্রতিশোধ নেননি; এটি কতকটা স্ববিরোধী আচরণ। বিচিত্রবীর্য রাজা হলে সত্যবতীর সাহায্যে ভীষ্মই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য চালনা করতেন যদিও নিজে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু সুখবিলাসটা ভোগ করেননি। মনে পড়ে রামচন্দ্রের কথা— পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বনে আসবার পর তাঁকে আর একবার প্রলোভিত করা হয়, যখন ভরত এসে তাঁকে রাজ্য নিবেদন করেন; রামচন্দ্র সংকল্পে অবিচল ছিলেন। কিন্তু ভীষ্মকে বারে বারে প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। রামচন্দ্রের মতো তাঁরও জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সিংহাসনে অধিকার ছিল, কিন্তু পিতার দাম্পত্য সুখের জন্য তা অনায়াসে ত্যাগ করলেন। কিন্তু ভীষ্মের ত্যাগ শুধু সিংহাসন নয়, দাম্পত্য জীবন, সন্তান সব কিছুই। দু-পুরুষের সুখ সম্ভাবনা তিনি ত্যাগ করলেন পিতার সুখের জন্যে। সে তুলনায় রামচন্দ্র বনবাসে সীতার সাহচর্য ও লক্ষ্মণের সেবা সবই পেয়েছিলেন, এবং চতুর্দশ বৎসরের পরে সিংহাসনও ফিরে পেয়েছিলেন।

অম্বা যখন ভীষ্মকে বললেন যে তিনি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন তখন ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পৌঁছে দিলেন।[8] এ আচরণের মধ্যে রাজপুত্রসুলভ সৌজন্য ও ক্ষত্রিয়-সুলভ ন্যায়বোধ প্রকাশ পেয়েছে। শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করলে পরশুরাম বলেন ভীষ্মের উচিত অম্বাকে বিবাহ করা। আবার সেই প্রলোভন; কৌমার্যব্রত থেকে স্খলিত হওয়ার নির্দেশ, কিন্তু অবিচলিত ভীষ্ম তেইশ দিন পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন। এখানেও ওই নির্লিপ্ত ঋষিকল্প মানুষটির ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সত্যবতী এবং প্রজারা ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করে আপদ্ধর্মনীতি অনুসারে সংসার-ধর্ম পালন করতে বলেন; আবার সেই প্রলোভন এবং আবার নির্দ্বিধায় প্রলোভন জয়। এখানে স্মরণ করতে হবে, শাস্ত্র এবং দেশাচারের নির্দেশ ছিল অপুত্রক জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদের বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করবেন। কিন্তু ভীষ্মের কাছে শাস্ত্রনির্দেশের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিজের অঙ্গীকারের কাছে খাঁটি থাকা।

অবশেষে বেদব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মালেন এবং তাঁদের দু'জনের একশো পাঁচ পুত্রের অস্ত্রশিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ভীষ্ম একাই বহন করেন।[৫] পরে যথাক্রমে দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করেন রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য; অর্থাৎ পিতামহের কর্তব্য তিনি

৪. আদিপর্ব; (৯৪:৯৪); হরিবংশ (১৬:২৯)

৫. আদিপর্ব; (৯৬:৪৮-৫১)

অনেকটাই করেছিলেন এবং এই রাজকুমারদের সুবাদেই মহাকাব্যে তাঁর পরিচিতি 'পিতামহ ভীষ্ম' হিসেবে। এর পর তিনি পিতামহের ভূমিকায় আসীন। জতুগৃহদাহে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে ভেবে এই ক্ষত্রিয়বীর অশ্রুপাতও করেছিলেন।[৬] সেখানে তিনি নেহাৎই স্নেহাতুর পিতামহ।

ভীষ্মের শৌর্য বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। সেখানে ভীষ্ম কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অতিথির অর্ঘ্য দেওয়ার প্রস্তাব করলে শিশুপাল ভীষ্মকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে; ক্রুদ্ধ ভীষ্ম প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময়ে বহু কটুকথার সঙ্গে এও বলেন যে, শিশুপাল ও তাঁর দলের লোকদের মস্তকে তিনি পদাঘাত করবেন।[৭] কৌরবপক্ষীয় হয়েও ভীষ্ম বারে বারেই দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে মিত্রতা করতে। ভীষ্মের চরিত্রের দুর্বলতম দুটি অধ্যায় হল, কৌরবসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও লাঞ্ছনা নিষ্প্রতিবাদে বসে দেখা। এটি ক্ষত্রিয় ধর্মে অপরাধ: দুর্বল, আক্রান্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর রক্ষা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য-কর্তব্য। এর পরে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে যখন চর এসে বলে যে পাণ্ডবরা নিরুদ্দিষ্ট, তখন কৌরবদের কী করণীয় সে বিষয়ে যে পরামর্শসভা বসে সেখানে উপস্থিত থেকেও ভীষ্ম নীরব ছিলেন, কোনও পরামর্শই দেননি। কৃষ্ণ যখন কৌরবরাজ-সভায় পাণ্ডব পক্ষ থেকে সন্ধি প্রস্তাব আনেন তখন দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দি করতে চাইলে ভীষ্ম বাধা দেন, কেন না দূত অবধ্য।[৮] কিন্তু তাঁর এ কাজটি পাণ্ডবদের অনুকূলেই যায়, যেমন আরও অনেক অন্য কাজও কৌরব-স্বার্থবিরোধী ছিল।

যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির ছুটে এসে ভীষ্মের পায়ে পড়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে মিনতি করলেন। ভীষ্ম উত্তর দিলেন: 'মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কখনও মানুষের দাস নয়। এ কথা সত্য, মহারাজ, অর্থের জন্যেই আমি কৌরবপক্ষে আবদ্ধ। তাই এখন ক্লীবের মতো বলছি যুধিষ্ঠির, এ ছাড়া অন্য কিছু চাও।'[৯] এখানে সবচেয়ে মর্মান্তিক স্বীকারোক্তি হল, 'অর্থের জন্যে আমি কৌরবপক্ষে বাঁধা পড়ে আছি, আমি কৌরবদের অন্নদাস, তাই ন্যায় হোক অন্যায় হোক ওই পক্ষেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।' নিজেই বলছেন 'ক্লীবের মতো বলছি' অর্থাৎ ভীষ্ম সচেতন যে, ক্ষত্রিয়োচিত নয়, এ সিদ্ধান্ত দাসোচিত। ভীষ্ম কৌরব পাণ্ডব উভয়েরই প্রথম শাস্ত্রগুরু। আচার্য যেখানে শিষ্যদের শিক্ষা দেন, সেখানে তাঁর তো দাবিই থাকে ভরণপোষণে। সে দাবি তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার বিনিময়ে, ঘটনাচক্রে এ ভরণপোষণ তাঁকে নিতে হয়েছিল কৌরবদের ভাণ্ডার থেকে; কিন্তু এতে তাঁর ঋণ থাকবে কেন? তিনি যোগ্যতা ও পরিশ্রমের দ্বারা যা অর্জন করেছেন সে সম্বন্ধেও এই দীন উচ্চারণ, এটা পাঠককে দ্বিধায়

৬ আদিপর্ব, (১২০ ২৯, ১২২:৪০)
৭. আদিপর্ব; (১১৭:১৬)
৮. সভাপর্ব; (৪১.৩১)
৯. উদ্যোগপর্ব; (৮৬:১৯-২২)

ফেলে। বিশেষ করে এই কারণে যে, এই কল্পিত ঋণ তিনি শোধ করেছেন সজ্ঞানে অন্যায় সমরে যুদ্ধ করে। তাঁর দ্বিতীয় পাপ দেহে-মনে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদ হয়ে দুর্যোধনের ওই নারকীয় পাপ— প্রকাশ্য রাজসভায় রাজকুলবধূর নির্মম অবমাননা— তা নীরবে সহ্য করা। ধৃতরাষ্ট্রের অন্নগ্রহণ করা ভীষ্মের নিজের বিবেকের কাছে তাঁর আদিম ও অন্তিম অপরাধ, তার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল আপন বিবেককেই বধ করে। যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রথমে সেনাপতি হওয়া এরই অনিবার্য পরিণতি। যুযুৎসু বা বিদুর কৌরবের অন্নপালিত হয়েও বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করেননি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ভীষ্ম সে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারেননি।

ভীষ্মের চরিত্রে এ দ্বিধা একান্তই মৌলিক ও নিরতিশয় জটিল। কৌরবকুল প্রধান ও সৈন্যধক্ষ্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পাণ্ডবদের তিনি বধ করবেন না; প্রত্যহ দশ হাজার সৈন্য ও এক হাজার রথ বিনষ্ট করবেন কিন্তু পাণ্ডবদের আঘাত করবেন না।[১০] নবম দিনের রাত্রে ইচ্ছামৃত্যু-বরে অবধ্য ভীষ্মকে বধ না করতে পেরে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন পাণ্ডবরা ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মৃত্যুর উপায় জানতে চাইলে তিনি অর্জুনকে বলেন, শিখণ্ডীকে রথের সামনে রাখতে। এটিও সেনাপতির অকর্তব্য। পরদিন, যুদ্ধের দশম দিনে তিনি দশ হাজার হাতি, অযুত রথারোহী সৈন্য ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে বধ করেন, কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতি করেননি।[১১] সে-জন্মে শিখণ্ডী পূর্ণ পুরুষ জেনেও পূর্বজন্মে তার নারীত্বের সুবাদে ভীষ্ম অর্জুনের বিরুদ্ধে শরনিক্ষেপ করলেন না। দুর্যোধনের দুর্বাক্যে মর্মাহত হয়ে একবার অর্জুনের দিকে ধাবিত হলে কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে অর্জুনকে বাঁচান। সেদিনই সূর্যাস্তের আগে সমস্ত দেহে অর্জুনের শরে জর্জরিত অবস্থায় ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে যান। অর্জুন বাণ দিয়ে তাঁর উপাধান নির্মাণ করেন এবং ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে শরনিক্ষেপ করে ভূগর্ভ থেকে প্রস্রবণ সৃষ্টি করেন যা ভীষ্মের ওষ্ঠের সামনে জলধারা বর্ষণ করে। ওই শরশয্যায় ভীষ্ম আটান্ন দিন কাটান, তার পরে সূর্য উত্তরায়ণে গেলে নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।[১২] মৃত্যুর পূর্বে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে উপদেশ দেন।

লক্ষ্য করলে দেখি, ভীষ্মচরিত্রটি সাংঘাতিক ভাবে দ্বিধাখণ্ডিত। কৌরবের আশ্রয়ে থেকে কৌরবদের পক্ষেই যুদ্ধ করবেন, এটা বোঝা যায়। কিন্তু কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করে পদে পদে কৌরব-স্বার্থের হানি ঘটাবেন এইটেই সেই মৌলিক দ্বিধার প্রকাশ। প্রথমত, দ্রৌপদীর অপমান নিষ্প্রতিবাদে সহ্য করাই বীরধর্ম থেকে বিচ্যুতি; তার পরে বারবার দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলা তো কৌরবদের বিরুদ্ধাচরণই। যুদ্ধে কোনও মতেই পাণ্ডবদের কোনও

১০. ভীষ্মপর্ব; (৪:৪১, ৪২)
১১. ভীষ্মপর্ব; (১১৪:১২)
১২. ভীষ্মপর্ব; (১০০:৩০-৩২)

ক্ষতি না করা সেনাপতির কর্তব্যে প্রবল ত্রুটি, কৌরবদের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ এই মানুষটি শান্তিকামী যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তিনি কৌরবদের কাছে ঋণবদ্ধ। এই কি তাঁর ঋণশোধ? যুদ্ধে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর, নিজের ইচ্ছা না হলে যাঁকে বধ করা যাবে না তেমন সেনাপতি তাঁর দীর্ঘতম সৈনাপত্যের দশ দিনে অজস্র সৈনিক, রথারূঢ় ও পদাতিককে বিনষ্ট করলেন, কিন্তু মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডব ভ্রাতাদের কোনও ক্ষতিই করলেন না। সেনাপতি হিসেবে এ তো চরম অধর্ম।

প্রতিন্যাসে মনে পড়ে বিভীষণকে, তাঁর বিবেকের দ্বন্দ্ব তিনি কত সহজে, কত বেশি সরলরৈখিক ভাবে নিরসন করেছিলেন। রামের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁর রাক্ষসজন্ম এবং রাজভ্রাতার কর্তব্যের নিরিখে কৃতঘ্নতা; কিন্তু তিনি সরাসরি পক্ষত্যাগ করেছিলেন। রাবণ অন্যায়কারী, পরস্ত্রী-অপহারক, অতএব তার স্বপক্ষে থাকা অন্যায়। তাই তিনি রামের শরণাগত হয়ে অনুমতি চেয়ে নিলেন তাঁর পক্ষেই যুদ্ধ করার। এর পরে আর একবারও পিছনে ফিরে চাইলেন না, দ্বিধাগ্রস্তের মতো কোনও আচরণই করেননি। সে তুলনায়, ভীষ্মের চরিত্রে এবং কাজে সাড়া দেওয়া পাঠকের পক্ষে অনেক বেশি দুরূহ, কারণ ভীষ্ম পদে পদে বিবেক এবং অন্নদাসের কৃত্যের মধ্যে দ্বন্দ্বে জর্জরিত। প্রভূত সংখ্যায় রথী, রথ ও পদাতিককে প্রত্যহ বধ করবেন, কিন্তু সেনাপতির যা মুখ্য করণীয়— প্রতিপক্ষের প্রধান বীরদের ধরাশায়ী করা— যা তাঁর সাধ্যের মধ্যেই ছিল, তা তিনি ভুলেও করতে উদ্যত হলেন না। এর মধ্যে খুব মোটা দাগের একটা বিশ্বাস হনন আছে। পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধন করা, ধ্বংসসাধন করাই যে-যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই যুদ্ধে ভীষ্ম অন্ন-ঋণ শোধ করতে সৈন্যপত্য গ্রহণ করলেন, অথচ সেনাপতির প্রধান কর্তব্যে সম্পূর্ণ বিমুখ রইলেন। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, সেনাপতির কর্তব্য, অন্নদাসের কর্তব্য, এ সবই ভীষ্ম জানতেন কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর বিবেকের অন্তঃস্থলে বিরোধ জাগাল প্রকৃত মানবধর্মের প্রতি কর্তব্য। সেখানে তিনি অনুক্ষণ অবহিত যে কৌরবরা, যারা দ্রৌপদীর অন্যায় অপমানের দ্বারা গভীর ভাবে কলঙ্কিত, তাদের পরাজয়ই বাঞ্ছনীয়। এই বোধ তাঁকে নিয়ে গেল সেই দুঃসহ নরকযন্ত্রণার মধ্যে যেখানে পরস্পরবিরোধী দুটি কর্তব্যের মধ্যে কোনও আপোস নেই। তাই ভীষ্ম মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে দশম দিনে অস্ত্র ত্যাগ করে অর্জুনের শরধারা সমস্ত অঙ্গ পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন: 'যেমন করে উষ্ণার্ত জন গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর প্রথম বারিধারা সর্বাঙ্গে গ্রহণ করে।'[১৩] মৃত্যু আসছে এবার মুক্তির রূপ ধরে।

হয়তো এই অনুক্ষণ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগই তাঁকে অধিকার দিয়েছিল সুদীর্ঘ শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও তীর্থধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার। বোঝা কঠিন নয়, এই বিপুল উপদেশমালা প্রক্ষিপ্ত; তৎকালীন সমাজ ও যুগোপযোগী কিছু কিছু নীতি ও ধর্মের

১৩. অনুশাসনপর্ব; (১৫৩:২৭, ২৮)

কথা মহাভারত স্থায়ী ভাবে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তাই কৃত্রিম ভাবে ভীষ্মের শরশয্যানির্মাণ, পানীয় জল ও মস্তকের উপাধান রচনা, কৃষ্ণের বরে আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধের বাক-শক্তিলাভ ও আটান্ন দিন ধরে উপদেশবর্ষণ। যুদ্ধের প্রাক্‌ক্ষণে সুদীর্ঘ ভগবদগীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত, মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ভীষ্মের এই সুদীর্ঘ উপদেশবাণীও তেমনই প্রক্ষিপ্ত। হয়তো বীজাকারে অল্প কিছু উপদেশ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তিপর্ব তাঁকে যে-রূপে উপস্থাপিত করছে স্পষ্টতই তা কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। কিন্তু যেটা লক্ষ করার বিষয় তা হল, মহাভারতকার ভীষ্মকে উপদেশ দেওয়ার অধিকারী বলে বিবেচনা করেছেন। এ কথা ভুললে চলে না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবনের সব পর্বে আচরণীয় নীতি সম্বন্ধে যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সংসারত্যাগী ঋষি। এক অর্থে ধর্ম, অর্থ, কাম, রাজধর্ম, বর্নাশ্রমধর্ম, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পক্ষে তাঁরা অনধিকারী। কারণ, তাঁরা সংসারের বাইরেই জীবনযাপন করেছেন, ফলে, এ সব বিষয়ে তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। অপরপক্ষে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জড়িত মানুষ নির্লিপ্ত ভাবে এ সব বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না, যেহেতু জড়িত থাকায় তাঁদের দৃষ্টি আবিল— নির্মোহ নয়। তাই দূর থেকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পারেন যে-মানুষ, প্রাচীন ভারতবর্ষ তাঁদেরই শাস্ত্রকার আচার্যের আসনে বসিয়েছে। তাই শান্তিপর্বের অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত হলেও সংসার জীবন, রাজত্ব, মানসিকতা, আতিথ্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলার গৌরব ভীষ্মকে দেওয়া হয়েছে এবং এ গৌরবের অন্যতম সত্য এক উৎস হল, তাঁর নিরন্তর যন্ত্রণাভোগ।

চিরকুমার, এক অর্থে অ-সংসারী, এই ঋষিকল্প মানুষটি ক্ষত্রিয়ধর্মের কাছ থেকে পলাতক, সেনাপতির কর্তব্যে বিশ্বাসহন্তা, কৌরবদের অন্ন-ঋণ শোধ করছেন গোপনে তাদের বঞ্চনা করে, এই সব পরস্পরবিরোধী কৃত্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। চিত্তের গোপনে একটি ক্রূর, দুঃসহ আততি বহন করেছেন দীর্ঘকাল। যে মানুষ পিতাকে সুখী করবার জন্যে অনায়াসে আমরণ জীবনের অপূর্ণতা, অতৃপ্তি বরণ করেছেন, এবং তা বহন করেছেন অনায়াসে বারংবার প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সেই মানুষই ক্ষত্রিয়ধর্ম, কৌরবদের প্রতি আনুগত্য, বীরকৃত্য ও সৈনাপত্য কর্তব্য থেকে কি গভীর ভাবে স্খলিত! প্রথম ত্যাগটা ছিল ব্যক্তিজীবনের সুখ বিসর্জন দেওয়া, সেটা তিনি সহজে পেরেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়টার মধ্যে জীবনের গভীরতর তাৎপর্যের কাছে খাঁটি থাকার প্রশ্ন ছিল। এর সমাধান সহজ হয়নি, এটি আদর্শের প্রশ্ন, ধর্ম-রক্ষার প্রশ্ন। এর মূল্য প্রতি পদে, প্রত্যেক অবস্থাচক্রে স্বতন্ত্র ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দিতে হয় মর্মমূলে অবিরত রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করার এবং তার মধ্যে দিয়ে ধর্মনিরূপণ করে চলাই ভীষ্মকে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইচ্ছামৃত্যু সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে ততটা যুক্ত ছিল না যতটা ছিল দশম দিনে পরস্পরবিরোধী কৃত্যের সমাধানে ক্ষতবিক্ষতচিত্ত বৃদ্ধের জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত, যথার্থ অনীহা জাগার লগ্নের সঙ্গে। অন্তরে শেষ বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে জীবনের কাছে ঋণমুক্ত বলে দাবি করতে পারলেন, জীবিত থাকার দায় থেকে মুক্তি পেলেন— নিজেরই কাছে।

মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ও তাঁর পুত্র শুকের বিবরণ আছে মহাভারতের শান্তিপর্বে।[১৪] দেবীভাগবত পুরাণে পড়ি ঋষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন— জন্মক্ষণেই পিতামাতার আশ্রয়চ্যুত। তিনি হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। একবার দেখতে পান কলবিঙ্ক পক্ষী দম্পতি তাদের শাবকদের খাওয়াচ্ছে। দেখে তাঁর অপত্যলাভের বাসনা হয়; কিন্তু স্ত্রী নেই, কী করে সন্তান পাবেন তাই ভাবতে থাকেন। সেই সময় অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামার্ত হন, সেই স্খলিত বীর্য থেকে পুত্র শুকের জন্ম। শুক বৃহস্পতির কাছে বিদ্যালাভ করেন, পিতার কাছে আসেন এবং বিবাহ করে পিতার সঙ্গেই বাস করেন। কিন্তু এক সময়ে তপস্যা করতে করতে সশরীরে আকাশে উঠে যান। ব্যাস খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু প্রতিধ্বনি মাত্র শুনতে পান, শুককে আর পান না। তখন শিব এসে সান্ত্বনা দিলে ব্যাস আশ্রমে ফিরে যান। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাস পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, স্ত্রী কিছুই পাননি। অলৌকিক ভাবে এক পুত্র লাভ করেন, সে তার বিবাহোত্তর জীবনে কিছুকাল পিতার সঙ্গে বাস করে, কিন্তু কিছুকাল পরে ব্যাস তাকেও হারান।

মহাভারতে ব্যাসের মাতা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ হলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য দুই ভাই জন্মায়। তাদের সঙ্গে ব্যাসের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। সত্যবতীকে বলেছিলেন, তিনি স্মরণ করলে ব্যাস উপস্থিত হবেন। হলেন যখন চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য মৃত এবং দুই বিধবা অম্বিকা অম্বালিকার কোনও পুত্র নেই। হস্তিনাপুর সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হবেন সত্যবতীর পুত্র— রাজমাতা হওয়ার এই উদগ্র কামনায় শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সন্তান গঙ্গার পুত্র দেবব্রতকে নির্মম ভাবে বঞ্চিত করেন, কঠোর চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন ভীষ্ম। কিন্তু তাঁর দুই পুত্রেরই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে, অতএব যে সন্তানকে জন্মক্ষণে বিসর্জন দিয়েছিলেন এই একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকেই স্মরণ করলেন সত্যবতী। তাপস ব্যাস দেখা দিতে সত্যবতী বললেন ভ্রাতৃবধূ দুটিতে পুত্র উৎপাদন করতে। এ নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু ব্যাস জানতেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কুৎসিত আকৃতি বিকর্ষণ ঘটাবে ওই রাজবধূ দুটির চিত্তের। তাই সত্যবতীকে বললেন, তারা যেন এক বৎসর শুচিব্রতা হয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যবতী বিলম্বে অসম্মত, তখন ব্যাস ঘৃণার্হ, অবাঞ্ছিত পুরুষরূপে দুটি নারীর গর্ভাধান ঘটালেন। পরে এক দাসী তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। জন্ম হল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, বিবর্ণ পাণ্ডু এবং শান্ত, দান্ত ধার্মিক বিদুরের।

কলবিঙ্ক শাবকদের প্রতি মা-পাখি বাবা-পাখির অপত্যস্নেহের প্রকাশ দেখে যাঁর অপত্যবাসনা জাগে তিনি বিনা দাম্পত্যে অপত্যের জনক হলেন; অলৌকিক ভাবে শুকের এবং দুই অনিচ্ছুক রমণীর ও একটি নম্রমধুর দাসীর সঙ্গে স্বল্পক্ষণের সংযোগে। পত্নীপ্রেম তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; পুত্র শুকের দাম্পত্য জীবন কাছে থেকে কিছুকাল দেখেছিলেন মাত্র, তা সে শুককেও অকালে হারালেন।

১৪. শান্তিপর্ব; (৩১১-৩১৪ অধ্যায়)

গান্ধারী যখন একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন এবং কুন্তির পুত্রভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হয়ে সে পিণ্ডটিকে নষ্ট করতে উদ্যত হন তখন ব্যাস সেটিকে একশত এক খণ্ডে ভাগ করে শত কৌরব পুত্র ও কন্যা দুঃশলার ভ্রূণে বিন্যস্ত করেন। নিজে অপত্নীক। কলবিঙ্ক শাবকদের দেখার পর থেকে অপত্যস্নেহ তিনি ইতস্তত বিতরণ করেছিলেন। স্নেহমমতা তাঁর সহজাত বৃত্তিই ছিল। পাণ্ডুর অকালমৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণের পরে ব্যাস এসে কুন্তিকে সান্ত্বনা দেন। বনবাসকালে পাণ্ডবদের একচক্রা নগরীতে বাসের ব্যবস্থা করে দেন এবং দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে যাওয়ার জন্যে তাদের পরামর্শ দেন।[১৫] যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ব্যাস উপস্থিত থাকতেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা হলে পর যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।[১৬] পাণ্ডবদের বনবাসকালে যখন দুর্যোধন পক্ষ তাদের বিনাশে বদ্ধপরিকর, তখন ব্যাসই দুর্যোধনদের নিরস্ত করেন।[১৭] যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ধারাবিবরণী শোনাবার জন্যে তিনিই সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দেন।[১৮] ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত, তখন ব্যাস এসে কিছুক্ষণ ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করে যান।[১৯] যুদ্ধে এক সময় যুধিষ্ঠির খুব উদভ্রান্ত বোধ করলে ব্যাস এসে তাঁকে নানা সান্ত্বনাবাণী শোনান। যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য যখন প্রচুর বিত্তের প্রয়োজন হল; তখন ব্যাসই এসে রাজা মরুত্তের গোপন বিত্তরাশির সন্ধান দেন।[২০]

ঘটোৎকচের মৃত্যুর সংবাদে যুধিষ্ঠির যখন নিরতিশয় ব্যাকুল, তখনও ব্যাস এসে যুধিষ্ঠিরকে নানা ভাবে আশ্বস্ত করেন। স্ত্রীপর্বে পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী সকল পাণ্ডবকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হলে ব্যাস এসে তাঁকে নিরস্ত করেন।[২১] যুদ্ধান্তে যে পাপবোধে যুধিষ্ঠির ভারাক্রান্ত বোধ করছিলেন তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ব্যাসই যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপনাশ করার পরামর্শ দেন।[২২] ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তি, ও বিদুর যখন বনগমনে উদ্যত, তখনও ব্যাস এসে তাঁদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেন।[২৩] অলৌকিক শক্তির প্রয়োগে সমস্ত মৃত সৈনিকদের এক রাতের জন্যে পরলোক থেকে মর্তে নিয়ে আসেন ও বহু ক্ষত্রিয় নারী তখন গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করে স্বামীদের সান্নিধ্যে চলে যান।[২৪] যদুবংশ যখন

১৫. আদিপর্ব; (১৫৭:১৫)
১৬. সভাপর্ব; (৪৯:১০)
১৭. আরণ্যকপর্ব; (৮:২৩)
১৮. ভীষ্মপর্ব; (২:৮, ৯)
১৯. শান্তিপর্ব; (৪৭:৫)
২০. আশ্বমেধিকপর্ব; (৩:২০)
২১. স্ত্রীপর্ব; (১৩:৭)
২২. আশ্বমেধিকপর্ব; (৩:৯)
২৩. আশ্বমেধিকপর্ব; (২:২০; ৩:১-৫)
২৪. আশ্রমবাসিকপর্ব; (৪১:২১-২৪)

ধ্বংস হচ্ছিল তখন অর্জুন ব্যাসের কাছেই আসেন কী করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে।[২৫] অনুশাসন পর্বে দেখি একটি কীট শকটের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিল, ব্যাস তাকে বাঁচান ও সে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়। জীবের প্রতি মমতা ব্যাসের সহজাত বৃত্তি এবং মহাকাব্য রচয়িতার পক্ষে এটি যে একটি অপরিহার্য গুণ তা দেখবার জন্যেই যেন এ ঘটনার উল্লেখ। শেষ জীবনে ব্যাস আবার তাঁর প্রথম সাধনস্থান হিমালয়েই ফিরে যান এবং তপস্যায় মগ্ন হন। ব্যাসের মৃত্যুর কথা শাস্ত্রে লেখে না।

চারটি বেদের বিভাজন, সমস্ত মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচনা ব্যাসেরই কৃতি— এ কথা বলা হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, কোনও একজন মানুষকে এতগুলি কাজ করতে হলে তাঁকে প্রায় আড়াই হাজার বছর বেঁচে থাকতে হয়, এবং ব্যাস যে তেমনই বেঁচে ছিলেন তার কোনও উল্লেখ কোথাও নেই। তা হলে দাঁড়ায়, ব্যাস একটি সংজ্ঞা মাত্র, যিনি বেদভাগ না করলেও মহাভারতের রচয়িতা বলে তাঁকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আমরা জানি, মহাভারত মূল রচনা ও অন্তত দু-তিনটি প্রক্ষিপ্ত অংশের সংকলনে নির্মিত, এর শেষতম রূপায়ণের সঙ্গেই রচয়িতা হিসেবে ব্যাসের যোগ। বেদ এবং পুরাণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব, যদি না বেদবিভাজন ব্যাপারটি মহাভারতের সমকালীন হয়ে থাকে।

এতগুলি গ্রন্থের রচয়িতা বলে ব্যাসকে চিহ্নিত করবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট; তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকের শ্রদ্ধা জাগানো। মহাভারত পড়ে পাঠক শ্রদ্ধায় অভিভূত হন, কিন্তু সে শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর প্রজ্ঞায়, তাঁর ভূয়োদর্শিতায়। পাঠকের এই ব্যাপারে একটা দ্বিধা থেকে যায়: যে মানুষটি বিবাহ করেননি, সংসারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাঁর পুত্র শুকের সংসার মাত্র কিছুকালের জন্যে কাছ থেকে দেখা, যিনি রাজপ্রাসাদে থেকে মূলত অসম্পৃক্ত, কেননা ব্যক্তিগত কোনও বন্ধনই তাঁর ছিল না, তিনি কেমন করে জীবনের এত বৈচিত্র্যের সন্ধান দিলেন? মহাভারত নিজের সম্বন্ধে বলেছে, 'যা এখানে নেই তা কোথাওই নেই।'[২৬] এ কথা বহু দূর পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কিন্তু ব্যাস কেমন করে এত গভীর এবং এত ব্যাপক ভাবে জীবনকে জানলেন? তিনি শোকে সান্ত্বনা দিয়েছেন বার বার, এমনকী শোকে আপ্লুত হয়ে অশ্রুপাতও করেছেন, পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করে পরামর্শ দিয়েছেন বারে বারে, কৌরবদের বলেছেন সর্বনাশের পথে না গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে। অর্থাৎ তিনি কৌরব-পাণ্ডবদের ভাগ্যভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু এগুলি ত মানবহিতৈষা, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে মহাভারত প্রায় নীরব। পরাশরকে তিনি চোখেই দেখেননি, সত্যবতীর সঙ্গে মাতাপুত্র সম্পর্ক ধরে এমন কোনও আলাপ নেই যার থেকে সত্যবতীর অপত্যস্নেহ বা ব্যাসের মাতৃভক্তির কোনও নিদর্শন পাই। তিনি জননীর

২৫. মৌষলপর্ব, পুরো অধ্যায়

২৬. যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ। আদি (৫৬:৩৩)

আজ্ঞা পালন করেছেন, কিন্তু সেটা ত কর্তব্য, জননীকে ভালবেসে বা ভক্তি করে তা করেছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। শুকের সম্পর্কেও খবর মেলে দেবীভাগবত পুরাণে— মহাভারত তাঁর সম্পর্কে প্রায় নীরব। সেখানে শুধু শুনি আর পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে শুকও তাঁর কাছে বিদ্যালাভ করেছেন ও মহাভারত শুনেছেন।[২৭] পিতাপুত্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোথাও চিত্রিত হয়নি। তা হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক মানবিক সম্পর্কগুলির মধ্যে ব্যাসকে দেখানোই হয়নি, অথচ ব্যাস সারা মহাভারত জুড়ে বিস্তর মানবিক সম্পর্কের আলেখ্য আঁকলেন। পাঠক বিব্রত বোধ করেন: ব্যাসের জীবন এমন নিরালম্ব রূপে দেখানো হল কেন? রামায়ণের শুরুতে এবং গোটা উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বর্তমান এবং সেখানে তিনি কঠোর তপস্বী, সীতার স্নেহপরায়ণ পালকপিতা, লবকুশের আচার্য এবং সীতা ও তাঁর সন্তানদের প্রতি মর্মান্তিক অবিচার করার জন্যে কঠিন শপথ করে রামকে ধিক্কার দিচ্ছেন। এখানে কোথাও কোনও বিরোধ নেই। সীতা ও লবকুশ ছাড়া কোনও মানবিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে উপস্থাপিত করা হয়নি, যেখানে তিনি দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিভক্ত।

ব্যাস কিন্তু নানা ভাবেই জটিল। কী ভাবে ব্যাসকে দেখব? তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল কেটেছে তপস্যায়। জীবনের নানা পর্ব সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ, কিন্তু জীবনকে তিনি ব্যক্তিজীবনের পরিসরে তো দেখলেনই না, সে সম্বন্ধে এত উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর জন্মাল কী ভাবে? তখন পাঠককে মনে করতে হয়, অসম্পৃক্ত থাকলে প্রবহমান সংসারের জীবন থেকে যে দূরত্ব থাকে সত্যকার চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে তা এক ধরনের তৃতীয় নেত্র দেয়; সে এক পূর্ণতর দৃষ্টি পায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা আবিল হয়নি। দূর থেকে অন্যদের জীবন দেখে মনের গভীরে তাকে বিশ্লেষণী উপলব্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারলে যে দেখা, সে শুধু সত্য দেখা নয়, ব্যাপ্তিমান স্থায়ী দেখা, তাৎক্ষণিকের দ্বারা সীমিত নয়। শাস্ত্রে তাই বলে 'কবিঃ ক্রান্তদর্শী'— কবির দৃষ্টি বর্তমান কাল ও অব্যবহিত পরিস্থিতিকে পেরিয়ে দেখতে পায়।

ব্যাসের চরিত্রে অন্য যে ব্যাপারটি পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে দ্বিধার মধ্যে আনে তা হল ব্যাসের দুটি আচরণ। প্রথম, ব্যাস ঋষির পুত্র, স্বয়ং তপস্বী। কিন্তু রাজপ্রাসাদের, অন্যায় পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির একের পর এক যা যা বাজি রেখে হারছেন তার অনেকটাই যে যুধিষ্ঠিরের অনধিকারের সীমায় তা তিনি নির্দেশ করলেন না। এর ফলে প্রকাশ্য রাজসভায় রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূর মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ঘটল, ঋষির বিবেক তা নিষ্প্রতিবাদে দেখল। এইখানে ব্যাসের প্রথম ও প্রধান অপরাধ, বাকি অপরাধগুলি এর থেকেই এসেছে। কৌরবদের তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ করতে প্রয়াসী হননি। সারা যুদ্ধকাণ্ড ব্যাপ্ত করে দেখি, ব্যাস দ্বিমনা, তাঁর আনুগত্যও যেন দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর অন্তরের পক্ষপাতিত্ব যে পাণ্ডবদের

২৭. দেবীভাগবত (১:১৪), হরিবংশ (১:১৮:৫১)

পক্ষে, এতে কোনও সন্দেহ থাকে না; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুজনেই তাঁর ঔরস সন্তান (নিয়োগের বলে)। এদের মধ্যে তিনি পক্ষপাতশূন্য আচরণ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি, যা বিবেকবান ঋষির পক্ষে অন্যায়। যুযুৎসু বা বিদুর যে নিরপেক্ষতা দেখিয়েছেন, ব্যাস তা পারেননি। তাঁর বিবেক দ্বিধাগ্রস্ত। মহাভারত-প্রণেতা ঋষিকবি সম্বন্ধে পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হবে? তাঁকে বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত করবে, না তাঁর বিচারে বিমুখ থাকবে? এই ব্যাপারটা পাঠককে রীতিমত ব্যাকুল করে এবং ধীরে ধীরে চরম এক প্রত্যয়ে পৌঁছে দেয়; তা হল: কেবলমাত্র মর্মান্তিক আততি থেকেই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব। ব্যাস যদি সরলরৈখিক চরিত্র হতেন, বাল্মীকির মতো শুধু শেষ পর্বে অপমান ও প্রত্যাখ্যান পেতেন তা হলে তাঁর সৃষ্টিও রামায়ণের মতোই সরল হত, পাঠকের প্রতিক্রিয়াতে এত জটিলতা বা যন্ত্রণা থাকত না। কিন্তু ব্যাসের জীবন, উপলব্ধি, আন্তর-সংঘাত সবই তাঁকে ধীরে ধীরে মহৎ সৃষ্টির স্রষ্টায় পরিণত করেছিল, তাই পাঠকের পক্ষে তাঁর জীবন বা সৃষ্টি কোনওটারই প্রতি সাড়া দেওয়া সহজ হয় না— এত মহৎ, এত দুরূহ, এত ঐশ্বর্যবান মহাকাব্যে সাড়া দেওয়াও সে জন্যে বহু মর্মযন্ত্রণা, বোধ ও বোধির বহু যাতনাময় স্তর পেরিয়ে তবেই সম্ভব। এ মহাকাব্যের জনপ্রিয় হওয়ার কথাই ওঠে না: মানস ক্লেশে দীর্ণ, জীবনের উপলব্ধিতে ঋদ্ধ, ধর্মবোধে ভাস্বর যে পাঠক এ মহাকাব্য তারই প্রিয়। সংখ্যায় তারা অল্প, কিন্তু তাৎপর্যে তারা গরীয়ান।

•

সংশয়ের উজ্জ্বলতা

সারা পৃথিবীতে বেশ কিছু মহাকাব্য রচিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য *গিলগামেশ* থেকে যদি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ভার্জিলের কাব্য পর্যন্ত ধরি তা হলে এগুলি সংখ্যাতেও কম নয়। কালের ব্যাপ্তিতেও বিপুল। সাধারণত মহাকাব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: প্রাথমিক পর্বের, *গিলগামেশ*, হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি; আর দ্বিতীয় পর্যায়ের, ওভিদ, ভার্জিল, প্রভৃতি। ভারতবর্ষের দুটি মহাকাব্যই প্রাথমিক। এই ধরনের মহাকাব্যের কতকগুলি স্বতন্ত্র লক্ষণ থাকে। এগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। *গিলগামেশ*-এর রচয়িতার নামই জানা যায় না; হোমার বা ব্যাস বাল্মীকি সম্বন্ধে যা জানি তার প্রামাণ্যতা সংশয়িত, কেননা তা অনেক পরবর্তী যুগের, বা সম্ভবত তাঁদেরই রচনার প্রক্ষিপ্ত অংশের থেকে সংকলিত। কাজেই রচয়িতার অনামিক কিংবা কিংবদন্তী-নির্ভর হওয়াটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হল, প্রাথমিক মহাকাব্যকাররা নিজেদের যথাসম্ভব নেপথ্যে রেখে কাব্যে তাঁদের দেশের ও কালের এমন একটা পর্বের কথা বলেন যখন তাঁদের জাতীয় জীবনের কোনও ঘটনা বা ঘটনাবলি কবির লেখনীর সাহায্যে অমরতা দাবি করে। এই কবিরা যেন সমস্ত জাতির হয়ে ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থেকে মহাকাব্যগুলি রচনা করেন।

কেন? কী তাঁদের প্রেরণা দেয়? শুধু কি কোনও কাহিনিকে অবলম্বন করে কাব্য রচনাই এঁদের উদ্বুদ্ধ করে? তেমন বহু কাহিনি তো লোকমুখে ভ্রাম্যমাণ থাকে দীর্ঘকাল, দূরদূরান্তরে গাথাসাহিত্যের আকারে। মহাকবি কাহিনিগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন মাত্র, নিজস্ব সংযোজন দিয়ে। তা হলে কাহিনি ও গাথার অতিরিক্ত কিছুই তাঁদের উপজীব্য, যাকে মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণ্যে নিবেদন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এই অতিরিক্তটুকু কী? জাতীয় জীবনের কোনও ঘটনা-সম্পাত বিশেষ মুহূর্তে মহাকবির চিত্তে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে যাতে তাঁর আবাল্য-অভ্যস্ত সমাজ-স্বীকৃত সব মূল্যবোধের শিকড়ে টান পড়ে; এতে আবার সব কিছু নিয়ে নতুন করে বোঝাপড়া করতে হয় নিজের সঙ্গে— সমকালীন সমস্ত স্বদেশবাসীর প্রতিভূ হয়ে; এই বোঝাপড়ার শেষ নির্যাসটুকু তুলে দিতে হয় দেশবাসীকে; সেই সময়, এই কারণ এবং প্রক্রিয়াতেই, জন্ম নেয় মহাকাব্য। কাজেই মহাকাব্যে কবি গৌণ,

দেশবাসীরাও ব্যক্তি হিসেবে গৌণ। যে সকল ঘটনার অভিঘাতে কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন, মহাকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা হিসেবে সেগুলিও গৌণ। এ সকলের সমাবেশে জনজীবনে যে সংঘাতের সূচনা হয়েছে, যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অস্ফুট ভাবে সচেতন, কবি সেই সংঘাতকে আত্মস্থ করে তাকে অর্থবহ রূপ দেন মহাকাব্যে। তখন পাঠক বা শ্রোতা মহাকাব্যের মধ্যে খুঁজে পান মূল্যবোধের সংক্ষোভে বিচলিত তাঁর আপন চিত্তের প্রতিরূপ, তাঁর কিছু সংশয়ের সমাধান, কিছু বা নতুন প্রশ্ন যা তাঁকে ভাবাবে এবং উন্নততর জীবনবোধের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

এ কথা সত্য যে, মানুষ স্বেচ্ছায় মূল্যবোধের বিরোধে সংক্ষুব্ধ হতে চায় না। পারলে সে অভ্যস্ত পরিবেশের অভ্যস্ত মূল্যবোধের আবহে শান্তিতে, নির্দ্বন্দ্বে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই করেও থাকে। কিন্তু মূল্যবোধের সংকট কারও কারও জীবনে আসে। যেমন দশরথের সামনে দুটি শ্রেয়োনীতির বিকল্প ছিল: কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসন অধিকার সমর্থন করা। লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, এঁদের কথায় এটি স্পষ্ট বোঝা যায়। জরাগ্রস্ত, বিকলচিত্ত দশরথ ওই দ্বন্দ্বের সামনে এসে এত বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সিন্ধুমুনির অভিশাপের উপাখ্যান উদ্ভাবন করতে হয়েছে, যার ফলে দশরথের নৈতিক সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে অতিলৌকিকের দ্বারা। কিন্তু আসলে দুর্বলচিত্ত রাজা কৈকেয়ীর অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না— একদা তাঁর প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল বলে, এবং এই আপৎকালে তার অনর্থ করবার প্রচণ্ড শক্তি জানতেন বলে। তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের বাসরে রাষ্ট্রের মঙ্গলের যুক্তি ও জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার যে সমগ্র প্রজাকুলের কাছে রাজার অকথিত অঙ্গীকার— এ কথা বলবার নৈতিক সাহস দশরথ খুঁজে পেলেন না। তেমনই স্নেহময় পিতা যখন রামকে ডেকে পাঠিয়ে অভিষেকের পরিবর্তে চতুর্দশ বৎসরের জন্যে বনে নির্বাসনের সংবাদ দেন তখন দেখা দেয় অনাশঙ্কিত সংঘাত: রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে রাজ্যাধিকার দাবি করবেন, না পিতার নির্দেশ মেনে নেবেন? পরে আবার সবার অলক্ষ্যে নির্বাসনভূমিতে যখন ভাই ভরত এসে রাজ্য প্রত্যর্পণ করবার জন্যে মিনতি করেন তখন পুনর্বার সে সংকটের মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে।

এ কোন সংকট? শুধু শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব নয়, দুটি ন্যায়সংগত বিকল্পের মধ্যেই বিরোধ। ভরতের অনুরোধে রাজ্য গ্রহণ করলে রাম পিতৃ-সত্য রক্ষা না করার অপরাধে অপরাধী হন না। কারণ, পিতার নির্দেশে বনে যাওয়াতেই তো পিতৃ-সত্য রক্ষা করা হয়েছে। বিমাতা যাঁকে রাজা করতে চান তিনি স্বয়ং যদি জ্যেষ্ঠকে রাজ্য দিতে চানই তাতে তো পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না। এখানে দুটি মূল্যবোধের সংঘর্ষ। এমন ঘটনা মানুষের জীবনে মাঝে মাঝেই ঘটে। রাবণের অন্তঃপুরে সীতা হনুমানের দেখা পাবেন এবং রাম তাঁকে উদ্ধার করবেন এমন আশ্বাসের নিশ্চয়তা দূরে থাক, সম্ভাবনাই ছিল না। সে অবস্থায় দু' মাস পরে তাঁকে মেরে ফেলা হবে জেনেও রাবণের প্রস্তাবে যখন তিনি সম্মত হননি, তখন রামের

প্রতি প্রেম ও আনুগত্য লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত হল। এর পরে বাল্মীকি স্বয়ং যখন রামের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেন যে, সীতা যদি কায়মনোবাক্যে রামেরই প্রতি অনুরক্তা না হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর বহু সহস্র বৎসরের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কোনও ফলই যেন তিনি না পান। তখন রামের সম্মুখে দুটি শ্রেয়ের বিরোধ দেখা দেয়: প্রজারঞ্জন ও মহর্ষি বাল্মীকির বাক্যে আস্থা স্থাপন করে প্রকাশ্যে সীতার শুচিতা ঘোষণা করে তাঁকে গ্রহণ করার বিকল্প। দুটিই ধর্মসংগত। কাজেই মূল্যবোধের সংঘাতে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন, তা শেষ পর্যন্ত ধর্মসংকটের রূপেই দেখা দেয়। শুধু শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হলে ধর্ম ও অধর্মের বিরোধেই তা পর্যবসিত হত, ধর্মসংকট হত না। নীতি ও দুর্নীতির মধ্যে বিকল্পগুলির গ্রহণ-বর্জন অনেক বেশি সহজ ও সরলরৈখিক।

রামায়ণে এ ধরনের সংকট বেশি নেই বলেই রামায়ণের জনপ্রিয়তা সহজে এসেছে এবং বেশি ব্যাপক ও স্থায়ী হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক, দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র্য, বন্ধুকৃত্য, পরিবারের মর্যাদারক্ষা, শত্রুনিপাত ও তার বাইরে প্রজারঞ্জনের একটা অস্পষ্ট মহনীয়তা— এই সবই রামায়ণের মূল্যাবোধে সংকট এনেছে এবং এগুলির অধিকাংশেরই নিষ্পত্তি হয়েছে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হিসেবেই।

মহাকাব্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বও থাকে, কিন্তু তাতে মহাকাব্যের যথার্থ চরিত্র নিরূপিত হয় না। ধৃতরাষ্ট্র যখন অপত্যস্নেহ ও রাজকৃত্যের মধ্যে অন্ধ পিতৃস্নেহকে প্রাধান্য দেন তখন আপামর-সাধারণ তাঁর রাজকর্তব্যে ঔদাসীন্য বা অবহেলাকে নিন্দা করেন, কারণ শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে তিনি নৈতিক ভাবে পরাজিত। ওই একই দ্বন্দ্বে গান্ধারী পরাজয় স্বীকার করেননি। যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে শৈশবে স্নেহে লালন করেছেন, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে আশীর্বাদপ্রার্থী সেই পুত্রের জয়কামনা করতে পারেননি।[১] না পারার জন্যে তাঁর মাতৃহৃদয় বেদনাদীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত সরল দ্বন্দ্বে তাঁর একটি পক্ষ বেছে নেওয়া তত কঠিন ছিল না, কারণ, এ দ্বন্দ্ব দুই মেরুর মধ্যে সাদা-কালোর মতোই স্পষ্ট। কিন্তু দ্যূতসভায় যখন নীরবে কৌরব মহারথীরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখেন তখন তাঁদের সামনে দুটি বিরুদ্ধ মূল্যবোধের সংঘর্ষ ছিল। দুটিরই সপক্ষে যুক্তি ছিল। তাঁরা কৌরবের অন্নে প্রতিপালিত, কৌরবদের দ্বারা সংরক্ষিত, অতএব কৌরব-পক্ষ সমর্থন করার পক্ষে তাঁদের নৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল। অপরপক্ষে এরও ওপরে ধর্মবোধ, যা নিঃসহায় রমণীর প্রকাশ্য, চূড়ান্ত অপমানের প্রতিকার করার স্পষ্ট পুরুষোচিত ও ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যের দায়, জনমানসে সেটিরও নৈতিক সমর্থন ছিল। তেমনই যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয় কর্তব্য ও মানবিক কর্তব্যের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দিল, তখন তিনি যে শ্রেয়স্তর নীতিকে অবলম্বন করে আপাত ভাবে ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হতে সাহস করেছিলেন এখানেই তাঁর ধর্মসংকটে বিজয়ের প্রমাণ থেকে গেছে। এইখানে,

১. স্ত্রীপর্ব; (১৭:৫-৬)

এবং শুধুই এইখানে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কৌরবপক্ষের উর্ধ্বে ধর্মবিজয়ীর গৌরব পেলেন পাণ্ডবরা এবং পাণ্ডবপক্ষ হয়ে উঠল ন্যায়পক্ষ, ধর্মপক্ষ। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষ্ণ মহিমা সংকীর্তনের জন্য আদিপর্বে যে সংযোজন, 'যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে বিজয়', এই দাবি অসার ও অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে, কারণ ধর্মসংকট কৃষ্ণের সামনে আসেনি, এসেছিল পাণ্ডবদের সামনে, বারংবার, এবং নিষ্ঠুর বিকল্পের রূপ ধরে। সেইখানে পাণ্ডবরা বিজয়ী, যুদ্ধের শেষ পরিণতির অনেক আগে থেকেই। বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে বলেন, তিনি একটি মাত্র ভাইকে সঞ্জীবিত করতে পারেন, তখন যুধিষ্ঠির সকলের অগোচরে একটি সংকটের সম্মুখীন হন এবং অনায়াসে মহত্তর মূল্যবোধে প্রণোদিত হয়ে সহোদর ভাইয়ের পরিবর্তে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নাম বলেন।[২] অর্জুন, যাঁর অস্ত্রবিদ্যা রণকৌশল সর্বজনবিদিত, তিনি যুদ্ধের পূর্বে ভ্রাতৃহত্যা, স্বজনহত্যার শঙ্কায় যখন বিচলিত হয়ে অস্ত্রত্যাগ করতে উদ্যত হন, তখন তিনি ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়ে উন্নততর বিকল্পকে আশ্রয় করতে চেয়েছিলেন। ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, রণকুশল অর্জুনের চেয়ে এই অর্জুনের চরিত্র উজ্জ্বলতর। তাঁর এই হৃদয়দৌর্বল্য ক্ষুদ্র নয়, মহৎ। এই ইতস্তত করার মুহূর্তে তিনি পাণ্ডবপক্ষকে ধর্মসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মহত্তর মহিমায় মণ্ডিত করলেন। বিজয়ী যুধিষ্ঠির যে দিন সাশ্রুকণ্ঠে সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হলেন, সে দিন তাঁর নৈতিক জয় এমন এক মাত্রা লাভ করল যা আয়ত্ত করা লুব্ধ দুর্যোধনের পক্ষে বা দাম্ভিক কর্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিজয়ের পর, রাজমাতা কুন্তি যখন পরাজিত পক্ষের সঙ্গে বনগমন করেন, তখন তাঁরও সামনে দুটি ন্যায়সংগত বিকল্প ছিল: তাঁর দুঃখী পুত্ররা বহুকষ্টে যে বিজয় লাভ করেছেন তার জন্যে তাঁদেরকে অভিনন্দিত করে তাঁদের সঙ্গে রাজমাতা হয়ে থাকা, যা ছিল প্রত্যাশিত এবং সম্পূর্ণ নীতিসঙ্গত, এবং বনাগমন। কিন্তু ওই ভিতরে-বাইরে সর্বস্বান্ত প্রাক্তন রাজদম্পতি বার্ধক্যের প্রান্তে এসে উক্ত-অনুক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করবেন তাঁদেরই পূর্বতন গৌরবের শ্মশান হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে, বা গভীর নির্বেদে, আত্মগ্লানিতে বনে যাবেন এ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন? এঁদের চেয়ে অনেক কম বয়সে তিনি নিজে বনবাসের ক্লেশ ভোগ করেছেন, তাই আর কিছু দিতে না পারলেও সাহচর্যটুকু দিতে উদ্যত হলেন। কুন্তির ধর্মসংকটের দুটি মেরুই বৈধ; কিন্তু দুঃখময়, বিকল্প বেছে নিতে পেরে তিনি ধর্মের নতুন এক ঔজ্জ্বল্যকে স্পর্শ করলেন।

২. আরণ্যক; (২৯৭:৬৬)

জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ন

কর্ণ যেদিন কুন্তির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন সে দিন তাঁরও দুটি বিকল্পই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুচির-প্রতীক্ষিত জননী মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু সন্তানকে আমন্ত্রণ করছেন জ্যেষ্ঠ কৌন্তেয়ের মর্যাদায়, আপন মাতৃস্নেহের আশ্রয়ে, একে স্বীকার করার মধ্যে অন্যায় ছিল না। সত্যই তো তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জয়ী হলে অনুজ পাণ্ডবদের উর্ধ্বে তাঁর স্থান হত; এ গৌরব স্বীকার করলেও কোথাও সত্যের অপলাপ ঘটত না। প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দীর্ঘ-সঞ্চিত অভিমান নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আরও কিছু ছিল: অধিরথ এবং রাধার কাছে আশৈশবকাল যে স্নেহসিক্ত আশ্রয়ে লালিত, তার অমর্যাদা ঘটত। দাতা কর্ণেরও অদেয় ছিল কুন্তিকে এ দান। বীর কর্ণেরও অদেয় ছিল কুন্তিকে এ দান। বীর কর্ণ বীরের সদগতি থেকে ভ্রষ্ট হলেন না, সূর্যের সন্তান জ্যোতির্ময় আত্মত্যাগে শ্রেয়স্তর বিকল্প স্বীকার করে নিলেন, পরাজয় ও মৃত্যু অবধারিত জেনেও। এইখানেই কর্ণের মহত্ত্ব; প্রথম কৌরবপর্যায়ের মহাকাব্যের তিনিই তো নায়ক। সেই চরিত্র মেঘের পশ্চাতে বিদ্যুৎ-রেখার মতো মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, তাই অক্লেশে ক্লেশবরণ করতে পারলেন। অখ্যাত, দুর্যোধনের আশ্রিত, সূতপুত্র, এই পরিচয় নিয়েই পৃথিবী ত্যাগ করতে সম্মত হলেন। তাঁর ধর্মসংকট তীব্র ও মর্মন্তুদ, তাই সেইখানে তাঁর ধর্মবিজয় এত গৌরবের।

ভুলে গেলে চলবে না যে, সব মহাকাব্যের নায়কই মানুষ, উপনায়ক ও প্রতিনায়করাও মানুষ। সংগ্রামটা দেবাসুরে নয়, মানুষে মানুষেই। এবং এই সংগ্রাম যখন চরিত্রগুলির মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁদের এনে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রায় সমান গুরুত্বের দুটি ধর্মগত বিকল্পের সামনে, তখনই তাঁদের চরিত্রবলের চূড়ান্ত পরীক্ষা। পরীক্ষা এই কারণে যে, যে কোনও বিকল্পই সমাজ ধর্মসংগত বলে স্বীকার করে নেবে— নীতিভ্রষ্ট বা অধার্মিক বলে দোষারোপ করবে না। বিকল্পগুলির ওজন আপাত ভাবে সমান বলেই সংকট, এবং আত্মত্যাগের পক্ষ, আপাত লাভের ও সমৃদ্ধির পক্ষ ত্যাগ করার মধ্যেই তাদের আত্মিক জয় নিহিত।

মহাকাব্য এ ভাবে ধর্মসংকটকে চিত্রিত করে কেন? মানুষ মহাকাব্যের কাছে কী প্রত্যাশা করে?— পথনির্দেশ। পাঠকশ্রোতাদের জীবনও ধর্মসংকট-সংকুল, বারে বারেই তাদের সামনে দুটি শ্রেয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীর রূপে দেখা দেয়। এর মধ্যে যেহেতু কোনওটিই ধর্মাচরণের

নীতিবহির্ভূত নয়, তাই সংকট। আদর্শকে কত উচ্চে মানুষ স্থাপন করতে পারে এবং তার জন্যে কত মর্মযন্ত্রণার মূল্য দিতে পারে তারই নিরিখ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মহাকাব্যের কেন্দ্র চরিত্রগুলি। ধর্মসংকটে যারা হার মানল তারা প্রতিনায়ক, মানুষের ধর্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্ম-প্রত্যাশা সেখানে গিয়ে প্রতিহত হল। স্বার্থসন্ধানী, আত্মসুখপরায়ণ থেকেও কতকদূর পর্যন্ত ধর্মপথে থাকা যায়, কিন্তু এমন একটি গিরিশিখর আছে যা শুধু কঠিন দুঃখে অধিরোহণ করা যায় বলেই তার উচ্চতা, শুভ্রতা মানুষকে সম্ভ্রমে নত করে। ইচ্ছে করলে সে দুঃসাধ্য শৈলশিখরকে নীচে থেকে প্রদক্ষিণ করেও জীবনের পথ-পরিক্রমা সমাধান করা যায়। কিন্তু মহান যাঁরা তাঁরা ওই পথক্লেশের ভয়ে বিচলিত হন না, বরং স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে ওই উত্তুঙ্গ শিখর অভিমুখে আরোহণ করেন। নিচের থেকে মানুষ ওই ঊর্ধ্বগামী দুঃখসাধনব্রতী আদর্শনিষ্ঠ মানুষের পরিক্রমা চেয়ে দেখে। শ্বাপদ আছে, আছে পথের দুঃসহ একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্য; কিন্তু আন্তরবলে বলীয়ান, নৈতিক শৌর্যে দৃঢ়চিত্ত যে-মানুষ পথের এই সব বিপদ জেনে দুঃখময় পথ বরণ করেছেন, নিচের মানুষ তাঁদের দেখে পথনির্দেশ পায়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় তারা আপন জীবনের ধর্মসংকটে কোন বিকল্পকে আশ্রয় করবে তার এক দিকনির্দেশ পায়।

এই পাওয়াটা সত্য হয়, কারণ মহাকাব্যের নায়কও দেবতা নয়, প্রতিপক্ষও অসুর নয়। মানুষের সংকটে মানুষই পথ দেখাতে পারে। নির্দোষ পাণ্ডবরা দ্বাদশবর্ষ বনে নির্বাসিত, রামলক্ষ্মণ-সীতাকে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী দেখে নিষ্কারণে নির্যাতিত মানুষ শক্তি পায়। যখন দুটি নীতিনিষ্ঠ বিকল্পের দুরত্যয় সংকটের সামনে মানুষ এসে পৌঁছয় তখন মহাকাব্যের চরিত্রদের অনুরূপ বিপর্যয়কালের আচরণ দীপবর্তিকা হয়ে পথ দেখায়। নীতির সংকটে জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে; রোগ শোক ব্যাধি দৈন্যের চেয়ে অনেক বেশি এই নীতির সংকটের অন্ধকার। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা মানুষের জীবনে পথচিহ্ন বিলোপ করে। তখনই মহাকাব্যের মানুষ-নায়ক পথভ্রষ্ট এই মানুষের অভিমুখে বাহু প্রসারিত করে, আত্মিক দীপালোকের পথে তাদের প্রবর্তনা দেয়। সে পথ দুঃখ ক্লেশে সমাকীর্ণ, এবং সেই কারণেই ধর্মসংকট হতে উত্তীর্ণ মানুষ গৌরবে আলোকিত। দুর্বল অনুগামী নিজেকে বলতে পারে, 'ধর্মাধর্মবিভ্রান্ত ওই মানুষটি যদি এত যন্ত্রণার মূল্যে শ্রেয়স্তরকে বরণ করতে পেরে থাকে, তবে আমিও পারি।' এবং টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কঠিন পথে, কঠিন উত্তরণের গৌরবের অভিমুখে।

পরিশেষে, এই ধর্মসংকটগুলির যোগফল কী? কেন এগুলিকে মহাকাব্যে এ ভাবে উপস্থাপিত করা হয়? উদ্দেশ্য একটিই: জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ন। কতকগুলি বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সমাজে ব্যাপ্ত থাকে, সেগুলি মানুষ উত্তরাধিকার-সূত্রে পায় এবং তা থেকে জীবনের পথসংকেত পায়। তার পর, সহসা কোনও অনাশঙ্কিত ঘটনায় পুরনো মূল্যবোধ হঠাৎ অর্থহীন, অচল হয়ে যায়। দুটি পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সামনে তখন মানুষ দিগভ্রান্ত বোধ করে। তখন তার প্রয়োজন হয় নতুন মূল্যবোধের। এই প্রয়োজন ধর্মসংকটের; এমন বহু বিচিত্র ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছেন মহাকাব্যের চরিত্রেরা, এবং পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের

আন্তর-বোধ ও শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধের সন্ধান পেয়েছেন। পাঠকশ্রোতা যখন জীবনের অনুরূপ সন্ধিক্ষণে দুটি বিরোধী নীতির মধ্যে নির্বাচন করতে বাধ্য হন তখন মহাকাব্যের নায়কের অনুরূপ অবস্থার সিদ্ধান্ত ও আচরণ তাঁকে পথ দেখায়। মানুষের জীবনের অন্তঃসংঘাতে মহাকাব্যের মানুষ-নায়কের সিদ্ধান্তই পথ দেখাতে পারে। তাই কৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক হতে পারেন না। বন্ধুকে আত্মিক সংকট থেকে ত্রাণ করবার উপায় হিসেবে বিশ্বরূপ-দর্শন করানোর জাদু যাঁর আয়ত্তে আছে তিনি তো দেবতা, সর্বশক্তিমান; স্বল্পশক্তি মানুষ তাঁর কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পায় না, কারণ মানুষের শক্তি সীমিত। তাই যুধিষ্ঠির নায়ক, কারণ বারে বারে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে, মূল্যবোধের দ্বৈধতায় পীড়িত হন, দুটি বিপরীত নীতির সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করেন, বহু যন্ত্রণার মধ্যে দ্বিধা নিরসনের জন্যে একটি মূল্যবোধকে বেছে নেন। এই সময়ে তিনি নৈতিক সংশয়ে মুহ্যমান সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এবং মানুষ তাঁর কাছে সংকেত পায় নিজের মূল্যবোধের সংঘাতে সিদ্ধান্ত খুঁজে নিতে।

মহাকাব্যের মূল বিষয়গুলিই হল এই ধর্মসংকট। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভাবে এর সমাধান করেছে। ধর্মসংকট দুর্যোধনের কাছেও এসেছিল: পাণ্ডবদের উৎকর্ষ মেনে নেওয়া অথবা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুশাসন মেনে যুদ্ধ করে যাওয়া। তার পর একদিন এল বিরাটপর্বের শেষে, যখন পাণ্ডবদের উৎকর্ষ পরাজয় হানল দুর্যোধনের ওপরে। সে দিন দুর্যোধনের কী প্রতিক্রিয়া? বসে আছেন প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা সংকল্প নিয়ে; তাঁকে সে দিন পথ দেখাল কে? কৃত্যারা; অর্থাৎ পাতালের মন্দশক্তি। ম্যাকবেথকে যেমন ডাইনিরা অর্ধ-সত্য অর্ধ-মিথ্যার প্রহেলিকা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল ঠিক তেমনই কৃত্যারা দুর্যোধনকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করল।[১] মানুষ তাই নৈতিক সংকটে দুর্যোধনের আচরণ বা সিদ্ধান্ত থেকে কোনও যথার্থ অনুপ্রেরণা পায় না। পুরুষের অর্থাৎ যথার্থ মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছে মহাভারত: 'যার পুণ্যকর্মের ধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্পর্শ করে সে ততদিনই জীবিত থাকে যত দিন ওই ধ্বনি থাকে।'[২] আত্মিক শৌর্যে ঋদ্ধ নায়ক, দুরূহ ধর্মসংকটে যাঁর শুভবুদ্ধি তাঁকে মানুষের হিতকর সিদ্ধান্তের সন্ধান দেয়, তেমন নায়কের আচরণ আজও পথনির্দেশ করে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ, দুটি শ্রেয়ের মধ্যে আনুপাতিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে আপন আচরণকে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই মানুষ যুগে যুগে বারে বারে ফিরে আসে জীবনবোধের উৎস-সাহিত্য মহাকাব্যে। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই জীবনের পুনর্মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠিত; এর আদিমতম সূচনা মহাকাব্য। এই কারণেই তা অমর।

১. ভীষ্মপর্ব; (২৪:৪-৮)
২. আরণ্যকপর্ব; ২৪০ পুরো অধ্যায়

রামায়ণ: সহজ পথরেখা

সব মহাকাব্যই কাব্য কিন্তু সব কাব্য মহাকাব্য নয়। মহাকাব্যের নিরিখ নানা সাহিত্যে নানা সংজ্ঞায় নিরূপিত হয়েছে। তবে, মোটের ওপর বিগত পাঁচ হাজার বছরের বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি মানুষ কতকগুলি কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছে, যদিও গুণগত মানে এগুলির মূল্য সমান নয়।

কাব্য সম্বন্ধে বরং একটা মোটামুটি ঐকমত্য আছে: যা মানুষকে চিন্তায় এবং/বা আবেগের ভূমিতে আন্দোলিত করে এবং জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে প্রণোদিত করে, তা-ই উচ্চস্তরের কাব্য। শুধুমাত্র বর্ণনা, বা যে-কোনও রস সৃষ্টি করে যা মানুষকে আপ্লুত করে তাকেও কাব্য আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু মূল্যের পরিমাপে তার স্থান সাহিত্যে খুব উঁচুতে নয়। কাব্যের আঙ্গিক তার বহিরঙ্গ, যেমন ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্য এ-বিষয়ে একটা সুস্থ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে, ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টিমাত্রকেই কাব্য বলেনি। ধর্মসূত্র, পুরাণ, ছন্দশাস্ত্র, অলংকারগ্রন্থ, কোষগ্রন্থ, এমনকী কিছু কিছু বিজ্ঞানগ্রন্থও ছন্দে রচিত; কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকরা সেগুলিকে কখনওই কাব্য বলেনি। অপর পক্ষে গদ্যে রচিত *কাদম্বরী* বা *হর্ষচরিত*-কে কাব্য বলা হয়েছে। কাজেই সংস্কৃতে বিষয়বস্তু বা বহিরঙ্গ দিয়ে কাব্যত্ব বা গদ্যত্ব নির্ণীত হয়নি, ভাব ও রস দিয়েই তা হয়েছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও বহু তথাকথিত কাব্য বেশ অপকৃষ্ট রচনা, কষ্ট-কল্পিত, কৃত্রিম, অলংকার-বহুল; চমক সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। তবু আঙ্গিকের ঊর্ধ্বে নিরিখের স্থাপনা করা হয়েছিল— এটিও প্রণিধানযোগ্য।

তা হলে প্রশ্ন আসে, মহাকাব্য কীসে মহাকাব্য হয়? সে আলোচনার পূর্বে বলে নেওয়া উচিত, মহাকাব্য প্রধানত দু'ধরনের হয়: আদি মহাকাব্য ও পরবর্তী যুগের মহাকাব্য। বস্তুত এই পরবর্তী যুগের মহাকাব্যও দু'শ্রেণির: চরিত্রগত ভাবে মহাকাব্য ও সংজ্ঞানির্ভর মহাকাব্য। আদি মহাকাব্যের উদাহরণ *গিলগামেশ, মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়াড, অডিসি* এবং সম্ভবত *ঈনীড*। গৌণ বা পরবর্তী কালে মহাকাব্যে প্রথম শ্রেণিটিতে পড়ে অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্য, মিলটনের মহাকাব্যদ্বয়, দান্তের মহাকাব্যত্রয়ী, গ্যেটের মহাকাব্য, কালেহ্বলা, নীবেলুঙ্গেনলীড, এল সিড, ইত্যাদি। এর দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত হল দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের মহাকাব্য এবং ইয়োরোপে প্রাচীন মহাকাব্যের অনুসরণে কিছু রচনা। আদি মহাকাব্যের

পরবর্তী মহাকাব্যগুলিতে ওই প্রাথমিক মহাকাব্যের প্রভাব চোখে পড়ে, যেন আদি মহাকাব্যকে আদর্শ ধরে আরও সংহত পরিপাট্যে এগুলি রচিত। প্রাথমিক মহাকাব্যগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা তাঁদের নাম ছাড়া কিছুই জানি না। *গিলগামেশ*-এর ক্ষেত্রে তাও জানি না। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের জীবন, কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কোনও তথ্যসূত্র কোথাও নেই। নীবেলুঙ্গেনলীড, কালেহ্বলা বা এল সিড সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, কিন্তু মিলটন, দান্তে, গ্যেটের জীবনী আমাদের পরিচিত, এঁরা অনেকটা পরের যুগের বলেই হয়তো এঁদের ইতিহাস কিছু জানা যায়। ভারবি, মাঘ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, তার কারণ অবশ্য ভারতবর্ষের সুবিদিত ইতিহাসবিমুখতা।

এই দ্বিতীয় শ্রেণির দুই বিভাগের মহাকাব্যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যেমন আছে, তেমনই আছে সচেতন ভাবে আঙ্গিক সৌষ্ঠব নির্মাণে কবিদের প্রয়াস, যা প্রথম পর্বের মহাকাব্যে নেই বললেই চলে। তা হলে কী আছে সেই আদি মহাকাব্যগুলিতে যা তাদের এমন অমরত্বে মণ্ডিত করেছে? *গিলগামেশ* সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, সেই যুগকে আমরা এত কম চিনি যে, আঙ্গিক উপজীব্যে মিলে যে সাহিত্য নির্মাণ, তার সামাজিক ও মননগত পটভূমিকাটি আমাদের কাছে অপরিচিত। কিন্তু বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, গভীরতা, মানবিক আবেগ ও আবেদন এবং মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমরত্ব লাভ করবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় কোন গুণে এ গ্রন্থ অমর।

কুষাণ সাম্রাজ্যের শেষ দিকে যে সব ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল, গোষ্ঠী ও কৌম সংগঠন ভেঙে যে নতুন 'কুল' বা বৃহৎ যৌথ পরিবারের উদ্ভব হচ্ছিল এবং এ-দুটিকে অবলম্বন করে সমাজের যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল তা বহুলাংশে রামায়ণে প্রতিফলিত। সৌভ্রাত্র্য, দাম্পত্য, অপত্যসম্পর্ক, ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য, শৌর্য, পিতৃসত্য রক্ষা, বন্ধুবাৎসল্য, বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ— এ সবই তখনকার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে বাস্তব সমস্যা। রামায়ণে এগুলি গুরুত্ব পেয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে। তা ছাড়া, ওই সমাজে বর্ণবিভাজন ক্রমেই কঠোর হয়ে উঠেছিল এবং নারী ও শূদ্রের অবনমন ঘটানোর জন্যে শাস্ত্র রচিত হচ্ছিল; সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা এর অনুকূলে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠছিলেন। তিন বর্ণের দাসত্ব শূদ্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হচ্ছিল এবং পাতিব্রাত্য ও শ্বশুরকুলের প্রতি আনুগত্য নারীর পক্ষে ক্রমেই অবশ্য-পালনীয় হয়ে উঠেছিল। সতীত্ব একটি অপরিহার্য গুণ বলে ধরা হত, ফলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সন্দেহেও স্ত্রীপরিত্যাগ হল স্বামীর কর্তব্য। মহাকাব্য তো এ সব নিয়েই গঠিত। এরই পরিসরের মধ্যে রাজ্যে নির্লোভ, পিতৃসত্য রক্ষায় অনমনীয় রাম, শুধুমাত্র স্বামীর প্রতি প্রেমে সীতার চোদ্দ বছরের বনবাসের দুঃসহ ক্লেশ সানন্দে স্বীকার করা, অচিরবিবাহিত লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে দীর্ঘ নির্বাসন মেনে নেওয়া, হনুমানের রামের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য, জটায়ুর বন্ধুকৃত্য করার মধ্যে দিয়ে বিনা দ্বিধায় ধ্রুব মৃত্যু বরণ করা, সুগ্রীবের রামের প্রতি মিত্রতা এবং সে কারণে কষ্ট স্বীকার— এই সব এবং আরও বহুবিধ মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখি মহাকাব্যটিতে। তা ছাড়া নিসর্গবর্ণনা— বৃক্ষলতা, অরণ্য, পর্বত, নদী, সমুদ্র, উপত্যকা বর্ণনার সঙ্গেই পশু পাখির বর্ণনা, সূর্যোদয়,

সূর্যাস্ত, রাত্রি, প্রত্যূষ এ সবের যে সুন্দর বর্ণনা তার মধ্যে জীবনের সহজ আনন্দের স্পর্শ আছে। তেমনই মানুষের নানা অবস্থাবিপর্যয়ে যে চিত্তবৈকল্য বা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশ পায় তারও সুন্দর বর্ণনা এ মহাকাব্য। এই সব উপাদানে সহজেই পাঠক অভিভূত হয়। রাষ্ট্রের সংকট তো বেশি মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করে না, বরং তাকে পারিবারিক মূল্যবোধের সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়তই। এই মূল্যবোধগুলি রামায়ণের নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কাজেই রামায়ণে সাধারণ মানুষ তার সমস্যার চিত্রণ ও সমাধান খুঁজে পেয়েছে; তাই রামায়ণকে ভারতীয় সমাজ সহজে গ্রহণ করেছে আপন স্বল্প পরিসর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে চিত্তলোকের পথপ্রদর্শন হিসেবে। সেখানে মহাভারতের গতিপথ অনেক জটিল, গভীর তার অনুসন্ধান।

মহত্তর সাধনার দিশা

হোমারের দুটি মহাকাব্যের মধ্যে *অডিসি* রামায়ণের মতো মোটামুটি পারিবারিক ও কতকটা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত। প্রকৃতির হাতে অডিসিউসের সুদীর্ঘ নিগ্রহ, পথে নানা বাস্তব অবাস্তব সংকটের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে অবশেষে স্বভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সে আবিষ্কার করে যে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিষ্কারণে সুচিরকাল ধরে বিপদে মগ্ন, তরুণ পুত্র টেলিমেকস একা সে সংকটকে যথাসাধ্য ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে মাত্র, কারণ সমাধানের শক্তি তার নেই। অতএব দীর্ঘ নয় বৎসরের বিপৎসঙ্কুল পথ-পরিক্রমার পরে অডিসিউসকে শেষ যুদ্ধ করতে হল স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে। এই সুদীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করার মধ্যে অডিসিউস মহানায়ক হয়ে ওঠেন এবং মহাকাব্যটি গম্ভীর একটি মাত্রা পায়।

ইলিয়ড-এ ঘটনা জটিল, সংকট গুরুতর এবং সংগ্রাম কঠিনতর। কারণ এ সংগ্রাম অন্তরে বাহিরে। আকিলিস তুচ্ছ কারণে সমবেত যোদ্ধাদের প্রতি কর্তব্য করতে অসম্মত হয়ে যুদ্ধোদ্যম থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নিজের দলের প্রতি এক ধরনের অবিবেচক বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মেনেলাওসের স্ত্রী হেলেনকে ট্রয়ের রাজকুমার হেলেনের সম্মতিক্রমেই হরণ করে এনেছে। তারই উদ্ধারকল্পে দুস্তর দুঃখের পথ পেরিয়ে মেনেলাওস, আগামেমনন তাঁদের নিজেদের অনুগত সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক নৌবাহিনী নিয়ে ট্রয়ের সিন্ধুতটে শিবির নির্মাণ করে যুদ্ধে উদ্যত। এর মধ্যে আকিলিসের যুদ্ধ বিমুখতায় একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হল। তবু যুদ্ধ চলল, লোকক্ষয় হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ট্রোজানদের হাতে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হলে অসহ্য ক্রোধের বশে আকিলিস অস্ত্রধারণ করলেন, যুদ্ধ ধীরে ধীরে শেষ হল। হেলেনকে নিয়ে গ্রিকরা ফিরলেন স্বদেশে।

এ মহাকাব্যের পরিকল্পনাতেই নানা জটিলতা। যে হেলেন স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে, তার পুনরুদ্ধারের জন্য অগণ্য গ্রিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস পরস্ত্রীহরণ করেছে সত্য, কিন্তু সেটা হেলেনের সম্মতিক্রমেই, কাজেই ট্রয়ের লোকক্ষয় আরও নিষ্কারণ এবং করুণ। যুদ্ধে এসে বীরের পক্ষে অস্ত্রসংবরণ করা অন্যায়, এটা বীরোচিত আচরণ নয়। তবু আকিলিসেব ক্ষোভের, অভিমানের, হেতুটাও যত তুচ্ছই হোক, সত্য। তাই পদে পদে জটিল হয়ে উঠেছে মূল কাহিনির সূত্রগুলি। সাদাকালো বিভাগ এখানে অচল।

সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের নানা সংঘাত এখানে উপস্থিত এবং কোনওটিরই সরলরৈখিক সমাধান বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া গ্রিকদের মধ্যে নানা জটিল প্রতিযোগিতা, ট্রোজানদেরও ধর্ম-বিপর্যয়ের অবস্থা, বিভিন্ন বীরের যুদ্ধকালে এবং অন্য সময়েও জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে বীরধর্ম, মানবধর্ম সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ মূল্যবোধের ও চেতনার প্রকাশ এ মহাকাব্যটিকে একটি অসামান্য মানবিক গৌরবে মণ্ডিত করেছে।

পরিশেষে মহাভারত। এর কেন্দ্রে যে যুদ্ধ তা যে কবে কোথায় সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তার কোনও নজির মেলেনি। কোনও এক সুদূর অতীতে হয়তো ভারতবর্ষে যে যুদ্ধ ঘটেছিল, কিন্তু সে ভারতবর্ষ সে দিন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমনকী মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত কিনা, তা আজ কিছু পণ্ডিত গবেষকের চর্চার বিষয়; স্থির সিদ্ধান্তে আসবার মতো উপাদান এখনও পাওয়া যায় না, এ সিদ্ধান্তের সময়ও তাই এখনও আসেনি। কোনও সময়ে কোনও এক জায়গায় যে একটি ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফল ছিল সুদূর বিস্তৃত, এ সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ বোধ হয় নেই। এও সত্য যে, যুদ্ধের পরে লোকমুখে বীর-গাথা, যুদ্ধবর্ণনা, বিলাপ, বিজয়বর্ণনা, চরিত্রের বিবরণ, ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হয়তো খ্রিস্টপূর্ব চারশো থেকে খ্রিস্টিয় চারশো সালের মধ্যে— কিছু আগে পরে হতে পারে— এটি মহাকাব্যের রূপ পায়। কোনও মূল সংকলক সম্ভবত পূর্ববর্তী লোকগাথাগুলিকে সংহত একটি রচনায় সন্নিবিষ্ট করে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কাছাকাছি এর মূল 'জয়' রূপটি নির্মাণ করেন। তার পরে নৈতিক, দার্শনিক, সর্বজনিক, সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নানা পুরোহিত, পুরাণকার, শাস্ত্রকাররা— যা তাঁরা তৎকালীন সমাজের পক্ষে হিতকর বা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন— সেই বিভিন্ন অংশগুলিকে তত দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই মহাকাব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তখন এর নাম হল 'ভারত'। এর শেষতম অংশ ভার্গব প্রক্ষেপ হল অভি-পৌরাণিক; আজ যা হিন্দু সমাজ বলে পরিচিত তার মূল শাস্ত্রের উদ্ভব এই অংশে। মূল মহাকাব্যের সঙ্গে এই অংশের কাহিনিগত যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ, প্রায় নেই বললেই চলে। বরং, মূল অংশের প্রতিপাদ্য বহু মূল্যবোধের বিরুদ্ধ মতাদর্শ এ অংশে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত, বহু দুর্বল উপাখ্যানের দ্বারা তার ভাষ্য রচনা করা হয়েছে।

এই আদি মহাকাব্যটিতে কী ছিল যা একে এমন অনন্য মহিমা দিয়েছে? কীসে এর আদি মহাকাব্যত্ব? একটা জাতি যখন তার উপলব্ধি, বেদনা-যন্ত্রণা, তার অভিজ্ঞতার মূল্যবোধের সংঘাত, তার মর্মস্থলে 'গভীরতম ভূমিতে ধর্মসংকটে উদ্বেলিত হয়ে কোনও কাব্যে সে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চায় তখন সে রচনা হয়ে ওঠে সে জাতির গভীরতম সত্তার আত্মপ্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবেই এই আত্মপ্রকাশ বিবৃত হয় একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে। মহাভারতের ক্ষেত্রে কাহিনিটি ঐতিহাসিক হয়ে থাকলেও এর একটি প্রতীকী মূল্য আছে। ধর্মসংকটে যেমন শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্ব, তেমনই দ্বন্দ্ব প্রেয়-প্রেয়স্তরের এবং শ্রেয়-শ্রেয়স্তরের; আবার, তেমনই দ্বন্দ্ব সমাজে স্বীকৃত বর্ণধর্মের অথবা আশ্রমধর্মের কোনও বিশেষ তৎকালীন ধর্মের কিংবা এ সকলকে অতিক্রম করে যে মানবধর্ম তার সঙ্গে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলে

মানুষ সহসা বিপর্যস্ত ও উদ্ভ্রান্ত বোধ করে; যে নীতিবোধের আকল্পে সে আশৈশব শিক্ষিত, সহসা তার বিরোধী নীতি যদি কোনও সংকটের মুহূর্তে গ্রহণের দাবি জানায়, তা হলে একটিকে বর্জন করে অন্যটিকে অবলম্বন করবার জন্যে কোনও সর্বজনস্বীকৃত নীতি যেহেতু নেই, সেখানে তাই মানুষকে নিজের অন্তরাত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মহাভারত তার বহু চরিত্রকে বারে বারেই এই ধরনের ধর্মসংকটের সামনে টেনে এনেছে; ফলে কাব্যটি ধর্ম সংকটের। অতএব এ-কাব্য বাস্তবজীবনে অনুরূপ সংকটে পথপ্রদর্শনের সংকেত দিতে সমর্থ। এইখানে মহাভারতের মহাকাব্য-গরিমা।

এ-কাব্যের কাব্যগুণ অবিসংবাদিত, যদিও ভার্গবপ্রক্ষেপের শেষ দিকে অনেক অংশই এমন সাম্প্রদায়িক পুরোহিতের রচনা যাঁরা কবি নন। ফলে সেই সব অংশে রচনা ক্লিষ্ট; তালিকা, বিবরণ ও ক্লান্তিকর উপদেশাত্মক উপাখ্যানে পূর্ণ। কিন্তু এ সব ছাড়াও মহাভারতে স্বভাবতই কাব্যগুণবর্জিত অন্য বেশ কিছু অংশ আছে; ইতিহাস, ভূগোল, পুরাকাহিনি, উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের বিবরণ, নানা দর্শনপ্রস্থান ও ধর্মানুষ্ঠানের কথা। এগুলি সংযোজিত হয় একটি মহাকাব্য কোনও উত্তুঙ্গ মহিমায় আরোহণ করলে পর। সমাজ তখন সে মহাকাব্যকে ব্যবহার করে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে। কিছু কিছু প্রাথমিক মহাকাব্যেই শুধু এই সব উপাদান আছে, পরবর্তীকালের মহাকাব্যগুলি এ সব পরিহার করে একটি নিটোল কলেবর লাভ করেছে। এর একটা কারণ, ততদিনে ওই সব আগন্তুক বিষয়গুলি স্বতন্ত্র চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, মহাকাব্যে তাদের সংকলন করবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু ওই নিটোল কলেবরের শিল্পোত্তীর্ণ রূপ ও ওই বহু আনুষঙ্গিক বিষয়ের দ্বারা কতকটা ভারাক্রান্ত প্রাথমিক মহাকাব্যের মহিমা অর্জন করতে পারেনি। কেন? প্রাথমিক জীবনজিজ্ঞাসার যে একটা অকুণ্ঠ ও তীব্র আকুতি তা শুধু ওই আদিকমহাকাব্যগুলিতেই বিধৃত। পরবর্তী কাব্যগুলি এই বিষয়ে আদিকাব্যগুলির উত্তরাধিকারী। তাদেরও জীবনজিজ্ঞাসা আছে এবং বিভিন্ন দেশকালের প্রথম মহাকাব্যগুলিতে তার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও মূল্যবোধের সংকট ও ঐকান্তিকতাতেই তাদের মূল্য নিরূপিত হয়। সে মূল্য বহু পরবর্তী কালের মহাকাব্যেই গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে এবং সর্বদেশকালে কাব্যগুলিকে সমাদৃত করেছে।

কিন্তু আদি মহাকাব্যগুলির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, এগুলিই প্রথমবার পৃথিবীতে উচ্চারণ করেছে মানুষের সংশয়, জীবন সম্বন্ধে অতৃপ্তি, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের সঙ্গে সুখ দুঃখের সংগতির অভাবের অভিজ্ঞতায় গভীর হতাশা ও বেদনাদীর্ণ উপলব্ধি: জীবনে কোনও আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান নেই। তবু এই মহাকাব্যগুলি আত্মিক ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে স্থাপন করেছে সেই মানুষকে যে প্রাকৃতিক ও দৈবগত বিপর্যয়ে প্রতিক্ষণে বিপর্যস্ত, যে শেষ পর্যন্ত জীবনে ঐহিক জন্মলাভ করবে না, শুধু মর্মমূলে রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে খুঁজে যাবে জীবনের সেই নিরঞ্জন মহিমা, যা লাভক্ষতি, জয়পরাজয়কে অতিক্রম করে গেছে। মানুষের শেষতম শত্রু মৃত্যু; *গিলগামেশ* থেকেই দেখি মানুষ মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমরত্বের সন্ধান করে চলেছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ও কঠিন মূল্যে। মহাভারতেও বক যুধিষ্ঠিরের

সংলাপে জীবন ও মৃত্যু, শ্রেয় ও প্রেয়, আপাতবিরোধী নীতির দ্বন্দ্ব, ধর্মের দ্বান্দ্বিক সত্তা এই সমস্ত বিষয় আলোচিত। কাছে থেকে এবং দূর থেকে জীবনকে দেখতে দেখতে, বহু কঙ্করাস্তীর্ণ পথ পার হতে হতে এবং পার হয়ে এসেও, সত্য মিথ্যা ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে অভ্যস্ত বিশ্বাস বারবার আঘাতে দীর্ণ হওয়ার পর কী বাকি থাকে যা মানুষের জীবনকে মূল্যবান করে তোলে?

মহাভারত নানা ঘটনা ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এ প্রশ্ন তুলেছে এবং নানা ভাবে এর উত্তর দিয়েছে। স্পষ্ট উক্তিতে, উপাখ্যানে, বিবরণে, রূপকে, সংলাপে জটিল জীবনের আকল্প নির্মাণ করে দু-তিনটি সত্য প্রতিপাদন করেছে: মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, কিছু নেই। এরই অনুকল্প হল, যা কিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত তা সব দর্শন, ধর্ম অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে কোনও ঐকান্তিক সত্যলোকে হিরকের মতো কঠিন ও উজ্জ্বল ভাস্বরতায় বিরাজ করে পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরণে দীপবর্তিকার মতো দীপ্তি বিকীর্ণ করে। মানুষের যে কাজ মানবগোষ্ঠীর পক্ষে হানিকর তা-ই পাপ; যে কাজ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পক্ষে মঙ্গলকর তা-ই পুণ্য। এবং পাপের পথ অর্থ, যশ অর্জনে আপাত ভাবে সমর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত মানবসমাজে ধিকৃত। অপর পক্ষে পুণ্যের, সত্যের পথ সুকঠিন, আমৃত্যু সাধনার পথ, বহু দুঃখযন্ত্রণা এবং পদে পদে বিস্তর ব্যর্থতা, অবসাদ এবং হতাশায় আকীর্ণ এ পথ। যে এ সব সহ্য করে সাহসের সঙ্গে দুঃখবরণ করে বৃহত্তর মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যর্থ, বঞ্চিত ও উপহসিত হলেও শেষ বিচারে সেই অমরতায় উত্তীর্ণ হয়। মহাভারত এ কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলেনি; বললে তা কাব্য হত না। বলেছে কাহিনি, উপাখ্যান, সংলাপ ও নানা আপাতবিরুদ্ধ মূল্যবোধের সংঘাত বারে বারে উপস্থাপিত করে। কোথাও নায়ক হেরেছে সাধনার উপযুক্ত সাহস, ধৈর্য, মূল্যবোধে প্রত্যয় ছিল না বলে, কোথাও বা দুঃসহ মূল্য দিয়ে ঐহিক বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে মনুষ্যত্বকে জয়যুক্ত করেছে। এবং সে জয়কে রেখে গেছে চিরকালের মানুষের আত্মিক উত্তরাধিকার রূপে।

রামের নামে বহু মানুষ ও স্থানের নামে ভারতবর্ষে আছে; তত বেশি নাম— মানুষের ও স্থানের— মহাভারতের নেই। তবু মহাভারত যে ভাবে জীবনের মর্মান্তিক নৈতিক সংকটগুলিকে প্রকাশ্যে এনে চরিত্রগুলির অন্তর-যন্ত্রণা ও তার মধ্যে দিয়ে তাদের নৈতিক উত্তরণ দেখছে, রামায়ণে তেমন সংকট শুধু সীতার জীবনেই দেখিয়েছে এবং এখানে উত্তরণটিও এই অন্যায়কারী অযোধ্যা থেকে জননীর ক্রোড়ে, নিরাপদ ও কাম্য আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে। এক দিক থেকে সীতাই পাঠকের দৃষ্টিতে মহনীয়তর চরিত্র; গ্রন্থটি যার নামে সেই রাম পাঠকের দৃষ্টিতে অনেক নেমে গেলেন।

দাম্পত্যের স্বরূপ

দু'টি কথা

বিবাহ বিষয়টি জটিল ও নানা সমস্যাসংকুল। কোনও সিদ্ধান্তই এখানে চূড়ান্ত বা প্রশ্নাতীত নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিবাহ— ঐক্যদাম্পত্য— বেশ অর্বাচীন একটি ধাপ। তবু এটি নিয়েই আলোচনা এ কারণে যে, এটি নরনারীর যৌন সম্পর্কের বিবর্তনে ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসে সম্ভবত শেষতম ধাপ, যেখানে পৌঁছে নরনারী সমাজস্বীকৃত একটা সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ স্থির আছে। এর কিছু ব্যতিক্রম, যা রক্ষণশীল মানুষের কাছে উন্মার্গগামিতা বা উৎকেন্দ্রিকতা বলে প্রতিভাত হচ্ছে তা নিয়ে গত কয়েক প্রজন্ম ধরে একটা প্রশ্ন তুলেছে— প্রশ্নটা তথাকথিত 'কেন্দ্রে'র যথার্থ ভূমিকা নিয়ে। মানুষের ইতিহাস কোনও একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং সমাজ যুগের প্রয়োজনের অনুকূল বিধান গ্রহণ করে।

বিবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু কিছু সমস্যা, সামাজিক ভাবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থিতি, এ যুগ বিবাহকে কী কী নতুন সমস্যার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে, এ সব থেকে নিষ্ক্রমণের সম্ভাব্য উপায়ই বা কী, এ সব নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ। বলা ভাল, সমস্যাগুলি জীবন্ত মানুষের জীবনের স্তরে স্তরে সংলগ্ন, তাই কোনও চূড়ান্ত সমাধান নির্দেশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু কিছু বিশ্লেষণের দ্বারা সমস্যাগুলিকে স্বরূপে বুঝবার চেষ্টা করেছি; বিশ্লেষণই হয়তো বা কিছু আলোকপাত করবে। সব কটি প্রসঙ্গ যেহেতু বহুকাল ধরে বহুধা-আলোচিত, তাই নতুন আলোকসম্পাতের সম্ভাবনা কম। শুধু বিশ্লেষণেরও কিছু নিজস্ব তাৎপর্য আছে, এই বিশ্বাসেই কাজটিতে হাত দেওয়া।

সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর সম্পর্কে, পরিবারের বিন্যাসেও যে অনিবার্য প্রভাব পড়ে এবং তার ফলে যে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায় তা অনুধাবন করে গবেষণা করলে আজকের সমাজে বিবাহের পরিবর্তিত রূপটি বোঝা সহজ হবে। সেই শ্রমসাধ্য গবেষণা করবার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি ও পরমায়ুগত অবকাশ আমার নেই, তাই এটা লিখতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে, সামাজিক-নৃতত্ত্ববিদ কোনও পণ্ডিত বা পণ্ডিতবর্গ যদি একক অথবা যৌথ ভাবে এ গবেষণায় প্রবৃত্ত হতেন, তা হলে আমাদের সমাজের 'বিবাহ' নামক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্যক ভাবে বোঝা সহজ হত। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এ অনুরোধ জানিয়ে রেখে নিজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে পাঠকের কিছু সহিষ্ণু প্রশ্রয় কামনা করছি।

এই বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে প্রকাশিত লেখাটি 'গাঙচিল' থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সংকলনের জন্য সাধ্যমতো পরিমার্জন করার চেষ্টা করেছি। বিবেচনার ভার পাঠকের।

প্রজনার্থী

বিবাহ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি পুরুষ একটি আধার সঙ্গীর সঙ্গে আমরণ বাস করবে, অন্য কোনও পুরুষ বা নারী তাদের মিলিত জীবনে অনুপ্রবেশ করবে না— এইটিই ছিল প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের পর থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক। অবশ্য একটি পুরুষের একাধিক নারীর সঙ্গে সহবাস প্রথা চালু ছিল, যদিও দ্রৌপদী ছাড়া অন্য কোনও নারী বৈধ ভাবে একাধিক স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে পারেনি। পুরাণের মধ্যে বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে বিবাহের অভিমুখ। এখন ওই দিকেই বোধ হয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা বেশি।

ছিয়াশি বছরের দিদিমা; শিক্ষিতা, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। সদ্য এম এ পাশ করা নাতনি সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করেন তাকে: 'হ্যাঁরে, কাকে বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?'

নাতনি লজ্জায় মিথ্যে বলল, 'না, দিদিমা, এখনও ঠিক করিনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ বলতো?'

'দেখ, ধরে দিলে (অর্থাৎ সম্বন্ধ করা) বিয়ে করবি না।'

'কেন?'

'কেন আবার? যে-শাড়িটা তিন বছর পরে ছিঁড়ে যাবে, সেটা কেনার বেলায় দোকানে নিয়ে গিয়ে তোর পছন্দে কেনা হবে, আর যে-মানুষটাকে জীবনে ফেলতে পারবি না, তার বেলায় পছন্দের কথা কেউ তুলবে না? তোর বিয়ে, তুইই করবি, তোর পছন্দে।' একটু থেমে যোগ করেন:

> দেখ, বিয়ের পর আশীর্বাদ করবার সময়ে বলি, 'সাবিত্রীসমানা ভব', অর্থাৎ স্বামীকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনো। বেমালুম ভুলে যাই যে, ওই সাবিত্রীই কিন্তু বিয়ের আগে প্রকাশ্যে রাজসভায় নারদের সামনে বাবার সঙ্গে প্রবল তর্ক করেছিল, তার পছন্দের মানুষকে সে বিয়ে করবেই। এক বছর পর বিধবা হবে জেনেও তর্ক করেছিল। এবং জিতেছিল। আশীর্বাদ করবার সময়ে সেই সাবিত্রীর সমান হতে বলি কি? নিজের পছন্দের মানুষকে পেয়ে তার প্রাণ ভরে গিয়েছিল, সেই জোরেই না সে যমের সঙ্গে অতক্ষণ লড়াই করেছিল। এবং জিতেছিল। এরা দুই সাবিত্রী নয়রে, একটিই মেয়ে, আশীর্বাদ করতে হলে এই মেয়ের দুটো দিক ভেবেই আশীর্বাদ করতে হবে।

প্রাচীন শাস্ত্রে যে আট রকমের বৈধ অনুলোম বিয়ের কথা বলে তার একটি হল গান্ধর্ব। ওই দিদিমা এই বিয়ের কথা মনে রেখেই কথা বলছিলেন। গান্ধর্ব বিয়েতে গুরুজনের অনুমতি বা সমর্থনের অপেক্ষা না রেখেই পরস্পরের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন অপরকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়ে বলে, তারা এখন থেকে স্বামী-স্ত্রী। এ বিয়ে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত, বৈধ ও সমাজে স্বীকৃত। (প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডে 'কমন ল' ম্যারেজ' ও এই রকমই ছিল। মধ্যযুগের আদিপর্বে আইনে তা স্বীকৃত হয়। মাত্র দু-এক দশক আগে এটি উঠে যায়। এ বিয়েতেও দু-একজনের সামনে দুটি নরনারী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত জীবনযাপনের অঙ্গীকার করত এবং সমাজ সে সম্পর্কটা স্বীকার করত। বেশ কয়েকশো বছর এ পদ্ধতি চালু ছিল।) কিন্তু আজ একবিংশ শতকের দোরগোড়াতে এসেও দুটি মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে মিলিত জীবনযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে অশিক্ষিত বা নিম্নবিত্ত সমাজে শুধু নয়, বহু শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজেও দু-পরিবারে যে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে তাতে বোঝা যায় আমরা শাস্ত্রের দোহাই তখনই পাড়ি, যখন সে শাস্ত্র আমাদের অভীষ্টের অনুকূল; প্রতিকূল হলে বেমালুম চেপে যাই। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সময়ে বিদ্যাসাগর মশাই সমাজের এই দীর্ঘকালীন স্বার্থসর্বস্ব ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর উৎকলিত শাস্ত্রবাক্য তৎকালীন ও পূর্ববর্তী সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই জানতেন; জেনেও চেপে গিয়েছিলেন, সে শাস্ত্র তাঁদের স্বার্থবিরুদ্ধ ছিল বলে। গান্ধর্ব বিবাহ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং/বা প্রতিরোধও ওই একই কারণে।

প্রাচীন শাস্ত্রে বৈধ বিবাহ আট রকমের ছিল: ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ।[১] ব্রাহ্ম বিবাহে সবস্ত্রা সালংকারা কন্যাকে পিতা উপযুক্ত পাত্রে দান করতেন। দৈব বিবাহে যজ্ঞ কর্মে রত পুরোহিতকে যজ্ঞকালেই কন্যাদান করতেন কন্যার পিতা। আর্য বিবাহে কন্যার পিতা বরকে একটি বলদ ও একটি গাভী দান করতেন। প্রজাপত্য বিবাহে কন্যার পিতা বর ও কন্যাকে 'উভয়ে একত্রে ধর্মাচরণ কর'— এই বলে আশীর্বাদ করে কন্যা দান করতেন। আসুর বিবাহে কন্যার পিতাকে অর্থদানে তুষ্ট করে বর কন্যাকে বিবাহ করতে পারত। রাক্ষস বিবাহে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করত বর ও তার বন্ধুরা। পৈশাচ বিবাহে ঘুমন্ত অথবা মদমত্ত কন্যাপক্ষীয়দের মধ্যে থেকে ঘুমন্ত কন্যাকে ধর্ষণ করে দিয়ে যেত বর।

লক্ষ্য করলে দেখি, আসুর বিবাহে কন্যাপণ চলিত ছিল। মনে হয়, অনেক আগে কন্যাপণই প্রচলিত ছিল। বিবাহের এ নামকরণগুলি পরবর্তী কালে খ্রিস্টিয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের। ততদিনে সমাজে কন্যাপণ উঠে গেছে, বরপণ চালু হয়েছে। আর্য বিবাহে কন্যার পিতা নিঃসম্বল জামাতাকে তখনকার কালে সংসার পাততে অত্যাবশ্যক গাভী-বলদ দিতেন; পণ হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংসারযাত্রায় রওনা করিয়ে দেওয়ার জন্য। আসুর বিবাহে কন্যাপণ স্পষ্ট

১. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১:৬) অংশে এগুলির বিবরণ আছে, অন্যান্য গৃহ্যসূত্রেও আছে।

ভাবেই অনুষ্ঠিত হত। অনুমান করা যেতে পারে, এটি অন্যান্য বিবাহের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। সেই কন্যাপণেরই স্মৃতি আর্ষ বিবাহে।[২]

রোমানদের মধ্যেও অর্থ দিয়ে কন্যাকে বিয়ে করার পদ্ধতি চালু ছিল।[৩] পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে নারীর সামাজিক অবনমন ঘটে, তখন কন্যাপণও ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বধূ লাভ করাটা বরের পক্ষে অসম্মানজনক হয়ে ওঠে। তাই সে দিনের কন্যাপণবিশিষ্ট বিবাহের সংজ্ঞা হল আসুর অর্থাৎ আর্যরীতি-বহির্ভূত। এর সমর্থনে বলা যায়, পরবর্তী কালের বহু পুরাণে অনুমাত্র কন্যাপণ গ্রহণ করে যে পিতা, তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে সে 'কন্যাবিক্রয়ী'। মনে হয় 'কন্যাবিক্রয়ী' সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠেছিল। ততদিনে বরপণ চালু হয়েছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রেই পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণকারী পিতাকে, পুত্রবিক্রয়ী বলা হয়নি। যদিও ছেলের বিয়েতে পণ নেওয়া মানেই বাপ ছেলেকে বিক্রি করছে, কারণ 'পণ' কথাটির একটাই মানে— দাম। তাই পণ নিয়ে ছেলের বিয়ে দেওয়ার অর্থই হল মেয়ের বাপের কাছে ছেলেটিকে বেচে দিচ্ছে তার বাবা। কিন্তু ততদিনে সমাজে পুরুষতন্ত্র এত প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, এর অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত অপমান কোনও ছেলের বাপ ভেবেই দেখে না, কারণ পুরুষমাত্রই ততদিনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত; নারী ঊনমানব। বরপণ অতি প্রাচীন যুগে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত থাকলেও মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যেত। যে কোনও কারণেই হোক, ঋষি কক্ষীবান বরপণে ধনী হয়ে ওঠেন: বিয়েতে পান দশটি রথ, বহু নারী ও এক হাজার ষাটটি গাভী। মনে হয় কক্ষীবান গোষ্ঠীপতি হিসাবে বিবাহে দলের কাছ থেকে প্রতীকী রাজস্ব পেয়েছিলেন।[৪] প্রাচীনকালে কোনও গোষ্ঠীপতি যখন গোষ্ঠীর কারও কাছ থেকে কন্যা ও সম্পত্তি পেতেন তখন তার মধ্যে গোষ্ঠী হয়তো প্রচ্ছন্ন ভাবে দলপতিকে রাজস্বই দিত।[৫]

বিয়ের সঙ্গে পণ ছাড়াও নানা রকম ভাবে অর্থ ও ধনরত্ন জড়িত ছিল। মেয়েটিকে তার বাপের বাড়ির আত্মীয়বন্ধুরা ভালবেসে যা উপহার দিত তা 'স্ত্রীধন'। বরবধূ এক সঙ্গে বসে (তাদের তখনকার সংজ্ঞা হল 'যুতক') দু-বাড়ির কাছে যা পেত তা হল 'যৌতক' বা 'যৌতুক'। মেয়ের বাবা যে দামে জামাই কেনে তা হল 'পণ'। শ্বশুরবাড়িতে ভালবেসে লোকে বরবধূকে

২. কন্যাপণের কথা পাই ঋগ্বেদে (১:১০৯:২); অথর্ববেদে (১৪:১৩২:৩৩) এবং পরবর্তীকালে কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রে (২:৪:২) এবং আরও অন্য বহু শাস্ত্রাংশে। গোভিল গৃহ্যসূত্রে পড়ি, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ই উভয়কে স্বর্ণদান করত, তবে বরপক্ষ অনেক বেশি সোনা দিত। (২:৩:৪); কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রে (২:৪:২) কন্যাপণের কথা আছে। এ ছাড়া পরবর্তী সাহিত্যে কন্যাপণের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

৩. Grant and Kitzinger: *Civilization in the Ancient Mediterranean Greece and Rome*, Vol II, p. 613

৪. ঋগ্বেদ (১:১২৬)

৫. 'The acquisition by a chief, a wive and dowries may be a disguised tax levied in support of tribal service and ceremonial' *Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. XI, p 530

যা দেয় তা হল 'সৌদায়িক'। এর মধ্যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীধন হল বধূর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ওপরে শ্বশুরবাড়ির কোনও অধিকার ছিল না; মেয়েটি তার ইচ্ছা মতো স্ত্রীধন খরচ ও দান করতে পারত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের বিষয়ে জানতে পারি যে, সেখানে স্ত্রীধনে সত্যিসত্যিই বধূরই একান্ত কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি থাকত, এবং স্বামীর মৃত্যু হলে বা বিবাহবিচ্ছেদ হলে সে এই সম্পত্তি রাখতে পারত।[৬]

কিন্তু পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে কোনও সম্পত্তির ওপরেই সম্পূর্ণ অধিকার দেবে এটা সম্ভব ছিল না, তাই অন্য শাস্ত্রে দেখি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নানা বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ত্রীধনে হাত দিচ্ছেন। পণ একান্ত ভাবে বর ও বরকর্তার সম্পত্তি। সৌদায়িক এবং যৌতুক বর ও বধূ উভয়েরই। সদ্ভাব থাকলে সম্ভবত প্রয়োজনমতো বা ইচ্ছেমতো দু'জনেই তা ব্যবহার করত, আর তা না থাকলে ওই সম্পত্তি (ধনরত্ন অলংকার, এমনকী সম্পন্ন পরিবারে, জমিও) যে পুরুষটির ও তার পরিবারের কর্তৃত্বে চলে যেত এটা সহজেই বোঝা যায়— এমন উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। এখানে বলে রাখি, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, নারীর সামাজিক অবনমন, শোষণ এ নিয়ে যত কথা বলছি বা বলব, তার সবেরই নিশ্চয়ই বহু ব্যতিক্রম ছিল; সুবুদ্ধিসম্পন্ন সহৃদয় স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও পরিবার চিরকালই ছিল, আছে ও থাকবে। কাজেই যে সব কথা বলছি, তা হল শাস্ত্রের মত, যে কোনও ব্যক্তি বা পরিবার যদি বধূটির ওপর অবিচার, অত্যাচার করতে চাইত তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্র তাদের সপক্ষে থাকত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পর পর্যন্ত যে সব শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, তাতে নারীকে নিজের দেহের বা সম্পত্তির ওপরে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে, শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা নারীর রক্ষাকর্তা, নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়; 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'।

বিবাহ সম্বন্ধে আর্থিক সঙ্গতির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? যে দুটি বিষয়ে পরনির্ভরতা মেয়েদের দাম্পত্যজীবনে বহু অশান্তির সৃষ্টি করে তার মধ্যে একটি হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহিত মেয়ে আর্থিক ভাবে স্বামীর আয়ের ওপরে নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের মনের মিল থাকে, ততক্ষণ এতে অশান্তি আসে না; কিন্তু যখনই কোথাও চিড় ধরে তখনই ওই নির্ভরতার ব্যাপারটা পরিণত হয় নিপীড়নের হেতুতে। বহু পরিবারের পরিণত বয়সের গৃহিণীরও স্বামীর অর্থ ইচ্ছামতো খরচ বা দান করবার অধিকার থাকে না। অন্যটাও অবশ্যই সত্য: বহু পরিবারে স্বতন্ত্র আয় না থাকলেও গৃহিণীই আয়-ব্যয়ের পুরো দায়িত্ব পান। কিন্তু যেখানে আর্থিক ভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল বধূ সহসা আবিষ্কার করে খাওয়া-পরার নির্দিষ্ট বরাদ্দের বাইরে তার কোনও সম্বল নেই, পারিবারিক ধন ভাণ্ডারে তার কোনও কর্তৃত্ব নেই, এমনকী

৬. 'A wife could have her own property which she was entitled to keep if her husband died or the marriage was discovered.' (Law Code of Gortyn II: 45-54), Grant and Kitzinger: *Civilization of the Ancient Mediteranean: Greece and Rome*, Vol. II, p. 592

তার খাওয়াও শ্বশুরবাড়ির হাত-তোলা ব্যবস্থায়, অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় তার খাদ্য, পুষ্টি স্বাদ বা পরিমাণে কম হলেও তার প্রতিবাদ করবার কোনও অধিকার নেই— তখনই তার বিবাহিত জীবন তার কাছে আর্থিক বন্দিত্ব হয়ে দেখা দেয়। এর সমাধানে বিস্তর মেয়ে বাইরে কাজ করে। সেটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী ও তার পরিবারের অনুমতিসাপেক্ষ এবং সব ক্ষেত্রে সে অনুমতি মেলেও না। অনুমতি মিললেও, বধূটি স্বাধীন ভাবে উপার্জন করলেও সে অর্থে তার অধিকার কমই থাকে। এবং বহু উপার্জনশীল বধূরও শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহ চলতেই থাকে। এর একটা কারণ, খুব কম ক্ষেত্রেই মেয়েটি ওই অপমানের পরিসর ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র সংসার পেতে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায় বা পারে। সমাজ ও পরিবার এ দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যায়। তখন বেড়ে ওঠে তিক্ততা, বিবাহ টলে ওঠে, মাঝে মাঝে ভেঙেও যায়। যখন ভাঙে না, তখন বধূটি আর্থিক ভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পরিবারের পোষ্য হিসাবে গ্লানির অন্ন গ্রহণ করে। স্বাধীন উপার্জনে অবশ্যই কতকটা সুরাহা হয়, যদিও এ দেশে কন্যার মন আশৈশব পুরুষের প্রতি যে বশ্যতা-শিক্ষার মধ্যে লালিত হয়, তাতে বহু ক্ষেত্রেই নিজের উপার্জিত অর্থের ওপরেও সে পুরো কর্তৃত্ব পায় না। চাইতে সাহস পায় না, বা চাইলেও প্রত্যাখ্যাত হয়। তবু ওই স্বতন্ত্র উপার্জনের জোরে বেশ কিছু মেয়ে দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পথ খুঁজে পায়। এই সম্ভাবনা রোধ করবার জন্যই নারীকে ধনের কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার শাস্ত্র রচিত হয়েছে আড়াই হাজার বছর ধরে।

দ্বিতীয় যে বিষয়ে শাস্ত্র নারীর কোনও কর্তৃত্ব মানেনি, তা হল, তার নিজের দেহের ওপর অধিকার। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি রচনা বলে অনুমান করা হয়। সেখানে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দাম্পত্য ব্যাপারে স্বামীকে পরামর্শ দিচ্ছেন:

> স্ত্রী যদি স্বামীর কামনা পূরণ করতে অস্বীকার করে তা হলে প্রথম তাকে মধুর বাক্যে বশীভূত করবার চেষ্টা করবে। সেটা নিষ্ফল হলে তাকে 'কিনে নেবে'। (অবক্রীণীয়াৎ— অর্থাৎ আভরণ, ইত্যাদি দেওয়ার লোভ দেখাবে বা দেবে।) তাতেও যদি সে না রাজি হয় তা হলে লাঠি দিয়ে বা হাত দিয়ে মেরে স্ববশে আনবে।[৭]

এ হল ঋষিবাক্য, এর ভিত্তি আরও দুশো বছর আগেকার প্রাচীন সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বচন: ধন বা নিজ দেহের ওপরে নারীর কোনও অধিকার নেই।[৮] এ ধরনের শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য বধূর যৌনজীবনের সব স্বাধীনতা হরণ করা; স্বামীই তার যৌনজীবনের নিয়ন্তা হয়ে থাকবে।

৭. আক্ষরিক অনুবাদ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৬:৪:৭)

৮. মৈত্রায়ণী সংহিতা (৩:৬:১; ৪:৬:৭; ৪:৭:৪; ১০:১০:১১)। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬:৫:৮:২) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (৪:৪:২:১৩), ইত্যাদি

এর দুটি দিক: বিবাহ স্বামীকে স্ত্রীর দেহের ওপর সর্বতোভাবে এমন অধিকার দিয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর দেহকে সম্ভোগ্য সামগ্রীর মতো ইচ্ছা মতো ভোগ করবে; সে বিষয়ে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও দাম থাকবে না। যাজ্ঞবল্ক্য থেকে এই বিধি শাস্ত্রের, সমাজের ও পরিবারের অনুমোদন পেয়ে এসেছে। শ'খানেক বছর আগে ১৮৮৭ সালে রুক্‌মা বাঈ স্বামীর যৌন সম্ভোগের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর যুক্তি, বাল্যে তাঁর মত না নিয়ে যে বিবাহ ঘটেছে তার ভিত্তিতে এখন তাঁর দেহের ওপরে স্বামীর কোনও কর্তৃত্ব তিনি স্বীকার করেন না। ১৮৮৯ সালে দশ বছরের বালিকা বধূ হরিমতির ওপরে বলাৎকার করে তাকে মেরে ফেলে ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক স্বামী হরি মাইতি। এ মৃত্যুর ভিত্তি ঘোরতর শাস্ত্রীয়: বধূর রজোদর্শনের পরেই স্বামীর কর্তব্য গর্ভধান করা। এ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে স্বপক্ষে বিপক্ষে মতভেদ ঘটতে থাকে। সহবাসে নারীর সম্মতি অপেক্ষিত এবং সেই সম্মতিদানের বয়স দশ থেকে বারোয় উন্নীত করবার জন্যে ইংরেজরা একটি আইন প্রবর্তন করতে চায়। বহু আপত্তিজনক রাজনৈতিক অত্যাচারমূলক আইন এর আগে পাশ হয়েছিল। কাগজে মৃদু গুঞ্জন অথবা তীব্র আপত্তিতেই সে-সব প্রতিবাদ অবসিত হয়। কিন্তু সহবাসে সম্মতির প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদে কলকাতার প্রথম বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯১ সালে।

এ পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি কেন? কারণ কাসুন্দিটা সত্যিই পুরনো নয়। এখনও দাম্পত্যে ধর্ষণ, অর্থাৎ বধূর সম্মতির অপেক্ষা না রেখে সম্ভোগ খুবই সাধারণ ঘটনা। শয্যাকক্ষে অসহায় নারীটির আজও কোনও আশ্রয় নেই। বলা বাহুল্য, বহু বিয়েই এই দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে যায়। অথবা সহায়সম্বলহীন বধূটিকে নিরুপায় ভাবে স্বামীর কাছ থেকে অহরহ নিষ্প্রতিকার অত্যাচার সহ্য করে যেতে হয়। অর্থাৎ সমাজের চোখে বিয়েটা ঠিকই আছে, কিন্তু দম্পতির অর্ধাংশের কাছে সে বিয়ে চুরমার হয়ে গেছে। যাজ্ঞবল্ক্য থেকে আজ পর্যন্ত এই অত্যাচার অব্যাহত আছে। নারীর এই অসহায়তার একটা হেতু তার অর্থনৈতিক পরতন্ত্রতা। আর্থিক ভাবে ভরণপোষণের জন্যে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির ওপরে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে নিজের শরীরের ওপরেও নারীর কর্তৃত্ব থাকে না। যে সব বিধি বিধান যৌনতার প্রকাশ, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির সাফল্য নারীটির আর্থিক অবস্থারই প্রতিবিম্বন। সংবিধান, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর অসামঞ্জস্য থাকে; নারীর অধিকার খণ্ডিত হতে পারে সংবিধানবহির্ভূত পক্ষপাতিত্বে।[৯] অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে সার্বিক অধীনতা তাকে মেনে নিতে হয়। আর ওই পরাধীনতার অন্তরাল থেকে বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রশক্তি— প্রাচীনকালে শাস্ত্রের মাধ্যমে, পরে আইনের দ্বারা।

৯. 'The effectiveness of the sanctions regulating sex expression of marriage and divorce is largely a reflection of woman's economic power Law, theory and practice are often widely at variance, woman's right may be neglected by extra-legal discriminations,' *Encyclopaedia of Social Science*, Vol XV, p 443

এখনও এ দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের ব্যাপারে মেয়েটির মত একান্তই গৌণ। সে আদৌ বিয়ে করতে চায় কিনা, কখন করতে চায়, কাকে করতে চায়, তার জন্য যে পাত্র নির্বাচন করা হয়েছে তাকে তার পছন্দ কিনা এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনাই হয় না। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও, মনে রাখতে হবে এখনও এই শ্রেণিটি দেশে সংখ্যালঘু। কাজেই অধিকাংশ মেয়ের যেহেতু বিদ্যা, স্বতন্ত্র বৃত্তি বা আর্থিক স্বনির্ভরতা নেই, তাই তার সামনে বিবাহ ছাড়া যৌবনোত্তর জীবনে আর কোনও পথই খোলা থাকে না: বিবাহ বাধ্যতামূলক হয়েই দেখা দেয়। নতুনত্ব সম্বন্ধে কৌতূহল বাদ দিলে খুব কম মেয়েই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্য জগতে উনিশ শতকে এই রকমই ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৬৯ সালে লেখেন 'যারা মেয়েদের সামনে আর সব দরজা বন্ধ করে তাদের বিয়ে করতে বাধ্য করে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়: তাঁরা যা ভাবেন সেটাই যদি বলেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁদের মতটা হতে হবে— পুরুষ নারীর কাছে বিবাহিত জীবনকে এমন বাঞ্ছনীয় করে তোলে না যাতে মেয়েরা বিবাহের নিজস্ব আকর্ষণেই বিবাহে প্রবৃত্ত হবে।'[১০] বিবাহে নারীর সাগ্রহ, সানন্দ সম্মতি থাকবে শুধু তখনই, যখন সে স্বনির্বাচিত পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে। এখনও দেশের অধিকাংশ নারীই এ সুযোগে বঞ্চিত। কাজেই বিবাহ নারীর জীবনের একটা অবস্থামাত্রই নয়, তার যৌবনোত্তর জীবনের লক্ষ্যও। জীবনের পথ নয়, গন্তব্যস্থল। সেখানে পৌঁছে যেন তার ব্যক্তিগত জীবনের সব দ্বন্দ্বের, শঙ্কার, অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে; এবং গভীর এক অর্থে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তারও অবসান ঘটে। অথচ এ যে কত বড় ভ্রম তা অল্প দিনেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শাস্ত্র নারীকে নিজদেহের ওপর অধিকার দেয়নি এবং সব দেশেই প্রাচীন কালে শাস্ত্রই ছিল সংবিধান। এই শাস্ত্রবিধি বলেছে, নারীর যৌনতার ওপরে পূর্ণ অধিকার তার স্বামীর এবং প্রকারান্তরে তার শ্বশুরবাড়ির এবং তারও ওপরে সমাজের। এক্ষেত্রে, সে গর্ভধারণ করতে চায় কিনা, কখনও ও কতবার চায় সে সম্বন্ধে তার মত প্রায় কখনওই গ্রাহ্য করা হত না এবং এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না। ফলে অবাঞ্ছিত গর্ভভারে ক্লান্ত ক্লিষ্ট জননীর মধ্যে স্বভাবতই একটি তীব্র প্রতিবাদের উষ্মা সঞ্চিত হত এবং হয়। এত দিন পর্যন্ত শাস্ত্র-সংবিধানের প্রতিবাদ করবার কোনও অধিকার নারীর ছিল না, কিন্তু এখন যখন বহু দেশে বিবাহ মানেই একমাত্র স্বামীর ইচ্ছাক্রমে সন্তানধারণ আর বাধ্যতামূলক নয়, বহু নারী এ ব্যাপারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেখানে বহু নারী একটি সন্তানধারণ করতেও অনিচ্ছুক। জনসংখ্যা কমছে, প্রতিকারে তৃতীয় বিশ্বের দুঃস্থ জনক

১০. 'Those who attempt to force women into marriage by closing all other doors against them lay themselves open to a similar retort. If they mean what they say, their opinion must evidently be, that men do not render the married condition so desirable to women as to induce them to accept it for its own recommendations.' *The Subjection of Women*, p 245

জননীর সন্তানকে দত্তক হিসেবে বরং কেউ কেউ গ্রহণ করছেন, কিন্তু নিজেরা মাতৃত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিমুখ, কোনও মতেই সন্তানধারণ করবেন না। সন্তানধারণ, প্রসব, শিশুর প্রাথমিক লালনের পরিশ্রম— এবং বলা বাহুল্য এ সবই সংসারের বিস্তর হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তির সঙ্গে সংযুক্ত। তার ওপর আছে প্রায় সব সংসারেরই নারীর অপুষ্টি, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য ও পুষ্টি। এই স্মৃতি অবশ্যই তাকে বারবার গর্ভধারণে বিমুখ করে তোলে। এখনও স্বামী ও শাশুড়ির গঞ্জনা এবং তাদের ওপর সার্থক নির্ভরতা তাকে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ থেকে অব্যাহতি দেয় না। এ অবস্থা বেশ কিছুকাল চলছে, ফলে কিছু মানুষ আতঙ্কিত; জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে কিছুকালের মধ্যে প্রজাতি বিলোপ ঘটবার আশঙ্কা। কিন্তু মনে হয়, স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সমন্বয়ের (thesis, antithesis, synthesis) যে নিয়মে সংসার আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে, এটি সেই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দশা: প্রতিস্থিতি। মাতৃত্বের নিজস্ব মাধুর্য ও আকর্ষণ আছে, অবশ্যই কিছু নারী প্রলুব্ধ হবে নিজস্ব সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে ও লালন করতে। এর পূর্বশর্ত অবশ্যই হবে এই যে, গর্ভধারণ ও সন্তান-প্রসবের ব্যাপারে তার পরিচর্যা ও আরামের দায়িত্বটা পরিবার ও সমাজ নেবে এবং জাতকের প্রথম পর্যায়ের লালনকালে স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করবে।

আরও একটি কারণে পাশ্চাত্য জগতে মাতৃত্বে এই অনীহা দেখা দিয়েছে। এটা হল নারীর মাতৃত্ব-নিরপেক্ষ যে যৌনতা, তার স্বীকৃতি সে দাম্পত্যে চাইছে। তার যৌনতার স্বতন্ত্র মূল্যেই সে নারী। মাতৃত্ব অবস্থামাত্র, একটি অতিরিক্ত গৌরব। কিন্তু নারীর যৌনতাকে পুরুষ যতটা ভোগ করে, তার পরেও যে সে নারী এবং তার রূপযৌবন ও যৌনতা অন্য পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় থাকে, এ সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সংশয়, ঈর্ষা ও অসহিষ্ণুতাও হয়তো পুরুষকে প্রবৃত্ত করেছে মাতৃত্বকেই নারীর চূড়ান্ত সার্থকতা হিসাবে রূপায়িত করতে। এ ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে যে ভাব ছিল সে সম্বন্ধে শুনি, নারীর এই যৌন ক্ষমতা সম্বন্ধে 'অসুস্থ ভিক্টোরিয়ানরা প্রায়ই এই অনুভূত শক্তিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবে তরলিত করে নারীত্বকে মাতৃত্বের আরও আত্মত্যাগনিষ্ঠ ও সহনীয় পবিত্রতায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল।'[১১]

এ ব্যাপার ভারতবর্ষে আরও বেশি প্রকট। রাধা ও সরস্বতী বাদে দেবী মূর্তিগুলি সবই মাতৃমূর্তি, এ-যেন মাতৃত্ব সম্বন্ধে এই আতিশয্যেরই এক প্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনে নারীর ঊনমানব অবস্থানের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যেমন পূজার ক'দিন মাটির প্রতিমাকে মাতৃসম্বোধন করে রক্তমাংসের নারীর প্রতি সারা বছরের আচরণের পাপক্ষালন ও ক্ষতিপূরণ করা হয়, এ-ও তারই এক প্রকাশ। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রে, পরিবারে সমাজে বরাবর শুনি, নারীর জীবন মাতৃত্বে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; কখনও কেউ বলে না পুরুষ পিতৃত্বে পূর্ণ হয়। মাতৃত্বের বহু

১১. 'Uneasy Victorians often rationalized this felt power by diluting womanhood into the more self-sacrificial and digestible holiness of motherhood.' Anerbach; *Woman and the Demon*, p. 219

দায় আছে, পিতৃত্ব শুধুই আনন্দের; তাই এই অসম দৃষ্টি। মাতৃত্বে নারী অবশ্যই গৌরবান্বিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্বকেও সম্মান করে দুটি অবস্থারই দায়িত্ব এবং অধিকার সমান ভাবে ভাগ করে নেওয়ার একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। কোনও দেবতাই পিতৃত্বের জন্যে মহীয়ান নয়, কিন্তু সর্বদেশে মাতৃদেবী মহীয়সী। ওই মহিমা বর্তায় মর্ত্যনারীতে, এবং নারীকে কেবলমাত্র মাতৃত্বে আবদ্ধ করে রাখলে তার যৌনতা সম্পর্কে আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি পায় পুরুষ সমাজ। তাই বেদ থেকে পুরাণে বারবার নারী সম্বন্ধে কামনা ও আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়েছে, সে যেন অশূন্যোপস্থা হয়, অর্থাৎ তার কোল যেন কখনও খালি না থাকে, ক্রমান্বয়ে সন্তানজন্ম দিয়ে যেন সে তার নারীজন্ম সার্থক করে। এ কথা ঠিক যে, উৎপাদনব্যবস্থা যখন আদিমস্তরে থাকে তখন কৃষক-শ্রমিক-সৈন্যের প্রয়োজনে মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কামনা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কোলে শিশুকন্যা এলেও তো কোল ভরে, এবং 'অশূন্যোপস্থা' হওয়ার আশীর্বাদটা তো ও সম্ভাবনা মনে রেখেই। অবশ্য সমাজ নারীর কাছে পুত্র সন্তানই চায়। শিশুকন্যা অবহেলার বস্তু। কিন্তু যৌবনে পৌঁছনোমাত্রই নারীর পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে এবং অতঃপর সমাজে তার স্থান বধূ ও সম্ভাব্য জননীরূপেই। শুধু নারী বলেই তার যা আকর্ষণ সেটা সমাজের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত ছিল। তাই তাকে হতে হল জননী। (কুমারী সরস্বতী উপাসনার কোনও সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি, কৃষ্ণ ছাড়া শুধু রাধাকে অবলম্বন করেও নয়।) এই নিরবচ্ছিন্ন মাতৃত্বে অভিশপ্ত নারী আজ যদি প্রতিবাদ করে বলে, 'দাম্পত্যে আমি শুধু নারী বলেই মহীয়সী থাকতে চাই, জননী হতে চাইনা'— তা হলে বহু যুগ ধরে গর্ভভারে জর্জরিত নারীর এই প্রতিবাদ বোঝা যায়। এবং এ অবস্থা সার্বিক বা চিরস্থায়ী হবে না, এ হল প্রতিবাদ— প্রতিস্থিতি। এর পরে সংহতি আসবে সমন্বয়ের রূপ ধরে। এ ক্ষেত্রে দাম্পত্য রক্ষা পাচ্ছে দম্পতির মর্যাদাতেই; নিঃসন্তান হলেও নারীর নারীত্ব ক্ষুণ্ণ বা হীন হয় না সেটা প্রতিপন্ন করাই এ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য।

স্ত্রী কখন সন্তানধারণ করতে চায়, কতবার চায় ও আদৌ চায় কিনা এ সম্বন্ধে স্বামী ও সমাজই শেষ সিদ্ধান্ত নেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন— সে শস্যই হোক, শিল্পই হোক, সন্তানই হোক— ঘটবে পুরুষের ইচ্ছায়। এর পেছনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও প্রবর্তনা প্রচ্ছন্ন থাকে। সন্তান উৎপাদনের সফলতার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এবং সমকালীন অর্থনীতির বিধানের কাছে এই উৎপাদনব্যবস্থা সমর্পণ করবার জন্য রাষ্ট্র নারীর নিজদেহের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই নারী নিজদেহের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।[১২] মনু নারীকে 'মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তি' বলেছেন, কিন্তু তার ঠিক আগে এ

১২. 'The state, in order to be in control of the success of reproducing human beings, and in order to submit these means to the interests of the economic system which happens to be in force at the time, has been obliged to extend its control and subjugation to that of her own body. She has, therefore, lost the real ownership of her own body.' *The Hidden Face of the Moon*, p. 63

সব বিশেষণের হেতুটিও উল্লেখ করেছেন: 'প্রজনার্থা'; সন্তানের জন্ম দেয় বলেই সে মহনীয়া পূজনীয়া এবং গৃহের দীপ্তিস্বরূপিণী।[১৩] এই সন্তানজন্মও পুরোপুরি পুরুষের ইচ্ছাধীন। অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের দুঃসহ বোঝা ও গ্লানিতে কত সংসারে যে দাম্পত্য বধূটির কাছে বিষাক্ত হয়ে ওঠে তার ইয়ত্তা নেই। বহু দম্পতির মধ্যে সেই পারস্পরিক সমতার সম্পর্ক নেই যার ফলে দু'জনে একমত হয়ে সন্তানের আগমন আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। এর ফলে পুরো গর্ভধারণের ব্যাপারটাই নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে দৃকপাত না করে। সংসার চলতে থাকে হয়তো, কিন্তু তার দাম্পত্যের ভিতটা যায় টলে। অর্থাৎ দাম্পত্যকে আটকে রাখা হয়েছে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার ওপরে।

১৩. মনু (৯:২৬)

কনকাঞ্জলি

বিবাহ = বি + √বহ্ + ঘঞ্; অর্থ বিশেষ ভাবে বহন করা। বিশেষ ভাবে, অর্থাৎ দেহমনের সব অসুবিধে, সংকটের সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা। বিবাহ একটি বিশেষ দায়িত্ব যা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। বিয়ে বা বিয়েবাড়ি বলতে চোখে ভাসে শানাই, আলো, ভিড়, রান্নার গন্ধ, হৈ-হট্টগোল, অল্পস্বল্প বাদবিতণ্ডা, উচ্চহাস্য, রঙিন শাড়ি, সুদৃশ্য (কখনও কুদৃশ্যও) গয়না, গান, অনবরত লোকজনের আনাগোনা— পুরো আবহাওয়াটাই উৎসবের। কিন্তু তারও আগে একটা উদ্যোগপর্ব আছে, যেটা শুরু হয় ঘটকালি থেকে। পাত্রপাত্রী নির্দিষ্ট হলে বরপক্ষ কনে দেখে, কনেপক্ষ বর দেখে। তার পরে দেনাপাওনার দীর্ঘ সংগ্রাম এবং দু-পক্ষের দরাদরির নিষ্পত্তি হলে তবে বিয়ের প্রস্তুতি। আশীর্বাদ, অধিবাস, গায়েহলুদ, বিয়ে, বৌ-ভাত। এখনও ভারতবর্ষে অধিকাংশ বিয়ের ছকটা মোটামুটি একই রকম। লক্ষ্য করা যায় যে, সমস্ত প্রস্তুতি পর্ব জুড়ে যে দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়াটি চলে তার নিয়ামক দুটি পরিবার; নেপথ্য থেকে চালায় সমাজ, তার নেপথ্যে থাকে রাষ্ট্র। কিন্তু সবচেয়ে গৌণ, সবচেয়ে নেপথ্যবর্তী এবং এক হিসাবে সবচেয়ে উপেক্ষিত হল সেই দুটি মানুষ যাদের বিয়ে হচ্ছে। এখন শহরে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত মেলে যেখানে সম্বন্ধ করে যে বিয়ে সেখানেও বরের পছন্দ অপছন্দের কিছু দাম দেওয়া হয়; তার চেয়ে অনেক কম ক্ষেত্রে কনের পছন্দের ওপরে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ দেশে এখনও বর-কনে বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে হয়; তারাই সবচেয়ে নিষ্ক্রিয়, বিয়ের সময়ের আগে তারা নেহাৎই দুটো প্রতীক হিসেবে থাকে।

বিবাহ একটি দ্বিপাক্ষিক যৌথ কর্ম। ম্যাকফারলেন যেমন বলেছেন, 'বিবাহ একটা দলগত খেলা এবং দম্পতিটিকে, বিশেষত বধূটিকে বিবাহের দিন পর্যন্ত সব হাঙ্গামার বাইরে রক্ষা করা হয়।'[১] এই রকম বিয়েতে বরকনের ইচ্ছে রুচি,. সম্মতি আপত্তি সম্বন্ধে পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের একটা ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য থাকে। বলা বাহুল্য, প্রথম বিবাহে বর-কনে অনভিজ্ঞ হবেই, কেবলমাত্র বারবার বিয়ে করলে তবেই তারা বিয়ে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে পারে!

---

১. 'Marriage is a team game, and the couple, esp, the girl is kept out of harm's way until the actual wedding day.' *Marriage and love in England* p 293

দু-পক্ষের অভিভাবক গুরুজনেরা ভাবেন ও বলেন বরকনে তো নেহাৎ অর্বাচীন, অনভিজ্ঞ, একটা আমরণ চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে-বিয়ে, সে সম্বন্ধে ওরা কী বোঝে? তার মধ্যে কত ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে, নিছক যৌবনসুলভ আবেগেই নারীপুরুষের মিলনের প্রবর্তনা এটা নয়, এ ভাবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো স্থৈর্য তাদের থাকে না। অতএব প্রবীণ, বিবাহিত, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ গুরুজনরাই কেবল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এ সব তত্ত্বকথার পেছনে কখনও কখনও সদিচ্ছা অবশ্যই থাকে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে থাকে 'আমার পাঁঠা আমি ল্যাজে কাটব' এই মনোভাব। আরও থাকে ব্যবসায়িক মনোভাব— এখনও অধিকাংশ অভিভাবকরা পণযৌতুক নিয়ে দরাদরি— প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে— রীতিমতো উপভোগ করেন। অতএব ছেলেমেয়ে মানুষ করার পূর্ণ মূল্য শোধ করে নেন তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করে। অবশ্য যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বধূটি শ্বশুরবাড়িতেই বাস করতে আসে, তাই সম্ভাব্য নতুন পারিবারিক সদস্যকে যাচাই করে নেওয়ার মধ্যে তাদের একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থও থাকে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি আছে। কিছু কিছু বৈদিক অনুষ্ঠান রয়ে গেছে— বৈদিক যুগের শেষাংশের, সঙ্গে কিছু বৈদিক মন্ত্রও। কিন্তু তার সঙ্গে এসে জুড়েছে বিস্তর লৌকিক অনুষ্ঠান। শুধু স্ত্রী-আচারে নয়, বিয়ের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেও এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। যুগে যুগে বিকশিত হয়ে পরিবর্ধিত আকারে এখন যা দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে আছে বরকে আসনে বসিয়ে সবস্ত্রা সালংকারা কন্যা দান করা। হোম করা হয়, আবার বহু পরবর্তী যুগের সংযোজন শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক হয়ে সাক্ষী থাকে— অগ্নির মতো। বৈদিক যুগের মতো পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন হয়। যোক্তবন্ধন অর্থাৎ বরকনের কাপড়ের শেষ প্রান্তে গিঁট বাঁধা হয়। মালাবদল অর্বাচীন কালের সংযোজন। পুরনো কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত আকারে রয়ে গেছে, যেমন অশ্মারোহণ। এটি বৈদিক; বর একখণ্ড পাথর বধূর সামনে রাখলে সে তার ওপরে দাঁড়ায়, তখন বর বলে, ওই পাথরের মতো স্থির হয়ো।[২] তেমনই বহু প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে ধ্রুবনক্ষত্র ও অরুন্ধতী দর্শনের স্মৃতিমাত্রই অবশিষ্ট আছে; সত্যিকার নক্ষত্র দুটিকে এখন বেশি কেউ চেনেও না, দেখেও না। কিন্তু মন্ত্রটি জরুরি। বর সেটি বলে: আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুবা, এই জগৎ ধ্রুব, ধ্রুব এই পর্বতরা, এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুবা।[৩] লক্ষণীয়, ধ্রুবত্ব, স্থিরত্ব শুধু বধূটির কাছেই অপেক্ষিত। সে-ই প্রতিজ্ঞা করবে আমি পতিকুলে ধ্রুবা হব, অরুন্ধতীর দ্বারা আমি অবরুদ্ধ। অর্থাৎ প্রাচীন পতিব্রতা ঋষিপত্নী আমাকে পতিকুলে স্থির থাকবার জন্যে অবরুদ্ধ করেছেন। পাণিগ্রহণের পরে বধূর শুদ্ধির জন্যে বর কিছু মন্ত্র পড়ত— ছ'টি আহুতি দিত বিনা মন্ত্রে এবং বলে যেত, 'এই নারীর চোখের পাতার চুল, মাথার চুল, চরিত্র, কথা, হাসি, দেহ ও বস্ত্রের রন্ধ্র থেকে

২. এহি অশ্মানমতিষ্ঠ অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। কৈশিকসূত্র (১০:৭৭)
৩. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১:৭.২২)

নিঃসৃত রশ্মিকণা (আরোক), দন্ত, হস্ত, পদ, উরু, উপস্থ, জঙ্ঘাসন্ধিতে, তার সর্বাঙ্গে যা কিছু ঘোর ও অশুচি আছে, তা শুদ্ধ হোক।'

প্রশ্ন আসে, পুরুষ কি স্বতই শুচি, আর যত অশুচিতা তা শুধু নারীর দেহে মনে আচরণে? তা শোধন করার দায় বা অধিকার কোথা থেকে পায় পুরুষ? আসলে তার চাই একটা শুচি কুমারী কন্যা এবং সম্ভাব্য অশুচিতার প্রতিকার স্পর্ধা শাস্ত্রই পুরুষকে জুগিয়েছে। পুরুষের অশুচিতার সম্ভাবনা পর্যন্ত শাস্ত্রে স্বীকৃত নয়। এই বৈষম্যের ভিত্তিতেই শাস্ত্রে নিষ্পন্ন হয় বিবাহ, এবং অনুষ্ঠানের পদে পদে এই বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। কন্যার পিতা ভাবী জামাতাকে আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করে বলেন 'আপনাকে অর্চনা করছি' (অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্) এবং জামাতা অনুমতি দেয় 'হ্যাঁ, অর্চনা করুন' (ওম্ অর্চয়)। সম্প্রদানের মধ্যেও কন্যা ব্যক্তি থেকে বস্তু হয়ে ওঠে: সে বস্তুর তৎকালীন মালিক পিতা ভাবী মালিক জামাতার কাছে কন্যারূপ বস্তুটিকে দান করেন— সবস্ত্রা, সালংকারা, এবং পণযৌতুক সহ। এর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে বধূটির সামাজিক সত্তার অবমাননা, তাকে বস্তু রূপে হস্তান্তরিত করা।

বিয়ের প্রায় প্রতি পর্বে এই ধরনের অবমাননা অন্তর্নিহিত ছিল। একটি মাত্র মন্ত্রে কন্যার দীর্ঘ আয়ু কামনা করে বলা হয়েছে, তুমি সম্পদ ধারণ কোরো। বলা বাহুল্য, এ সম্পদ তার পতিকূলেরই, কোনও সম্পত্তিতে কন্যার তো স্বতন্ত্র কোনও অধিকার ছিল না। একটি অনুষ্ঠানে কন্যা মাদুরে পা রাখবে, তখন উচ্চারিত হবে 'পতি দেবতা' এবং 'পতিযান কামনীয়' অর্থাৎ কন্যা কামনা করছে যে, সে পতিলোকে যেতে পারে। যেটা লক্ষণীয়, তা হল শাস্ত্রে অন্য দুটি যান আছে 'দেবযান' ও 'পিতৃযান', অর্থাৎ দেবলোক থেকে মোক্ষ ও পিতৃলোক থেকে পুনর্জন্মের পথ। দেবতা ও পিতৃগণের মতো উচ্চ আসন সৃষ্টি হল পতির, এবং পত্নীর কামনা হল, সে যেন পতিলোকে ঠাঁই পায়। লাজহোম (আগুনে খই দিয়ে হোম) অনুষ্ঠানে পতির দীর্ঘায়ু, শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে বধূ বলে, তার শ্বশুরবাড়ির সকলের যেন শ্রীবৃদ্ধি হয় (দীর্ঘায়ুবস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম)। সপ্তপদীগমনের মন্ত্রগুলিতে উভয়ের মিলিত জীবনের শ্রীবৃদ্ধির কামনা আছে। পাণিগ্রহণের মন্ত্রে বর বধূকে বলে: 'আমার ব্রতে তুমি তোমার হৃদয় ধারণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক। বৃহস্পতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন।'[৪] লক্ষণীয়, বধূটিরও যে চিত্ত আছে, আগামী বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যে তারও কিছু স্বপ্ন, কিছু কামনা থাকতে পারে সে বিষয়ে শাস্ত্র ও সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন। এক সময় বর বধূ সম্বন্ধে প্রার্থনা করে, এর যে পতিঘাতিকা তনু তাকে ধ্বংস কর, 'এর যে পুত্রহীনা তনু, পশুহীনা তনু তা দূর হোক— যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যা অপজহি, যাস্যা অপুত্র্যা তনূঃ যাস্যা অপশব্যা তনস্তামস্যাঃ অপহতা।'

৪. মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্ত।.. বৃহস্পতিস্ত্বা নিয়ুনক্তু মহ্যম। মানব গৃহ্যসূত্র (১:১০:১৩)

এই অনুষ্ঠান ও মন্ত্রগুলির মধ্যে নারীর, বিশেষত বধূর সম্বন্ধে যে মনোভাব বিবৃত আছে তা হল: প্রথমত প্রকৃতির সৃষ্টি যে নারী, যে স্বভাবত অশুচি, অকল্যাণী, পুরুষপরতন্ত্র, হীন এবং কতকটা যেন ঊনমানব। বিয়ের অনুষ্ঠানের ও মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তার শুচিতা সম্পাদন করে বর তাকে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নইলে সে সংসার ও সমাজে অকল্যাণ আনবে; স্বামীকে হত্যা করবে, পুত্রদের হারাবে ও পশুর বিনাশের কারণ হবে। দ্বিতীয়ত, তার স্বতন্ত্র চিত্ত বলে কিছুই নেই বা থাকলেও না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তার স্বতন্ত্র চিত্তের অবনমন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ স্বামীর চিত্তের অনুগামী, স্বামীর ব্রতের অনুব্রতা হওয়াই তার চূড়ান্ত কর্তব্য। তৃতীয়ত, স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির কল্যাণসাধনে সে আত্মনিয়োগ করবে। এতে দোষের কিছু থাকত না, যদি তার আপন বাপের বাড়ির প্রতি কোনও কর্তব্য করবার কোনও সুযোগ বা অধিকার তাকে দেওয়া হত, অথবা তার স্বামীও তার শ্বশুরবাড়ি, অর্থাৎ বধূটির বাপের বাড়ির সম্বন্ধে কোনও কর্তব্য সাধনের কোনও দায়িত্ব বোধ করত। বিবাহ অনুষ্ঠানে বধূর গোত্রান্তর এমনই আমূল এবং সর্বাত্মক, এমনই আত্যন্তিক যে তার পূর্বসত্তার প্রায় পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে তাকে— শুধু তাকেই— তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একাত্ম হতে হত। চতুর্থত, স্বামীর জীবনে সে ধ্রুবা হবে। যেমন ধ্রুবা অরুন্ধতী: পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে, বধূ প্রতিজ্ঞা করবে স্বামীর জীবনে এবং শ্বশুরকুলে সে থাকবে পাথরের মতো স্থির অটল। লক্ষ্যণীয়, অনুরূপ কোনও প্রত্যাশা বরের সম্বন্ধে কোনও অনুষ্ঠানেই উচ্চারিত হয়নি।[৫]

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিবাহের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক অবস্থানে নারীর এই রূপটিই স্বীকৃত: সে পুরুষের তুলনায় হীন, আর্থিক সামাজিক, ভরণপোষণ ও সুরক্ষার জন্যে স্বামী তথা শ্বশুরবাড়ির ওপরে একান্ত নির্ভরশীল ও আশ্রিত; কাজেই সে হবে স্বামীর ছায়ানুগামিনী। সব সমাজই আগাগোড়া এ ব্যবস্থা করেছিল যাতে সে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির মুখাপেক্ষিণী থাকে। এবং সমাজ এই আয়োজিত নির্ভরশীলতাকে ব্যবহার করেছিল তাকে অধীন রাখবার জন্য। আউরবাখের মতে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ভূমিকার মধ্যেই নারীদের জীবনযাপন করতে প্রণোদিত করা হয়।[৬] মিলের চোখে নারীকে সর্বত্র চিরকাল বোঝানো হয়েছে যে, যেহেতু প্রকৃতিই তাকে দুর্বল ও পরাধীন করে নির্মাণ করেছে অতএব স্বাধীন, স্বনির্ভর ভাবে বাঁচবার তার কোনও পথ নেই, অতএব বিবাহই তার একমাত্র গন্তব্য।[৭] নারীর হীনত্ব প্রতিপাদনে দৃঢ়পরিকর মনু বলেন, সর্বগুণহীন পুরুষও

৫. এ পর্যন্ত বিয়ের যে মন্ত্র ও অনুষ্ঠানগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হল সেগুলি দশকর্মের জন্য নির্দিষ্ট বাঙালির, ধর্মজীবনে সুপ্রচলিত 'পুরোহিতদর্পণ' গ্রন্থ থেকে উৎকলিত। ঈষৎ পরিবর্তিত ক্রম ও আকারে এগুলিই ভারতীয় হিন্দু বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে ও অনুষ্ঠানে আচরিত হয়।

৬. 'Women were exhorted to live in and through patriarchial family roles' *Women and the Demon*, p 61

৭. 'Marriage being the destination approved by society for women, and prospect they are borught up to...' *The subjection of women* p. 246

সর্বগুণযুক্তা নারীর পূজ্যা। (৫:১৫৪) ওই উক্তি সম্ভব হল একটি উপপাদ্য মেনে নিয়েই: পুরুষ বলেই পুরুষের উৎকর্ষ, নারী বলেই ব্যক্তিগত গুণ, যোগ্যতা বিচারের কোনও মানদণ্ড এখানে স্বীকৃত নয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পুরুষের উৎকর্ষ, নারীর ও পুরুষের মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের মতো দৃঢ়প্রোথিত। অথচ কয়েক দশক ধরে নারীর স্বাধিকারবোধে প্রণোদিত যে আন্দোলন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু তার মধ্যেই নারীর স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি।

নারীর এই হীনতার বোধ যেহেতু সমাজে বহুকাল ধরে পরিব্যাপ্ত সেই জন্যেই বিবাহের অনুষ্ঠানে ও মন্ত্রে এর প্রতিফলন। অতএব দুটি অসম মানুষের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়: উৎকর্ষ পুরুষের, ন্যূনতা নারীর। দাম্পত্যেও এর দীর্ঘ ছায়া পড়ে। লোকাচারেও এরই প্রতিবিম্ব। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে বর ও তার মায়ের মধ্যে একটি সংলাপ প্রচলিত। বরসাজে সজ্জিত, যাত্রায় উদ্যত ছেলেকে মায়ের প্রশ্ন: 'কোথায় যাচ্ছ বাবা?' বর: 'মা,তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।' তিনবার এই নাট্যাংশ অভিনীত হয়। শুধু যে বর, তার মা ও বাড়ির লোকেরা এটা বিশ্বাস করে তা-ই নয়, বধূ ও তার বাড়ির লোকেরাও এটা বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বধূটি যে শ্বশুরবাড়ির দাসী এ বিশ্বাস বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি দৃঢ়ভিত্তি। আগেই বলেছি, অন্নবস্ত্রের জন্য বধূ স্বামীর ওপরে নির্ভরশীল তাই দাসী-ভৃত্যের মতোই সে ভরণীয়া ভার্যা, তাকে খাওয়াতে হবে।[৮]

বধূটির কন্যা অবস্থায় এই অন্নঋণ ছিল পিতার কাছে, ঋণী ব্যক্তি বন্ধক রাখা বস্তুর মতোই স্বাধীন নয়; তাকে দান করা যায় না। তাই বিয়ের আগে বাপের সঙ্গে মেয়েকে কনকাঞ্জলি নামে একটি নির্মম নাট্যাংশ অভিনয় করতে হয়। একমুঠো ধুলো বাপের হাতে দিয়ে মেয়ে বলে: 'সোনামুঠি নিয়েছিলাম, ধুলোমুঠি দিয়ে শোধ করলাম।' এ অনুষ্ঠান রূপকাশ্রিত, কারণ পিতার কাছে কন্যা ঋণমুক্ত না হলে তাকে সম্প্রদান করা যাবে না, তাই পিতৃকুলের ঋণ সে প্রতীকী ভাবে শোধ করে এমন মর্মান্তিক উচ্চারণে। এর মধ্যে নিহিত থাকে পিতৃকুল সম্বন্ধে তার সব দায়িত্বের অস্বীকৃতি। তিনদিন অশৌচ মেনে, চতুর্থীশ্রাদ্ধ করেই পাত্রান্তরিত বধূটি মৃত পিতা বা মাতার সম্বন্ধে সব কর্তব্য সমাধা করে।

শ্বশুরবাড়িতে বধূবরণের সময়ে আঁকা লক্ষ্মী-পদচিহ্নে পা দিয়ে হেঁটে সে ঢোকে, দুধ উথলে পড়া দেখে, দুধে আলতায় দাঁড়িয়ে জ্যান্ত মাছ ধরে এবং সেখানকার প্রশ্নের উত্তরে সে বলে শ্রীবৃদ্ধি উথলে পড়া দেখছে, কারণ এই তার দায়িত্ব— শ্বশুরবাড়ির সম্পদ বাড়িয়ে তোলা। বৌভাতের দিনে সে রেঁধে পরিবেশন করে শ্বশুরবাড়ির লোকদের ও অতিথিদের— অন্তত এইটিই যথার্থ পাকস্পর্শের তাৎপর্য। সে দিন স্বামী তাকে এক থালা ভাত ও একখানা

---

৮. মধ্যযুগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে স্ত্রী স্বামীকে 'লর্ড' বলে সম্বোধন করত, এবং ভৃত্যও প্রভুকে ওই সম্বোধনই করত। এই 'লর্ড' শব্দটির বুৎপত্তি হল, half-ward, half অর্থাৎ loaf বা রুটির জন্যে যে নির্ভরশীল। স্ত্রী এবং ভৃত্য ও ব্যাপারে একই পর্যায়ে পড়ে। সংস্কৃতেও 'ভৃত্য' শব্দ নিষ্পন্ন 'ভৃ' ধাতুর উত্তরে 'ক্যপ্' প্রত্যয় দিয়ে, 'ভার্যা হয় ভৃ ধাতুতে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় দিয়ে। অর্থ একই, ভরণীয়।

কাপড় দিয়ে তার সারা জীবনের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের দায়িত্ব নেয়। বধূটির পোষ্যতাই তার বশ্যতাকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। তার অন্নসংস্থান করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি, তাই পুরুষ, এ ক্ষেত্রে স্বামী, প্রাধান্য পায় দম্পতির অবস্থানে। ব্যুভেয়ার-এর কথায় যতক্ষণ স্বামী দম্পতির আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে ততক্ষণ তাদের মধ্যেকার এই (সাম্য) একটি অলীক ভ্রম মাত্র।[৯] উপার্জনক্ষম, বা বিত্তবান পরিবারের সন্তান যে স্বামী, সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, যা বধূটি সেই অর্থে কখনওই হতে পারে না। পণ, যৌতুক, সৌদায়িক, স্ত্রীধন থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন ভরণপোষণের ব্যাপারে যেহেতু বধূটি স্বামী-শ্বশুরের মুখাপেক্ষী, তাই সে কখনওই স্বামীর মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বনির্ভর ব্যক্তি হতে পারে না।[১০] সামাজিক ভাবে পুরুষ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ব্যক্তি।

অনুষ্ঠান সব সময়েই প্রতীকী। বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রতীকগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, বধূটি ভরণপোষণের পরিবর্তে স্বামী, শ্বশুর ও তাদের আত্মীয়পরিজনের পরিচর্যায় একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করবে— এইটেই অপেক্ষিত। কিন্তু কর্তব্য সবটাই একতরফা, নারীর কর্তব্যেই অবসিত এবং অধিকারও একতরফা পুরুষের। এইখানেই বৈষম্যের ভিত্তি, অশান্তির বীজ। বহু বিবাহে সংঘর্ষ আসে যখন বধূটি তার বাপের বাড়ির জন্য কিছু করতে চায়। ওই যে শাস্ত্রে আছে বিবাহিত নারীর সমস্ত উপার্জনে তার স্বামীর অধিকার, এটাও লোকের মনে এত গভীর ভাবে প্রোথিত যে, আজ বাইরে কাজ করে উপার্জন করে যে মেয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বাপের বাড়িতে সাহায্য করতে পারে না; যদি বা করে, স্বামীর অনুমতি নিয়ে এবং কতকটা কুণ্ঠার সঙ্গে। আশার কথা, ব্যতিক্রম বাড়ছে এবং কিছু কিছু সদাশয় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। আড়াই হাজার বছরের শাস্ত্র এবং বহু প্রাচীন লোকাচার মিলে যে অধিসংগঠনটি বিবাহকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছে তা নেহাৎই একপেশে। তাই তা আজ এমন ভাবে টলে উঠেছে, কারণ মানুষের চেতনায় দীর্ঘকাল ধরে এই বৈষম্যে অস্বস্তি জন্মেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, বহু সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ ও পরিবার চিরকালই সমাজে ছিল ও আছে এবং তারা এই বৈষম্যে পীড়া বোধ করেছে। শাস্ত্র যে বহু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, লোকাচারে যে বহু অনাচার নিহিত আছে সে বিষয়ে চেতনা ধীরে ধীরে বেড়েছে। ইদানিং বেশ কিছু পরিবারে দাম্পত্যকলহের হেতু শাশুড়ি সম্পর্কে বধূর সম্পূর্ণ উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, কখনও কখনও ব্যবহারে অহেতুক রূঢ়তা, নির্মমতাও। বহু ক্ষেত্রে শাশুড়ি বধূটিকে উৎপীড়ন করেন এটা যেমন বহুকাল ধরেই সত্য, তেমনই বেশ কিছু পরিবারে, শ্বশুর শাশুড়িও উৎপীড়িত এও সত্য। বেশ কিছু শ্বশুর-শাশুড়ি সহায়সম্বলহীন পুত্রের পরিবারে আশ্রিত— এ ক্ষেত্রে হয়তো আর কতকটা মানবিক বোধ

৯. '. as long as the man retains economic responsibility for the couple, this (equality) is only an illusion ' *The Second Sex* p. 498

১০. A man is socially an independent and complete individual, *ibid*, p 447

নিয়ে সমাধান খুঁজলে ভাল হত। তেমনই দাম্পত্যে যদিও বহু সহস্রাব্দ ধরে বধূটি উনমানবের স্থানে থেকে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তেমনই এখন বেশ কিছু সংসারে, স্ত্রীর প্রবল দাপটে স্বামী পীড়িত। বলাই বাহুল্য, দাম্পত্যের মূল রস— প্রেম— শুকিয়ে গেছে। তাই এক পক্ষের পুরুষ অহমিকা অবিচার ও অত্যাচারে পরিতৃপ্তি খুঁজছে। এও বহু সহস্রাব্দব্যাপী শাশুড়ির বধূ নির্যাতনের প্রতিবাদ— ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রতিস্থিতি। কিছুকাল হয়তো চলবে, পরে ইতিহাসের নিয়মেই সংহতি আসবে, যখন বধূ বা শাশুড়ি কেউই কাউকে নির্যাতন করবে না; একত্রে বাস করতে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি সূত্র নিজেরাই আবিষ্কার করবে। যেখানেই যে পক্ষই যার ওপরেই অত্যাচার করুক না কেন, সেটা অমানবিক এবং তা বন্ধ করা প্রয়োজন। দাম্পত্য দুটি পরিবার ও দুটি ব্যক্তির সম্পর্কে জড়িত বলে এর নানা জটিল অনুষঙ্গ আছে, অতএব নীতিনিষ্ঠ মমতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হলে এ ধরনের জটিলতার গ্রন্থিমোচন সম্ভব।

ক্রীতদাসী

বিবাহ মানে এখন আমরা বুঝি ঐক্যদাম্পত্য (monogamy)— এক স্বামী, এক স্ত্রী। কিন্তু বহুপতিকতা আঞ্চলিক ভাবে এখনও আছে, প্রাচীন কালেও ছিল। আর বহুপত্নীকতা তো সে দিন অবধি বেশ জমাট ভাবেই ছিল, আইন করে বন্ধ করা হল। প্রাচীনকালে বিত্তবান ব্যক্তির বিজ্ঞাপন ছিল পশুসম্পদ আর পত্নীসংখ্যা। শাস্ত্রে যখন বলে, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যার পশুর সংখ্যা তার স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি।[১] তখন সহজেই বোঝা যায় স্ত্রীর সংখ্যা কত ছিল। সাম্প্রদায়িকতার ঝাঁঝে আজ বলা হয়ে থাকে মুসলমানের দুর্নীতির একটা প্রমাণ হল, সে চারটে বিয়ে করতে পারবে, যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি, খুব কম মুসলমানই চারটি স্ত্রীর স্বামী। এই সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট উক্তি শুনলে প্রথমেই মনে হয়, কুলীন ব্রাহ্মণের তো চার স্ত্রীতে কুলোতই না। বাঁধানো খাতা তল্পিবাহকের হাতে দিয়ে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর বাড়িতে একরাত্রির অতিথি হয়ে শ্বশুরবাড়ির আতিথ্য, স্ত্রী-সম্ভোগ এবং যথাসম্ভব দক্ষিণা আদায় করে পরবর্তী স্ত্রীর ঠিকানা খুঁজে সেখানে হাজির হওয়া— এই ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের জীবিকা। আইনের বলে এবং আর্থিক কারণে ঐক্যদাম্পত্যই এখন সমাজে বিবাহের একমাত্র রূপ।

গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে এল 'কুল' অর্থাৎ বৃহৎ যৌথ পরিবার, যেখানে একটি বিস্তৃত গৃহে বেশ কয়েক পুরুষ একত্র বাস করত, মনে হয় তখনই ঐকবিবাহ প্রবর্তিত হয়। তার বহু আগে বহু পুরুষ ও নারী একত্র বাস করত, দাম্পত্য ছিল ক্ষণস্থায়ী; সকল পুরুষেরই অধিকার ছিল কৌমের সকল নারীতে। পিতৃপরিচয় নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না; এমনকী প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে যৌনমিলনের সঙ্গে সন্তান-জন্মের বৈজ্ঞানিক সম্পর্কটাই জানা ছিল না। এরই একটা রেশ থেকে গেছে মাতৃধারায় প্রবাহিত পরিবারের গঠনতন্ত্রে, যেখানে সন্তান মাতৃপরিচয়ে অভিহিত হত। যেমন মহাভারতের যুগেও দেখি কৌন্তেয়, মাদ্রেয়, গাঙ্গেয়, রাধেয়, ইত্যাদির মধ্যে। মানুষ যখন সন্তান-উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণটা জানত না তখন যেটা চোখে দেখতে পেত সেটা হল মায়ের গর্ভ থেকেই সন্তান আসে। কাজেই পিতৃপরিচয় তখন

১. সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংসো ভার্যা আসন ভূয়াংসঃ পশবঃ। শতপথব্রাহ্মণ (২:৩:২:৮)

ছিল অনুমানসাপেক্ষ, মাতৃপরিচয় একেবারেই স্পষ্ট, তাই মাতার পরিচয়ে পুত্রের অভিহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তার অনেক পরে, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কৃষিবাণিজ্যজাত সম্পত্তি সঞ্চিত হতে লাগল। তখন সম্পত্তিমান পিতার পরিচয়ে পুত্রের পক্ষে অন্য একটি তাৎপর্য বহন করতে শুরু করল।

ঐতিহাসিক ভাবে আদিম সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ছিল যৌথ: একটি প্রজন্মের সব নারী ও পুরুষেরই অধিকার ছিল সেই প্রজন্মের সব নারীর ও পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পৃক্ত হওয়ার। পরের ধাপে বাদ যায় ভাই বোনের যৌন মিলন।[২] তার পরে, অনেক পরে এল ঐক্যদাম্পত্য; অন্য স্তরগুলির মতো এই স্তরেও সম্পর্কের নির্ণায়ক ছিল অর্থনীতি। সাধারণ যৌথ গোষ্ঠী কৌমের সমবেত পশুধনে গোষ্ঠী এবং/বা কৌমের সাধারণ অধিকারের স্তরে এক প্রজন্মের নারী পুরুষের সাধারণ সম্পর্কে ছিল। পরে ভ্রাতা ভগিনীর যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়। তার পরে যখন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল, তখন ধীরে ধীরে 'কুল' ভেঙে ঐক্যদাম্পত্য দেখা দেয় এক স্বামী ও এক বা বহু স্ত্রীর সংসার। এর পেছনে ক্রীতদাস বা দাসদের ভূমিকাও সক্রিয়। শ্রমসাধ্য কাজের ভার নারীর বদলে এসে পড়ল দাসের ওপরে। এতে নারী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সরে এসে পরিবারে ক্রীতদাসীর ভূমিকা নিতে বাধ্য হল। মিল বলেন, 'কোনও ক্রীতদাসই ততদূর পর্যন্ত এবং সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক সেই ভাবে ক্রীতদাস নয় যেমনটা স্ত্রী।'[৩] অন্যত্রও এমন কথা পাই; একশো বছরেরও বেশি আগে এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'সমবেত উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিতাড়িত হয়ে স্ত্রী প্রথমে গৃহদাসীতে পরিণত হল। গার্হস্থ্য দ্বারা প্রকাশ্যে বা ছদ্ম ভাবে নারীকে দাসীতে পরিণত করার ওপরেই বর্তমান ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত।'[৪]

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের পরে সমাজে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে লাগল তার মধ্যে একটা হল এই যে, সম্পত্তিমানের নতুন একটা শিরঃপীড়া দেখা দিল; তার সঞ্চিত সম্পত্তি সে তার বৈধ উত্তরাধিকারীর জন্যে রেখে যাবে। বৈধ মানে ঔরস পুত্র। অবস্থার বিপাকে অন্য নানা রকম পুত্রও সম্পত্তিতে কম বেশি অধিকার অবশ্য পেত।[৫] পুত্র নানা রকম হতে পারে। প্রধানত ঔরস: পিতার বীর্যে মাতার গর্ভে জাত। কানীন: কন্যাটির প্রাক্‌বিবাহ জীবনের সন্তান, যেমন কর্ণ। সহোঢ়: যে সন্তানকে গর্ভে নিয়ে কন্যার বিবাহ হল। গূঢ়োৎপন্ন: বিবাহের পরে গোপনে অন্য পুরুষের দ্বারা সঞ্জাত সন্তান। জারজ: স্বামীর জ্ঞাতসারে বা

২. সম্ভবত ঋগ্বেদের যম-যমী সংলাপের মধ্যে এই নিষেধের একটি ইঙ্গিত বিধৃত আছে। ঋগ্বেদ (১০:১০)

৩. 'No slave is a slave to the same lengths and in so full a sense of the word, as a wife is ' *The Subjection of Women*, p. 148

৪. 'The wife becomes the first domestic servant pushed out of participation in social production . the modern individual family is based on the open or disguisded enslavement of the woman.' *Origin of Family, Private Property and the State*. p. 211

৫. মহা. (১:১১১:২৮-২৯)

অজ্ঞাতসারে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সন্তান। পুত্রিকাপুত্র: অপুত্রক পিতা এই শর্তে কন্যার বিবাহ দিতেন যে প্রথম পুত্রটিকে কন্যার পিতা আপন পুত্র বলে গ্রহণ করবেন। ক্রীত: অর্থ দিয়ে অন্যের যে সন্তানকে ক্রয় করা হয়েছে। দত্তক: অন্যের সন্তানকে তার অনুমতিক্রমে আপন সন্তানের পরিচয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করা। স্বয়মুপাগত: যে বালক নিজেকে অন্যের কাছে বিক্রয় করে। পৌনর্ভব: নিয়োগের দ্বারা জাত বিধবার বা নিষ্প্রজ স্বামীর স্ত্রীর সন্তান। এত রকমের সন্তানকে সমাজ স্বীকার করেছিল, কারণ সমাজ চা'ক বা না চা'ক, এ সব সন্তান ছিল। কাজেই একটা সংহতির ব্যবস্থা করলে এদের সমাজের অভ্যন্তরে স্থান দেওয়া যায়। তা ছাড়া এ সবই পুত্রসন্তান এবং সমাজে পুত্রসন্তানের চাহিদা বরাবরই প্রবল।

এর মধ্য যে ছবিটা পাই তা হল দাম্পত্যের ভেতরে এবং বাইরে নানা ব্যতিক্রম। তথাকথিত নিষিদ্ধ সম্পর্কে যে সন্তান জন্মাত, তাকেও সমাজ নির্বাসন দেয়নি— যেমন কানীন, জারজ, সহোঢ় বা গূঢ়োৎপন্ন। কখনও বা আর্থিক কোনও কারণে ঐক্যবিবাহের সন্তান অন্যত্র স্থান পেত, যেমন, পুত্রিকাপুত্র, দত্তক, ক্রীত, স্বয়মুপাগত, ইত্যাদি। মনে হয়, এতগুলি ব্যতিক্রমকে সমাজ যখন স্বীকার করছিল তখন তার মধ্যে কিছু সজীব স্থিতিস্থাপকতা ছিল। বিবাহিত জীবনের মূল ছকটা বহুপত্নীক অথবা একপত্নীক যাই হোক, তার বাইরে যে সন্তান এল তাকেও প্রয়োজনে ঠাঁই দিয়েছিল সমাজ। অর্থাৎ বিবাহই যৌনসম্পর্কের একমাত্র আশ্রয় ছিল না। নারীর ক্ষেত্রে কানীন, সহোঢ় এবং গূঢ়োৎপন্ন সন্তানকে মেনে নেওয়াতে সমাজ নারীর তথাকথিত 'পদস্খলনকে'ই যেন কতকটা মেনে নিয়েছিল। প্রশ্ন উঠবে, কুন্তি তাঁর কানীন পুত্রকেও প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারেননি। এখানে তাঁর অল্পবয়স এবং রাজকন্যা পরিচয়ই হয়তো প্রধান অন্তরায় ছিল। সূর্য কর্ণের জনক এ কথা আক্ষরিক ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়; তা হলে দাঁড়ায় প্রাসাদে দ্বিতীয় কোনও পুরুষের সংসর্গে জাত এই সন্তান— তাকে নিয়ে অপরিণতবয়স্কা তরুণী জননীর বিব্রত বোধ করাই স্বাভাবিক। ওই কুন্তিই কিন্তু বিবাহের পরে স্বামী পাণ্ডুর নির্দেশে পাণ্ডুর অন্য তিনটি পুরুষের সংসর্গে তিনটি সন্তান ধারণ করলেন। এ চিত্রটা অন্য রকম: পাণ্ডু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম এবং সন্তানকামী, তাই এই নিয়োগ প্রথার ব্যবস্থা। এ প্রথা সে সমাজে প্রচলিত ছিল; ব্যাস সত্যবতীর বিধবা পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকাতে নিয়োগ প্রথা অনুসারে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, বিবাহ ও যৌনসম্পর্ক একাশ্রয়ী ছিল না। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই ভিন্ন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পৃক্ত হওয়ার কতকটা অবকাশ ছিল। একটা সময় তো নিশ্চয়ই ছিল, যখন কামনার বশে মিলনটা বিবাহ-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ ছিল:

> উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু। একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে উদ্দালকের স্ত্রীকে হাত ধরে সবলে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। তখন উদ্দালক তাঁকে বলেন, এতে রাগ করার কিছু নেই। এ সনাতন ধর্ম; সকল বর্ণের নারীই অনাবৃতা— যে কেউ তাকে ভোগ করতে পারে। তখন থেকে নাকি শ্বেতকেতু নিয়ম করলেন, স্বামী বর্তমান থাকলে তার স্ত্রীকে কেউ যথেচ্ছ ভোগ করতে পারবে না।

সেই থেকেই পত্নী পতিভোগ্যা অর্থাৎ সমাজের বিশেষ কোনও অবস্থায় কোনও শাস্ত্রকার বা সমাজপতির অথবা ক্রমে ক্রমে বহু শাস্ত্রকারের নির্দেশে সমাজে ঐক্যদাম্পত্য যৌনসম্পর্কের একমাত্র সমাজস্বীকৃত বিধান হয়ে উঠল। ব্যতিক্রম হলে ভ্রূণ হত্যার পাপ হবে।[৬] তা হলে গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ ভাবে গোষ্ঠীর সকল নারী পুরুষের সম্ভোগ অবাধ ছিল। এমন যুগ ক্রমে অচলিত হলেও এ প্রথার বেশ কিছু অবশেষ বর্তমান ছিল পরবর্তীকালে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত। পরে 'কুল' যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন বহুপত্নীকতা ও ঐক্যবিবাহ প্রচলিত হল। এইটিই মোটামুটি দাম্পত্যের ছক হিসেবে চলে এসেছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে।

কোনও সমৃদ্ধিমান পুরুষের সমৃদ্ধির একটি বিজ্ঞাপনই হল বহুপত্নীকতা। এই বোধের অন্তরালে সক্রিয় নারীর ভোগ্যবস্তু পরিচয়। ধনরত্ন, পশুপালের সংখ্যা যেমন সমৃদ্ধির বিজ্ঞাপক, তেমনই বহুসংখ্যক স্ত্রীও সমাজে আর্থিক প্রতিষ্ঠার একটি পরিচয়। প্রাচীন শাস্ত্রে শুনি, পত্নীরা হল সমৃদ্ধির রূপ।[৭] এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণের বহুপত্নীকতার পেছনে সমৃদ্ধির বিজ্ঞাপন ছাড়াও সমৃদ্ধি উপার্জনেরও একটা দিক ছিল, এবং কৌলীন্য সম্বন্ধে বাকি ব্রাহ্মণকুলের অসুস্থ, বিকৃত লোলুপতা এই অমানবিক প্রথাকে দীর্ঘজীবন দিয়েছিল। বৃদ্ধ শ্মশানযাত্রী কুলীনের সঙ্গে বালিকা কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, কুলীন জরৎকুমারীর বিবাহ দিয়ে কন্যার পিতা পুণ্য অর্জন করতেন। মনে রাখা ভাল, নারী এ ধরনের বিকৃত সমাজবোধের বলি অন্য দেশেও হত। ইউরোপে যাকে 'রাজপরিবারের বিবাহ' (dynastic marriage) বলা হত তার বলি হত অনেক অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী। তফাৎ শুধু একটাই, শাস্ত্রে তার সরাসরি সমর্থন মিলত না; এখানে এই নৃশংস প্রথার পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন ছিল। তবে সুখের বিষয়, এ সব শাস্ত্রও অর্বাচীন, মোগল যুগের শেষ দিকের রচনা এবং এ প্রথার পরমায়ুও কয়েকশো বছর মাত্র। কিন্তু এই ধরনের বহুবিবাহ ও অসম-বয়সের বিবাহ এবং নামমাত্র বিবাহ, এগুলি পুরুষের অনুকূলে সৃষ্ট প্রথা, এর মধ্যে নিহিত আছে দাম্পত্যের এবং নারীর অপমান। এগুলি শুধু শাস্ত্রসমর্থিত নয়, ওই কয়েকশো বছর ধরে ব্রাহ্মণ সমাজে বহুল আচরিত প্রথা। সহমরণ প্রথায় বহু নারীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু যেমন এক অমানবিক নৃশংস প্রথা ছিল, কৌলীন্য ও বহু বিবাহেও তেমনই ছিল নারীর সত্তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি এবং তার ওপরে অন্যায় অত্যাচার। এগুলি যদি দাম্পত্যের প্রহসন না হত তা হলে এ প্রসঙ্গই এখানে উঠত না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, বেশ কয়েক শতক ধরে, কৌলীন্যপ্রথার অন্তর্নিহিত নারীর অপমান সমাজ মেনে নিয়েছিল। কুলীন কন্যার পিতা পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হত তার কন্যাকে যখন বৃদ্ধ, মুমূর্ষু, পঙ্গু, বহুবিবাহিত, লম্পট, কামুক, অর্থলোভী কুলীনের হাতে সমর্পণ করে নিজের পরলোক নির্বিঘ্ন করত; কন্যাকে তখন সে দায় ও বস্তু বলেই গণ্য

৬. মহাভারত (১:১১৩:৯-১৮)
৭. শ্রিয়া বা এতদ্রূপং যৎ পত্ন্যঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩:৯:৪:১৯)

করত। সে কন্যার যে নিজের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে কোনও প্রত্যাশা থাকতে পারে এমন চিন্তা কদাপি তার পিতাকে পীড়িত করত না। এ দেশে দাম্পত্যের অবনমনের এ একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এমন কোনও বিবাহ-সম্পর্কিত প্রথা এখানে ছিল না যাতে পুরুষের পুরুষত্ব এ ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। সমস্ত কুপ্রথার দণ্ড দিতে হয়েছে নারীকে, সুখী দাম্পত্যে যার সহজাত অধিকার ছিল।

এখন বহুপত্নীকতার বিরুদ্ধ আইন থাকায় একবিবাহই দাম্পত্যের প্রচলিত চেহারা। আমাদের আলোচনার বিষয় এই বিবাহ। মনে রাখা দরকার, এখন সমাজে বিয়ে হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে অথবা রেজিস্ট্রি করে; আনুষ্ঠানিক বিয়েতেও আজকাল রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তার জন্যে। যে ভাবেই হোক, এখনও শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে বিয়ে ঠিক করে কন্যাপক্ষ ও পাত্রপক্ষ। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কৃষিজীবী পরিবারে প্রায় সর্বদাই এ ভাবে বিয়ে ঠিক হয়। শ্রমিকের ক্ষেত্রে এবং একবারে নিম্নবিত্ত চাষির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকে। ব্যতিক্রম কিছু উচ্চ ও মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রেও ঘটে, মাঝেমাঝেই পাত্রপাত্রী নিজেরা বিয়ের ঠিক করে, কখনও প্রেমের জন্যে, হয়তো তার চেয়ে বেশি সংখ্যাই হবে যাদের কাছাকাছি আসার ভিত্তি শুধু ভাল-লাগা। ভাল-লাগা থেকেও প্রেম জন্মাতে পারে, নাও পারে। আবার প্রেম দিয়ে যার শুরু বিরূপতা বিদ্বেষ দিয়েও মাঝে মাঝে তার শেষ হয়। সম্বন্ধ করে যে বিয়ে তাতেও ভালবাসা জন্মাতে পারে, জন্মায়ও অনেক ক্ষেত্রে; আবার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের প্রান্তে এসে দু'পক্ষই পরস্পরের কাছে স্বল্প পরিচিত দুটি ব্যক্তি থেকে যায় মাত্র, একে অন্যের প্রেম পায় না, চিত্তের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ দুটি মানুষের কাছাকাছি আসা বা একত্র বাস করার মধ্যে বিবাহিত দুটি মানুষের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতার, আবেগের ও অনুরাগ-বিরাগের নানা স্তর থাকে। তারা যে পরস্পরকে কতটা জানবে, মানসিক ভাবে কতটা আপন করে পাবে সে বিষয়ে কোনও স্থির নিশ্চয়তা নেই।

•

তা হলে প্রশ্ন আসে, বিবাহ কী ভাবে হওয়া উচিত? অনুষ্ঠান বা রেজিস্ট্রির প্রশ্ন নয়— দুটি মানুষের একত্র বাসের জন্য নির্বাচনের ভিত্তি কী হওয়া উচিত? এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি পরিবারের সামাজিক আর্থিক নিরিখ দিয়েই মূলত এই নির্বাচন হয়। এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশেও এই নিরিখ চলিত ছিল। 'বিবাহে সঙ্গী/সঙ্গিনী নির্বাচন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হত প্রেম বা স্নেহ দিয়ে নয়, বরং পরিবারে নির্ভরশীল আশ্রিতদের দেখাশোনার জন্যে সামাজিক ও আর্থিক প্রয়োজন দিয়ে এবং পারিবারিক বাণিজ্য বা শিল্পকে চালিয়ে দিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে।'[১] সে দেশে জাতিভেদ ছিল না, কিন্তু বিত্তকৌলীন্য ও বংশমর্যাদার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই বিত্তবানের পরিবারে বিবাহ নিষ্পন্ন হত। এ দেশে বাড়তি অভিশাপ হল জাতিভেদ। বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা, স্বভাব, রুচি সব মিললেও বহু ক্ষেত্রে বিবাহটি ঘটতে পারে না, পাত্রপাত্রীর জাতে মিল নেই বলে। এখনও খবরের কাগজে 'পাত্রপাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে শুধুমাত্র তফসিলি বা তথাকথিত নিম্নবর্ণের পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 'অসবর্ণ চলিবে'; অর্থাৎ সামাজিক অধিরোহণের পথটা খোলা থাকে, যাকে চলতি ভাষায় বলে 'জাতে ওঠা'। হয়তো হাজারে একটি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাত্রপাত্রীর ক্ষেত্রেও 'অসবর্ণে বাধা নাই' দেখা যায়। আসলে এই বাধা থেকে যারা মানসিক ভাবে মুক্ত তারা বেশির ভাগই নিজের পছন্দে বিয়ে করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে নয়।

বিয়ের ব্যাপারে পাত্রপাত্রীর মতামত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করা হয়। মোটা দাগের কিছু চাহিদা, যেমন ফরসা চাই, বেশি লম্বা নয়, গ্র্যাজুয়েট চাই, গান-জানা চাই, ইত্যাদি হয়তো গুরুজনেরা কখনও কখনও মনে রাখেন, সর্বদা নয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যে তাঁদের চাহিদা, বংশ, জাত, দেনাপাওনা, উচ্চপদ, ইত্যাদি মিললেও পাত্রপাত্রীর পছন্দ গৌণ হয়ে উপেক্ষিত হয়েছে। এ সব দাম্পত্য শুরুই হয় মনের একটা চাপা নালিশ দিয়ে, যে-নালিশ প্রকৃতপক্ষে তাদের মা-বাবার বিরুদ্ধে। তাঁদের খেয়ালের দেনা শোধ করে বর

১. 'Choice of a marriage partner was controlled primarily not by love and affection but by social and economic needs associated with the case of dependants and the continuation of the family enterprise or of the lineage.' *The European Family*. p 122

বা বধু, বা উভয়েই। কখনও এ নালিশ উচ্চারিতও হয় না, শুধু অতৃপ্তি জমিয়ে তোলে জীবনভর। আবার কখনও অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ থাকলে নালিশও কখন মিলিয়ে যায়।

বিবাহোত্তর জীবনে দাম্পত্যকে নানা সমস্যা পেরিয়ে এগোতে হয়। দুটি মানুষ তো বিচ্ছিন্ন দুটি দ্বীপ নয়। বর, বধূ উভয়েরই পরিবার আছে। সেখানে সকলেই যে আগন্তুককে আন্তরিক স্বাগত জানায়, তা নয়। এবং নতুন জীবনে প্রবেশের মুখে দুটি প্রাপ্তবয়স্কের চেতনায় প্রায়ই যে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়, তাতে খুব দ্রুত ধরা পড়ে আন্তরিক অভ্যর্থনার অভাব। রূপ, গুণ, স্বভাব, সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য, বংশ, দেনাপাওনা এগুলো পরিবারের তথা তৎসংলগ্ন সমাজের প্রত্যাশার সঙ্গে না মিললে প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় মৃদু গুঞ্জন, এবং অচিরেই তা মৃদুতা হারিয়ে, সরব এবং কটু হয়ে ওঠে। অবশ্যই, এর বড় ধকলটা সইতে হয় বধূটিকে। একে, তার জীবনে অন্য একটি মানুষকে মেনে-নেওয়ার পালাটি তখন চলছে, তার ওপর ঝাপটা এসে লাগে সেই মানুষটির আত্মীয়-পরিজনের অসমর্থন, বিরূপতা, সমালোচনায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মূল আশ্রয়স্থল যে মানুষটি, সে তাকে এ সময়ে মানসিক আশ্রয় দেয় না, বধূর যে অন্যায় সমালোচনা তার পরিবারে চলে তার প্রতিবাদ করে না। করাটা সে দুরূহ মনে করে, কারণ তার আবাল্য পরিচিত আত্মীয়-পরিজন তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে তাকে স্ত্রৈণ ভাববে, অসভ্য মনে করবে। কিন্তু নবাগত বধূটির মানসিক স্বস্তির জন্যে তার যে দায়িত্ব আছে, সে কথা মনে করে সে অন্তত কিছুকালের জন্যেও পরিবারের অপ্রীতিভাজন হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিটা এই রকমই। মেয়েটি মনে মনে তাকে কাপুরুষ ও অবিচারের সমর্থক মনে করে তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারায়— যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা দাম্পত্যের একটি দৃঢ় ভিত্তি। বহু ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই উৎসব হইচই মিটে গেলেই একটি অসহায় মেয়ে, তার স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে বিমুখ হয়ে ওঠে। মজা হল, সম্বন্ধ করে অর্থাৎ দু'পরিবারের পাত্রপাত্রী পছন্দের ব্যাপারে যে সব বিয়ে হয় সেখানেও এমন 'খুঁত' বের করা হয় যা সত্যিই অযৌক্তিক। নতুন মানুষটিকে সাদর স্বাগত জানানোর বদলে বহু ক্ষেত্রে তাকে প্রচ্ছন্ন শত্রুজ্ঞানে কেবল বিচার করে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। যেন প্রত্যাশা ছিল মেয়েটি নিখুঁত, সর্বংসহা ও সর্বগুণসম্পন্না হবে। এ ধরনের কোনও প্রত্যাশা বরের সম্বন্ধে সমাজে বা পরিবারে থাকে না, কারণ সে পুরুষ। শোনা যায়, 'সোনার বাটি, তার আবার চেহারা দেখা'। এমন ধরনের বিবাহে দাম্পত্য গড়ে ওঠার আগেই তার ভিত ভেঙে যায়, যদি না স্বামীর প্রশ্রয় সমর্থন স্পষ্ট ভাবে স্ত্রীকে রক্ষা করে।

দেনাপাওনার ব্যাপারেও বারে বারে দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছেলে এ ব্যাপারে ব্রজেশ্বর হয়ে ওঠে: বাবা যা ভাল বোঝেন, করবেন ও বিষয়ে আমি কোনও কথা বলব না। বস্তুত, সে-ও জানে নিজে দেনাপাওনার কথা বললে শুধু দৃষ্টিকটু হবে তাই নয়, দরাদরি মাঝপথে ভেস্তে যেতে পারে, পক্ষান্তরে বিষয়ী বাবা ওটা দেখলে প্রাপ্তিযোগটা বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, যে মেয়েটির বাবাকে এই দণ্ডটা দিতে হচ্ছে সেও এতে প্রসন্ন হতে পারে না,

কারণ এখানেও ভাবী স্বামীর নীরবতা যে প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতাই, সেটা সে বেশ বুঝতে পারে। এ তো সবে কলির সন্ধে; প্রাপ্তির স্বাদ-পাওয়া শ্বশুরবাড়ির লোভ চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলে। বেড়ে চলে বধূ ও তার বাপের বাড়ির কাছে দামি জুলুম, এবং দাবি না মেটালে বধূটির ওপরে অত্যাচার। সে অত্যাচার কখনও সমাপ্ত হয় অগ্নিদাহে, বিষে বা অন্য অপঘাতে। কখনও পথ না পেয়ে মেয়েটি আত্মঘাতিনী হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব একটি টেলিফোন সংলাপ— দৈবাৎ দূরভাষজটে সংলাপটা মিনিট দুয়েক শুনতে হয়। আলাপটার শেষ মিনিটে ছিল প্রেমালাপের উপসংহার। ছেলেটি বলে, 'তা হলে আর দেরি করে কী হবে? কালই আমি যাই তোমার বাবার কাছে তাঁর মত চাইতে।'

মেয়েটি আতঙ্কিত স্বরে বলে, 'খবরদার, অমন কাজও কোরো না। মত চাইতে গেলে শুধু মতটাই পাবে আর কিছু নয়। গত অঘ্রাণেই সেজদির বিয়েতে বাবা সাঁইত্রিশ হাজার টাকা খরচ করলেন। মত চাইলে এ সব কিন্তু পুরো ফাঁকি দেবেন।'

শুনে খুব হতাশ লাগে। এরা গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। প্রেমের বিয়ে, কিন্তু প্রাপ্তিযোগের হিসেবটা খুব মজবুত। মেয়েদের এখনও মেরুদণ্ডে সে জোর এল না যে বলে, 'যে-মানুষ আমার সঙ্গে পণও চাইবে তার ঘরে আমি যাব না।' ছেলেদেরও চেতনা জন্মাল না যে বোঝে 'পণ' কথাটার মানে দাম, অর্থাৎ মেয়ের বাবা জামাইকে টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছেন। মেয়েরা কেন বলতে পারে না, 'কেনা মানুষের সঙ্গে বাস করতে পারব না?' ছেলেরাই বা বলতে পারে না কেন, 'পণদ্রব্য হতে রাজি নই?' আসলে ওই লোভ। উভয়তই। অনর্জিত বস্তু ও বিত্ত ভোগ করার মধ্যে যে অসম্মান অন্তর্নিহিত আছে তা টের পাওয়ার মতো আত্মসম্মানবোধই জন্মায়নি অথবা লোভের চাপে তা গৌণ হয়ে গেছে।

সদ্যবিবাহিত বান্ধবীদের মধ্যে যৌতুকে পাওয়া বস্তু-সম্ভারের সুতৃপ্ত আলোচনায় যে আত্মপ্রসাদের সুর লাগে তা শুনে বিবমিষা জাগে। এটা আপাত ভাবে পিতার বিত্তকৌলীন্যের গৌরব সূচনা করে কিন্তু তা ছাড়াও এর মধ্যে আছে শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনা, প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেক, পরিজনদের তাক লাগিয়ে দেওয়া, বান্ধবীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বামীর কাছে নিজের আর্থসামাজিক বাজারদরের ঘোষণা। এর প্রত্যেকটিই এক নীচ অশালীনতার দ্যোতক। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা শুধু যে এর থেকে মুক্ত নয় তাই নয়, বরং ক্ষোভের কথা হল এই যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে সমাজে এ হীনতা ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। দাম্পত্যের ভিত্তিতে লোভের এই ক্লেদ থাকলে তা কখনওই সুস্থ ও নির্মল হয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। নিম্নমধ্যবিত্ত একটি ছাত্রীর বিবাহ সামাজিক ভাবে সমপর্যায়ের, উন্নতমনস্ক ও পূর্বপরিচিত একটি তরুণের। সে মেয়েটিকে বলে, বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে কোনও কাপড় গয়না, আসবাব বা তৈজসপত্র যেন সে কিনতে না দেয়। যুক্তি দেয়, 'আমিও তো বিয়ে করছি, কই আমি তো আমার বাবা-মাকে পীড়ন করছি না, তুমি কেন করবে? আমরা চাকরি করে আস্তে আস্তে যে সংসার গড়ে তুলব তাতেই আমাদের

যথেষ্ট হবে। পীড়ন শোষণের ভিত্তিতে কোনও ভাল জিনিস গড়ে উঠতে পারে না। মেয়ের বাড়ির থেকে স্বেচ্ছায় যা দিতে তাঁরা উদ্যত ছিলেন তাও নিতে অস্বীকার করে ছেলেটি। তার যুক্তি: তার বাড়ি থেকে তো অনুরূপ কোনও দানসামগ্রী মেয়ের বাড়িতে আসছে না। কুড়ি বছর আগে এই বিয়েতেই পাত্রপাত্রীপক্ষ এক সঙ্গে একটি সাদাসিধে সুরুচিপূর্ণ নৈশভোজনের আয়োজন করেন। নানা দিক থেকেই এঁরা একটি আদর্শ স্থাপন করেন, সমাজে যা প্রচলিত হলে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হতে পারে।

দাম্পত্য জীবন যদি যৌথ পরিবারে কাটাতে হয় তা হলে পরিবারে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মন্তব্য নিয়ে অশান্তি দাম্পত্যের সুখশান্তি নষ্ট করে। যদি শ্বশুরবাড়িতে বধূটি মানবিক ব্যবহার পায়, তা হলে, দম্পতিটির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকলে, শান্তি থাকে। কিন্তু প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হলে তার প্রভাবও দম্পতির জীবনে প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। প্রতিবেশীদের মারফতে সামাজিক প্রতিক্রিয়াও এসে পৌঁছয় এবং তার প্রতিকূল হলে শান্তি নষ্ট হয়। প্রতিবাসীরা সমাজের প্রতীক, যে সমাজকে অদৃশ্য থেকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাষ্ট্র। বিত্তকৌলীন্য, পুরুষতন্ত্র, বর্ণবৈষম্যের মূল্যবোধে রাষ্ট্রের নির্মাণ; এবং এই সব যেন কায়েম থাকে, সে ব্যবস্থা সে নেপথ্য থেকে আইন, সাহিত্য, গণমাধ্যম সব দিয়েই প্রতিষ্ঠা করে।

সমস্যার মৌলিক উৎপত্তিস্থল দম্পতির একান্ত ব্যক্তিগত মানসিক সম্পর্কে। দু'জনের শিক্ষাদীক্ষার মানে (প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে নয়) যদি দুস্তর ব্যবধান থাকে তবে তা মানসিক সাহচর্যের পথে অন্তরায় হতে পারে। তেমনই অথবা হয়তো তার চেয়েও বেশি দুরতিক্রম্য হল রুচির ব্যবধান। একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে আধুনিক সঙ্গীত একেবারেই সহ্য করতে পারে না, অপরজন ঠিক তার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে দাম্পত্য হয়তো ভাঙে না কিন্তু যতটা মানসিক সাযুজ্য হতে পারত তা হতে পারে না। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর হল স্বভাবে গরমিল।

> তেতাল্লিশ বছর একত্রে সংসার করার পর এক বৃদ্ধা গৃহিণী প্রতিবেশীর কন্যার কাছে চোখ মুছে বলছেন, 'চারটে পয়সা কখনও কাউকে হাত তুলে দিতে পারিনি। টাকাপয়সা সব ওঁর কাছে। প্রতিটি পাইপয়সার হিসাব আছে। মরণাপন্ন মায়ের অসুখে চিকিৎসার খরচ কিছু দিতে পাইনি। আমার ভাই নেই তা উনি জানেন, বাবা তাঁর শেষ কপর্দক দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করেছেন; চিঠি পড়ে বলতে গেলুম, "কিছু সাহায্য করি?" বললেন, "ও বাড়ির দায় তোমার নয়। তোমাকে তো শাড়ি গয়না দিয়ে আরামে রেখেছি, তোমার মা বাবার খরচা দেওয়া আমার দ্বারা হবে না।" ঠাকুরকে বলি, এঁকে এত ধন দিলে, মনটা কেন দিলেন না, ঠাকুর?'

এই শোক নিষ্প্রতিকার। ভদ্রমহিলা দুঃখীর দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। অথচ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জীবন কাটালেন। কার্পণ্য ও উদারতার সংঘাত খুবই মর্মান্তিক। শাস্ত্র এবং

সমাজনির্দেশ অনুসারে বৃদ্ধের কোনও দায়িত্ব ছিল না ঠিকই, কিন্তু মানবিকতার ক্ষেত্রে যে দুস্তর ব্যবধান তা শাড়ি গয়নায় ঘোচেনি। সেই বৃদ্ধার অশ্রুপাত একার নয়, এমন বহু দম্পতি দেখা যায় যাঁরা এই ধরনের মানসিক বৈষম্যের ফলে সারা জীবন দুঃসহ কষ্টে কাটান। এ ছাড়াও আছে আদর্শগত ব্যবধান। একজন হয়তো কোনও রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী, অন্যজন তার বিপরীত পন্থার অনুগামী, কিংবা দেশ বা সমাজে কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ অবস্থায় একের ঔদাসীন্য অপরকে তার সত্তার খুব গভীর স্তরেই আঘাত করে, কিংবা দুই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত দুজনকেই করে। এ ধরনের বৈষম্য উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষত যদি দু'জনের বা একজনেরও আদর্শে বিশ্বাসটা আন্তরিক হয়, তার জীবনের তাৎপর্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িত থাকে। এগুলো বেশির ভাগই ঘটে সম্বন্ধ করা বিয়েতে। বিয়ের আগে দু'জনের কিছুকাল আলাপ পরিচয় থাকলে এ ধরনের দুস্তর ব্যবধানে হয় দু'পক্ষ দূরে সরে যায় অথবা যদি সম্ভব হয় তো একে অন্যকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে স্বমতে আনতে পারলে ব্যবধান আর থাকে না। অবশ্য বিয়ের আগের মতবাদও পরিবর্তিত হতে পারে, দম্পতির অন্য জন সে পরিবর্তনকে অন্তরে স্বীকার করতে না পারলেও দেখা যায় সংঘাত।

বেশ বেশি সংখ্যায় বিয়ে ভাঙে আর্থিক কারণে। অভাবে, অথবা প্রত্যাশিত সচ্ছলতার অভাবে। আজকের দিনে আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না এবং সন্তানসন্ততি এলে প্রত্যাশিত ভাবে পারিবারিক ব্যয়ভার দুর্বহ বোধ হচ্ছে। এমন অবস্থায় দেখা দেয় পরস্পরকে দোষ দেওয়ার প্রবণতা। প্রথমে আয় বাড়াবার চেষ্টা, তা ব্যর্থ হলে ব্যয়সংকোচের প্রয়াস এবং বর্তমান পৃথিবীতে যেহেতু সমস্ত গণমাধ্যমই ব্যয়বাহুল্যের রাস্তাই বাতলে চলেছে, তাই অচিরেই দু'পক্ষই যেন দেখতে পায় ব্যয়সংকোচের পথটা একটা কানাগলিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর ওপরে আছে, প্রতিবেশী ও পরিচিত পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে, চেতনে অথবা অবচেতনে, নিজেদের অবস্থার একটা তুলনার প্রয়াস: প্রায়শই নিজেদের জীবনযাত্রার মান, অত্যন্ত উচ্চবিত্ত বাদে আর সকলের ক্ষেত্রেই যে ক্রমাগতই নেমে যাবে এই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটিকে স্বরূপে বোঝবার মতো মুক্ত দৃষ্টি বেশি জনের থাকে না। বাকিরা ক্রমবর্ধমান অভাবের অন্ধ গলিতে মাথা ঠোকে ও মনে মনে বা প্রকাশ্যে একে অপরকে পরিবারের অর্থনৈতিক মানের অবনমনের জন্য দোষ দেয়। আর মুক্ত দৃষ্টিতে বুঝলেও তো সত্যিকার অভাব থেকেই যায়। বিশেষত কালো টাকার হঠাৎ-নবাবদের অবিশ্বাস্য আয়বৃদ্ধির দিনে, যখন তারা দেখে, চারপাশের কিছু লোকের গায়ে অভাবের আঁচটিও লাগছে না, আটশো টাকা কিলোর মাছও তারা অনায়াসে নিয়মিত ভাবে কেনে। বিদেশি মদ বা প্রসাধনদ্রব্য, সেলুলার-ফোন, টেম্পল শাড়ি বা বিদেশি গাড়ি এবং দূর বিদেশে ছুটি কাটানো যেহেতু তাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে, তাই সেই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে নিজেদের অভাব যেন অহেতুক ক্রূরতর চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। হঠাৎ-নবাবদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার প্রবৃত্তি নিজের অপ্রতিকার্য অভাবকে আরও দুঃসহ করে তোলে। আদর্শগত কোনও স্থৈর্য বা

স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার সহজাত বা সাধনায় আয়ত্ত-করার ক্ষমতা যার নেই, এই পরিবেশে তার মর্মপীড়া বাড়বেই। এই আর্থিক ক্লেশের দিনে বহু দাম্পত্যে চিড় ধরতে দেখা গেছে। দু'জনের মধ্যে সহমর্মিতা যদি এমন গভীরে না পৌঁছয় যেখানে বাইরের এই সব ঝড়ঝাপটা এসে দাম্পত্যের ভিত্তিতে না লাগে, তা হলে অকারণে ভুলবোঝাবুঝি শুরু হয় ও ক্রমাগত বেড়েই চলে। স্থূল জীবনযাত্রাকে পেরিয়ে গভীরে কোনও এক জায়গায় দাম্পত্য সম্পর্কের নোঙর থাকলে তবেই এই সব ঝড় সওয়া যায়।

যৌনতা

বিবাহই একমাত্র সম্পর্ক যেখানে রক্তের সম্পর্কে সম্পৃক্ত নয় এমন দুটি মানুষ একটি মিলিত জীবনের সূত্রপাত করে। এ ছাড়া এই সম্পর্কের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে: এই একটি মাত্র সম্পর্কের শিকড় হল যৌন মিলনে। গাছ যেমন তার শিকড়কে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন রাখে, প্রত্যক্ষ থাকে তার কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পাতা; এবং সেই অদৃশ্য গভীর থেকে রস সংগ্রহ করে ওপরের শাখায় সে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তার শাখায় ও কোটরে পাখি ও অন্য প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, দুটি মানুষের মিলিত জীবনেও এই ব্যাপারটা অমনি চেহারা নেয়। তাদের মূলে যৌন সম্পর্ক থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে; তাদের সংযুক্ত জীবনের শ্রী ও সার্থকতা প্রকাশ্য দৃষ্টিগোচর; তাদের রচিত সংসার-নীড়ে অন্য মানুষ প্রশ্রয় পায়। কর্মে, ত্যাগে, সৌন্দর্যে, আদর্শে তাদের দাম্পত্য সার্থক হয়ে ওঠে। সন্তানে ফলধারণ করে, মনুষ্যজাতির জীবনকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রলম্বিত করে। কিন্তু যেহেতু এই একটি মাত্র সম্বন্ধের ভিত্তি যৌনসম্পর্কে, তাই এর নিজস্ব কিছু শারীরিক সমস্যা থেকে যায়। এ সব মিটিয়ে যখন যুগ্মজীবন শুরু হয় তখনও আগন্তুক উৎপাত, সমালোচনা, পারিবারিক নানা সমস্যায় দাম্পত্য জীবন বিঘ্নিত হতে পারে।

একটি সমস্যা হল সন্তানজন্ম সম্পর্কে। এ দেশে বহু পরিবারে সন্তানজন্মটা আপতিক, তার কোনও মানসিক পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না। এবং প্রায়শই এটা মায়ের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, চাপিয়ে দেওয়া। আগন্তুক সন্তানটির জন্য তার সম্মতি বা সাগ্রহ প্রতীক্ষা থাকে না। বহু ক্ষেত্রে বিশেষত, দুঃস্থ পরিবারে শাশুড়ি ও শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির অন্যান্য লোকেরা তুরীয় ভাবে বলে থাকে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। বোঝা সহজ, উক্তিটির পেছনে কোনও বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসের ভিত্তিও নেই; জীবটির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খিদে ও অনাহারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আহার দেবার তাগিদ কোনও উপরওয়ালার থাকে না এবং বাবা মা-র ইচ্ছা থাকলেও ক্রমবর্ধমান সন্তানকুলের খাদ্য সংস্থান তারা করতে পারে না। এর পরে দাম্পত্য জীবন প্রায়ই রণক্ষেত্রে পরিণত হয়: স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, সন্তানরা পিতামাতার বিরুদ্ধে যুযুধান হয়ে ওঠে। শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে দাম্পত্য বিষিয়ে ওঠে। অবশ্য অনেক পরিবার একান্ত নিষ্ক্রিয় নিয়তিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে সবটাই অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান ধারণের

প্রসঙ্গে মায়ের মত আছে কি না সেটা দেখাই হয় না। সন্তান আসবার পর অনেক দম্পতির জীবনে আর একটা সংঘর্ষ দেখা দেয়। সেটা হল সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা। ছেলেমেয়েকে মানুষ করার অধিকাংশ দায়িত্ব থাকে মায়েরই, অন্তত তারা কৈশোরে পদার্পণ করা পর্যন্ত। কিন্তু শিশুর শৈশব থেকেই তাকে কী ভাবে মানুষ করতে হবে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার থাকে বাবার। কখনও কখনও ছেলে মেয়ে নিজেদের রুচি নিয়ে তর্ক করে এবং ইচ্ছামতো শিক্ষাক্ষেত্র বেছে নেয়। কিন্তু তাদের জন্য কোন খাতে কতটা খরচ করা হবে, তাদের গৃহশিক্ষক ক'জন থাকবে, আদৌ থাকবে কি না, তারা কোন ধরনের বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য পাবে, ইত্যাদি বিষয়ে মায়ের মত খুব ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়। পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নও থাকে— 'মায়ের আদরের, বাবার আদরের' থাকার শ্রেণিবিভাগ থেকেও কখনও অশান্তি জন্মায়। কতকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিশ্চয়ই দু'জনে বসে দু'জনের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব। ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তিনির্ভর আলোচনা নিশ্চয়ই দু'জনে বসে করা যায় ও ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়। দু'জনের সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা যদি ছেলেমেয়েরা টের পায় তো অশান্তির ক্ষেত্র বাড়ে। মায়ের মতটা অযৌক্তিক হবেই এমন একটা ধারণা নিয়ে এগোলে অবশ্য কোথাও কোনও সমাধান আসে না। যখন মায়ের শিক্ষাগত মান নিচু, তখনও তাকে ধৈর্য ধরে বিষয়টা বোঝালে অনেকটাই বোঝানো যায়। দাম্পত্যে সমানাধিকার স্বীকৃত থাকলে এ বোঝানো অনেক সহজ হয়।

দাম্পত্য জীবনে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে আড়াই হাজার বছর ধরে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে, উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল যে স্বামীকে তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর উক্তির প্রতিবাদ করে না।[১] আবার বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও এই ধরণের কথা পাই: পুত্রসন্তানই কাম্য, তাই যে স্ত্রী শুধু কন্যার জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে পরিত্যাগ করা যায়।[২] নিঃসন্তান স্ত্রীকে দশ বছর পরে এবং মৃতবৎসাকে পনেরো বছর পরে ত্যাগ করা যায়।[৩] আপস্তম্ব ধর্মসূত্রও একই কথা বলে।[৪] এবং পরবর্তী কালে মনুসংহিতাতেও অনুরূপ উক্তি পাই।[৫] অর্থাৎ বোধটি ভারতীয়দের চিত্তে সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই দৃঢ়প্রোথিত। তবে এই যে 'প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'.[৬] এই বোধটি শুধু ভারতবর্ষই নয়, সারা পৃথিবীতেই চলিত ছিল। নিঃসন্তান নারীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে পারত, নেহাৎ ত্যাগ না করলেও তাকে অসম্মানে নির্বাসিত করা হত। ইউরোপে কোনও কোনও অঞ্চলে সন্তান

১. ঐ. ব্রা. (৩:২৪:২৭)
২. বৌ. ধ. সূ. (১:১০:৫১-৫৩)
৩. বৌ. ধ. সূ. (২:৪:৬)
৪. আ. ধ. সূ (২:৫:১১-১৪)
৫. মনু (৯:৪)
৬. মনু (৯:২৬); অনুরূপ বাক্য 'ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্। পূর্বোক্ত (৯:৩৩)

ধারণ না করতে পারলে সে নারীকে পরিহার করা হত, অন্তত তাকে খুব নিচু চোখে দেখা হত।[৭]

সন্তানহীনতার জন্য এতাবৎকাল শুধু নারীকে দায়ী করে বহু ক্ষেত্রে দাম্পত্য তিক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যদিও আজ আমরা জানি, বন্ধ্যা নারীর মতো নিষ্প্রজ পুরুষও আছে, এবং দু'জনেই সুস্থ ও প্রজননে সমর্থ হলেও বহুক্ষেত্রে সন্তান আসে না। আজকের বিজ্ঞান এর কিছু প্রতিকারও করেছে। কিন্তু এ সব জ্ঞান ছিল না বলে নারী বহু অবিচার ভোগ করেছে, সংসারে অনর্থক দোষারোপ নিরুপায় ভাবে সহ্য করেছে। তার একটা কারণ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজে নারী সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রম থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এখন তার ওপর বর্তেছে সম্পদের উত্তরাধিকারী ভোক্তা উৎপাদন করার দায়িত্বটি।[৮] যে দাম্পত্যে পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী নিরন্তর আশঙ্কায় ত্রস্ত থাকে— স্বামী তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করবে— সে দাম্পত্য তো ততক্ষণ পর্যন্ত নিরন্তর দোলাচল থাকবে। অথচ বিজ্ঞানের গবেষণা বহু দশক আগেই সমাজকে জানিয়েছে যে, নারীর বন্ধ্যাত্ব যেমন সন্তানহীনতার কারণ হতে পারে, পুরুষের নিষ্প্রজত্বও ঠিক ততটা পরিমাণেই সন্তানহীনতার জন্যে দায়ী হতে পারে। আবার দু'জনেই পুরো স্বাভাবিক হলেও শতকরা পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে সন্তান আসে না। ঠিক তেমনই কন্যাসন্তান না পুত্র সন্তানের জন্মের মধ্যে মা-বাবা কারওরই কোনও দায়িত্ব বা কৃতিত্ব নেই। ঘটনাটি সম্পূর্ণ আপতিক। তবু সেটা এখনও মানুষের বোধের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। তাই ধনী শিক্ষিত পরিবারে এমনিওসেন্টেসিস চলছে ও ব্যাপক হারে কন্যাভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে, তথাকথিত 'চিকিৎসক'-এর সাহায্যে। এখনও আমরা মুখে বলি, ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু পরিবার ও সমাজের চোখে পুত্রের জননী এখনও কন্যার জননীর ঊর্ধ্বে আসীন। গর্ভে পুত্র না কন্যা আসছে এ ব্যাপারে নারীর দেহটির পর্যন্ত যথার্থ কোনও দায়িত্ব নেই, তবু এই অসমদৃষ্টি। এর ফলে বধূটিকে সইতে হয় গর্ভকালে আতঙ্ক ও কন্যা জন্মে অপমান।

দাম্পত্য অশান্তির অনেকটা অংশেই নারী সম্পর্কে সমাজের এই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাই দায়ী। এমনকী হৃদয়বৃত্তিতেও নারীর ন্যূনতা, ক্রূরতা, কামুকতার কথাও শাস্ত্র বলেছে, যাতে সে অবজ্ঞার পাত্রী হয়। প্রাচীন যুগে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল নারী প্রেমে উৎসাহিনী নয়, সে শুধু যৌন মিলনেই আকাঙ্ক্ষিনী। মহাভারতে এ কথা অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দিয়ে বলানো হয়েছে: 'নারী স্বভাবতই অবিশ্বাসিনী, কামনা ছাড়া কোনও কিছুকেই সে মনে স্থান দেয় না

৭. 'In some regions she was case off by her husband or was at any rate held in little esteem if she was unable to have children.' *The European Family* p 124

৮. 'Whereas the farmer's and the master's wife played a decisive part in the production of goods for sale and for every day consumption in the domestic economy, the middle class woman was the first to be restricted to the task of private production ' পূর্বোক্ত, p. 130

এবং কামনায় উত্তেজিত হয়ে সে না করতে পারে এমন কোনও কাজই নেই।'[৯] তারও আগে ঋগ্বেদে স্বয়ং উর্বশী তার প্রেমিক পুরূরবাকে বলছে, 'একটি নারীর জন্য কেন তুমি আত্মহত্যা করবে? কোরো না। নারীর সঙ্গে কোনও বন্ধুত্বই হয় না, এদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের মতো।'[১০] লক্ষণীয়, এই দুটি ক্ষেত্রেই নারীর বিরুদ্ধে, তার হৃদয়হীনতাকে প্রতিপাদন করবার ভার নিয়েছে নারীই। এবং মনে রাখতে হবে, এই দুটি অংশেরই রচয়িতা পুরুষ। তবে কেন নারীর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যাচার? পুরুষ কি সত্যিই বিশ্বাস করে যে নারী প্রেমে অক্ষম কামনাসর্বস্ব জীবমাত্র? একেবারেই নয়। এই রকম একটি ধারণা— বিশ্বাস নয়— ধারণা ও জনশ্রুতি তৈরি করতে পারলে সমাজে নারীকে ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করা সহজ হয়। তা ছাড়া, কামসর্বস্ব নারীই যে পুরুষের পদস্খলনের হেতু এমন একটি মিথ্যা সমাজে চালু থাকলে পুরুষের অনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্ব অনেক কম। দুটি উক্তিই বসানো হয়েছে অপ্সরার মুখে, যারা স্বর্গবেশ্যা। কিন্তু দুটিতেই আছে সাধারণীকরণ, অর্থাৎ এ ধরনের হৃদয়হীন কামুকতা যে নারীমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। এই ধরনের ধারণা এ দেশের যৌথমানসে দীর্ঘকাল ধরে অন্তর্লীন ভাবে বিদ্যমান থাকার ফলে পুরুষের পক্ষে নারীকে অবজ্ঞা করা সহজ হয়েছে। গণমানসে প্রোথিত ধারণা অবচেতনের স্তরে থেকেও দাম্পত্যকে কলুষিত ও বিকৃত করতে পারে এবং করেও। সমান অধিকারের মধ্যে ছিল এর প্রতিকার। ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টনক্রাফট লিখেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, পুরুষের একচ্ছত্র অধিকারের দাপট থেকেই নারীর স্বভাবে বহু ভ্রমপ্রমাদ জন্ম নেয়।... স্বাধীনতা পেলে তার চরিত্র অনেক বেশি পরিপূর্ণতা পাবে।'[১১] প্রাচীন শাস্ত্রে, এবং নারীর নিকৃষ্টতার এই বোধ নিয়েই পুরুষ বিয়ে করে। আরও দুঃখের বিষয়, নারী নিজেও এই বোধবিশ্বাসের পরিবেশেই লালিত হয়। বারে বারে শোনা যায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত 'মেয়েমানুষ' এবং গর্ব ও দম্ভের সঙ্গে উচ্চারিত 'পুরুষ'। এখন, সবে কিছুকাল ধরে শহরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যৎসামান্য কিছু অংশ নিজেদের এই ধারণা থেকে মুক্ত করে নারীপুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে যুগ্মজীবন রচনা করতে উদ্যত হয়েছে।

শুধু আর্থিক স্বাবলম্বিতাতেও এ সুপ্রাচীন বৈষম্যবোধ ঘোচে না। এমনও দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীর সমান বা তার চেয়ে বেশি উপার্জন করা সত্ত্বেও গৃহকর্ম ও সন্তানপালনের দায়িত্ব প্রায় সবটাই নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। চাষি-বৌ বা মজুরনি সারাদিন বাইরে খেটে ফিরে স্বতন্ত্র উপার্জন থাকা সত্ত্বেও সংসারের যাবতীয় কর্তব্য একাই সমাধা করছে। স্বামী তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছে না, স্ত্রী চাইতে সাহস পাচ্ছে না। কাজেই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নারীকে এই বোধ দিতে পারছে না যে, সে সংসারে পুরুষের সমকক্ষ। এর জন্যে

৯. মহা. (১৩.৩৮:১১-৩০)

১০. ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকানাং হৃদয়ান্যেতা। ঋগ্বেদ (১০:৯৫:১৫)

১১. *A Vindication of the Rights of Women* pp. 214-215

চাই চেতনার মুক্তি। সেটা সময়সাপেক্ষ এবং তার জন্যে চাই দীর্ঘ সচেতন প্রস্তুতি ও সংগ্রাম। এর একটা সূত্রপাত হয়েছে, একটি শুভলক্ষণ খুব মৃদু, প্রায় অলক্ষ্যে হলেও ইদানীং দৃষ্টিগোচর হচ্ছে: কিছু কিছু মুক্তমনা পুরুষ স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য করছেন। সংসারের কাজে সাহায্যকারী দুষ্প্রাপ্য হয়েছে বেশ কিছুকাল ধরেই, ফলে দম্পতির এই পারস্পরিক সাহায্য অত্যাবশ্যক শুধু নয়, অপরিহার্য। কিন্তু বেশ কিছু দাম্পত্যে এই সাহায্যের অভাবে চিড় ধরেছে। মেয়েটি একলাই সন্তান, সংসার, শ্বশুরবাড়ির পরিজনদের পরিচর্যা করবে এই আশা করে ছেলেটি, বলে 'ও সব তো মেয়েদের কাজ'— এ মেয়েটি বাইরে চাকরি করলেও এই সংসারসেবা সে একাই করবে এমনটাই অপেক্ষিত। এই কাজের বোঝার গুরুভারে ক্লিষ্ট এবং সংসারের কাজে স্বামীর সহযোগিতা না পাওয়ায় যে অসহায়তা ও প্রচ্ছন্ন অত্যাচারের আভাস থাকে তাতে মেয়েটি স্বভাবতই বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হয়। মুশকিল হল এই যে, আমাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে, সমাজে এই পারস্পরিক সাহায্যের কোনও নজির নেই বরং উল্টোটাই আছে। মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলেছিলেন যে, প্রত্যুষে উঠেই সারাদিন তিনি অবিশ্রাম গৃহকর্ম করে চলেন; তাঁর মধ্যরাতের বিশ্রাম পর্যন্ত দায়িত্বের যে ফিরিস্তি তিনি দেন তার সঙ্গে মেলে তাবৎ ধর্মশাস্ত্রে গৃহিণীর দিনচর্যার নির্দেশ। এমন কথাও আছে যে, নারী সর্বদাই গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকলে সে অন্যায় কর্ম থেকে নিরস্ত থাকে। তবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ও ইসলামিক শাস্ত্রেও ঠিক একই রকমের ফিরিস্তি। এর মূলে সব প্রাচীন সমাজেই বিশ্বাস ছিল যে, নিরন্তর কাজের মধ্যে না থাকলে নারী দুশ্চরিত্র হয়ে যাবে, তাকে সে সুযোগ না দেওয়া তার চরিত্র-রক্ষারই একটা উপায়। কিন্তু দাম্পত্যে কাজের ভারের এই অসম বণ্টন নারীকে শরীরে মনে পীড়িত করে এবং এর ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তার কোনও প্রতিকার থাকে না। আরও ক্ষতি হয়: পুত্রকন্যারা বুঝে যায় গৃহকর্ম নারীরই এলাকা, অর্থাৎ ওই অসাম্যের বিষয়টা সঞ্চারিত হয় পরবর্তী প্রজন্মেও।

শাস্ত্র বলে, দুর্ভাষিণী স্ত্রীকে স্বামী এক বছর পরে গয়না কেড়ে নিয়ে ত্যাগ করবে;[১২] রোগিণীকে তিন মাস পরে, সুরাপায়িনী, অপব্যয়িনী, স্বামীদ্রোহিনী ও বন্ধ্যা স্ত্রীকেও ত্যাগ করবে।[১৩] ওই সব ক'টা দোষই স্বামীরও থাকতে পারে, সমাজ তার জন্যে কোনও শাস্তিবিধান করেনি। যেটা অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা মনে হয় সেটা হল, রোগিণীকে ত্যাগ করার কথা। নিরুপার্জন রোগিণী শারীরিক ও আর্থিক ভাবে সম্পূর্ণ অসহায়, তাকে আশ্রয়, চিকিৎসা, শুশ্রূষা, ভরণপোষণ ও সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্ব রইল না তার স্বামীর। পরিত্যক্ত রোগিণীর কী উপায় হবে সে সম্বন্ধে শাস্ত্র নীরব। এটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধে সমাজের যে বোধগত ভিত্তি ছিল তা হল সংসারটা পুরুষের স্বচ্ছন্দ নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার জন্যেই, তার কোনও ব্যত্যয় যদি স্ত্রী ঘটায় তা হলে তার জন্যে দরজা খোলা আছে। দুর্ভাষী,

১২. মনু (৯/৭৮)
১৩. যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১:৭৩)

সুরাপায়ী, অপব্যয়ী, স্ত্রীদ্রোহী এবং প্রজননে অক্ষম পুরুষ শুধু পুরুষ বলেই গার্হস্থ্য দণ্ডবিধির আওতার বাইরে। বস্তুত এই দু' মুখো বিধানে বহু দাম্পত্যের ভিত্তিটা গোড়া থেকেই নড়বড়ে হয়। কত অসংখ্য পরিবারে মাতাল, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী, কটুভাষী স্বামী দাপিয়ে প্রতাপ জাহির করে স্ত্রীকে পদানত রাখছে; স্বামীর শারীরিক বৈকল্যে সন্তান না আসলে স্ত্রীকেই নিষ্ঠুর ভাবে নিন্দা করছে স্বামী ও তার পরিজন। এর একটা কারণ, সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর অধিকার, ব্যক্তিত্ব তার সামাজিক অধিকার একেবারেই উপেক্ষিত। ফলে তার নিজের ও আশপাশের সকলের ধারণা ও বিশ্বাস জন্মায় যে সে যথার্থই ঊনমানব। দু'মুঠো ভাত ও দু'খানা কাপড়ই তার একমাত্র অধিকার। এই বোধ বিশ্বাসের ফলে তার পুষ্টির কথা পরিবার ভাবে না। এবং সে শুধু প্রাণধারণের মতো খাদ্য ও লজ্জা নিবারণের মতো বস্ত্র পায়। রোগে চিকিৎসা কমই জোটে এবং তার মানসিক বিকাশের জন্য কোনও ভার কেউ নেয় না। এর প্রতিকার হচ্ছে না। দাম্পত্য ভেতরে ভেতরে কবেই ভেঙে গেছে, তার ফাঁপা কাঠামোটাকেই সমাজ দাম্পত্য বলে অভিহিত করছে। ওই ধরনের অত্যাচারী স্বামীর দাপট বহু স্ত্রী অসহায় ভাবে সহ্য করছে। আজ কোথাও কোথাও যে এই অন্যায় অত্যাচারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিকার খুঁজছে এবং পাচ্ছে সেটা একটা আশার কথা।

প্রেম

দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহ ব্যাপারটাই নানা কারণে বড় গোলমেলে। পণ্ডিতরা বলেন, মানুষের সমাজ দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে ঐক্যবিবাহে পৌঁছেছে এবং এ ব্যাপারটা যখন বহু সহস্রাব্দ ধরে সুস্থায়ী হয়েছে তখন এইটিই নরনারী সম্পর্কে বিবর্তনের চূড়ান্ত ও অক্ষয় পর্যায়— এক হিসেবে ঐতিহাসিক ভাবে চূড়ান্ত। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে এটা মোটেই অক্ষয় নয়। প্রথমত, বহু আদিবাসী জীবনে ঐক্যবিবাহ প্রচলিত নয়; তাদের নারী পুরুষ উভয়ই বহুগামী, সন্তানও পিতৃপরিচয়ে পরিচিত নয়। এদের সংখ্যা কম নয়, এবং যেহেতু আমাদের সঙ্গে মেলে না সে হেতু এদের নারীপুরুষ সম্পর্ক বৈধ নয় এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। দীর্ঘকাল ধরেই বহুগামিত্ব— নারী পুরুষ উভয়েরই— সমাজে আচরিত এবং স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, প্রায় অর্ধশতাব্দীরও আগে থেকে ক্যাথলিক জগতে, ইয়োরোপে, উত্তর ও প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকাতেই এবং অন্যান্য ক্যাথলিক অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, তখন সরকারি ভাবে অর্থাৎ ধর্মের সংস্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে নারী পুরুষ পরস্পরের কাছ থেকে এমনিই সরে যাচ্ছে। তারা অন্য সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সঙ্গে একত্র বাস করছে। একটা কারণ, বিবাহ বিচ্ছেদের পরে দ্বিতীয় বিবাহ ক্যাথলিক ধর্মে অনুমোদিত নয়। তৃতীয়ত, প্রায় ওই সময় থেকেই বেশ কিছু নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই একত্র বাস করছে। কারণ, ক্যাথলিকরা বলেন, বিয়ে করলে সে বিয়ে যদি না টেঁকে তো ক্যাথলিক মতে বিচ্ছেদ হলে পর যখন পুনর্বার বিবাহ করা বে-আইনি তখন ওই জটিলতার মধ্যে না ঢুকে ওর মূলোচ্ছেদ করাই ভাল। যে যাকে চায় তার সঙ্গে বাস করুক। যদি বিয়ের পর কোনও দিন তার মধ্যে সাচ্ছন্দ্য বা আনন্দ আর না থাকে তো সরে গেলেই হল। সরে গিয়ে কেউবা একলা থাকে, কেউ ক্রমান্বয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পরিবর্তন করে। অনেকেই মনের মতো সঙ্গী বা সঙ্গিনী পায় এবং খুব সুখী হয়। কেউবা বারবার সঙ্গী সঙ্গিনী পরিবর্তন করে চলে, মনের মতো সুখ পায় না, কিংবা কোথাও স্বল্পকালের জন্য সুখ পায় পরে আবার সেটা ফুরিয়ে যায়।

এখনও সমাজে অধিকাংশ মায়ের ক্ষেত্রে বিয়ের ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য কম। অথচ এখনও এ দেশে অধিকাংশ মেয়ের জীবনের পরিণতি দাম্পত্যে। তার বিবাহোত্তর জীবনের সুখ দুঃখ সাচ্ছন্দ্য-অসাচ্ছন্দ্য সবই নির্ভর করে প্রভু অর্থাৎ স্বামীর ওপরে। সে কারণেই স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে তার এমন স্বাধীনতা থাকা উচিত যে, যতক্ষণ না মনোমত স্বামী পায় ততক্ষণ যেন

পরিবর্তন করতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল, প্রায় দেড়শো বছর আগে, ১৮৬৯ সালে বলেছিলেন, 'যেহেতু তার জীবনের সব কিছুই নির্ভর করছে একটি ভাল প্রভু লাভ করার ওপরে, সেই কারণে তাকে বারবার পরিবর্তন করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না সে তেমন একজনকে পায়।... দাসত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনতাই একমাত্র উপশম, যদিও তা-ও পর্যাপ্ত নয়। এ অধিকার প্রত্যাখ্যাত হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ ভাবে ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়ে যায়।'[১] দাম্পত্যে সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর পক্ষে বেশি প্রয়োজন, কেননা সমাজ তাকে নানা ভাবেই পুরুষের অধীন করে রেখেছে; অতএব পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে প্রভুর কাছ থেকে জীবনে তার নিষ্কৃতি নেই সে তার মনোমত হওয়া অনেক বেশি জরুরি ও বাঞ্ছনীয়। বিশেষত, সমাজ যখন এ স্বাধীনতা পুরুষকে দিয়েছে। কিছুকাল আগেও পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারত এবং এখনও গণিকালয়ের দ্বার তার কাছে খোলা; পরস্ত্রীর সান্নিধ্যও সে সদর রাস্তায় না পেলেও খিড়কি দরজা দিয়ে পায়। অবশ্যই কিছু বিবাহিত নারীও কখনও কখনও পর-পুরুষের সঙ্গ পায়; কিন্তু একে তো দেশের অধিকাংশ নারীর পক্ষে সে পথে দুস্তর বাধা, তার ওপরে তার কলঙ্কের বোঝাও অনেক অনেক গুরুভার। একটি পরস্ত্রীকামুক পুরুষের চেয়ে এই নারীদের অবস্থা কবির ভাষায়:

> বাঁশি বাজে বনে বসন্ত রাগে,
> জটিলা, কুটিলা দুয়ারে জাগে॥[২]

বিবাহের উদ্যোগপর্ব থেকে নারীকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় রাখা হয়, বিবাহের পরেও পুরুষতন্ত্রে সে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তার স্বার্থ, তার চিন্তা, সিদ্ধান্ত, আবেগ, অনুরাগ-বিরাগ, এমনকী তার স্বাস্থ্যও পরিবারে গুরুত্ব পায় না। সন্তানপালনে তার ভূমিকা স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সে ব্যাপারে তার মতামত উপেক্ষণীয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে রচিত একটি ইংরেজি কাব্যাংশ এখানে প্রযোজ্য:

> তারা উত্তর করতে পারে না
> তারা প্রশ্ন করতে পারে না
> তারা শুধু করে আর মরে।[৩]

এ বৈষম্য বিবাহিত জীবনের পদে পদে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, এমনকী শিক্ষিত নারীর ক্ষেত্রেও; এবং এ ব্যাপারটা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নারী বা পুরুষ কেউ-ই এর গুরুত্ব

১. 'Since her all in life depends upon obtaining a good master, she should be allowed to change again and again until she finds one the free choice of servitude is the only, thorugh a most insufficient alleviation Its refusal completes the assimilation of the wife to the slave.' *The Subjection of Women*, p 249

২. প্রমথ চৌধুরী: *সনেট পঞ্চাশিকা*

৩. 'Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do and die.' (Alfred Tennyson: *The Charge of the Light Brigade*)

সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়। সোলোমন দেখিয়েছেন, নারী নিজের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারত না, স্বামীই ছিল পরিবারের প্রভু, সন্তানরা ও ক্রীতদাসরা ছিল নিম্নবর্গের জীব। শুধুমাত্র পিতার অবর্তমানে মায়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী ছিল স্বামীর অধীনে।[৪]

বিবাহিত জীবনে পরিবারের বৃহত্তর সমাজের এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনের মধ্যেকার বাধা মাঝে মাঝেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিবাহ দু'জনের কাছেই, কখনও বা একজনেরই কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। কেন যে এটা হয় তার বাইরের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর, যেমন আর্থিক অসঙ্গতি, রুচির বৈষম্য, সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে মতবৈষম্য, পারিবারিক সমালোচনা, স্বামীর নিজের পরিবারের আচরণ ব্যাপারে পক্ষপাতী অন্ধতা, স্ত্রীর আপন পরিবারের প্রতি আনুগত্য বা কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে স্বামীর ও শ্বশুরবাড়ির অসহিষ্ণুতা— এই সব, এবং আরও হাজারটা কারণ দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। যথাকালে অর্থাৎ সূচনাতেই পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে এর নিষ্পত্তি না ঘটলে অভিযোগ ক্রমে অনুক্ত থেকে উক্ত এবং মৃদু থেকে দুর্বিষহ কটুতায় পরিণত হয়। তখন পরস্পরকে সহ্য করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে, বিয়ের ভিত টলে যায় এবং বিচ্ছেদ যেন অনিবার্য বলে মনে হয়। সূচনায় আলোচনায় মতৈক্য থাকলেও পরে বারে বারেই সে ঐক্য ভেঙে যায়, কারণ মানুষের চিত্ত ও জীবনবোধ সচল অততা পরিবর্তনশীল; কাজেই বারে বারেই এ ধরনের আলোচনার প্রয়োজন। এবং এ আলোচনা নিয়ন্ত্রিত হয় ঐকমত্যে পৌঁছবার শুভবুদ্ধি দিয়ে।

এ তো গেল বাইরের কারণ। এ ছাড়াও দুটি মানুষের ভিতরে, যদি প্রেম একদিন থেকেও থাকে তবু, আপাত ভাবে সম্পূর্ণ অকারণেও একদিন তা নিশ্চিহ্ন হয়। মনস্তত্ত্বিকরা বলেন, কারণটা অবিদ্যমান নয়, তবে দুর্লক্ষ্য। তবে ফলটা খুবই স্পষ্ট: প্রেমের মৃত্যু। বোধহয় পূর্বরাগের পরের বিবাহে প্রেমের মৃত্যুর সবটা আর্তি ধরা পড়েছে প্রাচীন ভারতের নারী কবি শীলা ভট্টারিকার একটি বিখ্যাত কবিতায়:

> যে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল, (পরে) সেই হল বর। সেই রকমই ফুল্ল মালতীর গন্ধ বয়ে আনছে কদম কুসুমের গন্ধবাহী বাতাস। আমিও সেই আমিই আছি, তথাপি (আজ) সেই (সংকেত) স্থলেই মিলনের লীলাবিধিতে এই রেবা নদীর কূলে বেতসকুঞ্জে চিত্ত (কেন যেন) উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।[৫]

৪. 'A woman did not question her place, the husband was the family's head, children and bonded servants were in lower categories, the mother had full authority only in the father's absence The wife was subordinate of her husband ' *In the Company of Educated women* p 2

৫. যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাশ্চৈব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

কেন— তা নায়িকাও জানে না। যে-প্রেমের আকুতিতে একদিন কুমারী শরীর প্রেমিককে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছিল সে পরে তাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। সেই পুরনো অভিসারের যে কুঞ্জ রেবানদীর তটে, তেমনই কদম আর মালতীর গন্ধে উদ্দাম সমীরণ, অথচ আজকে মিলনলগ্নে চিত্ত কেন এমন নিরুৎসুক? এমন উদাসীন? কেন, তা কে জানে? প্রেমের অপর এক কবি অমরু-র 'শতক কাব্যে' এমনই আর একটি দুর্লভ রত্ন আছে:

> যেখানে ভ্রুকুটিরচনাই ছিল ক্রোধের প্রকাশ, চুপ করে থাকা ছিল অত্যাচার, পরস্পরের (দিকে চেয়ে) স্মিতহাসি ছিল অনুনয়, দৃষ্টিপাত ছিল প্রসন্নতা— দেখ, সেই প্রেমের আজ এ কী মৃত্যু: তুমি আমার পায়ে লুণ্ঠিত, তবু এই হতভাগিনীর ক্রোধ যায় না।[৬]

বেশি না হলেও আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে কাব্যে সাহিত্যে। কবি বলছেন: 'যে প্রেম একদা সজীব ও উদ্বেল ছিল সেই প্রেমে নেমে এসেছে বিমুখ ঔদাসীন্য।' বিদেশি সাহিত্যে প্রেমের মৃত্যুর এই ধরনের বিবরণের অনেক বেশি দৃষ্টান্ত মেলে।

বহু স্থলে তৃতীয় বা তৃতীয়ার সমাগমে পূর্বপ্রেমে ক্লান্তি অনুভূত হয়। নতুনের সম্বন্ধে কৌতূহল, আগ্রহ অধীরতায় পৌঁছয়, দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী গৌণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আবার কখনও বা অন্য কারও উপস্থিতির আগেই প্রেমে শৈথিল্য দেখা দেয়। ক্লান্ত, পুরনো, একঘেয়ে লাগে পূর্ব-প্রণয়ের সমস্ত অনুষঙ্গকে। তার পরে কখনও নতুন অনুরাগ জন্মায়। কখনও বা জন্মায়ও না, শুধু পুরাতন প্রেম সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসে একজীবনের প্রেমের মৃত্যুর সূচনা। যে-পক্ষ এটা অনুভব করে সে কখনও কখনও চিত্তের এই পরিণতিতে ব্যথিত হয়। কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়* নাটকে নতুন প্রেমে উজ্জ্বল পুরূরবাও অল্পক্ষণের জন্যে হলেও সত্যই ক্লেশ ভোগ করেছিলেন অনুরাগিণী বধূ ঔশীনরী সম্বন্ধে তাঁর ঔদাস্যে। কিন্তু তখন তাঁর জীবনে সে প্রেমের মৃত্যু ঘটে গেছে, পুরূরবার চিত্তবৈকল্য সেই মৃত্যুর জন্যে শুধু ক্ষণিক শোক। জীবন জটিল, প্রেমের জীবনও বহু দুঃসমাধেয় জটিলতায় আকীর্ণ।

ফলে বিয়ে ভাঙে। কখনও ধীরে ধীরে, কখনও সহসা। তখন দেখা দেয় নতুন কিছু সমস্যা। কিন্তু তার আগে এই ভাঙা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও সমাজ কী বলেছে একটু দেখা যাক। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-তে 'ধর্মস্থীয়' প্রকরণে বলা আছে, বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পতিকে যদি স্ত্রী ত্যাগ করে তবে তাকে স্বামী কিছুই দেবে না। বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ত্যাগ করলে তাকে

৬. কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রন্যোন্যস্মিতমনুনয়ো দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেমণস্তদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং
ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ॥

তার যা প্রাপ্য তা দিতে হবে। যদি দু'জনে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ পোষণ করে তাহলে সে বিবাহ থেকে দু'জনেই মুক্ত হতে পার।[৭]

তা হলে কৌটিল্য স্বীকার করেছেন যে, যেখানে বিবাহের মানসিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, অনুরাগের স্থানে এসেছে বিরাগ, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারে। যদিও আগের অংশে আছে বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে পুরুষ ত্যাগ করলে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব তার থাকে, কিন্তু বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পুরুষকে স্ত্রী যদি ত্যাগ করে তা হলে সেই স্ত্রীকে খালি হাতেই চলে যেতে হবে। স্পষ্টই এখানে দু'মুখো মানদণ্ড; নারীর বিপক্ষে আইন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, বিচ্ছেদ অনিচ্ছুক স্বামীকে স্ত্রী ইচ্ছে করলে ত্যাগ করতে পারে। এবং দু'জনেই যদি পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয় তা হলে বিচ্ছেদ শাস্ত্র সমর্থিত। কৌটিল্যের সময়ে আইন যেটুকু ন্যায়-নির্ভর ছিল তা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। মনুসংহিতা প্রায় পাঁচশো বছর পরের রচনা। মনুতে নারী তার বহুবিধ অধিকার একে একে হারিয়েছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিতে ঊনমানব (মনুতে শুধু সতীদাহই নেই, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার নির্দেশ আছে)। মনুতে দেখি উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব নিবীর্য, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পতির পরিচর্যায় অনিচ্ছুক স্ত্রীকেও ত্যাগ করা চলবে না; ভরণপোষণের দায় প্রত্যাহার করাও চলবে না। কিন্তু 'স্ত্রী যদি পাগল, সুরামত্ত, রোগাক্রান্ত পতিকে ত্যাগ করে তা হলে তিন মাস অপেক্ষা করে তার বসনভূষণ কেড়ে নিয়ে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' যদি সচ্চরিত্রা বধূ প্রতিকূল অথবা সুরাসক্ত, অত্যাচারী ও অর্থলোভী হয় তবে সে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য বিবাহ করা বিধেয়। এই দ্বিতীয় বিবাহে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমা পত্নী যদি বাসগৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়, তবে তাকে হয় আটকাতে হবে (টীকায় আছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকানোর কথা) নয়তো সমস্ত বৃহৎ পরিবারের সামনে প্রকাশ্যে তাকে ত্যাগ করতে হবে।[৮] সবিস্ময়ে স্মরণ করি ঋগ্বেদে ঊষার একটি বিশেষণ 'পুনর্যতী'। সায়ণের ভাষায়, 'স্বামীকে ত্যাগ করে যে ব্যাভিচারিণী হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়।'[৯] দেখা যাচ্ছে, স্বামীকে ত্যাগ করার কল্পনা ওই সমাজে অপরিচিত ছিল না। পরে নারীর এই স্বাধীনতা হারিয়ে গেল, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে অব্যাহতই রইল।

এখানেও ওই দু'মুখো নীতি খুবই স্পষ্ট। যদিও মনুর প্রথম শ্লোকে জুগুপ্সিত অবস্থার স্বামীর পরিচর্যায় অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু এটা বিস্ময়কর এক উদারতার প্রমাণ, কারণ পরবর্তী পুরাণ সাহিত্যে বারংবার উপদেশ ও উপাখ্যানে ওই রকম স্বামীর সর্বতো ভাবে সেবা করবার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এবং, দ্বিতীয় শ্লোকে ওই

৭. পরস্পরদ্বাষান্মোক্ষঃ। অর্থশাস্ত্র, ধর্মস্থীয়, (৩:১৬)

৮. উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণং ন ত্যাগোস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্তমান।। মনু (৯:৭৯) মদ্যপা সাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ। বধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাথঘ্নী চ সর্বদা।। মনু (৯:৮০) আধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্দূষিতা গৃহাৎ। সা সদ্যঃ সংনিরোদ্ধব্যা ত্যাজা বা কুলসংনিধৌ।। মনু (৯:৯৩)

৯. ঋগ্বেদ (৭:৭৬:৩)-র ভাষ্যে, 'পতিং পরিত্যজ্যেতস্ততঃ সঞ্চয়ন্তী ব্যাভিচরন্তীতি।'

উদারতা প্রত্যাহৃত হয়েছে। পরাশর ধর্মশাস্ত্রে যে সব পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে তারই কিছু ক্ষেত্রে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করবার নির্দেশ এখানে আছে। আবার সতী সাধ্বী নারী সুরায় আসক্ত এবং স্বামীর প্রতি বিদ্বিষ্ট হলে তাকে ত্যাগ করে পুনর্বার বিবাহ করার অধিকার স্বামীকে দেওয়া হল। এ ভাবে লঙ্ঘিতা এবং লাঞ্ছিতা স্ত্রী গৃহত্যাগে উদ্যত হলে তাকে (দড়ি দিয়ে বেঁধে) আটকাতে হবে, নয়তো প্রকাশ্যে পরিজনসমক্ষে তাকে ত্যাগ করতে হবে। মনুর ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীর মন বলে কিছু থাকতে পারে না, বিদ্বেষ থাকলেও মুক্তি অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদে অধিকার নেই, যে অধিকার কৌটিল্যে ছিল। সমাজ ক্রমে ক্রমে বিবাহকে নারীর পক্ষে কারাগার করে তুলেছে।

বর্তমান আইন কৌটিল্যের মত বিবাহবিচ্ছেদের অবকাশ রেখেছে। কার্যত দুঃসাধ্য হলেও এখন অন্তত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারী আইনত স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে। সে নিজে উপার্জন না করলে তার ভরণপোষণের দায়ও থাকে স্বামীর— অন্তত আইনে; যদিও বাস্তবে এটা আদায় করা বহু ক্ষেত্রে খুবই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। যেটা লক্ষণীয়, তা হল বিবাহ অশান্তির বা কষ্টের হলে তার থেকে আজ নারী পুরুষের মুক্তির উপায় আছে। এখানে যে প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে তা হল, বিচ্ছিন্ন দম্পতির সন্তানদের কী হবে? আইনে কিছুকাল তারা মায়ের কাছেই লালিত হবে, পরে বাবা চাইলে এবং মা না চাইলে বাবার কাছে থাকবে অথবা মা চাইলে মায়ের কাছে থাকবে। দু'জনের কেউই না চাইলে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস করবে, ছুটিতে পালা করে মা, বাবার কাছে এসে থাকবে— যদি তারা চায়। প্রকৃতপক্ষে মা বাবা ছাড়া অন্য সহৃদয় আত্মীয়রাও কখনও কখনও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সন্তানদের দায়িত্ব নেন। নিঃসন্তান দম্পতির ক্ষেত্রে প্রশ্নটি ওঠেই না। এ কথা ঠিকই যে, মা-বাবার স্নেহের ও যত্নের পরিবেশে লালিত হওয়ার কোনও বিকল্প নেই, যে সন্তান তা পায় তার বাল্য কৈশোরের স্বাদ-গন্ধই আলাদা। কিন্তু প্রশ্নটা উঠেছে, যেখানে দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত ভেঙে গেছে সেখানে সন্তানকে বাবা-মার ভাঙা দাম্পত্যের দরুন যে মানসিক এবং বাস্তবিক নিরাশ্রয়তা, অসহায়তা, কখনও বা অহেতুক নিগ্রহ এবং তার বন্ধুসমাজের পরিবেশ সন্তানকে যে নিদারুণ মর্মপীড়া ভোগ করতে হয় তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে ওই বিশেষ শিশুটির জীবনে অন্য সুখী, পরিপূর্ণ শৈশব কৈশোরের সম্ভাবনা তো ভেঙে গেছে তার জনকজননীর দাম্পত্য ভাঙার সঙ্গে। এখন ওই ভাঙা দাম্পত্যে পূর্ণ সুখী পরিবারের ঠাট বজায় রেখে সন্তানকে সেই পরিবেশে লালন করলেও কিন্তু তার যা পাওয়ার ছিল তা সে পায় না। তবু অনেক ভাঙা পরিবারে এই ঠাট বজায় রাখার সিদ্ধান্ত দম্পতি নেন। যদি বাইরে তার গরমিলের কোনও ঝাঁজ প্রকাশ না পায় তবে, সন্তান মোটামুটি এক ধরনের সুস্থ জীবনই পায়, যদিও তার কৈশোরের স্পর্শকাতর চিত্ত ঠিকই বোঝে যে, আকাশে মেঘ আছে, বাতাসে বিষ। কখনও কখনও, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি থাকলে এতে তার স্থায়ী ক্ষতি হয় না। আবার অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তি থাকলেও কখনও কখনও শিশু স্বতন্ত্র একটি কল্পলোক তৈরি করে, পিতামাতার সাহচর্য-নিরপেক্ষ সেই জগতেই মনে মনে বাস করে। এমন বেশ কিছু মানুষ দেখা যায়

যারা ভাঙা সংসারে লালিত। সব জেনে, সব বুঝে বেশ কিছু যন্ত্রণা কষ্ট আত্মস্থ করে এরা মানুষ হয়েছে এবং ওই আত্মিক প্রয়াসে তাদের চরিত্রে এক ভিন্ন ও মূল্যবান মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। আবার এমনও দেখা যায়, মা-বাবার আসন্ন বিচ্ছেদে উন্মাদের মতো বিক্ষিপ্ত হল যে শিশু বা কিশোর কিশোরী, ধীরে ধীরে তারা তাদের নতুন সামাজিক অবস্থানে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

মা বাবা যদি স্বভাবে দীন, আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর না হন, তা হলে ওই ঠাট বজায় রাখা সংসারেও শিশুর এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ থাকে। যেটা হয়তো বাড়ি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বোর্ডিং হস্টেলে গেলে থাকে না। তা ছাড়া তাকে সামাজিক পারিবেশিক সমালোচনার সম্মুখীনও হয়তে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর মানসিক স্বস্তি তার বেড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল ভেবে মা-বাবারা নিজের মতদ্বৈধতা বা বিদ্বেষ চেপে রেখে শিশুর সামনে নির্লিপ্ততার অভিনয় করে চলেন; ফলে শিশু মানসিক ভাবে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ লাভ করে। কিন্তু, দম্পতির অন্তর্লোকে ধূমায়িত বিদ্বেষ যদি পারিবারিক পরিমণ্ডলে উদ্গীর্ণ হয় তা হলে ওই ছলনা আর থাকে না।

বহু পরিবারে এই ধরনের পারিবারিক আবহাওয়ায় শিশুদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেতে দেখা যায়, বেশ কিছু শিশু বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং তার চেয়েও বেশি সংখ্যক শিশু কলহ দ্বন্দ্বের ওই বিষাক্ত পরিবেশে বিকৃত মানসিক গঠন নিয়ে বেড়ে ওঠে। মনশ্চিকিৎসকেরা এ ধরনের মনোবিকারগ্রস্থ শিশুর যে পরিসংখ্যান ও বিবরণ দেন তা ভয়াবহ। তা হলে এর প্রতিকার কী? মা বাবা অন্তর্বিদ্বেষ চেপে গিয়ে সারা জীবন সুখী দম্পতির অভিনয় করে যাবেন? সেটা কি সম্ভব? বাঞ্ছনীয়? সন্তান কি কৈশোরে পৌঁছেও অভিনয়কে অভিনয় বলে চিনতে পারবে না? তার অন্য বন্ধুদের বাড়ির পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেও বুঝতে পারবে না যে কোথায় একটা বেসুর বাজছে? একটা বিকল্প হচ্ছে, শিশুটি যাতে বেড়ে ওঠার পথে মোটামুটি অনুকূল একটা পরিবেশ পায় তার ব্যবস্থা করে দু'জনের বিচ্ছিন্ন হওয়া। এখানে অন্য একটি প্রশ্নও থাকে: ওই দুটি নরনারী প্রথম বিবাহে সুখ পায়নি, যে কোনও কারণেই হোক বিয়েটা ভেতর থেকে যখন ভেঙে গেছে তখন কৃত্রিম অভিনয়ে সেটাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে সরাসরি প্রকাশ্যে ভেঙে দেওয়া এবং দু'জনে সম্ভব হলে অন্য সঙ্গী বেছে নিয়ে দ্বিতীয়বার সুখ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। এখনও সমাজ একে ওই দুটি মানুষের স্বার্থপরতার প্রমাণ হিসেবেই দেখে। সে দেখাটা ভুল। যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন হয়, তখন তার মূল মানবিক প্রেরণা উৎস কী ছিল? একটি নিরপরাধ নারীর জীবন যাতে পুনর্বার সুখের সন্ধান পায় তা-ই তো? সে নারীর বয়স চোদ্দ না চব্বিশ না চল্লিশ তা তো আলোচ্য ছিল না। সে সন্তানবতী না নিঃসন্তান তা-ও ত ভাবা হয়নি? তার জীবনটা যেন অকালে শুকিয়ে না যায়, সে যেন দাম্পত্যসুখের সন্ধান পায় এই ছিল সে আন্দোলনের মূল প্রেরণা। অপরপক্ষে, কোনও বিপত্নীকের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা নিয়ে সমাজ কখনওই কোনও মন্তব্য করেনি; বরং এ কথা বলেছে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরদিনই তার

কথা প্রশস্ত এবং বিধেয়। লোকে পোষা কুকুর বেড়ালের মৃত্যুতেও কয়েক দিন মুষড়ে থাকে, এ সমাজে স্ত্রীর স্থান গৃহপালিত জন্তুরও নীচে! কাজেই একবার নির্বাচনে ভুল হলে পুনর্বার নির্বাচন করার অধিকার থাকাই উচিত। প্রথমত এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমবার সঙ্গীকে নির্বাচন করে দেয় পরিবার, সেখানে পাত্র পাত্রীর, বিশেষত কন্যার মত প্রায় উপেক্ষিত। ফলে অন্তত মেয়েদের জন্যে ওই দ্বিতীয়বার সুখের সন্ধান করার পথটা খোলা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মেয়েদের জন্যে বিশেষ করে বলছি এই কারণে যে, পুরুষের পক্ষে সে পথ বরাবরই খোলা থাকছে। বিধিমতে বিবাহিত স্ত্রী সীতাকে রামচন্দ্র বলেছিলেন, 'তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি যাও'। এখনও বাড়িবাড়ি বহু মেয়ে বাসন মাজতে আসে, কারণ, 'স্বামী নেয় না'। স্বামী না নেওয়ার অধিকারটি পেয়েছে আমাদের 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' রামের কাছেই। কারণ, বলাই আছে, রামের মতো আচরণ করবে, রাবণের মতো নয় (রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ)। এবং অন্তত এ ব্যাপারে অসংখ্য পুরুষ রামের মতোই আচরণ করে। এই পরিত্যক্তা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার নতুন জীবনে সুখী হওয়ার মৌলিক অধিকার আছে। বিশেষত, পুরুষ যেখানে হামেশা এক বউ ছেড়ে আবার বিয়ে কিংবা বিয়ে না করেই সংসার পাতে।

প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, বিয়ে ভেঙে যদি দ্বিতীয় সংসারেও সুখ না আসে তা হলে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এই ভাবেই কি চলবে? এর উত্তরে বলা যায় আইন যখন বিচ্ছেদের পরে পুনর্বার বিয়ের অধিকার দিয়েছে এবং ক'বার বিয়ে করা চলবে তার কোনও সংখ্যা নির্দেশ করেনি, তখনই তো বারে বারে সুখের সন্ধান করার অধিকার কায়েম হয়েছে। মুশকিল হল, এমন বহু নজির আছে যেখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবারে সঙ্গী নির্বাচনটি পাকাপাকি সুখের সন্ধান দিয়েছে এবং তার পরের যুগ্মজীবন তিরিশ চল্লিশ বছর অব্যাহত সুখে কেটেছে। এই নির্বাচনের মূল অধিকারটি সংখ্যাসীমা দিয়ে বাঁধতে গেলে এটা সম্ভব হত না। কেউ কেউ বলেন, আরও অনেক নজির আছে যারা বারে বারে পরীক্ষানিরীক্ষা করেও কোথাও স্থিতিলাভ করেনি। তেমন অনেক নারী বহু পরীক্ষানিরীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে শেষ জীবনে কখনও বিষণ্ণ, কখনও প্রসন্ন মনে একক জীবনকেই মেনে নিয়েছে। এদের সমাজের বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই, কারণ নিজের জীবন নিজের মতো পরিচালনা করার স্বাধীনতা এরা সমাজের কাছে পেয়েছিল। সে পরিচালনায় সুখ হয়তো আসেনি, কিন্তু ওই স্বাধীনতাটা ছিল তার মৌলিক অধিকার। এমন কথাও প্রায়ই শোনা যায় যে, শুধুমাত্র নতুনের সন্ধানে ইতস্তত পরিক্রমাই ছিল এই ভাবে বহুবার নতুন জীবন শুরু করার মূল প্রেরণা। হতেই পারে। প্রশ্ন হল, এতে কার কী ক্ষতি হল? ব্যক্তি স্বাধীনতার আমরা তখনই সীমা নির্দেশ করতে পারি যখন তা অন্য কারও পক্ষে ক্ষতিকর। এখানে ওই নিত্যনতুনের সন্ধানে সুখ, দুঃখ, উন্মাদনা, বিষাদ যা-ই আসুক তা তো অন্য কাউকে স্পর্শ করছে না। যার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সে-ও জানে স্থায়িত্বের কোনও প্রতিশ্রুতি সে মিলনে নেই। প্রশ্ন হল, এক বিবাহ বন্ধনেই কি সে প্রতিশ্রুতি ছিল? তা হলে তো ভাঙতই না।

আনুষ্ঠানিক বিবাহ নিয়ে একটা মূল প্রশ্ন থেকে যায়, এর আইনগত ও অনুষ্ঠানগত সমর্থন আজকের সমাজে কতটুকু অবশিষ্ট আছে? অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আগেই দেখেছি তা সম্পূর্ণতই পুরুষের অনুকূলে। নারী সে অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। প্রাচীনকালে এর হয়তো কারণ একটা ছিল: নারীর উপনয়ন হত না, বেদপাঠে অধিকার ছিল না, ফলে বিবাহের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে তার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তা ছাড়াও মধ্যযুগ থেকে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হওয়ায় কী নারী কী পুরুষ আর সরাসরি মন্ত্রোচ্চারণ করত না, করত দু'পক্ষের পুরোহিত এবং তারাই বর ও বধূকে দিয়ে অপেক্ষিত অনুষ্ঠানগুলি করিয়ে নিতে। যাই হোক, অনুষ্ঠান ক্রমেই একটা নির্জীব বহিরঙ্গে পর্যবসিত হয়েছে। তাতে, বা আইনের রেজিস্ট্রেশনে, যা প্রতিপন্ন হয় তা হল দুটি নারী পুরুষ পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলে স্বীকার করছে এবং সুখে দুঃখে একত্রবাসের প্রতিজ্ঞা করছে। নিহিতার্থ হল, আইনের অনুমোদন না পেলে এ বন্ধন ভাঙা যাবে না। অর্থাৎ এর মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা এসে পড়ল। যতক্ষণ দু'জনের মধ্যেকার আকাশটা আবিল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় দু'জনের সঙ্গকামনা করে এবং তা পেয়ে সুখী হয়। এটা প্রাগ্-বিবাহ প্রেম থাকলে তো হয়ই, বিবাহোত্তর কালে যেখানে দম্পতির মধ্যে প্রেম জন্মেছে সে ক্ষেত্রেও হয়। এ ছাড়াও যেখানে প্রেম নেই, কিন্তু পারিবারিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, নির্ভরশীলতা, সাহচর্য আছে এবং দু'পক্ষের কারওরই এর বাইরে কোনও প্রত্যাশা নেই, তারা কামনার তৃপ্তি এবং সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেই পরিতৃপ্ত হন, এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই বন্ধনটি পীড়াদায়ক নয়, বরং পরিতৃপ্ত যুগ্মজীবনের একটা সীমানির্ধারক মাত্র। এ সীমাকে অতিক্রম করলে দম্পতির একজন অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয় এবং ওই আনুষ্ঠানিক বা আইনের কাছে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয়।

সমস্যা শুরু হয় এইখানেই। যখন ওই বন্ধন আর ভেতরে সত্য থাকে না তখনই তা উদ্বন্ধনে পরিণত হয়, সংসার হয়ে ওঠে কারাগার এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে নরক। কখনও কখনও দু'জনেই, এবং কখনও বা দু'জনের একজন তখন পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিচ্ছেদ

বহু কারণে দাম্পত্য অচল অবস্থায় পৌঁছতে পারে। আগেই দেখেছি পরিবার বা সমাজের প্রতিকূল অভিমত, পারিবারিক দায়িত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা, স্ত্রীর পরিবারে স্বামীর সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা স্ত্রীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে স্বামীর নিষ্ক্রিয়তা, সন্তান চাই কিনা, কটি চাই, কখন চাই সে বিষয়ে মতানৈক্য, যৌনমিলনে নানা অসন্তুষ্টি, আর্থিক অসাচ্ছন্দ্য, আদর্শগত পার্থক্য, রাজনীতিবোধে দ্বিমত, রুচিদ্বৈধতা, ছোটখাট ব্যাপারে দুটি স্বভাবের নানা পার্থক্য যা স্ফীত হতে হতে দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে— এ ছাড়াও নানা খুঁটিনাটি নিয়ে পরস্পর-বিমুখতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তার একমাত্র সমাধান রূপে দেখা দেয় বিবাহ বিচ্ছেদ। কত পুরুষ ও নারীকে বলতে শোনা যায়, 'নাঃ, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। ওর সঙ্গে আর এক দণ্ড থাকতে পারব না। ওই সংসারে দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

এ অবস্থা কাল্পনিক নয়। খুব বেশি দাম্পত্যে পরস্পরের প্রতি যথার্থ ঔদাসীন্যের সম্পর্ক স্থায়ী হয় না, যদি না দাম্পত্য সম্বন্ধে তাদের প্রত্যাশাই কম থাকে। যে সম্পর্কের ভিত্তি প্রেম সেখানে প্রেমের মৃত্যু ঘটলে প্রায়ই দেখা যায় বিদ্বেষ এবং তখন পরস্পরের সান্নিধ্য অসহ্য হয়ে ওঠে। অনেক দম্পতি অবশ্য এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসেব করে দেখেন সন্তানের জন্যে অথবা সন্তান না থাকলে পরিবার বা সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াবার জন্যে দাম্পত্যের কাঠামোটা বজায় রেখে চলাই ভাল। কখনও বা এর মধ্যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধে, ইত্যাদিরও হিসেব হয়। অনেক বড় চাকরিতে বড় কর্তাদের স্ত্রীর একটা আবশ্যিক ভূমিকা থাকে পার্টিতে; অর্থাৎ দাম্পত্য অটুট থাকার চেহারাটা বজায় রাখার বৃত্তিগত প্রয়োজন থাকে; সে সব ক্ষেত্রে স্ত্রী রাজি থাকলে অভিনয়টা চলে। আবার কখনও প্রেমের মৃত্যু ঘটলেও, আবেগের দিকটা ছাড় হয়ে গেলেও, যৌন সম্পর্কের দিকটা স্তিমিত হয়ে এলেও, বা না হলেও, এক ধরনের একটা মমতা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, কখনও উভয়েরই কখনও বা একজনের প্রবল সন্তানবাৎসল্য বিচ্ছেদ ঠেকিয়ে রাখে। যেখানে এ মনোভাব অনুপস্থিত সেইখানেই বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়। আর একটা কারণে ইদানীং বহু সংসারে দাম্পত্য কলহ বাড়ছে, সেটা হল সংসারে গৃহকর্ম একা মেয়েটিকেই সামলাতে হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের পক্ষে অত্যধিক পারিশ্রমিক দিয়ে লোক নিযুক্ত করে এবং গৃহকর্ম নির্বাহ করা সম্ভব। নিম্নবিত্ত পরিবারে ধরে নেওয়াই হয় যে বাইরে কাজ করলেও আর্থিক অসঙ্গতির জন্যে গৃহকর্মে

বাইরের লোকের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়; তাই সমস্ত চাপই বধূটির এবং একটু বড় ছেলেমেয়ের ওপরে পড়ে। মধ্যবিত্ত মানসিকতাটা ভৃত্যনির্ভর, কাজেই এখন বাইরে চাকরি করে যে বধূটি, সে জানে বাড়ি ফিরে অধিকাংশ গৃহকর্ম তাকেই সমাধা করতে হবে। এখনও মধ্যবিত্ত পুরুষের মানসিকতাটা এতটা মার্জিত নয় যে স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য না করাটা যে পুরুষের পক্ষে যথার্থ পৌরুষের অভাব এবং মানসিক দৈন্য, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই সূচিত করে তা উপলব্ধি করবে, এবং লজ্জা বা অপমান বোধ করবে এবং গৃহকর্মে স্ত্রীর সঙ্গে সমান ভাবে হাত লাগাবে। দোকানবাজার, বাসনমাজা, শিশুর সর্বাঙ্গীণ পরিচর্যা করা, ঘরমোছা, ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সমস্ত গৃহকর্মে সমান অংশ নেওয়াতেই যে পুরুষটির মানবিক মর্যাদা রক্ষিত হয়, অন্যথা যে সে মানুষ হিসেবে হেয় বলে প্রতিপন্ন হবে এ কথা স্মরণ রেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে স্ত্রীর সঙ্গে সমানে সব কাজ করা উচিত। খুব বিরল হলেও এর দৃষ্টান্ত ইদানীং কিছু আছে এবং সুখের বিষয়, ধীরে ধীরে হলেও এ দৃষ্টান্ত বাড়ছে। হয়তো এর একটা কারণ হল, কিছু কিছু ভারতীয় পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে এ ধরনের দাম্পত্য সাহচর্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আবার যাদের 'অন্ত্যজ' বলে ঘৃণা করা হয় তেমন নিচু জাতের মধ্যে এমন উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এ মনোভাব এবং গৃহকর্মে সাহায্যের এ উদ্যম স্বাভাবিক ভাবেই আসে যদি দাম্পত্য হয় প্রেমনিষ্ঠ। ভালবাসার মধ্যেই নিহিত থাকে সহানুভূতি এবং তা থাকলে স্ত্রীর কষ্ট লাঘব করার জন্যে স্বামীর স্বতঃউৎসারিত উৎসাহ আসবে। যেখানে মৌলিক ভালবাসার অন্তরালে থাকে পুরুষের মর্যাদা সম্বন্ধে বাসি বস্তাপচা ধারণা, যার বশে পুরুষ কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরা স্ত্রীকে চায়ের ফরমাস করে এবং সিগারেট টানতে টানতে চেয়ে দেখে ক্লান্ত স্ত্রীর ফের একদফা পরিশ্রমের ভূমিকা, সেখানে সে স্বামী সিনেমার টিকিট বা শাড়িগয়না দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করলেও স্বামীর স্বার্থপর নিষ্ক্রিয় আলস্য দেখে স্ত্রীর মনে যে স্বাভাবিক অভিযোগ পুঞ্জিত হতে থাকে, সেটা গভীর ক্ষোভে পরিণত হয়, কখনও বা ফেটে পড়ে আক্রোশে। সে দিন দারুণ দুঃখদিন। স্বামী নিশ্চিত জানে যে, স্ত্রী স্বামী এবং সন্তানদের অভুক্ত রাখতে পারবে না; কাজেই গৃহকর্ম পড়ে থাকবে না। পড়ে থাকেও না, কিন্তু তাতে দাম্পত্যের মর্মমূলে যে আঘাত লাগে তার কোনও প্রতিকার নেই। স্ত্রী যদি তখন বোঝে যে তার কষ্টে, পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে, ঘরে বাইরে একক পরিশ্রমের গ্লানিতে স্বামী বিচলিত নয়, তা হলে প্রকৃত অর্থে আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন সেই স্বামীর সম্পর্কে তার শ্রদ্ধায় চিড় লাগে এবং ধীরে ধীরে দাম্পত্য ক্লিষ্ট ও কলুষিত হয়। যত্রতত্র ভুল ইংরিজি বলে, বুঝে না বুঝে ইংরিজি ছবি দেখে, 'মামি ড্যাডি'র বকুনিতে বিগলিত যে অপসংস্কৃতিতে পুষ্ট আজকের মধ্যবিত্ত মানস, তার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সুস্থ দিকগুলি এখনও পৌঁছল না। তারা চোখ মেলে দেখলো না অধিকাংশ পাশ্চাত্য পরিবারে পুরুষ গৃহকর্মে কোনও গ্লানি বোধ করে না, স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বাসন ধোয়, মোছে, রান্নাও করে শিশুর সেবাযত্নও করে। এইখানে যদি এদেশি নারী দাবি করে স্বামী তার পারিবারিক শ্রমের অর্ধাংশ বহন করুক, তবে সেটা তো

একেবারেই অযৌক্তিক দাবি নয়। এবং এ সাহচর্য না পেলে যদি তার দাম্পত্যে অতৃপ্তি জন্মায়, তবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরেই গেরস্থালির জোয়ারে 'স্বেচ্ছায়' নিজেকে যুক্ত করে যে সব নারী তাদের উচ্চকণ্ঠে যে প্রশংসা করা হয় তা সম্পূর্ণ ভাবেই পুরুষের স্বার্থ-প্রণোদিত নীচতার প্রতীক। তার বদলে যদি অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হত সেইসব পুরুষের, যারা গৃহকর্মে স্ত্রীর ভার লাঘব করবার জন্যে বহু কাজ স্বেচ্ছায় করে, তবে স্ত্রীই যে শুধু সহানুভূতি ও মানসিক আশ্রয় পেত তাই নয়, দাম্পত্য ছন্দপতন ঘটত না এবং ছেলেমেয়েরাও ভিন্নতর, সুস্থতর একটি মূল্যবোধের পরিবেশে লালিত হত; তারাও বুঝত যে, কোনও শ্রমই মানুষকে, পুরুষকেও— হীন করে না, বরং স্বনির্ভর হতে শেখায় এবং তার একটা নিজস্ব গৌরব আছে। এ ধরনের সহমর্মিতায় দাম্পত্যের মর্যাদা অনেক বাড়ে।

বিবাহ হলেই বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে এবং এ প্রশ্ন সঙ্গে নিয়ে আসে বহুতর জটিল সমস্যা; সেই কারণে বিবাহ এবং বিবাহ অনুষ্ঠানটিই বাহুল্য এই বোধে এখন বহু তরুণ তরুণী বিবাহ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে উদাসীন হয়ে উঠেছে। তাদের মতে যদি প্রেমই হয় বিবাহের ভিত্তি, তবে তার ওপরে ধর্মানুষ্ঠানের গোবরজল ছড়া দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বহু শতাব্দী পূর্বে গান্ধর্ব বিবাহকে স্বীকার করে এ দেশের সমাজই তো এ কথা মেনে নিয়েছিল। আইনের সমর্থন সম্বন্ধে এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা সন্তান চাইনা, যদি কখনও চাই তখন আইনের সমর্থন চাইব সন্তানের বৈধতার জন্যে।' অন্য কেউ কেউ বলে 'শিশু কোনও অবস্থাতেই অবৈধ নয়, সংসারে যে এসেছে, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য। পিতামাতা চাইলে এবং পারলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে, না পারলে রাষ্ট্র নেবে, কিন্তু তাকে অবৈধ বলা চলবে না।' অর্থাৎ সামাজিক বা আইনের সমর্থিত বিবাহের ছাপ নিষ্প্রয়োজন। ওই ছাপে সন্তান এক ধরনের স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা পায় এ কথা তো সত্যই। পিতৃপরিচয়, পারিবারিক পরিচয় শিশুকে এক বৈধ স্বীকৃত নাগরিকের মর্যাদা দেয়। এখন যারা বলছে এটা নিষ্প্রয়োজন, তারা বলছে সর্ব অবস্থাতেই শিশুর ওই মর্যাদা প্রাপ্য,, তার অবিবাহিত জনকজননীও যে তার জন্মদাতা জন্মদাত্রী, সেই পরিচয়ই যথেষ্ট, তারা বিবাহিত কিনা সেটা অবান্তর। এ জন্যে এখনও সমাজ যে অবস্থায় আছে তাতে রাষ্ট্রের অ-সমর্থন যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। বিবাহ যদিও দুটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তবুও রাষ্ট্রও এতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। মেহতা লিখছেন, 'বিবাহ হল পরিবার সৃষ্টির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি সংবিধানসম্মত মিলন। এই কারণেই রাষ্ট্র এই মিলনে উৎসাহী এবং এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার কর্তব্য নিজে স্বীকার করে নেয়।'[১] বিবাহ অর্থাৎ রাষ্ট্রসমর্থিত নারী পুরুষের মিলন থেকে সন্তান এলে একটি পরিবারের সূচনা হয়, যা ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে বৃদ্ধিলাভ করে। অর্থনৈতিক,

১. 'Marriage is a legalized union betwen man and woman entered into with a definite purpose of raising a family It is because of this purpose that the state is interested in the union and takes upon itself the duty of regulating it.' *Indian Woman*, p. 129

রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক একক সেই পরিবার; কাজেই তা যেন সমাজের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে প্রবর্তিত হয় সে স্বার্থ সমাজ তথা রাষ্ট্রেরই। বিবাহ রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যারা রাষ্ট্রের ও সমাজের এই ছক অস্বীকার করে, স্বভাবতই রাষ্ট্র তাদের সম্বন্ধে দায়িত্ব নিতে চাইবে না। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, 'সমাজে বিবাহের দ্বারা যে একটি পারিবারিক একক সংযুক্ত হচ্ছে এতেই রাষ্ট্রের সন্তোষ এবং এই জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রে বিবাহের একটা স্থান আছে; নতুবা একটি বিবাহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি প্রত্যক্ষ অন্য কোনও যোগ নেই। যখন দুটি পক্ষ তাদের মিলিত হওয়ার বাসনাকে প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করে তখন বিবাহ সংক্রান্ত খুব প্রগতিশীল আইনও তাতেই তুষ্ট হয়।'[২] কাজেই বিবাহের একটা প্রান্তে দুটি ব্যক্তি থাকলেও অপর প্রান্তে পরিবার, এমনকী সমাজকেও অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্রেরও একটা ভূমিকা লক্ষিত হয়। এই কারণে আদিম যুগে মানুষ যৌনমিলনের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা ভোগ করত, এখন আর তার সে স্বাধীনতা নেই। যা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সে আচরণ নিয়ে দম্পতিকে জবাবদিহি করতে হয় রাষ্ট্রের কাছে। রাষ্ট্র খবরদারি করে যেন তার যৌন বা দাম্পত্য আচরণ রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতিসাধন না করতে পারে। অথচ যৌন আচরণের অন্য দিকটায় পুরুষের পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা: গণিকাগমন, পরস্ত্রীগমন, ইত্যাদির জন্যে তাকে কোথাও জবাবদিহি করতে হয় না। নারীর এ অর্থে কোনও প্রকাশ্য ও যথার্থ বিকল্প ক্ষেত্র নেই যেখানে সে তার অতৃপ্ত যৌনকামনা চরিতার্থ করতে পারে। এই হল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আইনের চোখে নারীপুরুষের বৈষম্যের একটা প্রকাশ। এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে নারীর এই অবনমন হল সামাজিক পরিবেশে নারীর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের অভাবের ফল— হেতু নয়। অর্থাৎ, 'অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকেই আইনের দৃষ্টিতে এই দু'জনের, নারী ও পুরুষের যে বৈষম্য পূর্বপুরুষের সামাজিক উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে, তা নারীর অর্থনৈতিক নির্যাতনের কারণ নয়, কার্য বা ফল মাত্র।'[৩]

বিবাহিত জীবনে দম্পতির মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দেয় যা বিশেষ ভাবে দাম্পত্য জীবনেরই সমস্যা। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, যে-কোনও দু'জন মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই সংঘাতের ও সমস্যার অবকাশ আছে। বাবা মা ছেড়ে মেয়েদের মধ্যে, ভাইবোনের মধ্যে, মাসি-পিসি-জেঠি-খুড়ির সঙ্গে, ভাইপো-ভাইঝি-বোনপো-বোনঝিদের সঙ্গে, জ্যাঠা-খুড়ো-মামা-মেসোর সংঘাত একটুও অপরিচিত নয়। এমনকী দুই প্রজন্ম পেরিয়েও কখনও কখনও

২. 'As far as marriage is concerned, even the most progressive law is fully satisfied as soon as the parties formally register their voluntary desire to get married.' *Origin of Family, Private Property and the State*, p. 211

৩. 'The inequality of the two (man and woman) before the law which is a legacy of the previous social conditions is not the cause but the effect of the economic operession of woman.' *Origin of the Family*, etc. p. 211

দিদিমা-দাদু, ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গেও নাতি-নাতনির সংঘর্ষ ঘটে থাকে। সে দিক থেকে দেখলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বা অনৈক্য স্বতন্ত্র কিছু নয়। কিন্তু পৃথিবীর এই একটি মাত্র আত্মীয়তা যা রক্তের সম্পর্কের ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, রক্তের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত দুটি মানুষকে হিসেব করে পূর্ব পরিকল্পনার ফলে কাছাকাছি আনা হয় বা তারা স্বেচ্ছায় কাছাকাছি আসে। এখানে চেষ্টা করলেও বিবাহোত্তর জীবনের সংঘাত এড়ানো যেত না; খুব মধুর সূচনার পরেও তিক্ততা আসতে পারে এবং অত্যন্ত সাদামাটা ব্যবহারিক সূচনার পরেও গভীর প্রেমের মাধুর্য আসতে পারে। এই একটি মাত্র সম্বন্ধ যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে নতুন মানুষ আসে এবং যাকে অবলম্বন করে বহু মানুষ আশ্রয়, সাহচর্য লাভ করতে পারে। অতএব এ সম্পর্কটি যদি প্রেমের ভিত্তিতে এবং কিছু প্রলম্বিত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, যাতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ রুচি বা আদর্শের সংঘাত দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তা হলে এই সম্পর্কটিতে যথার্থ আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য পরে সম্পর্কটি নষ্ট হওয়ার, অর্থাৎ পূর্বপ্রেমের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা ঠেকানো যায় না, তবু হয়তো আনুপাতিক ভাবে সে সম্ভাবনা কিছু কমে।

বিবাহে যে দুটি মানুষ কাছাকাছি আসে তারা তাদের দেহ ও মন নিয়েই পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, এর যে নানা অনুসঙ্গ তা অনেক সময়ে চাপা পড়ে যায় এর আইনগত দিকটির অন্তরালে। 'বুর্জোয়া ধারণা অনুসারে বিবাহ একটা চুক্তি, একটা সংবিধান সংক্রান্ত ব্যাপার, এবং সত্যিই এ ধরনের ব্যাপারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা সারা জীবনের মতো দুটি দেহ ও মনের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।'[৪] এই সম্পর্কটির নানা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনও সম্পর্কেই থাকে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজে ও পরিবারে বহুধাব্যাপ্ত, বহু গভীরে প্রোথিত এদের মূল এবং জীবনের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে এগুলির প্রসার। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জীবনে বহু গঠনমূলক বা ধ্বংসমূলক প্রভাব আনতে পারে, যা অন্য কোনও সম্পর্কে কেউই তেমন ভাবে বিশেষ আনতে পারে না। মা বাবার প্রভাব সন্তানের জীবনে নিশ্চয়ই খুব ব্যাপক হতে পারে, কিন্তু এ প্রভাব সন্তানের জন্ম থেকেই শুরু হয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং কিছুকাল পরে প্রত্যক্ষত এ প্রভাব আর থাকে না; সন্তানের স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। পারস্পরিক প্রভাবের কালসীমা হ্রস্বতর এবং ব্যতিক্রমী কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, এ প্রভাবের গুরুত্বও তেমন বেশি নয়। কিন্তু স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জীবনে প্রবেশ করবার পর থেকেই দু'পক্ষই নতুন একটি মানুষের জীবনবোধ, রুচি, আদর্শ, স্নেহমমতার প্রকাশ ও ক্ষেত্র, সহমর্মিতার গভীরতা ও অধিকার এ সব সম্পর্কেই এমন স্পর্শকাতর থাকে যে পারস্পরিক প্রভাব— ভাল, মন্দ অথবা মিশ্র— অতি দ্রুত

৪. 'According to bourgeoies conceptions matrimony was a contract, a legal affair, indeed the most important of all, since it disposed of the body and mind of two persons for life.' *Origin of the Family*, etc. p. 216

অনুভূত হয় এবং সে প্রভাব দুটি জীবনের পরিসরে সুদূরপ্রসারী হয়। কখনও কখনও তা অতি তীব্র ভাবে লক্ষিত হয়। ১৭৯২ সালেই মেরি উলস্টোনক্রাফট বলেছিলেন, 'দুটি লিঙ্গের মানুষ পরস্পরকে নষ্ট অথবা উন্নত করে।'[৫] এই আর একটা কারণেও দাম্পত্যের সামাজিক গুরুত্ব এত বেশি। দুটি মানুষ পরস্পরের নিকটতম সাযুজ্যে এসে ক্রমে ক্রমে নীতিনিষ্ঠ, আদর্শের অনুসারী উন্নততর মানুষে পরিণত হতে পারে, আবার একে অন্যের নীতিভ্রষ্টতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমে স্বার্থসংকীর্ণ দুর্জনেও পরিণত হতে পারে। তৃতীয় পরিণাম, অন্য পক্ষের অশুভ প্রভাব থেকে সরে থাকার দুঃসহ নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা সারাজীবন বহন করে চলতে বাধ্য হওয়া। যেমন গান্ধারী, হয়তো বা মন্দোদরীও। এই সম্পর্কটি দুটি মানুষকে এত কাছাকাছি আনে যে মনের দিক থেকে সাহচর্য না পেলে সেটা মর্মান্তিক যন্ত্রণারই হতে পারে। এ দুঃখ প্রাকবিবাহ পর্বে নিবারণ করবার কোনও উপায়ই নেই, শুধু যথাসম্ভব একে অপরের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে নেওয়া যে দৈনন্দিন জীবনে রুচি, আদর্শ বা মূল্যবোধের সংঘাত অসহ্য হয়ে উঠবে কিনা।

এ প্রসঙ্গে দু'টি কথা সত্যি। জীবনের অন্যান্য কিছু সম্পর্কেও আন্তর-বিরোধ দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে। তবে ডিভোর্সের মতো প্রকাশ্য এবং কষ্টকর পদ্ধতি ছাড়াও তেমন অধিকাংশ সম্পর্ক থেকেই পরিত্রাণের উপায় আছে। যদি একে অপরের ওপর আর্থিক বা শারীরিক ভাবে নির্ভরশীল হয় (রোগে, পঙ্গুতায় অথবা মস্তিষ্কবিকৃতিতে) তা হলে এ ধরনের মুক্তিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্র অবশ্য এখন এ ধরনের অনেক পরিস্থিতিতেই দায়িত্ব নিচ্ছে; আশ্রয় এবং/বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাচ্ছে। কিন্তু দম্পতির মধ্যে পরস্পরনির্ভরতার অনুষঙ্গ অনেক বেশি গভীর ও জটিল, ফলে বিচ্ছেদও সেই অনুপাতে দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়ত, আইন যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাতে গোড়া থেকেই বিচ্ছেদ অনিবার্য বলে ধরে না নেওয়া হয়। সব কিছুই ভাঙা অনেক সোজা, জোড়া বা জুড়ে রাখা অনেক কঠিন। তাই বহু দম্পতিই আন্তর-দূরত্ব মেনে নিয়েও কাজ-চলা-গোছের একটা আপোষ করে নেন, এতে হয়তো সন্তানরা পারিবারিক আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার দুঃখটা পায় না। তবে সেটাই যে সব ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় তা নয়, কারণ স্বভাবে উগ্র বা অসহিষ্ণু বা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হলে অনেক ভাঙা পরিবারে, যে ধরনের কলহ ও উচ্চগ্রামে পরস্পরকে দোষারোপ চলতে থাকে, কখনও বা রুচি ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেও— তার মধ্যে যে সন্তান বেড়ে ওঠে সে কি সুস্থ পরিবেশ পায়? এ সব ব্যাপারে অবশ্য প্রত্যেক দম্পতিকে পরিস্থিতি অনুসারে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, কোনও সাধারণ সূত্রই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দাম্পত্য জীবনে কোনও বিপত্তি দেখা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে দোষ দেওয়া হয়। দাম্পত্য সুখও যেন একা নারীরই হাতে, 'সে স্বামীর মতের অনুবর্তিনী হলেই গৃহে সুখ

৫. 'The two sexes mutually corrupt and improve each other' *A Vindication of the Rights of Women* p. 153

থাকে, গৃহাশ্রমের তুল্য কিছুই হয় না যদি নারী স্বামীর বশানুগা হয়।[৬] দাম্পত্য বিরোধে স্বামীর কোনও দায়িত্ব নেই, কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের ছায়েবানুগামিনী হবে এইটেই অপেক্ষিত; নারীর কোনও ব্যক্তিত্ব, মতস্বাতন্ত্র্যের কোনও অবকাশই শাস্ত্র রাখেনি। অথচ সাহিত্য কিন্তু অন্য কথা বলে। গান্ধারী প্রকাশ্য রাজসভায় স্বামীর মতের বিরোধিতা করেছেন, দ্রৌপদী স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্ম নিয়েই তর্ক করেছেন। গঙ্গা, শকুন্তলা ও সত্যবতী নিজেদের শর্তে বিয়ে করেন; মহাভারতে শকুন্তলা প্রকাশ্য রাজসভায় দুষ্যন্তকে নানা ভাবে ভর্ৎসনা করেন।[৭] তার চেয়েও বড় কথা অরুন্ধতী স্বামী বশিষ্ঠকে সন্দেহ করে ত্যাগ করে যান।[৮] অনসূয়া স্বামী অত্রিকে ছেড়ে যান এই বলে যে, 'আমি কোনও মতেই ওর বশে থাকব না।'[৯] দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা স্বামীকে ত্যাগ করে সোমের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বাস করেন। সোমের পুত্র বুধ জন্মানোর বেশ কিছুকাল পরে ওই ছেলেকে নিয়েই বৃহস্পতির কাছে আসেন ও দু'জনে আবার এক সঙ্গে বাস করতে থাকেন।[১০] সুগ্রীবের স্ত্রী তারা বালীর সঙ্গে বাস করার পরে আবার সুগ্রীবের কাছে ফিরে আসেন। এমন আরও বেশ কিছু নিদর্শন আছে যেখানে নারীর আচরণে শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পাই সাহিত্যে। এটা জানা যে, সমাজ নারীর কাছে যা প্রত্যাশা করে সেই নিরিখেই শাস্ত্র রচিত হয়, কিন্তু সাহিত্য জনমানসে দীর্ঘকাল সঞ্চরমাণ বহু কাহিনির মধ্যে বেঁচে থাকে, ফলে লিপিবদ্ধ হয়ে যখন তা স্থায়িত্ব লাভ করে তখন শাস্ত্র বচনের সঙ্গে না মিললেও নিজের সত্য সত্তার জোরেই তার পরমায়ু অক্ষয় হয়। তাই অনুজ্ঞা ও আচরণে বৈষম্য থেকে যায়। অনুজ্ঞা বলে স্ত্রীর নিজস্ব মত থাকবে না, সে স্বামী ও তার আত্মীয়স্বজনের নিষ্প্রতিবাদ পরিচর্যা করেই জীবনে চরিতার্থতা লাভ করবে; স্বামীই তার ইহপরকালের প্রভু। 'স্ত্রী স্বামীর হাতে নিজের সম্পূর্ণ সত্তার ভার দিলেই স্বামী তার জীবনে তাৎপর্য এনে দেবেন।'[১১] এটা এখনও অধিকাংশ সমাজের অনুক্ত প্রত্যাশা। স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের একমাত্র প্রভু, যিনি স্ত্রীর সত্তাকে অর্থপূর্ণ করেন। কী ভাবে? তাকে পত্নীর আসনে স্থান দিয়ে। এতে শুধু যে নারীর সহজাত মানসিক ন্যূনতা প্রতিপন্ন হচ্ছে তা নয়, সে ন্যূনতা পূরণের একমাত্র উপায় যে বিবাহ, তাও সংকেতিত হচ্ছে। এই বোধই সহমরণের নির্দেশের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এবং সহমরণ শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষেই আচরিত হত না, অন্যত্র এর বেশ কিছু দৃষ্টান্ত মেলে। 'থ্রেসে স্বামীর মৃত্যুর পর

৬. পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোহনুবর্তিনী স। গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্যা বশানুগা। *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা* (৪:১)
৭. মহা. (১:৬৯:১-২৭)
৮. মহা. (১:২২৪:২৭-২৮)
৯. মহা. (১৩:১৪:৬৫-৬৭)
১০. দেবীভাগবত পুরাণ (১:১১)
১১. 'She has only to put her existence in his hands and he will give it meaning.' *The Second Sex*, p 467

তার সমাধির ওপরে তার নিকটতম আত্মীয় স্ত্রীকে বধ করে দু'জনকে এক সঙ্গে সমাধিস্থ করত।'[১২] 'গলদের মধ্যেও স্ত্রীর জীবনমৃত্যুর ওপরে স্বামীর প্রভুত্ব ছিল এবং বিধবার আত্মহনন বাধ্যতামূলক ছিল।'[১৩] বিগত তিন হাজার বছরের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দাম্পত্য সম্পর্ককে বিশেষিত করেছে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব যাতে এ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী ব্যাপারে একটা রাজাপ্রজা মনোভাব উভয়েই মেনে নিয়েছে। এখনও বহু পরিবারে পুরুষের অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারীর বিশ্বাস আছে। এ বিশ্বাস সে সমাজ ও পরিবারের সুদীর্ঘ বিবর্তনের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে— তার মা-দিদিমা, শাশুড়ি-ননদ প্রতিবেশিনীদের নির্দ্বিধায় বারংবার উচ্চারণের দ্বারা এটা তার মধ্যে অলক্ষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই বিশ্বাস 'শুধুমাত্র স্বামীর লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রভুত্বের অধিকার হিসাবে স্বীকার করে স্বামীর অহমিকাকে পুষ্ট করেছে।'[১৪] এ ধারণার পশ্চাতে কার্যকরী আর একটি ধারণা, তা হল নারী মাত্রই পুরুষের তুলনায় হীন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই এই ধারণাটি সৃষ্টি ও প্রচার করেছে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় আজ এ ধারণার ভ্রান্তি ধরা পড়েছে এবং ক্রমেই এটি ভ্রান্ত বলে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত মানসে প্রতিভাত হচ্ছে। স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, 'এ কথা ঠিক নয় যে, লিঙ্গের প্রকৃতিই তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্রে ও (সামাজিক) অবস্থানের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায়, এবং তাদের এগুলির উপযুক্ত করে তোলে।'[১৫] অথচ লিঙ্গগত বৈষম্য যে পরিবারে ক্ষমতা, প্রাধান্য, দায়িত্বের, বৈষম্যের ভিত্তি এমনই একটি ধারণা নারীপুরুষ নির্বিচারে সকলেরই অবচেতনে অল্পবিস্তর কার্যকর; এবং এর ফলেই এ ধরনের বৈষম্য মেনে নিয়েই পরিবারের পত্তন হন।

এই বৈষম্য মেনে নেওয়ার ফলে পরিবারে নারীর অবদান একটি অনুচ্চারিত (মধ্যে মধ্যে সরবে উচ্চারিতও) মূলসূত্র। নারীর হীনতা সম্বন্ধে বোধ এত গভীর ও এমন ব্যাপক যে নারীর পক্ষে সুবিচারের আশা করাই ধৃষ্টতা। ফরাসি বিপ্লবের পরে যে সংবিধান রচিত হয় তার সম্বন্ধে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, সংবিধান কিছু ব্যক্তিকে অন্যদের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে, কিন্তু নারীকে কিছুই দেয়নি।'[১৬] এই ধরনের বৈষম্য পৃথিবীর সকল দেশে

১২. 'Thracian wives were slain over the grave by the hand of their next of kin, and then buried with their husband. Herodotus.' *The Histories*. IV 71

১৩. 'Gallic husbands right on wives life and death and to the obligatory self-immolation of the widow.' Caeser *Gallic War* vi: 19

১৪. 'Woman feeds man's vanity as the dominant person ' *The Second Sex*. p 208

১৫. 'Neither does it avail to say that the nature of the two sexes adapts them to their present functions and position and renders these appropriate to them.' *The Subjection of Women*, p. 238

১৬. 'The constitution gave some men more rights than other, but gave none to women ' *In the Company of Educated Women* p. 11

বহু যুগ ধরে চলিত আছে অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমীক্ষা বলে 'পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী; এরা পৃথিবীর মোট শ্রম-প্রহরের দুই তৃতীয়াংশ পরিশ্রম করে; পৃথিবীর উপার্জনের এক দশমাংশ ভোগ করে; এবং পৃথিবীর সম্পত্তির এক শতাংশেরও কমের অধিকারিণী।' এমন এক ভয়াবহ চিত্র সম্ভবই হত না, যদি না নরনারী নির্বিচারে মানবমনের অবচেতনে নারীর হীনতা সম্বন্ধে ধারণা, সুদীর্ঘকাল ধরে পুঞ্জিত হয়ে থাকত। নারীর ন্যূনতা প্রকৃতিদত্ত, এই বিশ্বাসের ফলেই নারীর স্থান দাম্পত্যে, পরিবারে ও সমাজে পুরুষের নীচে। এই হীনতা প্রমাণ করার কোনও দায় কেউ কোনও দিন বোধ করেনি, ফলে স্বতঃসিদ্ধের মতো এ বোধ নারী ও পুরুষ মেনে নিয়েছে এবং পুরুষ কোনও দিন চিন্তা করেনি যে, দাম্পত্যে নারীর সমানাধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে। এই অধিকার না থাকার ফলে নারীর অন্তর্জগৎ কী পরিমাণে বিধ্বস্ত, বিষাদগ্রস্ত ও হতাশাময় হতে পারে তা নিয়েও সে কখনও ভাবেনি।

কদাচিৎ এমন দম্পতি দেখা যায় যেখানে স্ত্রী আপন যোগ্যতায়, বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃতিত্বে স্বামীর ওপরে স্থান পেয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্বামী হীনম্মন্যতায় ক্লিষ্ট এবং তাদের অনেকেই বিদ্রূপ বক্রোক্তি ও কর্কশ ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর বশ্যতা অর্জন করবার চেষ্টা করে। এই অসাম্যের একটা দৃষ্টান্ত হল স্ত্রী যদি কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থও হয়, তার বদলি হলে কদাচিৎ স্বামী তার কর্মক্ষেত্রে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বাস করে। অপরপক্ষে স্বামীর বদলি হলে কর্মরতা স্ত্রী কাজে ইস্তফা দিয়ে স্বামীর কর্মস্থলে চলে যাবে, এইটেই সাধারণ ভাবে অপেক্ষিত। কিছু কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে এবং ইদানীং তা বাড়ছে: বেশ কিছু দম্পতি এখন যে যার কর্মস্থলে একাই থাকেন, ছুটিতে একত্র হন। ব্যবস্থাটি বাঞ্ছনীয় নয়, তবে যে পর্যন্ত না উভয়ের কর্মস্থল এক জায়গায় আনা সম্ভব হয়— যদি তা আদৌ হয়— ততক্ষণ এটি হয়তো পূর্বের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি খারাপ নয়। এখানে অন্তত স্ত্রীর কর্মের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি আছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। নারী ও পুরুষের পক্ষে বিবাহের অর্থ বা অনুষঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নয়। 'বিবাহের জৈব, আবেগগত, মানসিক প্রয়োজন নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে মূলত একই, কিন্তু এই প্রয়োজনগত সাম্য পারস্পরিক সম্পর্কে কোনও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।'[১৭] এখনও বিবাহ নারীর পক্ষে অনেক বেশি গুরুভার, অনেক বেশি দায়িত্বের প্রতীক। পুরুষ বিবাহকে গৃহ এবং গৃহিণী পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু এখন পুরুষের পক্ষে এই দুইয়ের দায়িত্ব এতটা দৃঢ় নয় যে, তার থেকে সে সরে যেতে পারে না। বস্তুত, সরে যাওয়ার বহু পথ তার সামনে ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই খোলা। 'সে (পুরুষ) গৃহ ও গৃহিণী চায় কিন্তু এ দুই থেকে পলায়নে স্বাধীনতাও তার চাই।'[১৮] সিমোন দ বোভোয়া

১৭. 'The two sexes are necessity to each other but this necessity has never brought about a condition of reciprocity between them.' The Second Sex, p. 446

১৮. ' he wants to have hearth and home while being free to escape therefrom.' প্রাগুক্ত; p 475

এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত অত্যুক্তি করেছেন এই বলে যে, 'বলা হয় বিবাহ পুরুষকে খর্ব করে। এ কথা প্রায়শই সত্য, কিন্তু প্রায় সর্বদাই বিবাহ নারীকে ধ্বংস করে।'[১৯] এই মতের শেষ প্রান্তে আছে বিবাহ প্রেমকে হত্যা করে আসলে পবিত্র দাম্পত্য স্বর্গেই রচিত হয়; ঈশ্বর নির্বাচিত বর বধূই মর্ত্যে মিলিত হয়; জ্যোতিষ শাস্ত্রের নির্দেশে রাজযোটক মিলন ঘটে। নানাদি অলৌকিক বিভায় মণ্ডিত দাম্পত্যকে ওই কৃত্রিম গৌরব থেকে মুক্ত করে বাস্তব পরিস্থিতিতে এর যথার্থ রূপ ও বহু বিচ্যুতি, বহু কলঙ্ক এবং নিতান্ত স্বার্থসংকীর্ণ উদ্দেশে সংঘটিত এই বিবাহকে অনলংকৃত রূপে দেখবার চেষ্টাতেই বোভোয়া বিপ্রতীপ প্রান্ত থেকে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। এতকাল যাকে দিব্য বিভার পরিমণ্ডলে কৃত্রিম ভাবে স্থাপিত করা হয়েছিল, গ্রন্থকর্ত্রী দেখালেন তার মধ্যে বহু ফাঁক, বহু ফাঁকি। এবং বিবাহের দীর্ঘ জটিল ইতিহাস স্মরণে রাখলে এ দেখারও মূল্য আছে। এ-ও ভ্রান্ত দর্শনমাত্র নয়।

১৯. 'It has been said that marriage diminishes man, which is often true, but almost always it annihilates woman ' প্রাগুক্ত; p 496

শৃংখলা

বিবাহ কী? বিশেষ ভাবে বহন করা? বি + বহ্ ধাতু + ঘঞ্? বিবাহ কি আত্যন্তিক ভাবে অনুষ্ঠান বা রাষ্ট্রবিধি নির্ভর? অর্থাৎ পুরোহিত, পাদরি বা মোল্লার মধ্যস্থতায় নিষ্পাদিত একটি চুক্তি অথবা রেজিস্ট্রেশনে সম্পাদিত একটি পারস্পরিক চুক্তি? এইগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহে যে দুটি মানুষ যুগ্ম জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয় তার মধ্যে পরে নানা অসংগতি ও বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং অনেক সময়ে দেখা দেয়ও। 'কেহ কাহাকেও লঙ্ঘন করিবে না' ইত্যাকার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে একপক্ষ অপরকে লঙ্ঘন করে থাকে। 'যতক্ষণ মৃত্যু আমাদের না বিচ্ছিন্ন করে' ততক্ষণ দু'জনের পরস্পরের সঙ্গে সুখে দুঃখে, রোগে ভোগে একত্র থাকার অঙ্গীকার সত্ত্বেও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবস্থাবিশেষে প্রেম অন্তর্হিত হওয়ার পরেও মৃত বিবাহের জের টেনে চলা গ্রিক পুরাণের সিসিফাস্-এর দণ্ডের সমতুল্য হয়ে যায়— সে দণ্ডের কোনও প্রতিকার বা অবসান নেই। বিচ্ছেদ দেখা দেয় কখনও দু'জনের মধ্যে কোনও তৃতীয়ের আবির্ভাবে কখনও বা উভয়ের যুগ্ম জীবনের মধ্যে কোনও এক বা একাধিক অসঙ্গতির ফাটল দেখা গেলে, কখনও আগন্তুক কোনও আঘাত বা মতদ্বৈধে। কারণ যাই হোক, ধর্ম বা আইনের সামনে গৃহীত শপথের বন্ধন যে অক্ষয় নয় তা বারে বারেই দেখা গেছে। তা হলে দুটি মানুষের মিলিত জীবনের পক্ষে এ শপথ অপরিহার্যও নয়, ইষ্টসাধকও নয়।

অথচ অনাদ্যন্ত কাল ধরে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে পেতে এবং সে পাওয়াকে স্থায়ী করতে চেয়েছে। এটা একটা সুস্থ স্বভাবিক চাওয়া, যার রূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পাঁচ ছয় হাজার বছর ধরে সাহিত্যে চিত্রিত ও অভিনন্দিত হয়েছে; সে চিত্র মানুষকে মুগ্ধ করেছে, আগ্রহী করেছে আপন উপলব্ধিতে এই মিলনকে পেতে, স্থায়ী করতে। তা হলে ধর্ম বা আইনের সমর্থন ছাড়াও এই মিলনের জন্য আকুতির একটি প্রকৃতিগত ভিত্তি আছে। ধর্ম বা আইন এ মিলনকে বাইরে থেকে একটা ছকের মধ্যে ভরে একে নিরাপদ ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করেছে। তাতে সমাজ স্বস্তি পেয়েছে। সন্তানরা এবং দম্পতিও এক ধরনের একটা নিরাপত্তা বোধ পেয়েছে। কিন্তু, এই মিলনের ভিত্তি যদি হয় একটি নারী ও একটি পুরুষের অন্তরের টান, তা হলে যথার্থ নিরাপত্তার ভিত্তি তো সেই অন্তরের টানেই। সেই টান যদি একদিন শিথিল হয় তা হলে আইন বা ধর্ম তখন বাইরে থেকে চাপানো বন্ধন মাত্র হয়ে ওঠে এবং সে

বন্ধনের মধ্যে সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি, লালন, ইত্যাদির নিরাপত্তা থাকলেও দম্পতির মানসলোকে সে নিরাপত্তা তো ততক্ষণে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, ঐক্যদাম্পত্যে মানুষ পৌঁছেছে ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে। গোষ্ঠী দাম্পত্য, কৌম দাম্পত্য, কৌল (কুল বা বৃহৎ পরিবারের) দাম্পত্য পার হয়ে তবে দাম্পত্য পৌঁছেছে ঐক্যদাম্পত্যে। এবং দাম্পত্যের ইতিহাসে এর স্থায়িত্বও নেহাৎ কম নয়। এর আশ্রয়ে দাম্পত্য এমন এক স্থিতি লাভ করেছিল যা সভ্যদেশে একে এত দীর্ঘস্থায়ী করেছে। আজ বহু ব্যতিক্রম বহু বিঘ্নে এ সম্বন্ধের প্রান্তে একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। পরিবার নিয়ে এঙ্গেলস, দাম্পত্য নিয়ে সিমোন্ দ বোভোয়া অনেক সংশয় প্রকাশ করে এ দুটির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখন বিবাহ সম্বন্ধে আইন খোলা রেখেছে অবাঞ্ছিত দাম্পত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ, ফলে অনিচ্ছায় আমরণ বন্দিত্ব মেনে নেওয়া আজ আর বাধ্যতামূলক নয়। যদিও এ মুক্তির সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক সমস্যাও দেখা দেয়— সন্তানের ভবিষ্যৎ, উপার্জনহীনা বধূর ভবিষ্যৎ, সংযুক্ত আয়ে কেনা সামগ্রী ও বাসস্থানের বিভাগ, ইত্যাদি, তবুও অসহ্য দাম্পত্য মুখ বুজে বহন করার দায় আজ আর কোনও পক্ষেরই নেই। কাজেই এখন আর একবার দাম্পত্য সম্বন্ধে নতুন করে ভাবা যেতে পারে।

ব্যতিক্রম এখনও স্বল্প সংখ্যক হলেও কিছু কিছু ঘটছে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে। বিয়ে না করে একত্রবাস, বিয়ে ভেঙে অন্যের সঙ্গে একত্রবাস, বিয়ে রেখেও যুগপৎ এক বা একাধিক সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাহচর্য— সদর রাস্তায় না হলে খিড়কির রাস্তায়— এ সবের ফলে বিবাহ ব্যাপারটাই আর একবার কাঠগড়ায় উপস্থিত। বলা বাহুল্য, এ সব ব্যতিক্রম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও মাত্রায় বহুকাল ধরেই সমাজে চলিত ছিল, আজ এগুেলো অনেক বেশি প্রকাশ্য এবং নায়ক নায়িকারা অনেক বেশি নিঃসংকোচ। এবং এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের প্রতি এক ধরনের অনুচ্চারিত প্রতিস্পর্ধা। এ ছাড়াও বর ও কন্যাপক্ষের চেষ্টায় সংঘটিত বিয়ে ও প্রেমের বিয়ে ছাড়াও নতুন এক ধরনের বিয়ে ইতস্তত ঘটছে। সেখানে সম্ভাব্য পাত্র ও পাত্রী প্রেমে না পড়ে বিজ্ঞাপন দেখে বা অন্য কোনও ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে দু'জনে একত্রে বসে সেই সব আলোচনা করছে, যার অনেকটাই আগে দু'পক্ষের মা বাবারা করতেন। এক কথায়, এর মূল ব্যাপারটা হল বৈষয়িক হিসেব— আয় ব্যয়, বাসস্থান, আসবাবপত্র, পারিবারিক দায়িত্ব, জীবনযাত্রার আর্থিক মান, সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শখ শৌখিনতা সম্বন্ধে আলোচনায় ঐকমত্যে পৌঁছবার প্রয়াস, মোটামুটি জীবন সম্বন্ধে ধারণা। গরমিল থাকলে আলোচনায় তার নিরাসনের চেষ্টা এবং সব দিকে সন্তোষজনক বোঝাপড়া হলে তবে বিবাহ। এ সব বিবাহের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম অনুপস্থিত থাকে এবং ব্যাপারটা নতুন হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংসার প্রেম ও আবেগ ছাড়াই ঠিক চলছে, , পরস্পরকে সহনীয় বা পছন্দ করা যায় এমন সহাবাসিক রূপে মেনে নিয়ে। এই দাম্পত্যে যৌন সম্পর্ক আছে, আর আছে বৈষয়িক, ব্যবহারিক সহযোগিতা, হয়তো চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু সাযুজ্য, রুচির ক্ষেত্রে ঐক্য। কিন্তু প্রেম এ সব বিয়েতে কদাচিৎ দেখা যায়, এবং এ সব দম্পতি

প্রেমের জন্যে উৎসুকও নয়, প্রেমের অভাবে এরা ক্লিষ্টও নয়। এটা একটা আধুনিক বিকল্প, কার্যকর এবং নিরাপদ। এ ব্যবস্থা থেকেও বেরোবার পথ বিবাহ বিচ্ছেদ— আইনের দিক খোলা, কাজেই আগের বন্ধন এখানে গোড়ার থেকেই বেশ শিথিল বলেই বেরোবার দিনে মারাত্মক কিছু প্রতিক্রিয়া হয় না। যেমন হিসাব করে গুছিয়ে শুরু করা গিয়েছিল মোটামুটি নিরুত্তাপ দাম্পত্য, চিড় দেখা গেলে বা দু'জনের একজনের অন্য কারও প্রতি আসক্তির উদ্রেক হলে আবার তেমনই হিসেব করেই তাঁবু গুটিয়ে ফেলা। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য এটি বেশ কিছুকাল যাবৎ চলিত আছে।

বিনা বিবাহে একত্রবাসও অধুনা-আচরিত আর একটি বিকল্প। বিচ্ছেদের পথে এখানে আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এর শুরুতেও আইন বা অনুষ্ঠানের কোনও ভূমিকা ছিল না। নানা কারণেই দ্বৈমত্য দেখা দিতে পারে; সেটা অলঙ্ঘনীয় হলেও তল্পি গুটিয়ে যে যার পথে রওনা হতে পারে। তিক্ততা না থাকারই কথা, তবু মাঝে মাঝে ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং তখন তিক্ততা দেখা দেয়। সচরাচর এ সব দাম্পত্যে সন্তান আসে না, এলেও তা নিয়ে সমাজ বা আইনের কিছু করণীয় থাকে না, কারণ এর শুরুতে ওই দুটিকে পরিহার করা হয়েছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক কারণে বিবাহ কি তা হলে আজ অবান্তর হয়ে গেছে? এতগুলো বিকল্প দেখে তাই মনে হওয়া সম্ভব। সমাজে এখন যুগপৎ যত রকম দাম্পত্য আছে— সংবিধানসিদ্ধ, সামাজিক ভাবে অনুষ্ঠিত বিবাহ, বিনা বিবাহে সহবাস, বিবাহ ভেঙে অপর সঙ্গী বা সঙ্গিনীর নিবিড় সান্নিধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সহবাস, একে অপরের স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য সহবাস— এ সব গুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের সংশয়; বিকল্পের অনুসন্ধান এবং নানা বিকল্পের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবন্ধনের শৈথিল্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় এবং তখন থেকেই সাহিত্যে এটি বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণাতেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা উচ্চারিত হয় যাতে বিবাহের ভিত্তি সম্বন্ধেই মানুষ সন্দিহান হয়। মনস্তাত্ত্বিকরা এমন কথাও বলেন যে, মানুষ মাত্রেরই যৌনবৃত্তিতে দ্বিচারিতা বা বহুচারিতা প্রকৃতিদত্ত; সমাজ তাকে গোপন করতে শেখায় এবং তার ফলে নানা মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। এ কথা সত্যি হলেও বলতে হয় চুরি করা, মারামারি করা, ইত্যাদি সমাজের পক্ষে অশুভ প্রবণতাও বহু মানুষের অবচেতনে জন্মগত লক্ষণ, সেগুলিকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিলে সমাজ কী করে টিকে থাকবে? আজ তো সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই বাস করে, এইটিই তার পক্ষে কল্যাণকর। পারস্পরিক সাহচর্যে সমাজের যে ছকটি আজ প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে অন্তর্নিহিত বহু বিকৃতি, অন্যায় ও অত্যাচারের অবকাশ আছে ঠিকই, এবং মানুষ যুগে যুগে তার প্রতিবাদ করে তাকে প্রতিরোধ করে সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে, হবেও। তবে দুটি নরনারীর এই একত্রবাসের মূল কাঠামোটা ভেঙে ফেলবে না, কারণ এর মধ্যে তার গোষ্ঠীগত আশ্রয় ও নিরাপত্তা। এটিকে রক্ষা করতে

গেলে অবচেতনে নিহিত— সমাজের পক্ষে হানিকর— বহু প্রবণতাকে নিজের মধ্যে দমন করতে হয় যাতে ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধি বা আপাত-তৃপ্তির জন্যে মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি না হয়।

এমনই এক প্রবণতা বহুগামিতা। আবার বলছি, ঐক্যদাম্পত্যে যেখানে দম্পতির কোনও পক্ষের অন্যায় বা অত্যাচার কিংবা অপমান ঘটে, সেখানে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এবং পরে আবার একটি সুখী দাম্পত্য খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা স্বৈরাচারিতা নয়। সে অধিকার মানুষের সহজাত। একাধিক বারের হলেও; যদি না তা কেবলমাত্র নূতনত্বের সন্ধানে দায়িত্ববোধহীন ছোটাছুটি হয়। কিন্তু বহুচারিতার প্রবৃত্তি যদি নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ না করা হয় তা হলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে তা শুধু দাম্পত্যের ভিতই টলিয়ে দেবে তাই নয় সমাজ দেহে এমন আঘাত করবে যা সহ্য করার কোনও দায়িত্ব সমাজের নেই। যেখানে সমাজের অন্যায় শৃঙ্খলে মানুষ অত্যাচারিত, সেখানে মানুষ অবশ্যই বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ করে অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করবে। কিন্তু যেখানে উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা, সেটা গোষ্ঠী স্বার্থের বিরুদ্ধ। সেখানে সমাজের পক্ষে যা হানিকর তেমন প্রবণতা দমন করার দায় নিশ্চয়ই যে কোনও সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ মানুষের আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা শব্দটি দু' ভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে: শৃঙ্খল ভাঙা অথবা শৃঙ্খলা ভাঙা। শৃঙ্খলাও মাঝে মাঝে শৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তখন তাকে ভাঙলে সমাজের মঙ্গলই হয়। কিন্তু যে শৃঙ্খলা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়', সুস্থ সংহতির জন্য যা আছে, তাকে ভাঙা সমাজ দেহে অকারণে আঘাত করা। সমস্ত উদ্দাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সুযোগ কোনও সমাজই দিতে পারে না। দিলে সমাজে উন্মত্ত তাণ্ডব দেখা দেবে এবং বহু নিরপরাধ মানুষ অকারণে কষ্ট পাবে। বহুগামিতার প্রবৃত্তি সুস্থ দায়িত্ববান মানুষ নিজের মধ্যে নিজের বিবেকের প্রণোদনাতেই দমন করে। কারণ অন্য কারও উদ্দামতা তার স্বার্থকে ঘা দিতে পারে। কাজেই বিবাহ মানেই শৃঙ্খলবন্ধন নয়। যখন বিবাহ সে রকমটা হয়ে ওঠে, তখনকার যা আপদ্ধর্ম তা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে না।

অমৃত কলস

অথর্ববেদ অতি স্পষ্ট নিরাবরণ ভাষায় বলেছে 'কে কাকে এটি দিয়েছে? কাম দাতা, কাম প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। কামের সঙ্গে তোমাকে প্রতিগ্রহণ করছি। কাম, এই তোমার ভূমি, তোমাকে গ্রহণ করুক অন্তরীক্ষ।'[১] যৌন প্রেমের মূল কামনায়, মূল, কিন্তু শেষ পরিণাম নয়। তবু পৃথিবীর এই একটি মাত্র সম্পর্ক যার ভিত্তি যৌন কামনায়, যে কামনা অতল সীমাহীন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে; তাই প্রেমিক বলছে তার প্রেমিককে গ্রহণ করুক অমনই অবাধ সীমাহীন অন্তরীক্ষ। এই মন্ত্রে কামনাসঞ্জাত প্রেমের গম্ভীরতা সমুদ্র ও আকাশের অনুষঙ্গে অনুরণিত। খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো অব্দের মিশরী কবি আমেন মোসে-র কাব্যে শুনি প্রেমিক অসিরিসের মৃত্যুর পর আইসিসের বিরামহীন রোদন, যেন মাঝদুপুরে চিলনীর তীক্ষ্ণ করুণ রব। এই প্রেম পৃথিবীর অসংখ্য কাব্য উপন্যাস নাটকে অভিনন্দিত; সর্বত্র ধর্মীয় অতিকথায় প্রেমের দেবতা ও দেবী কল্পিত হয়েছেন এই আবেগটিকে একটি অতিপার্থিব মহিমায় মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে। একটা কারণ হল, সত্যকার প্রেম সকল মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে না; যার করে, স্পর্শমণির স্পর্শে তার সত্তার উত্তরণ ঘটে এক অপার্থিব লোকে, যেখানে প্রেম আপন মহিমায় বিরাজিত। এই বিষয়ে সারা পৃথিবীর সকল সাহিত্য শিল্পের সাক্ষ্যই এক। সকলেই এর যৌন মূল সম্বন্ধে অবহিত থেকেও উপলব্ধি করেছেন এর যথার্থ অবস্থান এক উজ্জ্বল মহিমায়।

সত্যকার ঐক্যদাম্পত্য-বিবাহের মূল এই প্রেম। তাই আমরা ভারতবর্ষে বলেছি, গান্ধর্ব বিবাহ অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ, গুরুজনের অনুমতি বা নির্দেশনারও অপেক্ষা সে করে না। তাই এই বিবাহের গান্ধর্ব নামের সঙ্গে আছে সঙ্গীতের অনুষঙ্গ। যেন জাগতিক বাস্তবের মধ্যে থেকেও কোনও সুর-লোকের সঙ্গে এর আন্তর-যোগ। এই বিবাহ এমন এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত যা প্রাত্যহিকের মধ্যে থেকেও প্রাত্যহিককে অতিক্রম করে একটি নিত্যকালের রমণীয়তাকে স্পর্শ করেছে। কাজেই ঐক্যদাম্পত্যের এই কল্পনাটি প্রাচীন; বাস্তবেও এর মূল নিহিত

১. ক ইদং কস্মা অদাৎ? কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা। কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি। কামৈতত্তে ভূমিস্ত্বা গৃহণাত্বন্তরীক্ষম্।। অথর্ব (৩:২৯:৬)

ছিল। এই দাম্পত্যের ভিত্তিতে রচিত পরিবারের মধ্যেও একটি মহিমা থেকে যায়। মহাভারত ভরতবংশের বংশধর পুত্র দৌষ্যন্তি ভারতকে সৃষ্টি করেছে গান্ধর্ব বিবাহের সন্তান রূপে। রূপক অর্থ নয়, কিন্তু গূঢ় কোনও সত্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে এ তথ্যটি। এবং এ তথ্যের গভীর তাৎপর্য বিবাহের যৌনমূলকে স্বীকার করেও তাকে অতিক্রম করে প্রেম ও বিবাহের পূর্ণ বিকাশের একটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে। শুধু বৈষ্ণবসাহিত্য নয় সব চিরন্তন সাহিত্যই প্রেমের নানা অনুষঙ্গ স্বীকার করেছে। প্রেমে মোহ আছে। প্রেমিক-প্রেমিকা নাকি পরস্পরকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। যারা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, তারাই কি পায়? তাদের ভ্রম হয় না? কবি বলেন:

যদি প্রেম হয় অমৃতকলস
মোহ তবে রসনার রস॥

থাক না মোহ? দুটি বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী মানুষ মোহের চোখে পরস্পরকে দেখলেও তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এমন আচ্ছন্ন বা কলুষিত হয় না যে, ভাবী জীবন সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনা করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম হবে। মোহ ছাড়াও প্রেমে আছে দুঃখ, বিরহ ও অপ্রাপ্তির আর্তি, নিজেকে অপরের যোগ্য নয় জানার গোপন দৈন্যবোধ ও আরও নানা আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা। পূর্বরাগে শুধু নয়, অনুরাগে, মিলনে, দাম্পত্য পর্বেও এ সবই আসে যায় নানা পর্বে, নানা লগ্নে প্রেমের উপলব্ধির স্তরে স্তরে।

প্রেমে প্রতিষ্ঠিত যে দাম্পত্য ও পরিবার তা বর-বধূকে ধ্বংস করে না বরং তা 'সম্মুখপানে চলিতে চালাতে জানে'; প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করতে জানে। এ পরিবারে যে সন্তান আসে সে পায় মাধুর্যের একটি পরিবেশ এবং তার যথার্থ নিরাপত্তার ভিত্তি এই মাধুর্যের অন্তর্নিহিত শক্তিতে। সম্ভবত মানুষের জীবনে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আকুতিই হল আর একটি মানুষের সঙ্গে সাহচর্যের সহমর্মিতার জন্যে। এই সাহচর্য সবচেয়ে ঋদ্ধ ও সুন্দর হয়ে ওঠে যথার্থ ঐক্যদাম্পত্যে। আবার বলা ভাল, মানুষের সমাজ ঐক্যদাম্পত্য পেয়েছে যৌন যুগ্মতার দীর্ঘ পরিক্রমার পরে। অসংখ্য দম্পতির ক্ষেত্রে এটা দেখা দেয় বিরূপ, বিকৃত, বেসুর ছন্দপাতে। কিন্তু সেটাই এর স্বরূপ নয়। মেকি টাকা বাজারে থাকা মানে কোথাও আসল টাকাও আছে। মেকি টাকার চাপের নীচে সেটি আপাতত অপরিদৃশ্যমান হলেও সে তো মায়ামাত্র হয়ে যায় না। এখন যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার প্রধান কারণ দুটি— প্রথমত, বহু যুগের ঐতিহ্যের প্রভাবে সারা পৃথিবীতে দাম্পত্যে নারীর অধোবর্তন ও অবনমন ঘটেছিল, বর্তমান সমাজ সেটির প্রতিকার চাইছে যাতে বিবাহবন্ধন উদ্বন্ধনে পরিণত না হয়। এ চাওয়া নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত: নারীকে দাম্পত্যের অর্ধাংশ রূপেই থাকতে হবে, অন্য কোনও ভূমিকায় শুধু নারীর অবমাননা নয়, দাম্পত্যেরই অপভ্রংশ ও বিকার ঘটে। দ্বিতীয়ত, বহু বিকৃতিতে, স্বার্থসংকীর্ণ, অহমিকানিষ্ঠ সংঘাতে যুগে যুগে দাম্পত্য থেকে প্রেম অন্তর্হিত হয়েছে। পড়ে থেকেছে শুধু বন্ধনটি। যে হতে পারত সহচর বা সহচরী সে হয়ে ওঠে

কারা-প্রহরী। সহানুভূতির স্থান নেয় তিক্ত বিদ্বেষ, দু'জনের মধ্যে মানসিক আশ্রয়ের পরিবর্তে গড়ে ওঠে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বহু যুগ ধরে বহু দেশে পরিব্যাপ্ত দাম্পত্যের এই অপভ্রংশ মানুষকে সংশয়ী করে তুলেছে দাম্পত্যের আন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে, বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে। এ সন্দেহ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভিত্তিহীন নয়, একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমত সম্বন্ধ করে বিয়ে, যা এখনও বহুল-প্রচলিত, তাতে তরুণ দম্পতিটি কী অনুভব করে, তা নিতান্ত গৌণ হয়ে যায়। তাদের কাছে যে ভূমিকা চাওয়া হত সেটা ছিল ন্যূনতম। আমরা আগেই (দ্বিতীয় অধ্যায় 'কনকাঞ্জলি') দেখেছি, বিবাহ একটি দলগত খেলা। ফলে দলের খেলা ফুরোলে অনেক সময় দেখা যায় যে, বিবাহিত দুটি মানুষের কোনও আন্তরিক সাযুজ্য নেই। বোভোয়া বলছেন, একটি সামাজিক একক হয়ে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যই এবং সমাজের অংশ হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্যই যেন দুটি মানুষ মিলিত হল।[২] অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক বিবাহে বর ও কন্যার সম্মতি জানতে চাওয়া হয়। সম্মতি সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত নাও হতে পারে: নানা রকম চাপে আর্থিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে, নির্ভরযোগ্য বৃত্তি ও আয়ের প্রত্যাশায়, উপযুক্ত বংশমর্যাদার প্রলোভনে, বিবাহিত নামে সামাজিক সমর্থন ও নিরাপত্তার লোভে সম্মতি আসতে পারে। কিন্তু যথার্থ বিবাহের পক্ষে সম্মতি যথেষ্ট নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গভীর আগ্রহ ও তীব্র আকুতিই সেই প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃত বিবাহিত দাম্পত্যের এটাই ভিত্তিভূমি।

প্রাচীন ভারতে অশ্মারোহণ অনুষ্ঠানে বর বধূকে একটি শিলাখণ্ডের ওপরে দাঁড়াতে বলে, 'ওই শিলার মতো দৃঢ় হয়ো আমার জীবনে'। কথাটায় খাঁটি সুর বাজত যদি শিলাখণ্ডের ওপরে দু'জনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে দু'জনেই ওই কথা বলত। অরুন্ধতী দর্শনের অনুষ্ঠানেও যদি দু'জনে বলত ধ্রুব দ্যৌ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা অরুন্ধতী, আমরাও পরস্পরের জীবনে যেন ধ্রুব হই। তা নয়, সমস্ত দাম্পত্যে নিষ্ঠা একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার দায়টা দেওয়া হত বধূটির ওপরে, তার পাতিব্রত্য ছিল অপরিহার্য। তাকে সতী বধূ হতে হবে অথচ ওই সতীর কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দই নেই। তাই ফাঁকি থেকে যায় বিবাহে, তাই দাম্পত্য নড়বড়ে শিলার ওপরে স্থাপিত হয়। দু'জনে একই প্রেমের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যুগপৎ স্থায়ী সাহচর্যের কথা উচ্চারণ করতে পারলে ভিতটা খাঁটি হত। এবং সেটা সম্ভব হতে পারত শুধুমাত্র প্রেমনিষ্ঠ বিবাহেই।

বিবাহে পরস্পরের কাছে শাস্ত্রোক্ত প্রত্যাশাও খুব তাৎপর্যবহ। দ্রৌপদী সত্যভামার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, 'নিরন্তর দাসীর মতো স্বামীদের সেবা করি, তার বিনিময়ে পাই— সন্তান, শয্যা, মহার্ঘ্য, আসন, বসন, মাল্য, গন্ধ, স্বর্ণ ও অতুলনীয় যশ।'[৩] বস্তুগত প্রাপ্তি বিবাহে সর্বোচ্চ

২. 'Marriage is only a means of integration into society' *The Second Sex*. p 447

৩. মহা. বনপর্ব (৩২২-৩২৩)

কাম্য— এ কথা উচ্চরণের মধ্যেই নিহিত দাম্পত্যের অপমান। বিবাহে পুরুষনির্ভর অনুপার্জিকা নারী বস্তুগত ব্যবহারিক নিরাপত্তা নিশ্চয়ই পেত, কিন্তু সেটা তো বিবাহের বহিরঙ্গ। এখানে আন্তর-প্রত্যাশা বা প্রাপ্তির কোনও কথাই নেই, তাই এর মধ্যে বিবাহের স্বরূপকে অনুধাবন করা যায় না। বুঝতে অসুবিধে নেই, এ যশ পতিব্রতার, এবং এর অনুরূপ কোনও যশ পুরুষের কাম্য নয়, কারণ পত্নীব্রত পুরুষ সমাজে অপযশস্বী, তার অভিধা হয় স্ত্রৈণ। এই যেখানে সমাজ অনুমোদিত অধিকাংশ বিবাহের চেহারা, সেখানে আজ এই ঐক্যদাম্পত্যে আস্থাহীন মানুষ যদি নানাবিধ বিকল্প খোঁজে তা হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু তারও আগে পরে কথা থেকে যায়। একটি নারী ও একটি পুরুষ সমস্ত দেহমন দিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করার ফলেই সূচনা হয় প্রেমনির্ভর বিবাহ ও দাম্পত্য। শরীরও এখানে গৌণ নয়, মনও নয়। সমস্ত জীবজগতের মধ্যে শুধু মানুষের মিলনেই মনের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। এটা না থেকে যে মিলন তা তো শুধু জৈব বা বৈষয়িক স্তরেই থেকে যায় এবং সেটা বিবাহের একটা মৌলিক অপূর্ণতা।

দু'জনের মধ্যে নিবিড় মানসিক বন্ধন গড়ে উঠলে দু'জন দু'জনের কাছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি রূপে দেখা দেয়। না হলে বিপত্তি। মানসিক সংযোগ ও মিলন ঘটার পূর্বেই ফুলশয্যা, যা এখনও এ দেশে অধিকাংশ বিবাহেই চলে আসছে। তাতে ওই ব্যক্তিপরিচয়ও গড়ে উঠতে পারে, তবে না গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও খুবই প্রবল। সেখানে ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্থূলতা ও অন্তর্নিহিত অপূর্ণতারও যেন আভাস মেলে। এমন ভাবে যে মিলনের সূচনা তাতে দেহ যেন মাত্রাতিরিক্ত একটা গুরুত্ব পায় যা, আজকে অন্তত, মানুষের রুচিকে পীড়া দেয়। 'এই বিবাহ তত্ত্বগত ভাবে গ্লানিময়, কারণ (এ বিবাহ) দুটি মানুষকে পরস্পরকে শুধু শরীর হিসাবে জানার নরকে ঠেলে দেয়। ব্যক্তি হিসাবে জানতে দেয় না।'[৪] শরীর ও মন সমান প্রাধান্য পেলে তবেই দাম্পত্য সত্যকার একটি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এবং এ ভিত্তির কোনও বিকল্প নেই। 'বিবাহে মনের সাহচর্য, যাকে পাশ্চাত্য জগতে বলে সাহচর্যভিত্তিক বিবাহ, এটি সার্বত্রিক নয়।'[৫] কিন্তু এই পরস্পরের সাহচর্য কামনা, সহমর্মিতা এগুলি প্রেমেরই অপরিহার্য অনুষঙ্গ, কামের নয়। কামনায় তীব্রতা থাকে পরস্পরের আসঙ্গের জন্য, সে-ও খাঁটি, কিন্তু অস্থায়ী, কামনা চরিতার্থ হওয়ার পরও পরস্পরের কল্যাণকামনায় প্রেমে নিরন্তর স্বার্থত্যাগে যে একটি মাধুর্যের সৃষ্টি হয়, শুধুমাত্র কামে তার স্থান নেই। এই সঙ্গকামনাকে স্থায়ী করাই ঐক্যদাম্পত্যের উদ্দেশ্য এবং শুধুমাত্র কামের সে সাধ্যই নেই। প্রেম থাকলে সংকীর্ণ সম্ভোগলিপ্সা নিজেকে অতিক্রম করে নিয়ে আসে সহিষ্ণু ও সুন্দরতর এক পরিবেশ,

৪. 'Marriage is obscene in principal in dooming them to know each other as bodies, not as persons.' *The Second Sex*, p 463

৫. 'The Western concept of companinonship marriage is unusual. Elsewhere marriage is not entered into for the sake of companionship' *Marriage and Love in England*, p 154

যেখানে দু'জনের মধ্যে একটি আকাশ থাকে। সেখানে কল্পনার বিহরণ, সেই কল্পনায় একজন অপরের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে কী প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করে এবং প্রায়শই এই উপলব্ধির মধ্যেই তার কাছে প্রতিভাত হয় তার দিক থেকে অপরের বিকাশের জন্য কখন কতটা স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। ওই আকাশটুকু না থাকলে সে কল্পনা সক্রিয় হয় না, তখন আন্তঃব্যক্তিস্বার্থের কটু সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক ধরনের সংকীর্ণ অহমিকাসর্বস্বতা মুখ্য হয়ে ওঠে। তখন বিবাহ অবাঞ্ছিত বন্ধন। প্রেমে মুক্তিও আছে:

আমার প্রেম রবিকিরণ হেন।
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘিরে যেন।।

প্রেমে অবশ্যই পরস্পরের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু তার মধ্যে সহজাত যে প্রত্যয় থাকে তার দ্বারা ঈর্ষার উদ্রেক ঘটতে পায় না। সংঘাতের বাস্তব কোনও কারণ থাকলেও প্রেমের সম্পর্কে দুটি নারীপুরুষ তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে; একবার নয়, বারবার। কারণ 'প্রেমে ভয় নেই, পরিপূর্ণ প্রেম ভয়কে সরিয়ে দেয়... যে ভয় পায় সে প্রেমে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। প্রেম মৃত্যুর মতোই শক্তিশালী এবং অমোঘ।'[৬] এ প্রেম প্রকৃতিদত্ত বা সহজাত নয়, জীবনে এর উন্মেষ ঘটলে দীর্ঘ কঠিন সাধনার মধ্যে আত্মসমীক্ষার দ্বারা একে প্রতিদিন অর্জন করতে হয়। যাচাই করতে হয়; তবেই পূর্বরাগ অনুরাগের পথ ধরে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়।

> ভয় ছিল না দময়ন্তীর: মধ্যযৌবনা, দুই সন্তানের জননী, দীর্ঘবিরহের মর্মান্তিক যন্ত্রণায় মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, 'নল বিনা তাঁর জীবন অর্থহীন, দুর্বহ। এবং তিনি নিশ্চিত জানেন, নল যেখানেই থাকুন না কেন, দময়ন্তী তাঁর জন্যে ব্যাকুল এ সংবাদ পেলে নিশ্চয়ই দেখা দেবেন।' দেখা গেল, এটা তাঁর অনুমানমাত্র নয়, দৃঢ় প্রত্যয়; তাঁর নির্ভীক প্রেমের ভিত্তি সত্যিই দৃঢ় ছিল। নল এলেন।
>
> এমনই তীব্র আকুতি ছিল রুরুর। প্রমদ্বরার মৃত্যুর পরে জীবন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে প্রতীত হল, নিজের পরমায়ুর অর্ধেকের বিনিময়ে তিনি প্রমদ্বরাকে উজ্জীবিত করেন।

এর মধ্যে স্বার্থত্যাগ আছে। নিজের পরমায়ু ক্ষতিস্বীকার করে প্রমদ্বরার জীবন চাইলেন রুরু, কারণ প্রমদ্বরা বিনা দীর্ঘ জীবন তাঁর কাছে দীর্ঘ অভিশাপ মাত্র। পুরুষের প্রেমের তীব্রতার এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। গ্রিক অতিকথায় আডমিটস-এর অবধারিত মৃত্যু নিবারিত হতে পারত কেবলমাত্র তার বিনিময়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে। অবশ্য কোনও আত্মীয়ই

---

৬. 'There is no fear in love, perfect love casteth out fear   He who fears has not been perfected in love   Love is as strong as death ' *I John 4·18; Song of Solomom 8 6*

রাজি হয়নি, হল শুধু সদ্যপরিণীতা স্ত্রী আলকেস্টিস। এ সব কাহিনিতে প্রেমকে এক নতুন মাত্রায় মণ্ডিত করেছে প্রিয়জনের স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ।

যে-প্রেম শরীরনিষ্ঠ হয়েও শরীরকে ছাড়িয়ে মনকে আশ্রয় করছে তার ওপরে বিবাহের ভিত্তি হলে সে বিবাহ অন্য এক স্তরে উন্নীত হয়। অন্তত যতদিন সে প্রেম সজীব থাকে। যদি সে প্রেমের মৃত্যু আসেও একদিন, তবু তার ওই উজ্জ্বল পর্বটা তাতে মিথ্যা হয়ে যায় না।

প্রেম প্রথম দর্শনে হতেও পারে, না-ও হতে পারে। জীবনে যেমন ভাবেই তার আবির্ভাব ঘটুক, তাতে গভীরতা আনে দুটি মানুষের রুচি, আদর্শ, চিন্তাধারা এবং আবেগনির্ভর সূক্ষ্ম সংবেদনাগুলির সাযুজ্য। আরও একটা বড় উপাদানের অভাবে প্রেম হতমান ও নির্জীব হয়ে পড়ে; তা হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানুষ হিসেবে, প্রেমিক-প্রেমিকা হিসাবে, জীবনের সহযাত্রী হিসেবে। এর মধ্যে নিহিত থাকে পারস্পরিক বিশ্বাসও। (সংস্কৃত শ্রধ্ ধাতু, যার থেকে নিষ্পন্ন শ্রদ্ধা, তার মূল অর্থ, বিশ্বাস।) শ্রদ্ধা যদি হারিয়ে যায় তাহলে মানুষ হিসেবে পরস্পর পরস্পরের কাছে ছোট হয়ে যায়, তখন প্রেমের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা অনুকম্পা বা করুণা হতে পারে; কিন্তু শ্রদ্ধা বিনা প্রেম বাঁচে না, বিনা শ্রদ্ধার দাম্পত্য অনেক সময় দুর্বহ হয়ে ওঠে। এই শ্রদ্ধা দর্শনে বা স্বল্প পরিচয়ে জন্মায় না, পরস্পরকে নিবিড় ভাবে চেনার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যেই এর উন্মেষ ঘটে ধীরে ধীরে। প্রেমনিষ্ঠ দাম্পত্যে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এবং একই সঙ্গে এও সত্য যে, পরস্পরের কাছে শ্রদ্ধেয় থাকার জন্য নিরন্তর দু'জনের এক সাধনাও চলা চাই, যাতে দাম্পত্যের এই দৃঢ় ভিতে কোনও ঘা না লাগে। এর জন্য পরিচয় কিছু নিবিড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেটুকু ধৈর্য এবং সময় দিলে অনেক সময় হঠকারিতার দরুন অনুতাপ এড়ানো যায়। এ কথা ঠিকই, যে কিছুদিন মেলামেশার মধ্যেই দুটি মানুষের মনের সব দিক উদ্‌ঘাটিত হয় না, বিবাহের পরে প্রত্যহ পরস্পরের নতুন নতুন দিক চোখে পড়ে, তার মধ্যে অনাশঙ্কিত দোষত্রুটি বা মানসিক বৈষম্যও ধরা পড়তে পারে এবং তার দ্বারা সংঘাত আসতে পারে। এ-ও সত্য যে, প্রথম অনুরাগ স্বভাবতই অসহিষ্ণু: অদূরদর্শী গভীর ভাল লাগাকে ভালবাসা বলে ভুল করার ইতিহাসও বিস্তর। নতুন প্রেমের কাছে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা কতকটা বেরসিকের মতোই কাজ। তবু সেই মধুর অনুরাগ যাতে তার মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে— এবং প্রেমিক প্রেমিকার কাছে প্রেমের পরমায়ু দীর্ঘায়িত করাও তো এক বাস্তব স্বার্থই— এ জন্যে নিজের আবেগ ও অন্য পক্ষের মানসিকতা একটু ভাল করে বোঝবার মতো সময় নিজেদের দিলে ফলটা শুভ হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্যই এ সব সতর্কতা সত্ত্বেও ভুলবোঝাবুঝি ও বিরোধ দেখা দিতে পারে কারণ:

> সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
> তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

তবু এত কথা উঠছে এই কারণে যে, বিবাহ আনুষ্ঠানিক বা আইনের দ্বারা সিদ্ধ হোক, অথবা গান্ধর্ব মতে একত্রবাসের পরওয়ানাই হোক, বিবাহের দ্বারাই দাম্পত্য প্রতিষ্ঠা হয় ও

পরিবারের সূচনা হয়। এবং এখনও পর্যন্ত সমাজ যেখানে যতটা এগিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, এ ভাবে দুটি নারী পুরুষ যখন কাছাকাছি আসে, থাকে ও সন্তানকে আনে, দু'জনের রচিত গৃহনীড়ে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, দুর্গত, পীড়িত মানুষ যেখানে বিপদে, প্রয়োজনে আশ্রয় পায়, তখন এই সহাবস্থানকে আইনে অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ ভাবেই বিবাহ আখ্যা দেওয়া চলে। যে নীতিটা দম্পতির পক্ষে অনুসরণ করা আবশ্যক তা হল, তারা যেন যথাসাধ্য পরস্পরের বা সন্তানের বা সে পরিবার-সম্পৃক্ত অন্য কারও কোনও ক্ষতির নিমিত্ত না হয়। দম্পতির যে কোনও একজন তৃতীয়ের প্রতি যদি এমন ভাব আসক্ত হয় যাতে তার কাছে পুরাতন প্রেম অর্থহীন হয়ে যায় ও সেই তৃতীয়ের সঙ্গে মিলনেই শুধু জীবন অর্থপূর্ণ হয়, তা হলেও পূর্ব সম্পর্কের সঙ্গীর সঙ্গে খোলাখুলি এ বিষয়ে কথা বলে সে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর এবং সন্তানের প্রতি যাতে যথাসম্ভব কম অবিচার হয় সে ব্যবস্থা করে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ভাল। এর জন্যে প্রয়োজন দায়বদ্ধতার মানসিকতা; পরস্পরের প্রতি, সন্তানের প্রতি এবং পটভূমিকায় যে সমাজ আছে তারও প্রতি। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেও কখনও কখনও মানুষ সুফল পেয়েছে এবং উত্তরকালে সে নিজেই বলেছে, ভাগ্যে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ সরে যায়নি! আবার সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেও নতুন আকর্ষণ থেকে সরে থেকেছে। সংসারটাকে বজায় রেখে বাইরে থেকে পরস্পরের প্রতি ও সন্তানের প্রতি পূর্ণ কর্তব্য পালন করার আনন্দে সান্ত্বনা পেয়েছে, নবতর আকর্ষণ থেকে সরে থাকার এমনও বহু দৃষ্টান্ত আছে। কখনও বা অসুস্থ স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি মমতাবশে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং আত্মার গভীরে পারস্পরিক দায়বদ্ধতার কাছে খাঁটি থাকার পুরস্কারে শান্তি পেয়েছে এমনও শোনা গেছে। কখনও বা প্রথম প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ করে নিজের অন্তরে আত্মসম্মানবোধকে অপ্রতিহত রাখবার পরিতৃপ্তিতে স্বস্তি পেয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

শেষ কথা কে বলবে? অনুরাগ প্রেম-মিলন-বিবাহ-দাম্পত্য-সন্তান-পরিবার যে দীর্ঘ তন্তুতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তার সূচনাতে যদি নারীপুরুষ তলিয়ে দেখে যে একে অন্যকে বাদ দিয়ে থাকতে পারবে না, মিলিত হতে না পারলে জীবন নিরর্থক হবে এবং তার সঙ্গে যদি এ-ও অনুভব করে যে, এ প্রেম এমনই ঋদ্ধ যে এর জন্যে অনেক ক্ষতি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করা যায় এবং তারা মনে মনে নিজেকে সে জন্যে প্রস্তুত করে, তা হলে অনেকটা স্থির ভিত্তির ওপরে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দু'জনেরই জীবনে অন্য অনুরাগের সম্ভাবনা প্রথম থেকে স্বীকার করে দ্বার মুক্ত রাখার সাধনাও করা প্রয়োজন। হয়তো কোনও দিনই অন্য অনুরাগ দেখা দেবে না, কিন্তু দিতে পারে— এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা মূর্খতা। যদি দেখা যায়, তা হলে সে নিয়ে যেন তিক্ত সংঘর্ষ না হয় তেমন মানসিক প্রস্তুতি এবং সাধ্যমতো, অন্তত নিজের কাছে অপরকে যথাসম্ভব প্রসন্নচিত্তে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন। সত্যই এ কাজ সহজ নয়, কিন্তু নিজেকে বলা প্রয়োজন, 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।' প্রেম অপরের প্রতি যে অধিকার দেয়, তা ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ নূতন অনুরাগ পুরাতন প্রেমকে আচ্ছন্ন না করে। করলে অবশ্যই মর্মের গভীরে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে এবং তা

দুঃসহ, দুর্বহ; কিন্তু প্রেমের মূল্যও নানা ভাবেই মানুষকে দিতে হয়। এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নবীন অনুরাগ দীর্ঘায়ু হয়নি। প্রথম প্রেমের কাছেই ফিরতে হয়েছে। তখন অপরপক্ষের রুষ্ট বা বিমুখ না হওয়ার সাধনাও প্রয়োজন। ভুললে চলবে কেন যে, কোনও বস্তু ভাঙা সহজ, জোড়া কঠিন এবং সেটি সাধনাসাপেক্ষ। এমন ভাবে দ্বিতীয়বারে জোড়ার পরেও দাম্পত্য মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রবাহিত হচ্ছে, তা-ও বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

ভবিষ্যৎ

এখনকার সমাজে দাম্পত্য সংঘর্ষের একটা মূল হেতু হল সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিলাসের উপকরণ বাহুল্য। মেয়েরাও পিতা মাতার ওপর চাপ সৃষ্টি করে: চাই বহুবিঘোষিত অলংকার, আসবাব, মহার্ঘ্য বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্র, যার দ্বারা গৃহকর্মে সময়লাঘব হয়; তা ছাড়াও প্রদর্শন মূল্য আছে এমন বহু সব বস্তু। এ সবের সঙ্গে তারা দূরদর্শনের প্রদর্শিত যে সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয় দাম্পত্যের জীবনযাত্রার চিত্র দেখা যায়, যার মধ্যে জীবন সম্বন্ধে কোনও সুস্থ বোধ প্রায়শই অনুপস্থিত, তার দ্বারা প্রভাবিত হয় কিশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণীর চিত্ত। প্রায়ই উপকরণ বহুল সুসজ্জিত বাড়ি, বাগান, গাড়ির পরিবেশে শুরু হয় ছবি। ক্ষণে ক্ষণে উদ্দাম যৌন প্রেরণার চমক উত্তেজক বেশেবাসে প্রায় নগ্ন নারীপুরুষের অবাধ দায়িত্ব-বোধহীন নাচে, বোধবুদ্ধিহীন চটকদার সংলাপে, যথেচ্ছ আচরণে, এবং সম্পূর্ণ জাদুকরী মায়ায় শেষ পর্যন্ত সব আপাত সমস্যার একটা সুরাহা হওয়ার দৃশ্য। এর মধ্যে থাকে প্রচুর ষড়যন্ত্র, আদিম বর্বরতা, হিংস্র আক্রমণ, প্রচুর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা; অনিবার্য ভাবে থাকে গুলি, বারুদ, ধর্ষণ ও গুণ্ডামি, বহু কুসংস্কার ও প্রচলিত ধর্মবোধের ও অলৌকিকের উপাদান। এ দৃশ্য দিনের পর দিন দেখার ফলে যে ধরনের স্থায়ী মস্তিষ্কবিকৃতি দর্শকের অবচেতনে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হতে থাকছে, তার একটা ফল জনমানসে অনিবার্য ভাবে দেখা দেবেই।

পাশাপাশি পরিবারে যদি সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ থাকে, বিদ্যালয়ে ও কর্মস্থলে যদি বিকল্প সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা এ সব বিকৃত মানসিকতার সমালোচনায় ছেলেমেয়েরা যোগ দেয়, পৃথিবীর সুস্থ সংস্কৃতি ও সুন্দর ঐতিহ্যের ভাণ্ডার যদি তাদের সামনে উদ্ঘাটিত করা যায় তা হলে— হয়তো এই আগ্রাসী পণ্যলোভাতুরতা থেকে নিষ্কৃতি মেলে। তা হলে হয়তো, দাম্পত্যে প্রবেশের মুখেই দুটি নরনারী মনের মধ্যে বস্তু ও ভোগের অদম্য বাসনা নিয়ে নবজীবনে প্রবেশ করে না। ইদানীং বহু কর্মক্ষেত্রে পারিশ্রমিক যে রকম অকল্পনীয় ভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে, ব্যবসায়ীর সামনে পৃথিবীর সমস্ত বাজার খুলে যাওয়ার সমৃদ্ধি তথা ভোগ্যপণ্যলাভের যখন কোনও সীমাই আর নেই, তখন মানুষ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জীবন সম্বন্ধে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছে। নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যেও অন্ধগলিপথে যে বিপুল পরিমাণে টাকা পুঞ্জিভূত হয়ে কালোবাজারে পৌঁছচ্ছে তাতে সৎ দরিদ্র ব্যক্তিকে

ক্রমেই মূর্খ ও কৃপাপাত্র বলে গণ্য করা হচ্ছে। চোখের জলে এক অতি ধনীর সুন্দরী তরুণী গৃহিণী বলেন, 'পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে সব রকম কাম্য ভোগ্য পদার্থ এনে দিয়েছে স্বামী, দেয়নি এতটুকু ভালবাসা, মমতা।'

'ভালবাসা নেই তো এত দামি সব জিনিস আনে কেন?'

'ওর ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন। তা ছাড়া, ওর পার্টিতে আমার অঙ্গে এ সব কাপড়-গয়না ওর পদোন্নতির উপায়। ওর সহকর্মীদের ঈর্ষা উৎপাদন, ওর ওপরওয়ালার উদ্যত কামনা আমার ওপরে। এর নানা পরিণতি হতে পারে; কোনওটাতেই ওর আপত্তি নেই যদি তাতে ওর সামাজিক অধিরোহণের পথটা খুলে যায়।'

'তোমার কী প্রতিক্রিয়া?'

'হয়ত লোভে তলিয়ে যাব কোনও নরকে। নইলে এই প্রেমহীন কুবেরপুরীতে ঐশ্বর্যে, সুরায়, উন্মাদনায় ভুলতে চেষ্টা করব যে এটা নরকই।'

এটি একটি বাস্তব সংলাপ এবং এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত বাস্তবে আছে। এমন কথা বা এর প্রতিধ্বনি ইতস্তত মাঝে মাঝেই শোনা যায়। অতিভোগ যে দাম্পত্যকে বিপথে নিয়ে যায়, সুখের বদলে দেয় সম্ভোগ, এ আজ ঘরে ঘরেই দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়, জীবন যখন একটাই, তখন যতটা ভোগ করে নেওয়া যায় তার চেষ্টা করতে দোষ কী? দোষ প্রথমত, ওই নগ্ন অতিলুব্ধতা মানুষের কুৎসিত একটি রিপু, যা অশুভ এবং অশুচি। দ্বিতীয়ত, এই লোভের ভোগের আতিশয্যে মানুষ সেই সব কিছুকে হারাতে বসেছে যা জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। প্রেম, আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তৎপরতা, নতুন সুন্দর এক পৃথিবী রচনার স্বপ্ন। কুবেরের সাধনা শ্রীকে পরাহত করছে, অতিভোগের লালসা দাম্পত্যকে কলুষিত করছে।

চোখের সামনে অতি দ্রুত মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। আজকের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী প্রতিদিনই এই অবনমিত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। প্রচারমাধ্যম যে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন ছবির পর্দায় তুলে ধরেছে, এরা এদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে ওই ঐশ্বর্যের মধ্যে কল্পনায় নিজেকে প্রতিস্থাপিত করে। ফলে বাস্তবে যখন তা সম্ভব হচ্ছে না তখন দম্পতির জীবনে দেখা দিচ্ছে অন্তঃকলহ, একে অপরকে দোষ দিচ্ছে ওই অবাস্তব স্তরের ঐশ্বর্য না পাওয়ার জন্যে। এর জন্যে প্রয়োজন সুস্থ জীবনবোধ, যুক্তিনির্ভর আলোচনা, বাস্তববোধ ও ভোগ্যপণ্যের মাদকতা থেকে আত্মরক্ষা করবার মতো আত্মসংযম। একবার যদি দাঁড়িপাল্লায় তারা মেপে দেখে যে টাকা দিয়ে যা কেনা যায় এমন বস্তুর বিনিময়ে তারা হারাতে বসেছে, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় না সেই প্রেম— তা হলে ঐশ্বর্যের মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ছোটা থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারে। উপকরণবাহুল্যের মধ্যে যে কুরুচি ও নগ্ন লুব্ধতা আছে তাকে স্বরূপে চিনে তা পাওয়ার উদগ্র বাসনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এত কথা বলার কারণ গণমাধ্যমের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে নতুন নতুন চ্যানেল যুক্ত হচ্ছে এবং সরকার গ্রামে গ্রামে দূরদর্শন পাঠাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সরকারের দিক থেকে

গণশিক্ষার উদ্দেশ্য এখানে গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য হল বহুজাতিক সংস্থার অসংখ্য ভোগ্যপণ্য সম্ভারের যে অজস্র সমাবেশ তার জন্য ক্রেতা চাই। দূরদর্শনের দর্শক সেই সম্ভাব্য ক্রেতা। কোনও দম্পতি যদি এই গূঢ় অভিসন্ধি বুঝতে পেরে দুরন্ত লোভ সংবরণ করতে পারে, নিজেদের আয়ের পরিমাপে ক্রয়ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে পরস্পর আলোচনা করে তাহলে বহু অসম্ভব লোভের ও অতৃপ্তির অন্তর্জ্বালা থেকে রক্ষা পায়, তাতে শুধু টাকাই বাঁচে না, বাঁচে দাম্পত্য শান্তি।

দুটি মানুষ, যারা আগামী প্রজন্মের সূচনা করবে নিজেদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে, যারা আগামী পৃথিবীকে, অত্যন্ত স্বল্পাংশে হলেও নির্মাণ করবার দায়িত্ব নেয় নিজেদের মিলনের সূত্রে, তারা পরস্পরের কাছে সমকক্ষরূপে প্রতিভাত হলে তবে মিলনে একটি মর্যাদা আসবে যা অন্যথা অসম্ভব। শ্রেয় এবং হেয়, প্রভু এবং ভৃত্য, আজ্ঞাকারী এবং আজ্ঞাবাহীর মধ্যে কোনও সমতা আসা সম্ভব নয়। এবং, সেই কারণেই দায়িত্ব এবং অধিকারের অসম বণ্টন নিয়ে নানা বিপত্তি দেখা দেয়। তখন চুলচেরা হিসেব হতে থাকে দায়িত্ব ও অধিকারের ন্যূনতা ও আধিক্য নিয়ে— অশান্তি পরিণত হয় সংঘাতে। কখনও বা সে সংঘাতের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন ঘটে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ সঙ্গে নিয়ে আসে তার বহুতর জটিল অনুষঙ্গ। বিবাহ ব্যাপারটাই যদি প্রেম নির্ভর ও পরস্পরের শ্রদ্ধা বিশ্বাস, মানসিক সৌজন্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা আইনে নিষ্পন্ন হোক বা অনুষ্ঠানে অথবা সম্পূর্ণ নিরনুষ্ঠান গান্ধর্বমিলনের দাম্পত্য হোক, তার নিজস্ব একটি স্থির মহিমায় যে বিরাজিত থাকে। পরিবর্তন, অথবা বিপর্যয় ঘটতে পারে কিন্তু যতক্ষণ তা না ঘটে— এবং কখনও কখনও আদৌ তা ঘটে না— ততক্ষণ এমন এক মানবিক সত্যে এর ভিত্তি স্থাপিত থাকে যে নরনারীর মিলনের অন্তর্নিহিত যথার্থ সৌন্দর্য তাকে মূল্যবান করে তোলে। 'বিবাহ যে রকমই হোক না কেন, এটি একটি উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত চুক্তি এবং এ চুক্তি আদর্শ ভাবে সফল হত যদি দুটি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর মানুষ শুধুমাত্র পারস্পরিক প্রেমের অনিরুদ্ধ প্রবর্তনায় মিলিত হত।'[১] যতক্ষণ পর্যন্ত এ মিলন সজীব থাকে ততক্ষণ গার্হস্থ্য, আর্থিক সামাজিক বাধায় এর কোনও ক্ষতি হয় না। সমস্যা হয় প্রথমত যখন দুটি মানুষ আন্তর আবেগের প্রবর্তনায় কাছাকাছি আসে না। অথবা জীবনের এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপটি সম্বন্ধে যখন কতকটা অসহিষ্ণুতা বা চাঞ্চল্য থেকে যায়, ফলে পরস্পরকে চিনবার, জানবার ও বোঝবার জন্য প্রাথমিক ভাবে যে সময়টুকু দেওয়া দরকার সেটাকে সংক্ষিপ্ত করে কিন্তু পরে পশ্চাত্তাপে শোধ করে অসহিষ্ণুতার এই মূল্য। এ ধরনের পরিণাম এড়ানো যায়— সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকটাই। স্বীকার করাই ভাল যে, প্রথম প্রেম স্বতই দুর্বার, কতকটা বা অন্ধও। ঠিক এই

১. 'The deal . would be for entirely self sufficient human beings to form unions one with another only in accordance with the untruncated dictates of their mutual love.' *The Second Sex*, p 490)

কারণেই একটু সময়, একটু গভীরে চেনাজানা, পরস্পর সম্বন্ধে এবং নিজের আন্তরিক আবেগকেও চেনা ও পরীক্ষা করার ধৈর্যটুকু ওই আবেগনির্ভর গান্ধর্বমিলনকেই দীর্ঘ পরমায়ু দিতে পারে। এ-তো প্রেমিকযুগলের স্বার্থেই। প্রেম কিছু আত্মত্যাগের প্রেরণা দেয় যা শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ বা পাতিব্রাত্য দিতে পারে না। এইখানেই প্রেমের অপরাজেয় শক্তি, যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ। যে বিবাহ বা দাম্পত্য এই প্রেম থেকে সঞ্জাত, তার অগ্নিপরীক্ষা নিজের মধ্যেই ঘটে এবং সে পরীক্ষায় জয়ও আসে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে। সে প্রেমে ভয়ের স্থান নেই এবং সেই প্রেমেই গান্ধর্বমিলন, বিবাহ বা দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা। প্রেমনির্ভর মিলন ও বিবাহ আনুষ্ঠানিকই হোক বা নিরনুষ্ঠানই হোক, তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যুগলজীবনের দাম্পত্যের যে সুষমা ও দীপ্তি তা যুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ করেছে, করবেও। তার কারণ, মানুষ এখনও এর কোনও বিকল্প পায়নি।